পরিশ্রম সার্থক করেন। যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, সে আপাততঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের-দণ্ড অবশ্যম্ভাবী এবং যথাসময়ে হইবেই হইবে। মানুষ-বিচারকের বিচারে ভুল হয়;—কত সময় নির্দ্দোষীর দণ্ড ও দোষীর অব্যাহতি হইয়া থাকে, গুরু পাপে লঘু দণ্ড ও লঘু পাপে গুরু দণ্ডও হইয়া থাকে। কিন্তু ন্যায়বান্ ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে ঠিক্ ওজন হয়; যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনি ফল বিচার হইয়া থাকে। তিনি চুল চিরিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করেন, তাঁহার বিচারে কখনও কোনও অন্যায়, ভ্রম বা পক্ষপাত হইতে পারে না।

"আখেরে জানিবে বান্দা হিসাবের কালে" এই বাক্যটী প্রত্যেক হিসাবদায়ী প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্যের মনে রাখা উচিত। ইহা মনে রাখিলে হিসাব করিয়া সকল কার্য্য করা যায়—যাহার প্রতি যাহা ন্যায়-সঙ্গত, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা যায়—অন্যায়াচরণে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা মনে রাখিলে জীবনকে ছেলের হাতের খেলার জিনিষ মনে করিয়া যেমন তেমন্ করিয়া ব্যয় করা যায় না। জীবন ঈশ্বরের অমূল্য দান, এই দানের সদ্ব্যবহারের জন্য আমি জীবনদাতার নিকট দায়ী। জীবনের এক মুহূর্ত্তকালের যদি অপব্যবহার করি, তাহার জন্য দণ্ডভাগী হইতে হইবে। যিনি কেবল ইহকালের বিচারক নহেন, পরকালেরও বিচারক, তাঁহার বিচারে খাঁটি থাকিতে পারিলে আর ভয় কি?—ভাবনা কি?

সকল ধর্ম্মই পাপীকে ভয় দেখাইয়া পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মৃত্যুর পর নরকভোগ বা তাদৃশ অন্য কোন ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর যেমন দণ্ডদাতা পিতা, তেমনি তিনি করুণাময়ী জননী। তিনি যে ইহকালের পরিমিত পাপের জন্য মানবাত্মাকে অনন্তকাল দণ্ড দিবেন, ইহা মনে করা যায় না। পিতা মাতার তাড়না যেমন সন্তানের সংশোধনের জন্য, তাঁহার দণ্ড ব্যবস্থাও পাপীকে পবিত্র করিয়া তাঁহার প্রেমক্রোড়ে লইবার জন্য। তথাপি পাপীর প্রত্যেক পাপের জন্য তাহাকে ধর্ম্মের দণ্ডাঘাত সহ্য করিতে হইবে, অনুতাপের তুষানলে পুড়িতে হইবে, এবং হৃৎপিণ্ড গলাইয়া অশ্রুর তর্পণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যত নরক-যন্ত্রণার ভীষণ বর্ণনা আছে, তাহার কোনওটীই আত্মগ্লানির যন্ত্রণার সমতুল্য নহে। মানুষ যে পাপ করে, যখন তাহার জন্য চেতনা হয়, তখন তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। যত পাপ স্মরণ, ততই গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্দাহ। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা। ইহকালে অনেক স্থলে হাতে হাতে পাপের ফল ভোগ হয় দেখা যায়, কিন্তু আবার অনেক স্থলে দেখা যায় না। এখানে মানব পাপের অসাড়তায় ও সংসারের মোহ কোলাহলে অচেতন হইয়া থাকে।

যে এখানে জাগিল না, যে এখানে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল না, বিচারপতি পরকালে তাহাকে জাগাইবেন এবং তাঁহার ন্যায় দণ্ড বিধান করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইবেন। অতএব সময় থাকিতে থাকিতে সকলে জাগ, এখানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাও, পরলোকে দণ্ডের হাত এড়াইবে এবং অপার সুখশান্তি ভোগ করিবে। পাপভারাক্রান্ত হইয়া যে পরলোকে যাইবে, বিচারপতির মহাবিচারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। সে বিচারকালে আর কেহ থাকে না "খোদা আর বান্দা" ঈশ্বর ও মানবাত্মা; ঈশ্বর বিচার করিয়া ফল বিধান করেন, আত্মা বিচারিত হইয়া যথোচিত দণ্ড ভোগ করে।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতং॥

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, একাকী স্বীয় দুষ্কৃতির ফলও ভোগ করিয়া থাকে।

কলালাপ।

(৩৯৫ সংখ্যা,—৩০৯ পৃষ্ঠার পর)

২১। তণ্ডুল-কুসুম-বলি বিকার,—তণ্ডুল-ফুল-ফল-পত্রাদি দ্বারা নানাপ্রকার পূজোপহার নির্ম্মাণ করা। এখন দ্রব্যময় উপহার দ্বারা দেবপূজা করেন, এরূপ আচারী হিন্দু হিন্দুসমাজে অল্পই আছেন। ঈশ্বরদত্ত পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করা এখন উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে এককালে নানাবিধ উপাদেয় বস্তু দ্বারা পূজোপহার নির্ম্মাণ করা একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং তাহা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিতে হইত। খৃষ্টান্‌দিগের রোমান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়মধ্যে পূজোপহার প্রদান-প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের আদিম প্রবর্ত্তক বোধ হয়, হিন্দুগণের পূজাপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। পূজাঙ্গরূপে হউক, না হউক, একটী পুরাতনী ও মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া এই কলাটীর পুনঃসংস্কার হওয়া মন্দ নহে।

২২। মণি-ভূমিকাকর্ম্ম,—বিবিধ বেশরচনা এবং কাচ, প্রস্তর স্ফটিকাদি দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ। বিবিধ বেশরচনা বিষয়ক ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। মহাভারতের পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, ময় নামক কোন দানব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ময়নির্ম্মিত সভাগৃহ কিরূপ আশ্চর্য্য ও মনোহর, তাহাও মহাভারতে বর্ণিত আছে। কুরুক্ষেত্রের যে মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয়

পাইয়াছিল, ময়নির্ম্মিত সভাগৃহই তাহার বীজ নিদান। ঐ সভাগৃহের মণিভূমিকায় মহারাজ দুর্য্যোধনের মহান্ ভ্রম জন্মিয়াছিল। জলভাগে স্থল ও স্থলভাগে জল ভ্রম হইয়াছিল। ভিত্তিতে দ্বার ও দ্বারে ভিত্তি বোধ হইয়াছিল। ভ্রমবশাৎ জলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়াছিল, মস্তকে ভিত্তির আঘাত লাগিয়াছিল। মহাভারতে ইত্যাকার বর্ণনা আছে। দুর্য্যোধনের ঐ সকল ভ্রমবিজৃম্ভিত কার্য্য দর্শনে ভীমাদি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহাতে দুর্য্যোধনের অতিশয় ক্রোধ ও অভিমান জন্মিয়াছিল। এই ক্রোধ ও অভিমান হইতেই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জন্মে। কপট পাশক্রীড়া ঐ প্রবৃত্তির ফল। ময়নির্ম্মিত সভাতলে দুর্য্যোধনের লাঞ্ছনা দর্শনে সভাস্থ সকলেই ভাবী মহানিষ্টের শঙ্কা করিয়াছিলেন। সেই দূরদর্শী ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের শঙ্কা বিফল হয় নাই।

এই মণিভূমিকাকর্ম্ম যে বর্ত্তমানে এককালে লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ক্রিষ্টাল্ প্যালেস" এবং রাজা বদ্রিদাসের মাণিকতলাস্থিত ঠাকুরবাড়ী ঐ বিদ্যার নিদর্শন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য প্রস্তরময় গৃহ ও দেবমন্দিরাদি আছে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক্ মণিভূমিকা কর্ম্ম নহে। ঐ বিদ্যাজাত গৃহাদিতে একটু বিশেষ বৈচিত্র আছে। যদিও ঐ বিদ্যার বিশেষ প্রচলন এখন নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ ক্ষতিও নাই। তাদৃশ গৃহাদির নির্ম্মাণ কদাচ হইয়া থাকে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঐ বিদ্যাবিৎ লোকও খুঁজিয়া পাইবেন।

২৩। উদকবাদ্য—তাল সংযোগে বাদ্য। সপ্তদশসংখ্যক কাচের বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের তাল রক্ষা করিয়া কিরূপে তালতরঙ্গবাদ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তালপূর্ণ বৃহৎ পাত্র, মৃন্ময় বা ধাতুময় কলস ও হণ্ডিকা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে মৃদঙ্গাদির ন্যায় মধুর বাদ্যের সৃষ্টি হয়। এই বাদ্য ঢোলক, তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ হইতেও কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। এখন আর উহা প্রায় দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা ঐ সকল যন্ত্র-বাদ্য শিক্ষা করেন, তাঁহারা অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার উদকবাদ্যের অনুশীলন করিতে পারেন। উহাতে ব্যয়াধিক্য বা কার্য্যসঙ্কট কিছুই নাই। বিশেষতঃ শ্রীপঞ্চমীমেলায় গীতবাদ্যের অনুশীলন যত অধিক হয়, ততই ভাল।

২৪। উদকঘাত,—জলস্তম্ভনী বিদ্যা। এই বিদ্যাপ্রভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা জলমধ্যে অবস্থান করা যাইতে পারে। মৎস্য ধারণ, মৌক্তিকাদি উত্তোলন, জলমগ্ন বস্তুর উদ্ধার এবম্বিধ কার্য্যে ঐ কলার সবিশেষ উপযোগিতা আছে। তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ঐ বিদ্যা দ্বারা বিপদ্ হইতেও আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তিকে দস্যু বা হিংস্র জন্তুতে আক্রমণ করে, আর তাহার ঐ বিদ্যা জানা থাকে, সে নিকটস্থ জলাশয়ে

প্রবেশ করিয়া অনায়াসে প্রাণরক্ষা করিতে পারে। গদাযুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন 'জল-স্তম্ভনী বিদ্যার প্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত ছিলেন। শুনা যায়, ঠগি-কমিসনার ব্র্যাকিয়ার সাহেবের শাসন-কালে, অনেক অপরাধী জলমধ্যে আশ্রয় লইয়াও ধৃত হইয়াছিল। তাহারা জলস্তম্ভনী বিদ্যা জানিত না,—এক একটা সছিদ্র কৃষ্ণবর্ণ দগ্ধহণ্ডিকা (কেলেহাঁড়ী) মাথায় দিয়া জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া দিন যাপন করিত। ঐরূপে লুক্কায়িত একটা দস্যু দৈবাৎ ধৃত হওয়াতে দস্যুগণের নবাবিষ্কৃত আত্ম-গোপন-কৌশল এককালে বিফল হইয়া যায়। ঐ বিদ্যা জানা থাকিলে তাহারা ধরা পড়িত না।

২৫। বিশেষকচ্ছেদ্য,—শারীরিক বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য দর্শনে মানুষের মানসিক সুখ সচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন মনে সুখ থাকে না, তখন শারীরিক বেশবিন্যাস দূরে থাকুক, আহার বিহার শয়নাদি অপরিহার্য্য নিত্য কার্য্যও ভাল লাগে না। কিন্তু কলালাপে দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ বেশ বিন্যাস ও শয়নসাচ্ছন্দ্য সম্পাদনার্থ কয়েকটী কলার সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক সুখানন্দের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা ধারাবাহিকরূপে সেই কলা কয়টীর উল্লেখ করিতেছি। "বিশেষকচ্ছেদ্য" এই কলাটীর অর্থ,—তিলকে নানাবিধ বিচ্ছেদ রচনা। যাঁহারা প্রতিদিন আহ্নিক পূজার পূর্ব্বে দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করেন,—তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে,
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনম্
ত্রিবিক্রমং কন্ধারেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥

ব্রহ্ম যে সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিলক-ধারণ-কালে দ্বাদশাঙ্গে অনন্তনাম ব্রহ্মের দ্বাদশটি নাম স্মরণ করিবার বিধি আছে। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধারে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিদেশে দামোদরকে স্মরণ করিবে। চন্দন, গোপীমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি অনেকগুলি বস্তু দ্বারা তিলক ধারণ করা হয়। এই তিলকে নানাবিধ বিচ্ছেদ রচনা করা বা নক্সা কাটার নাম বিশেষক-চ্ছেদ্য। মনে প্রচুর পরিমাণে ভক্তি-রস না থাকিলে আর ঐ সকল কার্য্য হইয়া উঠে না।

২৬। কেশশিখরাপীড়যোজন,—বেণীরচনা, কবরীবন্ধন, চূড়াধারণ, কেশকুঞ্চনাদি দ্বারা মস্তকের বেশ বিন্যাস। রজত কনক দাম, পত্রকুসুম মাল্যাদির সংযোজনও উহার অন্তর্গত।

কাল সহকারে এই কলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঢাকা অঞ্চলের স্বর্ণকারেরা রমণীগণের বহুবিধ শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ফুল, কাঁটা, ভ্রমর, প্রজাপতি, চিরুণী, বাগান ইত্যাদি। বিলাতী বিলাসিনীগণ যদিও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কেশকবরীতে কিছু ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের টুপিতে এই কলার চূড়ান্ত বিলাস দেখা যায়। কোন কোন মেম সাহেবের টুপির উপর এত লতা-পাতা-ফল-ভ্রমর-প্রজাপতি দৃষ্ট হয় যে বোধ হয়, যেন এক একটী বাগান মাথায় করিয়া চলিয়াছেন। আপীড় শব্দে পাখীর পাখা। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে হিন্দু রমণীগণ মস্তকে বিবিধ পক্ষীর পালক ধারণ করিতেন। এখন সভ্য মেমেরা ও অসভ্য রমণীরা পক্ষীর পালক দ্বারা মস্তকের বেশ রচনা করিয়া থাকেন।

২৭। কর্ণপত্রভঙ্গ,—শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণী নামক টীকায় চতুঃষষ্টি কলার ব্যাখ্যা আছে। তাহাতে এই কলাটিকে কর্ণের চিত্রময় অলঙ্কার বলা হইয়াছে। কর্ণের ধাতুময় ও মণিমাণিক্যময় বিবিধ আভরণ ও তন্নির্ম্মাণের বিদ্যা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রময় আভরণত কিছুই দেখা যায় না। উড়েরা কাণে শ্বেত ও রক্তচন্দনের ২।৪ টা বিন্দু ধারণ করে এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কর্ণের নিম্নভাগে রক্ত চন্দনের এক একটী গোলাকার ফোঁটা ধারণ করেন, ইহাই দেখা যায়। ফলে এই কলাটীর অর্থ ভাল বুঝা গেল না।

২৪। শয়ন রচন,—পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ। যদিও খাট, তক্তপোষ, চৌকি, কোচ, নৌকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্ববর্ণিত তক্ষণের অন্তর্গত, তথাপি শুদ্ধ শয়নার্থ পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ একটি পৃথক্ কলার মধ্যে পরিগণিত। "একবিদ্যা সুশিক্ষিতা"। একজনে পাঁচ কাজ করিলে কোন কাজ ভাল হয় না। এই জন্য কেবল শয়নবিলাসিগণের শয়নাধার নির্ম্মাণার্থ একটী পৃথক্ কলার সৃষ্টি হইয়াছিল।

২৯। চিত্রাযোগ—বিবিধ অদ্ভুত বিষয় প্রদর্শন। ছায়াবাজী, ম্যাজিক্, সহরবিন, নখদর্পণ ইত্যাদি ব্যাপার এই বিদ্যার ফল। রাত্রিকালে অল্পালোক-ভাসিত স্থানে বস্ত্রাবাস মধ্যে কাষ্ঠ, কাগজ, তালপত্রাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করে। সেই সকল ক্রীড়াশীল পুত্তলিকার ছায়া বস্ত্রে পতিত হয়। বহিঃস্থ দর্শকগণ তদ্দর্শনে আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার নাম ছায়াবাজী।

ম্যাজিকের প্রকরণ প্রায় ঐরূপ, কিন্তু উহা উচ্চ শ্রেণীর ক্রীড়া। ইহাতে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উপকার আছে। উহার সহিত খগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকায় উহা দ্বারা দর্শকগণের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, উল্কাপাত, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি গুরুতর বিষয় সকল ম্যাজিকে প্রদর্শন করা হয়। অনেক প্রাচীন ইউরোপীয় অধ্যাপক

এ বিষয়ে বিশেষ কৌতুকী ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে ম্যাজিক দ্বারা জ্যোতিষ ও খগোলের গুরুতর তত্ত্বনিচয় শিক্ষা দিতেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের পূর্ব্বতন ইন্স্পেক্টার (পরে ডিরেক্টর) উড্রো সাহেবের এ বিষয়ে বড়ই আমোদ ছিল। তিনি স্বসমকালীন অনেক হাই স্কুলে ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উড্রো সাহেবের পর তাঁহারা কিছুদিন এখানে সেখানে ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন। এখন আর উহার বড় একটা আলোচনা দৃষ্ট হয় না। শ্রীপঞ্চমী মেলার অধ্যক্ষগণ এই প্রয়োজনীয় কলাটীর শিক্ষা ও আলোচনা বিষয়ে মনোযোগ করেন, ইহা নিতান্তই প্রার্থনীয়।

সহরবিনের প্রচলন উত্তমরূপই আছে বোধ হয়। পৃথিবীস্থ বড় বড় নগর, রাজধানী, পর্ব্বত, জলপ্রপাত, প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঝটিকা ও ভূকম্পকালীন প্রকৃতির অবস্থা, বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী, পৃথিবীর বিস্ময়কর সপ্ত পদার্থ, আধুনিক বড় বড় সেতু, লৌহ-বর্ত্ম, সমুদ্রে ঝড়, অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র-বন্যশূকর-গণ্ডারাদি শিকার,—ইত্যাদি বহুবিধ আশ্চর্য্য পদার্থের আলোকচিত্র (Photograph) অণুবীক্ষণজাতীয় কাচ নলিকা দ্বারা প্রদর্শনের নাম সহরবিন্। অধিকাংশ হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীপুরুষ যেখানে সেখানে এক একটী পয়সা লইয়া উহা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক একটী পয়সা খরচ কাহারও গায়ে লাগে না,—অথচ উহার দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ হয়। বিশেষতঃ ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন-কালে মানচিত্র দর্শনে স্থান সন্নিবেশাদির যেরূপ স্থূল অভিজ্ঞতা জন্মে, সহরবিন্ দর্শনে বিশেষ বিশেষ বস্তুর একটু বিশেষ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। যিনি চিরকাল হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সীতকুণ্ড, জ্বালামুখী, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র, নায়গেরা, বিসুবিয়স্, লণ্ডন, পারিস, প্রভৃতির নাম শুনিতেছেন,—কখনও দেখেন নাই,—দেখিবার আশাও নাই, তাঁহারা সহরবিনে কথঞ্চিৎ সেই সকলের বিন্দুমাত্র সংস্কারও লাভ করিতে পারেন। সহরবিন্ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থনিচয়ের বিচিত্র চিত্র দর্শন যে এত সহজ হইয়াছে, তাহা ইংরাজের গুণে,—দেশীয়দিগের তাহাতে কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। যাহাই হউক, যাহাতে ঐ কলাটী বজায় থাকে এবং তাহার ক্রমশঃ আরও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীপঞ্চমী মেলার অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে ঐ মেলাস্থলে নানাস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সহরবিন্ আইসে এবং বহুসংখ্যক লোকে সচ্ছন্দে তাহা দর্শন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

নখদর্পণ নামক ব্যাপারটী এককালে এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। উহা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। বোধ হয়, প্রকৃত

"চিত্রাযোগ", এই নখদর্পণ ক্রিয়ায় পর্য্যবসান পাইয়াছিল। কেননা ইহার সহিত বাস্তবিকই একটু যোগবলের সংস্রব ছিল। এইরূপ শুনা গিয়াছে, যিনি যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার আপন দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখরদ্বয় মধ্যে, চিত্রাযোগ কলাবিৎ ব্যক্তি তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন। উহার প্রকরণ এইরূপ ছিল;—দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ পাশাপাশি করিয়া আপন চক্ষুর উপর ধরিতেন এবং কলাবিদের উপদেশমত চিত্ত সংযত করিয়া ঐ নখদ্বয়ের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। কলাবিৎ তাঁহার নিকটে বসিয়া মনে মনে মন্ত্রাদি পাঠ ভিন্ন আর কিছুই করিতেন না। ক্রমে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি অভীষ্ট বস্তুর দর্শন পাইতেন। অপহৃত দ্রব্যাদির পুনঃপ্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অন্বেষণ, প্রোষিত পতির এবং সৈরিন্ধ্রীর গতি প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ, প্রয়াণ (যুদ্ধযাত্রা) কারীর শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়েই নখদর্পণ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। চোর অপহৃত দ্রব্যের সহিত কোথায় কি রূপে অবস্থান করিতেছে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তি কোন্ দেশে কি করিতেছে, বিদেশী পতি বিদেশে এবং পতিবিরহিণী ভার্য্যা গৃহে কি করিতেছেন, যোদ্ধা রণভূমিতে কি অবস্থায় আছেন, ইত্যাদি বিষয় নখদর্পণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু "হস্তলাঘব" নাম্নী কলার বিষয় আমরা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে, "নখদর্পণের" বিবরণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঐ সকল কলার এককালে লোপ হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, এই জন্যই সত্য বিষয় সকল অসত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দুপরিবার।

পূর্ব্বকালে আমাদের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একটি আদর্শ পরিবার ছিলেন। কি ধনী, কি নির্ধন, সকল সংসারেই কেমন সুখশান্তি ও ধর্ম্ম ভাব বিরাজিত থাকিত এবং সংসারধর্ম্মকেই তাঁহারা স্বর্গের সোপান বলিয়া জানিতেন। কেননা সংসারধর্ম্ম হইতে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করা যায়, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম হইতে হয় না। সদ্গুণের বশীভূত হইয়া সুচারুরূপে সংসার প্রতিপালন করা মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই তাঁহাদের সময়ে সংসারধর্ম্ম এত সুখের ছিল ও প্রত্যেক গৃহস্থই একরূপ এক একটি আদর্শ পরিবার ছিলেন। অশান্তি ও অসচ্ছন্দতা কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না এবং ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কখনও কোনও কর্ম্ম করিতেন না।

তাঁহাদের সময়ে মনুষ্যহৃদয়ে ধর্ম্মভয় বড়ই প্রবল ছিল। অধর্ম্মকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা ও ভয় করিতেন এবং সেই জন্যই সতত শান্তিতে বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু হায়! এখন আমাদের অবস্থা কি হইয়াছে? আমরা আমাদের আর্য্যনারীগণের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ছাড়িয়া ভিন্নজাতীয় রীতি, নীতির অনুকরণ করিয়া কি অশান্তিতে বাস করিতেছি! আমাদের আর্য্যমহিলাগণ অপেক্ষা আমরা কত উন্নতি লাভ করিয়াছি, ইংরাজী সভ্যতায় সকল বিষয়ে, ধনে, মানে, অর্থে ও বিদ্যায় আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কত উচ্চতর অবস্থা লাভ করিয়াছি এবং যথেষ্ট স্বাধীনতাও পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহাদের মত আদর্শ সংসার করা দূরে থাকুক, কিরূপ রীতি নীতি অনুসারে চলিলে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সুখে বাস করা যায় এবং সংসার সুখের আগার হয়, তাহা আমরা জানি না বা জানিতে ও শিখিতে চেষ্টাও করি না। আমাদের শিক্ষায় ও স্বাধীনতায় এখন এই ফল হইয়াছে।- স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এবং স্বাধীনতা পাইয়া সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়া আপন পরিবারবর্গকে চিরসুখী করিবে। তাহা না হইয়া এখন আমাদের সংসারের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন কি কোন কোন শিক্ষিতা মহিলার সংসারের দুরবস্থা, বিশৃঙ্খলতা ও উদ্ধত স্বভাব হেতু গুরুজনদিগের মনঃকষ্ট দেখিলে যথার্থই আক্ষেপ হয় এবং বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ঘৃণার উদয় হয়। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করিবার অথবা পুরুষ সাজিবার জন্য নহে। যে মহাত্মারা আমাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। স্ত্রীশিক্ষায় অনেক উপকার আছে সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুরুষ হইলে সংসার সুখের হয় না। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া গুরুজনদিগকে সুখী করা এবং যত্নে পুত্র কন্যা পালন করা ও তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া। সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিজ নিজ সংসার যাহাতে আদর্শ পরিবার হয়, তাহার চেষ্টা করা। আদর্শ হিন্দু-সংসার বড়ই সুখের ও শান্তির এবং প্রীতির আগার। অতএব আমরা যদি এখনও সাবধান হই এবং আমাদের ধর্ম্মপ্রাণা পিতামহী, মাতামহীদিগের পবিত্র রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার শিখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের সংসারের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আদর্শ হিন্দু সংসারে যে কি সুখ শান্তি ও সচ্ছলতা পাওয়া যায়, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আজ আমি উপস্থিত হইতেছি।

২৪ পরগণার অন্তর্গত এক গ্রামে সামান্য অবস্থার এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার মাসিক আয় ৩০৲ মাত্র। ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোনও আয় অথবা পৈতৃক সম্পত্তিও

কিছু ছিল না। তাঁহার এই যৎসামান্য আয়ে অনেকগুলি প্রাণীর ভরণ পোষণ হইত। পরিবারমধ্যে তাঁহার ৫টি পুত্র ও ৩টি কন্যা, স্ত্রী ও একটি ভগিনী এবং নিজে, এই ১১টি প্রাণীর জীবনের সম্বল উক্ত ৩০ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী এমন মিতব্যয়ী ছিলেন যে, তাঁহাদের কোন কষ্ট না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। সংসার আপাততঃ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উক্ত গৃহস্বামী কখনও নিশ্চিন্তভাবে আলস্যে কাল কাটান নাই। যাহাতে পরিণামে সংসারটির সকল বিষয়ে মঙ্গল হয়, সেই জন্য সতত চেষ্টা করিতেন ও সকল সময় সেই সর্ব্বদুঃখহারী হরিকে স্মরণ করিতে ভুলিতেন না। একান্তমনে হরিকে ডাকিতে পারিলে তাহার ফল যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণের সংসার তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। ভাগ্যফলে ব্রাহ্মণ একটি সর্ব্বগুণশালিনী রমণীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন, যাঁহার অপরিসীম গুণে আজ তাঁহার সংসার আদর্শ হইয়াছে। স্ত্রীজাতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ ধর্ম্মভয়, লজ্জা, নম্রতা, শ্রমশীলতা, গুরুভক্তি, দয়া, এ সকল গুণ উক্ত রমণীতে ছিল। ইনি একজন ধনী ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। ধনীর কন্যা বলিয়া দরিদ্র স্বামীকে কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও অলৌকিক প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেন। স্ত্রীলোকের যে স্বামীই একমাত্র দেবতা ও গুরু, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এইজন্য ইহাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। স্বামী যখন যে বিষয় বলিতেন, স্ত্রী সানন্দচিত্তে তাহা সম্পাদন করিতেন। দম্পতীর মনের ঐক্য না থাকিলে সংসার সুখের হয় না। স্বামীর স্বল্প আয় বলিয়া উক্ত গৃহিণী কখনও অণুমাত্র দুঃখ বোধ করিতেন না, স্বামীকে বাক্যজ্বালায় জ্বালাইতেন না। উপযুক্তা স্ত্রী পাইয়াছিলেন বলিয়া স্বামী সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন এবং যাহাতে সংসারে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে সতত তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গৃহিণী ঐ অল্প আয়ে সংসারটি এমন করিয়া চালাইতেন যে,পাড়াপ্রতিবেশী সকলের দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত। নিজের অথবা পুত্র কন্যাদের কাহারও বিলাসিতা এ সংসারে ছিল না। স্বামী বেতন পাইলেই তাহা গৃহিণীর হাতে সমস্ত দিতেন। গৃহিণী সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিতেন। পরে সেই অল্প টাকা হইতে সর্ব্বাগ্রেই দান ধর্ম্মের নিমিত্ত ২ টাকা রাখিয়া বাকি টাকায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অল্প টাকা আয় বলিয়া নিজের সাহায্যের জন্য কোনও দাস্ দাসী রাখেন নাই। সমস্ত দিন নিজে পরিশ্রম করিতেন এবং যত্নে পুত্র কন্যাদের পালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করিয়া আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নিজ

হস্তেই প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার শারীরিক কষ্টের কথা শুনিলে পাছে স্বামী মনে দুঃখ পান, এই জন্য কখনও তিনি স্বামীকে কষ্টের কথা বলিতেন না। স্বামী যদি কখনও কষ্টের কথা বলিতেন, স্ত্রী হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন এবং স্বামীর মন ভুলাইয়া রাখিতেন। বলিতেন আমাদের ভগবান্ যা দিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট, আমাদের অপেক্ষা কত দরিদ্র আছে, আহা! তাহাদের না জানি কত ক্লেশ হয়! আমার কোনও কষ্ট নাই, বেশ সুখে দিন চলিতেছে,—তুমি বৃথা দুঃখ করিও না। এইরূপ ভাবে স্বামীকে সতত আনন্দে রাখিতেন ও নিজেও সতত প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। তিনি একাকী সাংসারিক কার্য্য সকল এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ করিতেন যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত ও শত মুখে প্রশংসা করিত। গৃহিণী প্রত্যুষে ঈশ্বর ও স্বামীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। স্বহস্তে ঘর-গোবর, ছড়া, ঝাঁট, কাপড় কাচা প্রভৃতি গৃহকার্য্য সকল সম্পাদন-পূর্ব্বক শেষে স্নান করিয়া রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতেন। স্নান করিয়া বাটীর একটি নির্জ্জন স্থানে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন ও স্বামী পুত্রের মঙ্গলকামনায় সর্ব্বমঙ্গলার নিকট মাথা খুঁড়িতেন। পরে স্বামী ও পুত্রদিগকে আহার করাইয়া কিছুকাল পরে আনন্দিতচিত্তে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া নিজে সর্ব্বশেষে শাকান্ন ভোজন করিতেন। উক্ত গৃহিণীর দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও অতিথিতে অত্যন্ত ভক্তি ছিল। যে কোন সময়ে হউক, বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন এবং যতক্ষণ অতিথিকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না দেখিতেন, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেন না। এক দিন দেখিলাম, বেলা ৩টার সময় একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া ইহাঁর বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মা, মা, বলিয়া চিৎকার করিতেছে। গৃহিণী কোন কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যেই তাঁহার কাণে উক্ত শব্দ গিয়াছে, তিনি অমনি সকল কর্ম্ম ফেলিয়া সেই বৃদ্ধ লোকটির নিকটে গিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কি চাও?" তখন বৃদ্ধ বলিল, "মা! আমি আজ দুই দিনের উপবাসী, আমার বাড়ী এখান হইতে ছয় ক্রোশ। এই গ্রামে এক জন বৈদ্য আছেন, তাঁহারই নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তাই তোমার বাড়ী আসিয়া পড়িলাম, আমাকে একটু আশ্রয় দাও ও একটু জল দাও।" গৃহিণী বৃদ্ধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন "বাবা! তুমি বসো, আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া গৃহমধ্যে গিয়া তাহার বসিবার জন্য একটি মাদুর ও তাহার পুত্রদের জন্য যে মিষ্টান্ন রাখিয়াছিলেন, তাহাই ও এক ঘটি জল আনিয়া উক্ত

রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে আহার করাইয়া সেই মাদুরে শয়ন করিতে বলিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ রন্ধনঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া তাহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া নিজের শয়নঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে তাহাকে উত্তম শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন। পরে নিজ পতির নিকট উক্ত বৃদ্ধের অবস্থা জানাইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামী স্ত্রীর এরূপ দয়ার ও অতিথিসেবার কথা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পর দিবস তাহার ভালরূপ শুশ্রূষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণীর সেবা ও যত্নে বৃদ্ধটি সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। রোগগ্রস্ত দরিদ্র বৃদ্ধকে উক্ত গৃহিণী ও কর্ত্তা, পুত্রের মত সেবা যত্ন করিতেন। একদিনও তাহার প্রতি মনে মনে ঘৃণা বা বিরক্তি বোধ করেন নাই—এমন কি তাহার মল মূত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন এবং সে সুস্থ হইলে তাহাকে কোন লোক সঙ্গে দিয়া তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আহা! কি আশ্চর্য্য দয়া! ইঁহারা এরূপ দয়া প্রকাশ না করিলে হয়ত বৃদ্ধের জীবন অকালে নষ্ট হইত ও শেষে সে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইত। উক্ত বৃদ্ধেরই আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ক্রমে ক্রমে ইঁহার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রত্যেক সংসারের গৃহিণীর হৃদয়ে এইরূপ দয়া থাকা উচিত। যদি সকল স্ত্রী এবং পুরুষের মনে এইরূপ দয়া ও মমতা থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর কত নিঃসহায় জীবের মঙ্গল হয় ও কত শত জীব অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়! (ক্রমশঃ)

ত্রয়োদশ জাতীয় মহাসমিতি।

এ বৎসর মধ্যভারতের অন্তর্গত অমরাবতী নগরে "কংগ্রেস" বা জাতীয় মহাসমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভারতের যেরূপ দুর্ব্বৎসর, তাহাতে এবার ভারতবাসিগণ নানা স্থান হইতে যে একত্র সম্মিলিত হইতে পারিবেন, তৎপক্ষে অনেক সন্দেহ ছিল। যাহা হউক, সভাস্থলে ছয় সাত শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্থানীয় লোকেরও মহা জনতা হইয়াছিল এবং বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, মহারাষ্ট্রীয়, পারসী ও ইংরাজ প্রায় ২০০ মহিলা সভামণ্ডপকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা না থাকাতে তাঁহারা অবাধে পুরুষ-দিগের সহিত প্রকাশ্যে আসন গ্রহণ

করিয়াছিলেন। মণ্ডপটী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত ও সুন্দর কারুকার্য্যে বিভূষিত হইয়াছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেদীর উপর স্বর্ণ ও স্ফটিকমণ্ডিত বিচিত্র আসন বিস্তারিত এবং ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপে মহারাণীর সহিত জাতীয় সমিতির সুন্দর চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছিল।

২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ১৷৷টার সময় সভাপতির সহিত সদস্যগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি মহাত্মা থাপার্দ্দে এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মনোনীত সভাপতি শ্রীযুক্ত সঙ্কর নায়রের পরিচয় দিলেন। সভাপতি সভাকর্ত্তৃক বৃত হইয়া এক সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ ৩ সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তৎপরে দুই দিবস সভার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। প্রস্তাব সকলের সংক্ষেপ মর্ম্ম লিখিত হইল :—

(১) কংগ্রেসের মতে ভারতগবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান সীমান্ত-নীতি ইংরাজরাজ্যের, বিশেষতঃ এ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কংগ্রেসের অনুরোধ, এ নীতি আর অবলম্বিত না হয়। বিলাতের স্বার্থরক্ষার্থ ইহা আবশ্যক হইলে ইহার অধিকাংশ ব্যয় ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

প্রস্তাবক বোম্বাইয়ের বাচ্চা, পোষক হিন্দু সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

(২) দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ে ভারতের রাজস্বের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় এবং সীমান্ত-যুদ্ধের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থ জড়িত থাকায় পার্লামেণ্ট গত আফগান যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধেরও অধিকাংশ ব্যয় বিলাত হইতে দিবার অনুমতি করেন।

প্রস্তাবক বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, পোষক লাহোরের শ্রীযুক্ত যশীরাম।

(৩) বিলাতের রয়াল কমিশন ভারতবাসীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কয়েকটী প্রার্থনা।

প্রস্তাবক এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয়, পোষক বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, সমর্থক মান্দ্রাজের পার্থ সারথি নাইডু ও নাগপুরের কেশব রাও যশী।

সভাপতি নিজেই প্রস্তাব করেন :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রস্তাবিত আবকারী আইন, অস্ত্র আইন, সখের সৈন্য, বিনিময়ের ক্ষতি-পূরণ, শিক্ষা সার্ব্বিস পুনর্গঠন, জুরীপ্রথা ও ব্যবস্থাপক সভা প্রচার, কুলী আইন ইত্যাদি।

(৫) ভারতে ও বিলাতে উভয় স্থানে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রার্থনা।

(৬) দেশীয় রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্রের শাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে বিজ্ঞাপন আছে তাহা রহিত করা।

(৭) যে সকল প্রদেশে ভূমি সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে তাহার প্রচলন।

প্রস্তাবক বারিষ্টার জন এভান্স্, পোষক বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গরুড়।

(৮) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগ পৃথক্ করা।

প্রস্তাবক জে চৌধুরী, পোষক বোম্বাইয়ের শীতলবাদ।

(৯) প্রজার দরিদ্রতা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ দুর্ভিক্ষ কমিশনকে অনুরোধ করা।

শেষ দিবস পুনা বিভ্রাট ও সাময়িক আরও কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

জাতীয় সভার আগামী অধিবেশন মান্দ্রাজে হইবার সম্ভাবনা। মান্দ্রাজ কমিটি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে সাধারণকে জ্ঞাপন করিবেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গামোহন দাস।

জীবন আহুতি দিয়ে
মহাযজ্ঞ-দেশহিতে
দেখালে যে দেবভাব
দেখিব কি অবনীতে?
হাসিতে হাসিতে সুখে
বীরেন্দ্র-কেশরী আজ
চলিলেন সুরপুরে
সাধিয়ে দেশের কাজ।
সংসার-সংগ্রাম ক্ষেত্রে
মহাবীর্য্য প্রকাশিয়া
নাশিলা কু-দেশাচার
বসুমতী কাঁপাইয়া।
শত শত অত্যাচার
লইলা মস্তক পাতি,
সহিলা তাড়না কত
অদম্য উৎসাহে মাতি।
অটল অচল সম
টলাইবে সাধ্য কার?
পায়ে ঠেলি শত বাধা
আগুয়ান অনিবার।
অবলা-বান্ধবহীন
বঙ্গের অবলাকুল
তুলিয়াছে হাহাকার
মহাশোকে শোকাকুল।
অকাতরে অন্নদান
দুখিনী বিধবা তরে

কে করিবে বল আর?
কার চক্ষে অশ্রু ঝরে?
অতুলন ক্ষমাগুণে
চিরশত্রু নতশির,
কে দেখেছ ধরাতলে
এ হেন ধরমবীর?
যে করিত নির্যাতন
তারে দিয়ে আলিঙ্গন
বাঁধিতেন স্নেহগুণে
এমনি উদার মন!
মধুর প্রকৃতি হেরি
অবাক্ মোহিত সবে,
সরল শিশুর মত
আর কি সেরূপ হবে?
হারানিধি পেয়ে আজ
হারাইলে সে রতনে,
কে আছে মা তোর মত
কাঙ্গালিনী এ ভুবনে?
কোল হতে কেড়ে নিল
অঞ্চলের নিধি কাল,
কাঁদিতে এসেছ ভবে
কাঁদ বসে চিরকাল।
যাও যাও যাও দেব
সেই দেবতার দেশে
অসার অনিত্য ভুলি
পরম যোগীর বেশে

পশারিয়া প্রেম-বাহু
কোলে নিয়ে স্নেহময়ী
তুষিছেন কত মতে,
দিব্য চক্ষে দেখ তাই।
সযতনে সাজাইয়া
মণিময় আভরণে
বসায়ে দেবতা পাশে
দেবতার সিংহাসনে,

আশীষ করিছে কত
স্নেহময়ী স্নেহে গলি,
দেবতাসমাজে আজ
সকলেই গলাগলি।
সার্থক জনম তব
সাধিয়ে দেশের কাজ
অমর হইলে তুমি
অমর লোকেতে আজ।

শ্রীচ।

ঐতিহাসিক রহস্য।

১। দাসী রাজবংশের জননী।

ইংলণ্ডেশ্বর ১ম চার্লসের রাজত্বসময়ে একটী পল্লীগ্রামস্থ নিরুপায় দুঃখিনী বালিকা চাকরাণীর কাজের জন্য লণ্ডন সহরে আইসে। অন্য কোনও কার্য্য না পাওয়াতে বালিকা মুটিয়ার মত একটী মদের ভাঁটী হইতে মদ্য বহন কার্য্য করিতে লাগিল। ভাঁটীওয়ালা মেয়েটীর রূপ আছে দেখিয়া তাহাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করিল। অল্পদিন পরে স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে বালিকা তাহার ধন সম্পত্তির অধিকারিণী হইল। হাইড সাহেব (পরে যিনি ক্লারেণ্ডনের আরল হন) তখন ওকালতীর কার্য্য করিতেন। এই রমণীর সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। চতুর উকীল ইহাঁকে রূপবতী ও ধনশালিনী দেখিয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের ফল একমাত্র কন্যা। তিনি ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জেম্‌সের সহধর্ম্মিণী। ইনি ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী মেরী ও আনের গর্ভ ধারিণী।

২। বোনাপার্টিদিগের পত্নীগণের দুর্দ্দশা।

চার্লস বোনাপার্ট ও লেটিসিয়া রামোলিনো মহাবীর নেপোলিয়নের জনক ও জননী। ইহাঁদের ৫টী পুত্র—যোজেফ, নেপোলিয়ন, লুসিয়েন, লুই ও জেরোম। নেপোলিয়ন যখন রাজরাজেশ্বর, তাঁহারই প্রভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোজেফ স্পেনের অধীশ্বর হন। তিনি রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাদিগের নিতান্ত অপ্রিয় ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনে তাঁহারও পতন হইলে তিনি আপনার স্ত্রী জুলিয়া ক্লারাকে লইয়া ত্রিসংসার পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় স্থান পান নাই; অবশেষে ফ্লোরেন্স নগরে অস্থি রাখিয়া শান্তিলাভ করেন। ইহাঁর পত্নী মার্সেলের এক ধনাঢ্য বণিকের কন্যা ছিলেন। স্বামীর

মৃত্যুর পর বৃদ্ধাবস্থায় দীন দুঃখিনী বিধবা সকলের পরিত্যক্তা হইয়াও নিশ্চিন্তা হইতে পারেন নাই। তাঁহার উপর রাজদণ্ডাজ্ঞা—'যে কেহ তাঁহাকে দেখিবে, মারিয়া ফেলিবে।' তিনিও মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের দুই পত্নী—প্রথম সুপ্রসিদ্ধা পতিপরায়ণা যোজেফাইন। তিনি স্বামীর কষ্ট দুঃখ ও জীবনসংগ্রামের চিরসঙ্গিনী হইয়া যখন স্বামী সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহা কর্ত্তৃক নিরপরাধে পরিত্যক্তা হইলেন এবং মনের দুঃখে জীবন শেষ করিলেন। দ্বিতীয় পত্নী অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়া লুইসা—ঘোর গর্ব্বিতা ছিলেন। স্বামীর মহাসিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী হইয়া যেমন আকাশে উঠিলেন, তাঁহার পতনেই তেমনি নিম্নতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং অবশেষে এক সামান্য কারাগারের বন্দিনী হইয়া শেষ জীবন অতিবাহন করিলেন।

লুসিয়েন বোনাপার্টি ক্রিষ্টাইন বয়ার নাম্নী এক সামান্য ঘরের মেয়ে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুইটী পুত্র হয়। কিন্তু তাঁহার অকালে মৃত্যু হওয়াতে ১৮০২ সালে লুসিয়েন আলেক্‌জাণ্ড্রাইন জুবার্থন নাম্নী এক দালালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এ সময় নেপোলিয়ানের ভারী দপ্‌দপা, তিনি বিপত্নীক ভ্রাতার কোনও রাজারাজড়ার ঘরে বিবাহ দিবার পন্থা খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া মহা কোপান্বিত হন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রাতার মুখ দর্শন করেন নাই। আলেকজাণ্ড্রাইন সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী নিরীহ ধাতুর লোক থাকাতে তাঁহার উচ্চ আশা আদৌ পূর্ণ হয় নাই। ইটালীর এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ১৮৫৫ সালে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়।

চতুর্থ পুত্র লুই সাম্রাজ্ঞী যোজেফাইনের প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কন্যা হর্টেন্স বোহারণেকে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। সম্রাট্ নেপোলিয়ান এই উদ্বাহযোগ সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; লুই তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য দুইবার বিদেশে পলায়ন করেন, কিন্তু অবশেষে ভ্রাতার আজ্ঞাধীন হন। এ বিবাহ দম্পতীর কাহারও সুখের কারণ হয় নাই। ১৮০৭ সালে লুই পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। বিপক্ষ সেনানীরা পারিস অধিকার করিয়া হতভাগিনীকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তিনি আরেনবর্গ নামক স্থানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কলেবর পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র জেরোম ১৮০৩ সালে বাল্‌টিমোরের এলিজেবেথ পাটার্সন নাম্নী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহা নেপোলিয়নের মনোনীত না হওয়াতে তৃতীয় সহোদরের ন্যায় ইনিও তাঁহার ক্রোধ খর্পরে পতিত হন। লুসিয়েনের ন্যায় জেরোমের চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না,

এজন্য মহাতেজা ভ্রাতার আদেশে তিনি অচিরে ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়ার্টেনবর্গের কাথারিণকে পত্নীত্বে বরণ করিতে বাধ্য হন। ভ্রাতাও আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ জেরোমের জন্য ওয়েষ্ট-ফেলিয়া নামক এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করেন এবং তাহার সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন। যাহাহউক জেরোমের দুই পত্নীর জীবনই দুঃখের জীবন। পাটার্সন আলেকজান্ড্রাইনের ন্যায় সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন এবং নেপোলিয়নের প্রভাবে রাজমুকুট ধারণের আশাতেও আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়া তাঁহার সকল আশা চূর্ণ করিল। তিনি অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজ তাঁহার প্রতি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা লাভ হয় নাই। তিনি চিরদিন নিগূঢ় মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইয়া জীবন অবসান করিয়াছিলেন। তাঁহার সপত্নী কাথারিণ ১৮১৩ সালে সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি দুর্ভাগ্য স্বামীর সহিত একটু আশ্রয়-স্থান লাভের জন্য ভিখারিণীর ন্যায় অষ্ট্রিয়া, ইটালী ও সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, অবশেষে লসানি নামক স্থানে মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করিয়া দুঃখময় জীবনের অবসান করেন।

নেপোলিয়ন বংশের উপর কি দারুণ অভিসম্পাত! এই বংশের দুইটী রাজ্ঞী দুর্ভাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছেন:—একটি লুই নেপোলিয়ানের পত্নী সাম্রাজ্ঞী ইউজিন, দ্বিতীয়া ইটালীর রাজকুমারী ক্লটিডা। ইউজিনের সম্পূর্ণ নাম ইউজিন মেরী ডি মণ্টিজো। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে ১ম নেপোলিয়নের মৃত্যু হইলে তাহার ৫ বৎসর পরে স্পেনের রাজ-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। লুই নেপোলিয়ন বুদ্ধিকৌশলে যখন ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিয়া ৩য় নেপোলিয়ন নাম গ্রহণ করেন, তখন কুমারী ইউজিন মাতার সহিত পারিস দর্শনে আসেন। নেপোলিয়ন তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তাঁহার বন্ধুগণ এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সাম্রাজ্ঞী ইউজিন ১৩ বৎসরকাল সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য লাভ করিয়া পৃথিবীতে মহোচ্চপদ ও পার্থিব সুখের পরাকাষ্ঠা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী জর্ম্মণ সমরে ফ্রান্সের পরাজয় হওয়াতে তাঁহার শিরে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি রাজ্যসম্পদ ও পতি হারাইয়া ফ্রান্সে মাথা রাখিবার একটু স্থান পাইলেন না, ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে গ্রেট-ব্রিটেনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অনাথ সন্তানকে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে নেপোলিয়নবংশের শেষ আশার স্থল তাঁহার একমাত্র পুত্র ইংরাজ

পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়া অসভ্য আফ্রিকাবাসীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন। স্বামি-পুত্র-হীনা হৃতসর্ব্বস্বা বর্ষীয়সী ইউজিনের ন্যায় দুর্ভাগিনী আজ আর কে?

রাজকুমারী ক্লটিডা ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা জেরোমের পুত্র প্রিন্‌স জেরোমের সহিত বিবাহিত হন। ১৮৫৯ সালে ইহাঁর বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন ইহাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের একটী মহা শুভ ফল ইটালীরাজ্যের ঐক্যবন্ধন। কিন্তু ক্লটিডা চিরদুর্ভাগিনী। শৈশবে ও বাল্যে পিতা ও স্বদেশ কর্ত্তৃক বিক্রীত ও পরিত্যক্ত, যৌবনে স্বামী দ্বারা প্রতারিত, অত্যাচরিত ও অবশেষে বর্জ্জিত হইয়া ৫০ বৎসর বয়স হইতে না হইতে অকাল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হন। তিনি সাম্রাজ্ঞী ইউজিনের সহচরী হইয়া অনেক দিন পারিসের রাজগৃহে ছিলেন, কিন্তু সেখানে জাঁকজমক ও বাহ্য চাকচিক্যের মধ্যে তাঁহার গুণ কেহ গ্রহণ করে নাই। তিনি স্বামীকর্ত্তৃক নিপীড়িত ও নানাপ্রকারে মর্ম্মাহত হইয়া টিউরিনের নিকট এক নিভৃত স্থানে প্রায় ৩০ বৎসর কাল কাটাইলেন। জীবনে আর যে কখনও সুখের মুখ দর্শন করিবেন, সে আশা নাই। কি আশ্চর্য্য! বোনাপার্টিবংশের সহিত যে রমণী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারই অদৃষ্টে ঘোর ক্লেশ ও দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। ইহার রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে?

নূতন সংবাদ।

১। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে যে বিশ্বপ্রদর্শনী হইবে, রুষীয় সম্রাট তদ্দর্শনে গমন করিবেন।

২। প্রিন্স ভিক্‌টর দলীপ সিংহ কভেণ্ট্রীর আরল্-কন্যা আনের সহিত বিবাহিত হইয়াছেন।

৩। যে মহাবীর হাবেলক সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজপক্ষের জয়সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সীমান্ত যুদ্ধে হত হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার পত্নীকে শোকসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

৪। আগামী বসন্তকালে মহারাণীর ইটালীভ্রমণে যাইবার সম্ভাবনা।

৫। গত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নূতন লেডী ডফারিন্ হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ভিক্টোরিয়া জেনানা হাঁসপাতাল হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয় প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা হইবে।

৬। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে শম্বুক রন্ধনের ১০০ প্রকার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বার্লিনে ১৮১০ প্রকার ভিন্ন

ভিন্নপ্রণালীতে গোল আলু পাক করা হইয়া থাকে।

৭। কুচবিহারের রেলরাস্তা বিস্তারিত হইবে। এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২,০০,০০০ টাকা ঋণ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

৮। পুনাতে মড়ক পরিদর্শক র‍্যাণ্ড ও আয়ারেষ্ট সাহেবের বিধবা পত্নীদিগের জন্য বাৎসরিক ১৮৭ ও ১৫০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহাদের সন্তানদের জন্যও অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৯। সার উইলিয়ম লকহার্ট বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বোম্বাইয়ের সেনাপতি সার চার্লস নেয়ল প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি হইবেন।

১০। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের পুত্র মানব মনের চিন্তার ফটোগ্রাফ লইবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিয়াল্লিসকর্ম্মা!

১১। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আয় ১,০০,০০০, কলিকাতার ৪,৮০,০০০ ও মান্দ্রাজের ২,০০,০০০ টাকা।

১২। ২৮৯৬—৯৭ সালের শিক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশে কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ৯৩, হাইস্কুলের ১৯১, মধ্যস্কুলের ১৬৮২, আপারপ্রাইমারী ২১৭০, নিম্নপ্রাইমারী ১৫৩৩২। বিদ্যালয়ে যাইবার যোগ্য বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা ২জন মাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে।

বামারচনা।

তারা দুটি দেবকন্যা।

তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল পথ ভুলে
আলোক-আলয় হতে
আঁধারের এ মরতে,
দুই দিন এ আঁধারে মধুর জোছনা ঢেলে,
আঁধার আঁধারে রেখে কোথা গেল ফিরে চলে।
তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল খেলা ফেলে;
দুঃখময় এ হৃদয়ে
খেলার পুতুল হয়ে
হেসেছিল খেলেছিল সুখের লহর তুলে;
কেন কাঁদাইয়ে গেল দুই দিন হেসে খেলে!

সুধার সে শিশু দুটি স্নেহে ছিল সুধা মাখা;
হাসিত স্নেহের হাস,
কহিত স্নেহের ভাষ,
স্নেহের লতিকা দুটি দুলাত স্নেহের শাখা,
তারা দুটি ছিল ঘরে স্নেহ যেন পটে আঁকা।
আদরের মেয়ে দুটি আদর বিলা'ত তারা;
আদরে ধরিত গলা,
মোর আদরের দোলা
ছিল সেই মেয়ে দুটি, আদরের ডোরে বাঁধা,
খেলায় সঙ্গিনী দুটি এক প্রাণ আধা আধা।

কোথা গেলি তোরা দুটি কৌতুক-জননী
মোর ?
তোদের খেলার ছেলে
আজি সত্য আঁখিজলে
ভাসি ডাকে মা মা বলে ; তোরা কেন
নিরুত্তর ?
আজি কি নূতন খেলা নিঠুর নিঠুরতর !
বারেক ডাকিলে তোরা ব্যাকুল জননী
প্রায়
ছুটে কাছে আসিতিস্
কত কথা সুধাতিস্,
আমার তাপিত প্রাণ কত স্নেহ মমতায়
জুড়াতিস, নিয়ে এসে স্নেহের মলয় বায়।
স্নেহের পরশ লাগি এখনও এ প্রাণ ধায় ;
তোরা শুধু স্মৃতিমাঝে
নিঠুর সুন্দর সাজে
বারেক সুদূর পথে দেখা দিয়ে কেন হায় !

আঁধার আঁধারতর করিস বিজলি প্রায় ?
কেন রে এত সুধায় সুধা এত বিষময় !
পুতুল ভাঙ্গিয়া যায়,
কুসুম শুকায় হায় !
কেন তবে ভালবাসা নারি ভুলিবারে তায় !
কেন চিরলুপ্ত ধনে হৃদয় ধরিতে চায় !
আজি ভালবাসা সুখ; কালি প্রাণ কাঁদে তায় !
বিশ্ব ভালবেসে সুখী,
ভালবেসে চির দুঃখী ;
তবু কেন ভালবাসি ? দেব ! একি মায়া হায়
শুনি তুমি ভালবাসা, তবে কেন দুখ তায় ?
দেবতার প্রাণ কিরে কাঁদে না মানবদুখে ?
এই কাল-যবনিকা,
অর্দ্ধ বিশ্ব তাহে ঢাকা;
আর অর্দ্ধ কাঁদিতেছে করাঘাত করি বুকে,
হে দেবতা ! এই দৃশ্য ব'সে কি দেখিছ সুখে ?
শ্রীব।

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

হায় ! বঙ্গবাসী আজি হলো মাতৃহীন ;
অনাথ করি সন্তানে,
শোক দুঃখ জ্বালি প্রাণে,
কোথা গেল আমাদের জননী রতন ;
সন্তানের প্রাণে দিয়ে দারুণ বেদন।
সহায় সম্বল হীন,
করিয়ে দরিদ্র দীন,
স্নেহের পুতুলি সবে হ'লে অন্তর্দ্ধান ;
দয়া ধর্ম্ম তেয়াগিয়া, হইয়ে পাষাণ।
কি উপায় হবে তবে,
কে ভালবাসিবে সবে,

বিতরিয়ে স্নেহ দয়া তোমার মতন,
সন্তানের দুঃখে দুঃখী জননী যেমন ?
আসিয়ে অবনীধামে,
সুযশ রাখিয়ে নামে,
তুমিত স্বরগধামে করিলে প্রয়াণ,
মোদের ভরসা আশা হইল নির্ব্বাণ।
ছিল অতুল ঐশ্বর্য্য,
পালিয়াছ ব্রহ্মচর্য্য,
দীনভাবে দিন তুমি করেছ যাপন,
কঠোর বৈধব্য ব্রত করিয়ে পালন।
লোকহিতকর ব্রত,

দয়া ধর্ম্ম অবিরত,
নিজের কর্ত্তব্য ভাবি করেছ পালন;
করেছ সার্থক ভবে মানব জীবন।
কল্পতরু ছিলে দানে,
দেবী আর্ত্ত-পরিত্রাণে,
প্রেমমন্ত্র জপমালা ছিল জ্ঞান ধ্যান,
প্রাণপণে জগতের, সাধিলে কল্যাণ।
দানশীলা দয়াবতী,
প্রেমময়ী সাধ্বী সতী,
ভুবন ভরিয়ে তব সুযশ অশেষ,
ঘোষিতেছে কীর্ত্তি তব ইহ পর দেশ।
দেশের কল্যাণ তরে,
করি দান অকাতরে,
বিবিধ প্রকারে হিত করেছ সাধন;
মুক্ত হস্তে স্বীয় ধন করিতে বর্ষণ।
স্কুল আর পাঠশালা,
কলেজ অতিথিশালা,
তোমার সাহায্যে সব হয়েছে নির্ম্মাণ;
দুর্ভিক্ষেতে অন্নসত্র,
পেত দান দীন ছাত্র,
তোমার প্রেমের চক্ষে সকলে সমান,
পাপী সাধু জ্ঞানী মূর্খে নহে ভেদজ্ঞান।
কত যে চিকিৎসালয়ে,
কত যে অনাথাশ্রয়ে;
রোগাতুর ক্ষুধাতুর পেয়েছে পরাণ;
বাঁচিয়াছে তাহারা যে পেয়ে তব দান।
কাঙ্গাল অতিথি যত,
নিত্য নিত্য শত শত,
ভুঞ্জিত তোমার অন্ন, করুণা অশেষ;
হৃদয় গলিত তব, দেখি দীন বেশ।

সুশিক্ষা বিস্তার তরে,
দিয়ে ধন গ্রন্থকারে,
কত উপকারী গ্রন্থ করেছ প্রকাশ;
করিতে অজ্ঞতা নাশ, জ্ঞানের বিকাশ।
"কীর্ত্তি র্যস্ত স জীবতি,"
সত্য যদি এ ভারতী,
তবেত জননী তুমি, রয়েছ জীবিত;
কার্য্যত না হেরি তোমা, আছি বিষাদিত।
প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিখানি,
স্বর্ণময়ী মহারাণী,
মানস-নয়নে তোমা, হেরি'ছি সতত;
হৃদয়ের পটে তুমি, রয়েছ অঙ্কিত।
ছিলে আদর্শ রমণী,
নারীকুল-শিরোমণি,
"ভারত-মুকুট" সত্য, ছিলে যে গো তুমি,
সার্থক তোমায় পেয়ে এ ভারতভূমি।
নিজের সুকৃতি তরে,
গিয়াছ স্বরগপুরে,
শান্তিময় বিভুকোলে, লভহে বিশ্রাম;
ভুল না সন্তানে বলি, অকৃতি অধম।
শোক তাপ সব ভুলে,
থাকিও সদা কুশলে,
সুখেতে রাখুন তোমা, প্রভু প্রাণারাম,
নাহি সেথা দুঃখ তাপ, সে যে শান্তিধাম।
লিখিতে গুণকাহিনী,
অক্ষম যে এ লেখনী,
মূর্খ আমি তব গুণ বর্ণিব কেমনে?
ভক্তি ফুলে চিরদিন পূজিব জীবনে।

শ্রীভুবনমোহিনী দেবী।

স্বর্গ।

১

"কোথা রহে ধ্রুবলোক
গোলোক ও ব্রহ্মলোক,
কোথায় অমরাবতী, নন্দনকানন ?
'স্বরগ, এ-ত্রি-অক্ষরে
আহা ! কি অমিয় ক্ষরে !
কোথা সে স্বরগ স্নিগ্ধ আলোকভূষণ ?
স্বর্গ কি গগনোপরে ? ,,
" না না তা কেমন করে ?
গগন যে শূন্য বই আর কিছু নয়,
স্বরগ সৌন্দর্য্য-সার,
গগন ত শূন্যাকার,
শূন্যে সে সৌন্দর্য্য ছটা সম্ভব কি হয় ?"

২

(তবে) কোথা সেই স্বর্গস্থল ?
হর্ষ বিনা অশ্রুজল
নাহি ঝরে যথা ? সদা সুখের হিল্লোলে
বিলাস মলয় বায়
খরতর বেগে ধায়,
প্রফুল্ল কুসুমরাজি সুষমার কোলে,
সৌরভ মাখিয়া গায়
অনন্ত যৌবনে ভায়,
দুঃখ চির অস্তমিত সুখের প্রভায়,
বসন্ত অমর হ'য়ে
শারদী পূর্ণিমা ল'য়ে
বার মাস অবস্থান করিছে যথায় ?
রোগ, শোক, বার্দ্ধক্যেরে
শাণিত ছুরিকা মেরে।
সন্তাপ-অনল যোগে করে ভস্ম ছাই ;
সুখ শান্তি বারি দিয়া
সে অনল নিভাইয়া
ধুইয়া ফেলেছে ছাই চিহ্নমাত্র নাই।
হীরকের হর্ম্ম্যরাজি
কাঞ্চন কুসুমে সাজি
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত মণির বৌটায়,
মুকুতা স্তবক ধরি
মস্তক উন্নত করি
দাঁড়ায়ে সৌন্দর্য্য ছটা বিস্তারে যথায় !
যথায় সরসীমাঝে
বৈদুর্য্যের নালে রাজে
সুনীল হিল্লোলে স্বর্ণ কমলিনীচয়,
মাণিকেতে বিরচিত,
চারি তট সুশোভিত,
সুন্দর সোপানশ্রেণী মরকতময় !

৩

" যথায় কুসুমোদ্যানে
বিহগের কল গানে
মোহিত করিয়া মন প্রাণ হরি লয়,
পবন বাহনে উঠে
দিগ্ দিগন্তরে ছুটে,
সে গীত লহরী শুধু সুধাধারাময়।
কমলা কুসুম-আলি,
পবন আপনি মালী,
বাল-বেণু-প্রভমণি-লতিকার পাশে ;
সোণার মুকুলগুলি
কোমল পাপড়ী খুলি
মাণিক কেশরে সাজি হেলে দুলে হাসে !,,

৪

"(না,) যথা পুণ্য বিভাময়
নিত্য প্রেম চন্দ্রোদয়
প্রেমের আলোক যথা চির বিভাসিত,
শারদ কৌমুদী রাশি
সন্তোষ প্রফুল্ল হাসি,
ছুটিতেছে সে আলোকে আনন্দের গান—
"সবে মোরা ভাই ভাই,
ভাই বোন, পর নাই
শ্বেত কৃষ্ণ, রাজা প্রজা সবাই সমান,
কেন কর ভেদজ্ঞান?
হিন্দু, খ্রীষ্টী, মুসলমান
সকলে সন্তান সেই পরম পিতার।"
সে আলোকে পায় তাপ
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, পাপ;
লেখা আছে সে আলোকে "সবাই সবার",
নাহি যথা প্রবঞ্চনা,
অহঙ্কার প্রতারণা,
বাসনা বিরক্তি সে আলোকে পুড়ে মরে।
মান অপমান জ্ঞান
যথায় পায় না স্থান,
যথা আত্মবলিদান জগতের তরে।
যথা অনাবৃত প্রাণ
করে প্রেম বারি দান
আপনাকে অর্ঘ্য দেয় জগতের পায়,
যথা প্রেম নদ-স্রোত,
বহিতেছে অবিরত,
চঞ্চলা আসক্তি কিন্তু ডুবে মরে তায়।
অনুরাগ অনুক্ষণ
করিতেছে সন্তরণ
প্রতি তরঙ্গের পর নাচিয়া নাচিয়া,
পরের দুঃখের তরে
যে অশ্রু নিয়ত ঝরে,
সেই অশ্রুবারি রহে এ নদে ভরিয়া।
আপনি আপনোচ্ছ্বাসে
কভু ডোবে কভু ভাসে
আপনাকে চূর্ণ করে বিশ্বের মাঝারে,
সহস্র আপনি হয়ে,
সহস্র আপনা ল'য়ে
মহানন্দে এই নদে বেড়ায় সাঁতারে।
সুন্দর সংযম-বেলা
ঢেউ ল'য়ে করে খেলা,
যথায় প্রেমের হর্ম্ম্য প্রেমের চত্বর,
প্রেমের কুসুম ফুটে
প্রেমের সৌরভ ছুটে
প্রেমের মলয়ানিল স্বনে সর্ সর্।
প্রেমের কৌমুদীরাশি
প্রেমের উজ্জ্বল হাসি
তথায় স্বরগ রহে সৌন্দর্য্যের সার,
সে সৌন্দর্য্য নাহি ধারে পৃথিবীর ধার।"

কুমুদিনী রায়।

নিদ্রা।

প্রতি নিশি শুনি আমি তোর পদধ্বনি—
অতি মৃদু দূরাগত সঙ্গীতের মত।
কোথায় অদৃশ্য হয়ে বাজাস্ না জানি—
মোহন বীণায় তোর মোহমন্ত্র যত॥

পড়ে তোর মৃদু শ্বাস আননের পরে,
আঁখি পরে জাগে তোর নীরব চুম্বন।
অয়ি নিদ্রে! মোহময়ি! কি কথা গো ধীরে
বলিস অস্ফুট স্বরে—করিয়া শ্রবণ
আঁখি দুটি মুদে আসে, ধীরে থেমে যায়
জাগ্রত এ জীবনের অধীর কল্লোল।
ঢাকি তোর শান্তিময় অঞ্চল ছায়ায়
ললাটেতে স্নেহহস্ত বুলাস কেবল।
শিয়রে ছায়াটি তোর করিয়া বিস্তার
নিয়ে যাস্ কোন্ এক মায়াময় পুরে।
অসত্য যথায় ধরে সত্যের আকার,
বাস্তব জীবন- ছায়া মিলায়রে দূরে॥

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

স্বর্ণময়ীর প্রতি।

সোণার বরণী সোণামুখখানি
নাম স্বর্ণময়ী তার,
বিনোদ মাধুরী আহা মরি মরি
কোমল সৌন্দর্য্য সার
সরগের শোভা মরতে গঠিত
নেহারী ও বিধুমুখে,
আঁকা আছে ওতে প্রতি পাতে পাতে
শুভ্র পবিত্রতা সুখে।
নাহিক গরিমা প্রেমের প্রতিমা
বিমল প্রশান্ত মতি,
হেরে ও সুষমা লাজেতে চন্দ্রমা
লুকায় কনকভাতি।
ছুটেছে জীবনে হীরক কাঞ্চনে
কত মরকত ফুল,
অলি স্তরে স্তরে সাহিত্য ভিতরে
হীরক তারকাফুল।
নবীনা ভারতী তুমি যে গো সতি!
আসীনা বিমল যশে,
বীণাটি ফেলিয়া এসেছ নামিয়া
না জানি কোন্ প্রয়াসে;
রমণীর মণি হও তুমি ধনী
বিধি-বর-দত্ত ফুল,
হও কি মানবী মনে মনে ভাবি,
হৃদে লেগে যায় ভুল।
অয়িগো সুভগে! তোমার গৌরবে
গৌরবিণী মোরা সবে,
প্রকাশ সুকৃতি হাসুক প্রকৃতি,
মাতুক আনন্দরবে।
দেখাও যতনে নারীর জীবনে
ধরে কি না গুণ জ্ঞান,
ভূতলে আবার আর্য্যপ্রেমাধার
লভুক রমণী মান।
ভারতের ঘরে আসুকগো ফিরে
খনা গার্গী লীলাবতী,
আর্য্য-সুতগণে পূজুক যতনে
নারী সতী গুণবতী।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
সাহারাণপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৭ সংখ্যা।	মাঘ ১৩০৪—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮।	৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—গত ১২ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের ৬৮ সাংবৎসরিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃসল অনেক স্থলে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে। কলিকাতাস্থ তিন সমাজেই খুব জনতা হইয়াছিল।

দেশীয় সখের সেনা—অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইসলামপুরের জমীদার বাবু প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদার বলণ্টিয়র বা সখের সেনা দলভুক্ত হইয়াছেন।

সূর্য্যগ্রহণে মেলা—গত ১০ই মাঘের সূর্য্যগ্রহণে অনেক তীর্থস্থানে অনেক জনতা হইয়াছে। স্থানেশ্বরে ৬ লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। গ্রহণোপলক্ষে মাঘ মেলায় প্রয়াগে প্রায় ১১,০০,০০০ এগার লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়—১৯ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করিবেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তদশ (convocation) বার্ষিক অধিবেশনে পঞ্জাবের ছোট লাট ১৬ জন এম্ এ, ১০৪ জন বি, এ এবং ২৩ জন বি, এলকে উপাধি দিয়াছেন। প্রাচ্য বিদ্যায় এক

জন মাত্র বি, এ, এবং এক জন মাত্র এম, এ, হইয়াছেন।

মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি—ইহা কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য গোয়ালিয়ারের মহারাজা ৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

অশুভ লক্ষণ—১৮৯৮ সালে আবার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা, তাহা পশ্চিম ভারতবর্ষে হইবে। আগামী এপ্রেল, মে ও জুনে এবং সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসে এক একটী ধূমকেতুর উদয় হইবে। এক বর্ষে ৫টী ধূমকেতুর উদয় অসাধারণ ঘটনা। এ দিকে সীমান্ত যুদ্ধ পুনরারব্ধ।

সংস্কৃত কলেজ সম্মিলন—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের উদ্যোগে এ বৎসরও সরস্বতী পূজার সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের একটী শুভ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

প্রাদেশিক সমিতি—এ বৎসর ঢাকা সহরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে।

দান—শিয়াড়সোলের রাণী ভবসুন্দরী দেবী একটী স্থানীয় ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণার্থ ৬০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—মড়ক কর্ত্তৃপক্ষদ্বয়ের হত্যাকারী দামোদর চাপকারের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। জুরীরা হত্যাকারী নয়, কিন্তু হত্যার সাহায্যকারী বলিয়া তাহাকে অপরাধী করিয়াছেন। সে হাইকোর্টে আপীল করিবে।

স্বভাবের প্রভাব।

জীবন বিকাশের উপায় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমেই দেখিতে পাই—স্বভাবই মানব জীবন বিকাশের একমাত্র মহতী শক্তি। স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতি জীবনেই কার্য্য করিতেছে। ইহারই প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে, কুসুম মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতেছে, ফল সুপক্ক হইতেছে, —প্রকৃতিতে সকল প্রকার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সংঘটিত হইতেছে, প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ইহার কার্য্য দেখিতে পাই। ঐ যে প্রান্তরে প্রকৃতির শোভন নয়নমনোরঞ্জন হরিৎ আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে;—উহা কে বিস্তৃত করিল? কে উহার শ্যামল শোভা রক্ষা করিতেছে? ঐ যে প্রসন্ন স্বচ্ছ সলিলে পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার মধুর হাস্যে ও লাবণ্যে সকলকে মুগ্ধ করিতেছে—উহা কে রোপণ করিল, কে উহা বর্দ্ধিত করিতেছে—কে ঐ বিকশিত কুসুমকে হাসাইতেছে—কে

উহার লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য ফুটাইতেছে? উহাদের কাহারও ত নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ফুল নিজের চেষ্টায় ফুটিতেছে না। তাহার জীবন ও সৌন্দর্য্যের জন্য সে কিছুই করিতেছে না, অথচ সে জীবিত, সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য স্বভাবের প্রভাবেই সংঘটিত হইতেছে। আবার এই স্বভাবের প্রভাবেই শিশু-দেহ বর্দ্ধিত হইতেছে, বালক যুবা হইতেছে, যুবা বৃদ্ধ হইতেছে,—ইহার প্রভাবেই জীবদেহে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে—ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—জীবন রক্ষিত হইতেছে। সংসারের নানা কার্য্যে সর্ব্বদাই আমাদের শরীর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের মৃত্যু ঘটিতেছে। স্বভাবই সতত নবদেহ, নবশক্তি প্রদান করতঃ সে ক্ষতি পূরণ করিতেছে, জীবন রক্ষা করিতেছে। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রতি সাত বৎসর মধ্যে জীবদেহের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে, পূর্ব্ব দেহের একটী পরমাণুও আর বর্ত্তমান থাকে না। স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা বিকশিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা অজ্ঞাতসারে এবং কোন প্রকার চেষ্টা ব্যতীত কত শিক্ষাই লাভ করিতেছি! প্রকৃতি যেন বল-পূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞানী, প্রেমিক ও সাধু করিতেছে। আমরা নিজ যত্ন ও চেষ্টায় যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি, স্বভাবের প্রভাবে তদপেক্ষা কত সহস্র গুণ শিক্ষালাভ করিতেছি, তাহা কে বলিবে? পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শিশু পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে শিক্ষা লাভ করে, সমস্ত জীবনের শিক্ষাও তাহার সমান হইতে পারে না। কিন্তু শিশুজীবন অতিক্রম করিলেই আমরা স্বভাবের প্রভাবের অতীত হইতে পারি না। পর-বর্ত্তী জীবনেও ইহার প্রভাবেই আমরা জ্ঞানে, প্রেমে ও পবিত্রতায় উন্নত হই—ইহার প্রভাবেই সর্ব্বদা প্রাণে শুভ বুদ্ধি উদিত হয় ও হৃদয়ে সদ্ভাব কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, এবং আমাদের জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়। আমরা দেখিতেছি স্বভাবের প্রভাবই জীবন বিকাশের একমাত্র মূল শক্তি। এই কার্য্যে আমাদের শক্তি ও অধিকার অতি অল্পই আছে।

আমরা বীজ বপন করিতে পারি, তাহাতে জল সেচন করিতে পারি, কিন্তু উহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারি না। আমাদের এরূপ শক্তি নাই যে, কুসুম বিকশিত করিতে পারি, ফল সুপক্ক করিতে পারি। আমাদের নিজ শরীর, মন, প্রাণ বিকাশ করিবার শক্তিও আমাদের নাই। আমরা আহার গ্রহণ করিতে পারি, শারীরিক নিয়ম পালন করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাবলে আপন দেহ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও বর্দ্ধিত করিতে পারি না। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা লাভের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছামাত্র তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিতে পারি

না। যেমন আমরা বৃক্ষে সার প্রদান করিতে পারি, কিন্তু সে সারকে বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, দেহে পরিণত করিবার শক্তি আমাদের নাই; যেমন আমরা আহার গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু সেই আহারকে রক্ত মাংসে পরিণত করিবার সাধ্য আমাদের নাই—সমস্ত কার্য্যই স্বভাবের প্রভাবে হইয়া থাকে—উহাতে আমাদের কোনও হাত থাকে না; এ স্থলেও সেইরূপ।

স্বভাবের প্রভাব যে হৃদয়ে যে পরিমাণে মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, সেই হৃদয় সেই পরিমাণে সুন্দর, মধুর ও জীবন্ত ভাব ধারণ করে। সকলের হৃদয়েই ইহা অল্পাধিক কার্য্য করিতেছে। যে হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, সেই হৃদয়ে স্বভাব যথোপযুক্তরূপে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তাহাকে বিকশিত ও লাবণ্যযুক্ত করে। স্বভাব প্রতি জীবনকেই বিকাশোন্মুখ অবস্থায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। স্বভাব সর্ব্বদাই জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল। বহির্জগতে স্বভাবের শক্তি সর্ব্বদাই মুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে, বহির্জগৎ এত রমণীয়, এত মধুর! অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে, তরুলতার কিরণোন্মুখীন স্বভাব হইতে তাহাদিগকে কে কবে ভ্রষ্ট হইতে দেখিয়াছে? তাহারা সর্ব্বদাই বিকাশোন্মুখ অবস্থায় স্থিতি করিতেছে। সর্ব্বদাই তাহাদের উপর স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাব কার্য্য করিতেছে। তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাহারা বাধা প্রদান করিতে পারে না, তাই তাহাদের ভিতরে স্ব স্ব ধর্ম্মের এমন মধুর ভাব বর্ত্তমান, তাই তাহারা সর্ব্বদা জীবন্ত। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আছে, স্বভাবের কার্য্যে আমরা বাধা প্রদান করিতে পারি, তাই আমাদের সকল জীবনে স্বভাবের প্রভাব মুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং আমাদের জীবনও উপযুক্তরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে না। বহির্জগতে জীবন বিকাশের প্রধান শত্রু—জীবন বিনাশের প্রধান কারণ—কীটাদি। আমাদের জীবনের প্রধান শত্রু, পাপ-কীট। কুসুমকোরকে কীট প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়, এবং স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া উহাকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না, আমাদের জীবন-কুসুমেও সেইরূপ পাপ-কীট প্রবেশ করিয়া আমাদের কোমলতা, সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত ভাব সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়, এবং আমাদিগকে আর বিকশিত হইতে দেয় না। ফুলে যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে ফুলের হাত নাই, কিন্তু আমাদের জীবন-ফুলে যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে আমাদের হাত দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, ইচ্ছা করিয়াই যত কীটকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। যাহাকে সুন্দর মনে করিয়া আদরের সহিত হৃদয়ফুলে বাস করিতে দিয়াছি, আজ দেখি সেই বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধু—সেই সুন্দর কীট—জীবন-ফুলটী

একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কীট ফুলের জীবন নাশ করিতে আসিলে, স্বভাবই সে বিনাশ নিবারণে চেষ্টিত হয় এবং অনেক সময়েই তাহাতে সফল হইয়া ফুলের পূর্ব্ব শ্রী ফিরাইয়া দেয়। আমাদের শরীরে কোনও বিষ প্রবেশ করিলে শরীরের সমস্ত শক্তি সেই বিষ বাহির করিবার জন্য সতত কার্য্য করিতে থাকে, যাবৎ সেই বিষ বহির্গত না হয়, তাবৎ সেই শক্তি নিরস্ত হয় না। ঔষধ,—এই প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষীণ হইলে, তাহার বলের সাহায্য করে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে স্বভাবের প্রভাবেই ব্যাধির উপশম হয়—পূর্ব্বস্বাস্থ্য, পূর্ব্বলাবণ্য ফিরিয়া আইসে। স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের কীটদষ্ট জীবন হৃত শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয়, রোগমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়া বিকাশের বাধা জন্মাইতে পারি, যে ফুল শীঘ্র ফুটিত,তাহার বিকাশের বিলম্ব ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বভাবের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিয়া জীবন বিনাশ করিতে পারি না। কীটদংশনে কুসুম বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দেহ বিনষ্ট হইতে পারে—তখন স্বভাবের প্রভাব আর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না—কিন্তু শত পাপ-কীট দংশনেও আমাদের জীবন একবারে বিনষ্ট হয় না। সকল সময়েই স্বভাবের অপ্রতিহত শক্তি সমস্ত কীট ধ্বংস করিয়া আমাদের জীবন-কুসুম প্রস্ফুটিত করিতে পারে। তাহার প্রমাণ নিজে অপবিত্র ও শ্রীহীন হইয়াও পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ যে মুগ্ধ হয়, ইহাই জীবনের লক্ষণ। এই শক্তিই আমাদের জীবন বিকাশের প্রধান সহায়। যদি আমাদের এই স্বাভাবিক ভাব না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ও তাহাতে মোহিত হইতে পারিতাম না। এই এক সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তির অভাবে অপরের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও সদ্ভাব আমাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীবনের পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারিত না। সাধুজীবনের সৌন্দর্য্য এবং সুন্দর প্রকৃতির পবিত্র দৃশ্য সকলই আমাদের নিকট বৃথা হইত। তাহাহইলে

মলয় বাতাস বইলে পরে ফুল ফোটেরে বনে,
সাধুর বাতাস লাগ্‌লে গায় প্রেম ফুটেরে মনে।"

এ কথা কেবল কবি-কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইত। স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাবেই মানবজীবন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, পবিত্রতা ও প্রেমের সংস্পর্শে পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হয়। যেমন বৃক্ষের স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থা তাহার সুরসাল ও সুশোভন ফল ফুলের মাধুরীতে প্রকাশিত হইয়া সকলের প্রাণ স্নিগ্ধ করে, তেমনই মানবাত্মার স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থা তাহার সদ্ভাব ও সদ্‌গুণ-কুসুমের মধুর লাবণ্য ও সুসৌরভে প্রকাশিত হইয়া জগৎ মুগ্ধ, পবিত্র ও ধন্য করে। সকলের দৃষ্টি এই প্রভাব-সুন্দর জীবন্ত কুসুমের দিকে আকৃষ্ট

না হইয়া থাকিতে পারে না। কাহারও ইহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যদি মানবমণ্ডলী স্বভাবের অপ্রতিহত কার্য্যে বাধা না জন্মাইত, তাহাহইলে সমস্ত জগৎ কি সুন্দর শোভায় শোভান্বিত হইত! বহির্জগতের দিকে চাহিয়া তাহাতে স্বভাবের সুন্দর বিকাশ দেখিয়া যেমন সর্ব্বদাই মুগ্ধ হই, তেমনই মানব জগতের দিকে চাহিয়াও মুগ্ধ হইতাম। তাহাহইলে জগতে কেবল অমৃত ও শান্তির মধুর স্রোত প্রবাহিত হইত, সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিত। সংসারের দুঃখ একবারে তিরোহিত হইত বলিতেছি না, কিন্তু স্বভাবের বিকাশে স্বভাবের প্রভাবে, সে দুঃখ অমৃতের প্রস্রবণ ও শান্তির সোপান স্বরূপ হইত। স্বভাব সকলই অমৃতে পরিণত করে। স্বভাবের প্রভাবেই পঙ্কিল ও মলিন, বিষাক্ত ও লবণাক্ত সলিলকণাসমূহ রবি-তাপে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নির্ম্মল বারি-ধারায় ধরা সুশীতল করে, ধরাকে নব-জীবন প্রদান করে। স্বভাবের প্রভাবই সুখ দুঃখ, রোগ শোক, সম্পদ, বিপদ, সকল অবস্থা হইতে জীবন-উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিপুষ্ট করে। তাই বলিতেছি স্বভাবের কি সুমহান্ প্রভাব! ইহা দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন করে, গরল হইতে অমৃত উৎপন্ন করে, অশান্তি হইতে শান্তি উৎপন্ন করে। এই স্বভাবই জীব ও প্রকৃতির ধর্ম্ম, ইহাই জগৎরূপা, ইহাই জগৎশক্তি। পরমেশ্বরের করুণা ও শক্তি আমাদিগকে পাপ ও অপবিত্রতা হইতে পুণ্য ও পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে আকর্ষণ করিতেছে। নিতান্ত অসাড় ও মৃত না হইলে পরমাত্মার এই টান, এই আকর্ষণ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা অসাড় ও মৃত হইয়া থাকিতে চাহিলেও, জীবনবৃক্ষের মূলে রসপ্রবেশের পথে বাধা জন্মাইলেও, পাপ পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নিতান্ত কুৎসিত হইয়া থাকিলেও করুণাময় ঈশ্বরের সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও অসীম স্নেহে সকল অবস্থা ধরা পড়িতেছে, আমাদের মৃত্যুপথ রুদ্ধ হইতেছে, জীবনবৃক্ষের মূলে আবার রস প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার অবিরাম কার্য্যশীলতা ও স্নেহগুণে মৃত, অসুন্দর ও কুৎসিত হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। সকলকেই জীবিত হইতে হইবে; সুন্দর হইতে হইবে, উঠিতে হইবে, চলিতে হইবে। তিনিই সমস্ত করিবেন। তাঁহার অসীম শক্তি, মহতী ইচ্ছা সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে।

পরমাত্মাই আমাদিগকে পবিত্রতা হইতে অধিকতর পবিত্রতাতে, জ্যোতি হইতে উজ্জ্বলতর জ্যোতিতে, উন্নত হইতে উন্নততর লোকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণের বিরাম নাই, ইহা অনন্ত কালের জন্য। এই আকর্ষণের জন্যই আমাদের অনন্তজীবন—অনন্ত উন্নতি—অবিরাম গতি। স্বভাবের প্রভাবেই আমরা উর্দ্ধে আকৃষ্ট হইতেছি, এক অবস্থায় এক স্থানে স্থির

থাকিতে পারিতেছি না, এইজন্যই অনন্ত গতি, অনন্ত উন্নতি। এই অনন্ত গতি, ও অনন্ত উন্নতির প্রবাহ কেবল আমাদের মধ্যেই রুদ্ধ নহে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এই প্রভাবে অনন্ত গতিশীল, অনন্ত উন্নতি-পথে প্রধাবিত, কিছুই এক অবস্থায় স্থির থাকিতে পারিতেছে না। আমরাও এই অনন্ত উন্নতির স্রোতে, এই স্বভাবের সুমহান্ প্রবাহে জীবন ঢালিয়া ধন্য হই। আমরাও অনন্ত দেবের মহান্ ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দিয়া, সতত বিকাশোন্মুখ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া অনন্ত গতিতে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হই। মানব জীবনে স্রষ্টার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক—সব জীবন্ত, মধুময় ও সুধাময় হউক।

কলালাপ।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

হস্তলাঘব,—অলক্ষিত ভাবে নিজ বা পর হস্তের সঞ্চালন দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর প্রবর্ত্তন। এ দেশে "হস্তচালন", "করলিপি" প্রভৃতি ব্যাপার বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে এবং তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। মৈস্মরতত্ত্ব অর্থাৎ মেস্‌মেরিজম্ তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। একজনের অক্ষি-সমীপে নানা ভঙ্গীতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাকে অচেতন করা হয়। ইহা এক প্রকার মৈস্মরক্রিয়া। এই ক্রিয়ার অন্যবিধ প্রকরণও আছে। যাহাহউক, হস্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি, এই কলার অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়। কোন ব্যক্তির দেহে কোনরূপ বিষজ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইলে, তাহা কোন্ জাতীয় কীট, পতঙ্গ, বা গোধিকার বিষ; তাহা হস্তসঞ্চালন (হাতচালা) দ্বারা নির্ণয় করা হয়। কাহাকেও সর্পে দংশন করিলে, সেই সর্প নাগ কি বাসুকী জাতীয়, ঐ হাতচালায় তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সকল সর্প বিষধর, তাহা বাসুকী-জাতীয় এবং যাহারা বিষধর নহে, তাহারা নাগজাতীয় সর্প। কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, বা হারাইয়া গেলে, হাতচালার দ্বারা তাহারও সন্ধান হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপন বাম হস্ত মৃত্তিকার উপর স্থাপন করেন। করতল কিয়ৎ কাল ভূমিস্পৃষ্ট হইয়া নিশ্চল থাকে। হস্ত-চালক অনুচ্চস্বরে নিরন্তর মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। সে সকল মন্ত্র প্রায় কাহাকেও সহজে শিক্ষা দেন না। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, সে সকল মন্ত্র শিক্ষা করিতে শিক্ষিতগণের রুচি ও বিশ্বাসও হয় না। যাহাই হউক, ঐ নিশ্চল হস্ত ক্রমশঃ চলিতে আরম্ভ করে। যে স্থানের যে ভূমিতে এই হস্তচালনী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

হয়, সেই ভূমির একদেশে পূর্ব্বেই একটী মনুষ্য অবয়ব অঙ্কিত হইয়া থাকে। চালিত হস্ত সেই অঙ্কিত অবয়বের অঙ্গ-বিশেষ স্পর্শ বা উল্লঙ্ঘন করে। সেই চিত্র স্পর্শ বা উল্লঙ্ঘনের প্রকারাদি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই করচালনে অনেকেরই বিশ্বাস নাই। কেহ কেহ বলেন, এই হস্তচালন চালকের ইচ্ছাকৃত প্রতারণামাত্র। অশিক্ষিত প্রতারকগণ ইহা দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মন্ত্রে বিশ্বাস না হইলে নিজের হস্তসঞ্চালন বিষয়ে অপরের এরূপ মন্তব্য প্রকাশ অসঙ্গত নহে।

করলিপি বিষয়ক আশ্চর্য্য ঘটনা, বোধ হয়, অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় করলিপি দ্বারা অনেক লৌকিক ও অলৌকিক তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছিল, তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহা অনেক দিনের কথা, ইহার সত্যতার জনশ্রুতি ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই; সুতরাং ইহাতেও অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। করলিপি ক্রিয়ার সহিত বোধ হয়, প্রেততত্ত্ব বা যোগ বিশেষের সম্বন্ধ আছে; নতুবা তাদৃশী অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্ভবে না। এই প্রক্রিয়াবিৎ ব্যক্তিগণ একটী নিরক্ষর কুমার, বা কুমারীর কর পরিচালিত করিয়া তদ্দ্বারা অদ্ভুত প্রশ্নাবলীর উত্তর লিপিবদ্ধ করাইয়া থাকেন। কখন বা নিরক্ষর যুবক বা প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অচেতন করিয়া তাহার কর দ্বারা উক্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

১২৮৮ সালে রাণাঘাটের সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীগোপাল পালচৌধুরী বাতব্যাধি রোগে শয্যাগত হয়েন। ঐ পীড়ায় তিনি প্রায় নয় মাস শয্যাগত থাকিয়া পরিশেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে নিরাময় করিবার উদ্দেশে বিবিধ লৌকিক ও দৈবানুষ্ঠান করা হইয়াছিল। করলিপি দ্বারা পীড়া বিষয়ক শুভাশুভ তত্ত্ব নির্ণয় করণ তন্মধ্যে অন্যতম অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বীরনগরনিবাসী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন ব্রাহ্মণ ঐ অনুষ্ঠানের নেতা ছিলেন। একাদিক্রমে এক সপ্তাহ কাল ঐ অলৌকিক অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। প্রায় বিংশতিটি ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন। আমরাও সাত দিন ধরিয়া তাহা দেখিয়া তাহার দৈনিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।

একটী বিলক্ষণ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণযুবককে আসনে বসান হইল। এই যুবাটী নিতান্ত নিরক্ষর ছিল। তাহাকে গঙ্গাজলে আচমন করিতে বলায় সে তাহা করিল। তাহার সম্মুখে গঙ্গামৃত্তিকা চূর্ণের একটী ক্ষুদ্র স্তূপ রক্ষিত হইল। ব্রাহ্মণ-যুবক অনুষ্ঠাতার আদেশে

ঐ মৃত্তিকা স্তূপের উপর দক্ষিণ করতল স্থাপন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল। অনুষ্ঠাতা পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যুবকের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং নিজ মুখে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যোগাসনে উপবিষ্ট যুবকের মুখ দিয়া লালা ভাঙ্গিতে লাগিল এবং দন্তঘর্ষণের শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। এই সময়ে অনুষ্ঠাতা এক একবার যুবকের চক্ষুদ্বয়ে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুবকের দক্ষিণ কর সঞ্চালিত হইয়া মৃত্তিকা-স্তূপকে ভগ্ন করিল এবং চূর্ণ মৃত্তিকাকে সমধরাতলে বিস্তৃত করিল। অনন্তর বিস্তৃত করতল তদুপরি ঘুরাইতে লাগিল। "মা লেখ! মা লেখ!" কর্ম্মী নিরন্তর এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যুবকের তর্জ্জনী ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল, কেবল তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মৃত্তিকাসংযুক্ত রহিল। এই সময়ে রোগীর পক্ষ হইতে বিবিধ প্রশ্ন হইতে লাগিল। প্রশ্নানুক্রমে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ধূলি-ক্ষেত্রে উত্তর সকল লিখিত হইতে লাগিল। সাড় দিন প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা করিয়া বিবিধ উৎকট প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছিল। শেষে দেখা গেল, সেই বর্ণজ্ঞানবিহীন যুবক অচেতন অবস্থায় রোগের উৎপত্তি, স্থিতি-কাল, প্রতীকার জন্য স্বস্ত্যয়ন, পূজা, হোম, বলি, ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল উত্তর লিখিয়াছিল, সকলই শাস্ত্র ও যুক্তি-সঙ্গত। তবে এইটুকু বুঝা গেল কর্ম্মীর জ্ঞানের সীমা যতদূর, যুবকের কোন উত্তরই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহাতে বোধ হয় কর্ম্মী যেন যুবকের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন, তাহাও নহে। তিনি সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত গৃহস্থ ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, অথচ এই অদ্ভুত কাণ্ড অনায়াসে প্রদর্শন করিলেন। কাহারও মনে এমন সংশয় হইতে পারে যে, ঐ যুবক নিরক্ষর হইলেও, তাহাকে পূর্ব্বে সাধারণ প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখিতে শিখান হইত। এরূপ সংশয় করিবার স্থল আদৌ নাই। কেননা, প্রতিদিন যখন এই অনুষ্ঠান শেষ হইত, তখন ঐ যুবক সম্পূর্ণ অচেতন। তাহার চৈতন্য সম্পাদনার্থ বিশ ত্রিশ কলস জল মস্তকে ঢালিতে হইত এবং দন্ত ও হস্ত পদের সন্ধি শিথিল করিতে ২।৩ জন বলবান্ পুরুষকে বল প্রয়োগ করিতে হইত। তাহার তৎকালীন অবস্থা দর্শনে হয়ত আর চৈতন্য হইবে না বলিয়া আমরা সশঙ্কিত হইতাম। যাহা হউক, এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায়, এই বিস্ময়োৎপাদিনী বিদ্যা এককালে এ দেশে এত সহজবেদ্য হইয়াছিল যে, যে সে তাহা শিক্ষা করিতে পারিত। এমন

বিশ্বের এককালে লোপ হওয়া নিতান্তই কৌতুকের বিষয়।

কৌচুমার যোগ,—আপনাতে নানা রূপের অভিব্যক্তি। আমরা ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছি যে, ঐন্দ্রজালিক গুণে মনুষ্য আপনাকে নানা রূপে প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু মহর্ষি কুচুমারের আবিষ্কৃত যোগ সেরূপ নহে। বোধ হয় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত এই কৌচুমার যোগ প্রভাবে মনুষ্য আপনাকে অণুবৎ ক্ষুদ্র দেখাইতে পারেন। আপনি এমন লঘুভার হইতে পারেন এবং অন্য পদার্থকে এমন লঘুভার করিতে পারেন যে, তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এমন জন-শ্রুতি আছে যে, কোন কোন সাধু সকলের সমক্ষে দিবালোকে জলের উপর পদব্রজে নদীপার হইয়াছেন। কেহ বা আপনার কাষ্ঠপাদুকা শূন্যভরে অবস্থান করিয়াছেন। রামায়ণে দেখা যায়, লঙ্কেশ্বর-পুত্র মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। মহাভারতপাঠে জানা যায়, দেবগণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরাজকে গগন-মার্গে পরিচালিত করিয়াছেন। এরূপ ঘটনার কথা কতই শুনা যায় এবং পুরাতন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। এ সকল ব্যাপার কি? বোধ হয়, কৌচুমার যোগ সিদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

৮। পানকরস-রাগাসব যোজন,—পানক অর্থে শরবৎ। রস,—রাগ,—আসব অর্থে যথাক্রমে মধুর অম্লাদি রস, লোহিত পীতাদি বর্ণ এবং সুরাদি মাদক। জলমিশ্রিত মিষ্টান্ন-শর্করাদির নাম শরবৎ, —অর্থাৎ মিশ্রি বা চিনির পানা (পানক)। ঐ পানায় বিবিধ আস্বাদ যোগ, নানাবিধ রঙ করণ এবং সুরাদির মিশ্রণ পূর্ব্বক পানকের মাদকতা গুণ উৎপাদন। এখন চা, কাফি খাইয়া যে কার্য্য হয়, পূর্ব্ব-কালে উপরি-উক্ত প্রকার শরবৎ পান করিয়া বোধ হয় সেই কার্য্য হইত। এখন দেখা যাইতেছে, চা পান করা সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক ইংলণ্ডেই বৎসরে চৌদ্দ কোটি টাকার চা খরচ হইয়া থাকে। তদনুসারে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে কত টাকার চা খরচ হয়, তাহা অনুমান করাও কঠিন। ইংরাজের অনুকরণে, বোধ হয় বাঙ্গালীরও শতকরা পঁচিশ জন চা-খোর হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যিনি সকালে বিকালে চা পান না করেন, তাঁহাকে অসভ্য বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক, এ হিসাবে ভারতবাসী বহু পূর্ব্বকালে সভ্য হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। কেননা যখন পৃথিবীতে চা ও কাফির গুণ প্রকাশ পায় নাই, তখনও তাঁহারা শরবতে চা ও কাফির গুণ যোজনা করিতে শিখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য একটা বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কোনরূপ মাদক সেবনে হঠাৎ দৈহিক ক্লান্ত অপগত হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে।

এই জন্যই ভ্রমশীল মানবসমাজে মাদকের এত প্রাদুর্ভাব। কিন্তু উহার পরিণাম ফল বিষময়। কোনরূপ মাদক কিছু দিন সেবন করিলে, তাহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ উহার মত্ততাজনিকা শক্তি দেহে থাকে, ততক্ষণই শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি ও লঘুতা থাকে,—কিন্তু তাহার পর অর্থাৎ নেসা ছুটিয়া গেলে দেহ ও মনে দ্বিগুণ অবসাদ উপস্থিত হয়। এই অবসাদ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কিন্তু চা, কাফি, অথবা এই কলায় বিবৃত পানকে অল্পপরিমাণে মাদকত্ব শক্তি থাকিলেও, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। চা ও কাফিতে ঐ শক্তি স্বভাবতঃই আছে এবং প্রাচীন পানকে যে মাদক মিশ্রিত করা হইত, তাহা সাধারণ গৌড়ী বা পৈষ্টী, উৎকট সুরা নহে;—তাহা আসব, অর্থাৎ পুষ্পমধু। এই জন্যই জনসমাজে চা ও কাফির এত আদর এবং প্রাচীন ভারতে আসবমিশ্রিত পানকের তাদৃশ গৌরব ছিল।

(ক্রমশঃ)

আত্মঘাতিনী।*

১

কে জানে কেমন ক'রে
সে নিঠুর গেল ম'রে,
সুখদা বসুধা-পানে
দেখিল না চেয়ে,
আমাদের শশী রবি,
তারো ছিল ওরা সবি,
তারেও শুনা'তে, পাখী
বেড়াইত গেয়ে।

২

তারেও ঢালিতে প্রীতি,
কুসুম হাসিত নিতি,
তারেও মলয়ানিল,
দিত জুড়াইয়া,
আমাদের সাথী যারা
তারো ছিল সবি তা'রা,
প্রকৃতি স্নেহের কোল
দিত পসারিয়া।

৩

যদিও তাহার বুক
ভরা ছিল কত দুখ,
মরমে জলিত সদা
লুকানো অনল,
তবু'তো মা বসুন্ধরা,
অনন্ত শোভায় ভরা,
তবু'তো মানব-গেহ
শত প্রীতিস্থল!

* সাহিত্য-সেবিকা, বামাবোধিনীর লেখিকা কুমুদিনী রায়ের শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

৪

কত প্রাণ তার লাগি,
আনন্দে উঠিত জাগি,
কত আঁখি তার দুখে
ঝরিত নির্জ্জনে,
কত স্নেহ কত প্রীতি,
কতজনে দেছে নিতি,
কত সাধ কত আশা
ছিল আরো মনে!——

৫

সকলি ভুলিয়া হায়,
জীবনে দলিয়া পায়,
অনা'সে সে চলে গেল,
উদাসীর প্রায়,
গভীর আঁধার রেতে
নীরব শয়ন পেতে,
ভাঙিল সাধের খেলা,
মরণ-ছায়ায়!

৬

কে জানে তখন তার
দু'টি তপ্ত অশ্রুধার,
উজল কপোলযুগে
বহেছিল কি না,
কে জানে প্রাণের টানে
চাহিয়া জগত-পানে,
ভাবিল কি "বাঁচি যদি,
মৃত্যু চাহিব না!"

৭

চির প্রিয় মুখগুলি
অলস নয়ন তুলি,
যবে সে মুমূর্ষু-প্রাণে
আসিল ভাসিয়া,
তখন অবশ করে
ধীরে ধীরে—সকাতরে,
শেষ আঁখিজল বুঝি
ফেলিল মুছিয়া!

৮

আবার রুচিরা উষা
পরিয়া কনক ভূষা,
ভাঙিল বিশ্বের ঘুম
অমিয় বাতাসে,
তারে ও সাধিল কত—
সে কুমুদ জন্ম মত,
ঢেকেছে যে মুখ, চির
অন্ধকার বাসে!

* *

৯

আজো তার বাতায়নে,
হাসে শশী তারা সনে;
পাপিয়া "প্রভাতী" গেয়ে,
জাগাইতে যায়,
না পেয়ে স্নেহের সাড়া
ভয়ে ফিরে আসে তা'রা,
শূন্য ঘরে বায়ু শুধু
করে "হায়! হায়!"

১০

আর সে নিতান্ত নাই!
মিছা কাঁদে বন্ধু ভাই,
আর সে অভিমানিনী
দেখিবে না চেয়ে!...
গেছে যদি সুখে থাক্,
কুশলে—আরামে থাক্,
জুড়াক্ তপত হিয়া
মা'র কোল পেয়ে!

শ্রীকনকাঞ্জলি রক্ষয়িত্রী।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩১৬ সংখ্যা ৩৩৪ পৃষ্ঠার পর)

গোরুর প্রসব সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে। একগাছা শক্ত দড়ী অগ্রে যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ দড়ী বৎসের আগপায়ে বাঁধ ও গাভী যেমন প্রসবের নিমিত্ত কোঁথ দিতে থাকিবে, অমনি একটু একটু করিয়া টান। দড়ী না বাঁধিয়া কেহ কেহ হাতে ঘুঁটের ছাই মাখিয়া বৎস ধরিয়া অল্পে অল্পে টানিয়া থাকে। এই সময়ে সাবধানে থাকিবে যেন পড়িয়া গিয়া বৎসের মস্তকে আঘাত না লাগে।

প্রসব হইবার সময় যদি বৎস অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

যদি বৎসের লাঙ্গুল অগ্রে বাহির হয়, তাহা হইলে বাছুরকে ফিরাইবার আবশ্যক নাই, কারণ এ অবস্থায় বাছুরকে টানিয়া বাহির করা সুবিধাজনক। এই কাজে একটু তৎপর হওয়া আবশ্যক, তা না হইলে বাছুর হাঁপাইয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। হস্তদ্বারা বাছুরের কটিদেশ একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া পশ্চাদ্ভাগের একটী পায়ের জঙ্ঘা ধরিয়া টান, তাহা হইলে একটী পা নির্গত হইবে। পরে আর একটী পা নির্গত কর।

যদি আগে সামনের পা নির্গত হয়, কিন্তু মস্তক ভিতরে থাকে, তাহা হইলে বাছুরের মুখ হাত দিয়া পায়ের মধ্যে সরাইয়া দাও এবং গাভী যেমন কোঁথ দিতে থাকিবে, বাছুরকে অমনি একটু একটু করিয়া টানিয়া বাহির কর।

যদি বাছুরের উদরের পার্শ্বভাগ উপরে থাকে, মস্তক ও স্কন্ধ এক পার্শ্বে থাকে, এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে বৎসকে একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া পায়ের সঙ্গে মস্তকের সহিত নির্গত করিতে চেষ্টা কর।

সামনের পা যদি মাথার সহিত বক্ষঃস্থলের নিম্নে থাকে, তাহা হইলে বাছুরকে একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিলে মস্তক দেখিতে পাইবে, কিম্বা পা দুইটী বদ্ধ হইয়া উদরের নীচে আছে দেখিতে পাইবে। এক একটী সামনের পা ক্রমে ক্রমে বাহির কর। যদি মরিয়া গিয়া বাছুরের মস্তক অত্যন্ত ফুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে একখানি সূক্ষ্মধারবিশিষ্ট অস্ত্র কৌশলপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা বাছুরের চক্ষের কাছ হইতে নাক পর্য্যন্ত কাটিয়া বাহির কর, এবং সামনের হাঁটু ধরিয়া মৃত বৎসকে ক্রমে ক্রমে বাহির কর।

যদি বাছুরের একটী পিছনের পা অগ্রে নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহা ভিতরে ঠেলিয়া দাও, কারণ পিছনের ও সামনের পা একত্র ধরিয়া বৎসকে নির্গত করা যাইতে পারে না।

এই সকল উপায় দ্বারা যদি বাছুরকে নির্গত করা দুঃসাধ্য হয়, তবে গাভীকে কপিকলে ঝুলাইয়া সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাৎ ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত কর, পরে প্রসবদ্বারে হাত প্রবেশ করাইয়া বাছুরকে জরায়ুর ভিতর ঠেলিয়া দাও এবং ফিরাও, পরে তাহার মস্তক ও সামনের পা ধরিয়া অনায়াসেই বাহির করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দুপরিবার।

(৩৯৬ সংখ্যা—৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

এই গৃহিণী ও কর্ত্তা সামান্য অবস্থার মনুষ্য হইলেও ইহাঁদের মনের প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত উন্নত ছিল এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিক আস্থা ছিল। নিজের সংসারের শত কষ্ট সহ্য করিয়াও ইহাঁরা পরের উপকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। গৃহিণী প্রত্যহ একটী দরিদ্রা বৃদ্ধাকে বাড়ীতে খাইতে দিতেন। এক দিন সে ভিক্ষা করিতে আসিয়া আপন নিঃসহায়তার ও দুর্দ্দশার কথা ঐ গৃহিণীকে জানায়। তিনি তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, এবং আপনাদের সংসারের অল্প আয় ভুলিয়া গিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে প্রত্যহ আসিয়া আহার করিতে বলিলেন। কত দিন তাহাকে নিজের মুখের গ্রাস দিয়া সানন্দচিত্তে সামান্য কিছু আহার করিয়া থাকিয়াছেন। এই কর্ত্তা ও গৃহিণীর এমন দয়ার শরীর ছিল যে, ইহাঁদের মুখ দেখিলেই তাহা লোকে বুঝিতে পারিত এবং আপন আপন কষ্টের কথা জানাইত। এই গ্রামে কত ধনী লোক বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে দরিদ্র লোকদের ভাগ্যে একমুষ্টি ভিক্ষা সকল দিন জুটিত না। অথচ এই সামান্য অবস্থার লোকের বাড়ীতে যে কোন রকমের অসহায় লোক আসুক না কেন, কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। ইহাঁরা পরের দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইতেন ও প্রাণপণে তাহার উপকারের চেষ্টা করিতেন। পরের ক্লেশের কথা শুনিলে যতক্ষণ তাহার কষ্টের লাঘব করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেন না। হৃদয়ের এই উদারতাগুণের জন্যই ঈশ্বর তাঁহাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। এই গৃহিণীর মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং দয়া দেখিয়া সকলে শত মুখে প্রশংসা করিত। বাড়ীর গৃহিণী যেরূপ সদ্গুণ-

গৃহিণী ছিলেন, কর্ত্তা ও গৃহিণী সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁদের অবস্থা অতি সামান্য হইলেও আচার ও রীতি নীতি বড় উন্নত ছিল। ইহাঁদের মনের মহত্ত্বগুণে ধনী ব্যক্তি সকল ইহাঁদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও সমাজের সকল কর্ম্মেই উক্ত কর্ত্তা ও গৃহিণীকে অগ্রগণ্য করিতেন। গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত কর্ত্তা ও গৃহিণী যে কর্ম্মে থাকিবেন, সে কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে; কেননা ইহাঁরা বড় ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। গৃহিণীর গুণপণা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, যে তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিত, সেই বুঝিতে পারিত। তাঁহার বাড়ী ঘর, রন্ধনশালা, ও প্রাঙ্গণ এমন পরিষ্কার থাকিত যে, সকলে দেখিয়া পুলকিত হইত। গৃহিণী সাংসারিক পাট ঝাঁট রন্ধন প্রভৃতি কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া আপনি বা পুত্র কন্যাগণ যে অপরিষ্কার থাকিতেন, তাহা নহে। যেমন আপনি, তেমনি পুত্র কন্যাগণ সর্ব্বদা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন যে, দেখিলেই বোধ হইত যেন বাড়াতে সতত লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। পুত্র কন্যাদের শয্যা প্রত্যহ স্বহস্তে কাচিতেন, পাছে অপরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে সন্তানদের পীড়া হয়। আর অন্ন বলিয়া যা, তা, খারাপ সামগ্রী সন্তানদিগকে খাইতে দিতেন না। স্বহস্তে মুড়ি ভাজিয়া তাহাই সন্তানদের জলযোগ করিতে দিতেন। বাড়ীতে একটী পয়স্বিনী গাভী রাখিয়াছিলেন। এই গাভীর দুগ্ধ খাইয়া আমার সন্তানগণ জীবন ধারণ করিতেছে বলিয়া স্বহস্তে পরম যত্নে গাভীটীর পরিচর্য্যা করিতেন। স্বামীর আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া তিনি পুত্র কন্যাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পাছে পীড়া হইলে স্বামীকে জালাতন হইতে হয় বা বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়, এজন্য সতত সাবধান হইতেন। সামান্য অসুখে পারতপক্ষে চিকিৎসক ডাকিতেন না। দেশী গাছগাছড়ার ঔষধ এত জানিতেন যে, সামান্য পীড়ায় আপনি চিকিৎসা করিতেন। ব্রাহ্মণও অনেকগুলি সন্তানের পিতা অথচ আয় অল্প বলিয়া বিপুল পরিশ্রমে ও চেষ্টায় বেশ ভাল রকম চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন। এমন কি অনেক বড় বড় চিকিৎসক ইহাঁর নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতেন। এজন্যও ডাক্তারকে প্রায় অর্থ দিতে হইত না। নিজে না খাইয়া সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু অপব্যয়ে একটী কপর্দ্দক ব্যয় করিতে বড় কাতর হইতেন। পরার্থে স্বার্থ পরিত্যাগই গৃহীর মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রের সাধনা করিতে তাঁহারা ক্ষণকালও ভুলিতেন না। মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া যদি পাঁচজনের উপকার না করিলাম, দীন দুঃখীকে আশ্রয় না দিলাম, অন্ধ আতুরকে একমুষ্টি ভিক্ষা না দিলাম, তবে জীবনই বৃথা ও উপার্জ্জিত অর্থও বৃথা, ইহাঁদের উভয়ের এই ধারণা ছিল। এই মহৎ গুণেই ক্রমে ইহাঁরা সর্ব্বাংশে মহৎ হইয়াছেন এবং গৃহিণীর অপরিসীম

গুণেই ইঁহাদের সংসার আদর্শ সংসার হইয়াছে। গৃহিণী যদি পিতার ধনে গর্ব্বিত হইয়া স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে কখনও এরূপ হইত না। সংসারে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সন্তানদের উপর কখনও অন্যমনস্ক হন নাই। সতত তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। যে সকল কুসংসর্গে থাকিলে সন্তানদের পরিণাম অতি শোচনীয় হইবে, এরূপ সংসর্গে কদাচ থাকিতে দিতেন না। পরে যাহাতে পুত্রেরা মানুষ হয় ও কন্যাগণ প্রকৃত গৃহিণী-পদের যোগ্য হয়, এজন্য সতত কায়মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেন ও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতেন। ইঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না। সেই জন্য প্রত্যহ দুইবেলা পিতা সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। ইঁহারা জানিতেন যে, বেতনভোগী শিক্ষক যেরূপ শিক্ষা দিবেন, ও তাহাতে সন্তানগণ যে শিক্ষা লাভ করিবে, তদপেক্ষা পিতার নিকট অধিক শিক্ষা হইবে। পিতামাতার শিক্ষায় যে ফল হয়, শিক্ষকের শিক্ষায় তাহা কখনই হয় না। এজন্য বহু পরিশ্রম সত্বেও ইনি পুত্রদিগকে নিজে শিক্ষা দিতেন এবং ফলও তদ্রূপ পাইয়াছেন। শিক্ষকের নিকট যাহা ছয় মাসে শিখিত, পিতার নিকট তাহারা তাহা ছয় দিনে শিখিতে লাগিল। সন্তানগণ ক্রমে বড় হওয়াতে ও শিক্ষালাভ করাতে সংসারের ব্যয় বাড়িতে লাগিল। আর পূর্ব্বের ন্যায় চলা কষ্টকর হইতে লাগিল। এজন্য কর্ত্তা ও গৃহিণীর ভাবনা বাড়িতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সংসারের একটু সচ্ছলতা হয় ও সন্তানদের শিক্ষা উত্তমরূপ হয়, এই ভাবনা তাঁহাদিগকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। কর্ত্তার যে বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিল, ক্রমে সেটী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহার বিবাহের সময় হইল। বৈমাত্রেয় ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মণ কখনও তাহাকে অনাদর করেন নাই, নিজের কন্যার মত তাহাকে ভালবাসিতেন, গৃহিণীও সেই মাতৃহীনা ননদকে কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করিয়া অতি যত্নে লালনপালন করিতেন এবং সে যাহাতে পরিণামে কষ্ট না পায়, এই জন্য একটী সুপাত্র সন্ধান করিয়া তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটী সুপাত্র পাইলেন। কিন্তু সে পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে গেলে কিছু বেশী অর্থের প্রয়োজন, এজন্য ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন কি করিব? প্রাণ থাকিতে এই মাতৃহীনাকে কোনও অপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিব না। আমরা সুখে থাকিব, আর আমার ভগিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, অথচ আমাদের কৌলীন্যপ্রথার ন্যায় পাত্রে কন্যা দিতে গেলে অনেক

অর্থের প্রয়োজন, অতএব সে অর্থ আমি কোথায় পাই? আমার কেবল ভগবান্‌ই সম্বল। তখন স্ত্রী বলিলেন তুমি কেন ভাবিতেছ? আমরা যাঁহাকে সম্বল করিয়াছি, সেই চিরসম্বল ভগবান্ আমাদিগকে দয়া করিবেন। দেখ আমার পিতৃদত্ত যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা বিক্রয় কর এবং সেই অর্থে উক্ত পাত্রে তোমার ভগিনীর বিবাহ দাও। আমার অলঙ্কার থাকিতে তুমি কাহার নিকট ঋণ করিতে যাইবে? স্ত্রীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া স্বামী আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। যদিও অলঙ্কার বিক্রয় করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল, তথাপি তিনি ভগিনীর জন্য সানন্দচিত্তে তাহা বিক্রয় করিলেন এবং বিক্রয় করিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা পাইলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইহাঁর বিমাতার কিছু স্ত্রীধন ছিল। কিন্তু পাছে উহাঁর সপত্নী-পুত্র এই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এই সন্দেহে সেই সম্পত্তির একখানি উইল করিয়া যাহাতে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উহা পায়, এজন্য তাহা মৃত্যুকালে কোনও আত্মীয় জনের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। যাহার নিকট তাহা রাখিয়াছিলেন, সে বলিল যে উহারই সম্পত্তি, অতএব উহারই বিবাহের জন্য তুমি এই সম্পত্তি হইতে কিছু লও, তাহা হইলে আর তোমাকে স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিতে হইবে না। কিন্তু ইহাঁরা এমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না। বলিলেন যখন বিমাতা আমার উপর বিশ্বাস করিয়া এই সম্পত্তি আমার হস্তে দিয়া যাইতে পারেন নাই, তখন আমি উহা লইতে পারি না। শেষে ভগিনী এই সম্পত্তি ভোগ করিলেই আমি চিরসুখী হইব। আমার ভগবান্ আছেন। এই বলিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সমারোহে ভগিনীর বিবাহ দিলেন। বহুল অর্থ ব্যয় হইল বলিয়া কোন দুঃখ করিলেন না। তাঁহার দরিদ্রা-বস্থায় তিনি যে আপন বৈমাত্রেয় ভগিনীর উত্তম পাত্রে বিবাহ দিতে পারিয়াছেন, ইহা জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্য-বাদ দিলেন ও পরম সুখী হইয়া ভগিনীকে স্বামি-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিমাতা।

১

আমি হিন্দু পরিবারের মেয়ে হইলেও আমার বিবাহ হইতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাবা অপিসে চাকরি করিতে করিতে হঠাৎ মারা গেলেন; ভাই দুটী আমার চেয়ে বয়সে ছোট; অন্য উপযুক্ত

অভিভাবকও নাই; সেই জন্য মা'র একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার বিবাহ শীঘ্র ঘটিল না। আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে দুইবেলা ঘটকী যাতায়াত করিতে লাগিল।

আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া ও সেলাইয়ের কাজ করি। বাবার একটী ছোট হারমোনিয়ম যন্ত্র ছিল, সেটীও বাজাইতে পারি। ইহা ভিন্ন কুটনা, বাটনা, রান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মও করিতে হয়; অবকাশসময়ে তিন ভাই বোনে মিলিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করি; মা আমাদিগকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। এই সকল আমোদে বিবাহের প্রতি আমার মনের ঝোঁক নাই,সে বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু চিন্তাও করি না।

যাহা হউক সহসা আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। একজন বড় ডাক্তার; বয়স উনত্রিশ বৎসর; সম্প্রতি দুইটী শিশু পুত্র রাখিয়া, তাঁহার পত্নী পরলোকে গমন করিয়াছেন; ঘরে তাঁহার এক বিধবা পিসিমা আছেন, অন্য কেহই নাই; সেইজন্য বিবাহার্থে তাঁহার বয়ঃস্থা পাত্রী আবশ্যক। অদৃষ্ট বশতঃ আমি নিতান্তই বয়ঃস্থা হইয়া উঠিয়াছিলাম।—তোমরা শুনিলে কি বলিবে জানি না, আমার বয়স কিন্তু সত্য সত্যই সতর বৎসর ছাড়াইয়াছে। পল্লিগ্রামের ভিতরে থাকিলে আমার মা'কে যে কতদূর অপদস্থা হইতে হইত, তাহা বিধাতাই জানিতেছেন! কলিকাতায় আছি বলিয়াই অনেক রক্ষা।

পাত্রের বন্ধুগণ "কনে" দেখিতে আসিয়া, আমার বয়স, চেহারা ইত্যাদি দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। একজন অপর জনকে জনান্তিকে বলিলেন "বেশ মেয়ে! নরেন বাবুর জন্য আমরা যে রকম মেয়ে চাই, ইটী সেই রকম সুপাত্রী বটে!" কথা "জনান্তিকে" হইলেও আমার কাণে গেল; আমি বড়ই লজ্জিতা হইলাম। তাঁহারা আমার একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া চলিয়া গেলেন।

পাকা দেখার পরে যথাসময়ে, যথানিয়মে আমাদিগের বিবাহ হইল। পিতৃহীনা কন্যার সহিত বিপত্নীকের বিবাহ, এজন্য ধুমধাম কিছুই হইল না। উভয় পক্ষের দুই চারি জন আত্মীয় বন্ধু আসিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিলেন মাত্র।

জামাতা দেখিয়া মা যারপর নাই সুখী হইলেন। বাবার কথা মনে করিয়া মা'র চোখের জল পড়িতেছিল; মা আমাকে বলিলেন "সরলা! ভগবানের কৃপায়, আর তোমার পিতৃদেবের পুণ্যবলে তোমাকে এমন সোণার চাঁদের হাতে দিলাম!—আশীর্ব্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হইয়া, স্বামীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া, মাতৃহীন বাছাদে'র মা হইয়া সুখে ঘরকন্না কর।" মায়ের কথা শুনিয়া আমারও চোখের জল উথলিয়া উঠিল; আমি মুখ ফিরাইয়া আঁচলের কোণ পাকাতেই লাগিলাম। মায়ের মুখ পানে চাহিতে পারিলাম না।

২

"শুভ দৃষ্টির সময়ে লোক জনের ভিতরে, আমি স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। লোকের উত্তেজনায় একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু উজ্জ্বল, বিস্তৃত নয়নযুগল দেখিয়া তখনই আমার দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; আমি কি দেখিলাম, বলিতে পারি না। তারপরে বিবাহান্তে, সমাগতা মহিলামণ্ডলীর মধ্যে, উজ্জ্বল দীপালোকে কার্পেটের আসনে বসিয়া, তিনি যখন জল খাবার খাইতেছিলেন, তখনই অন্যের অজ্ঞাতে, অন্তরাল হইতে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম।

তাঁহার পরণে চেলী বা গরদাদি নহে, একখানি লালপেড়ে ধুতী। গলায় এক গাছি বেলফুলের হার, হাতে একটী আংটী। সাজসজ্জা কেবল এই মাত্র। আমি কালিদাসের শকুন্তলাও নহি, শেক্ষপিয়ারের মিরাণ্ডাও নহি; ইতিপূর্ব্বে কোনও মহাত্মাকে দেখি নাই এমন নহে; আমি শত সহস্র আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিয়াছি,-কলিকাতার রাস্তা পূর্ণ করিয়া যখন অসংখ্য লোক চলে, তখন সেই অগণ্য লোকশ্রেণী দেখিয়াছি, কিন্তু আজি যাহা দেখিলাম, তাহা এ জনমে দেখি নাই।—এমন স্নেহময়, পবিত্রতাপূর্ণ, স্নিগ্ধ, গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি আমি এ জনমে কখনই দেখি নাই! ইনি যখন আমাকে জীবনের অর্দ্ধভাগিনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ কবিলেন, তখন আমার মত ভাগ্যবতী আর কে? সুখের উচ্ছ্বাসে আমার শরীর অবশ হইয়া গেল!

কিন্তু এ সংসারে মানুষের সুখের গর্ব্ব কতক্ষণ থাকে? সেই অপরিসীম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সহসা একটী কথা মনে হইয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল—আমার মনে হইল "কালের অদম্য প্রভাবে, এমন স্বামীকে ছাড়িয়া যে রমণী অসময়ে চলিয়া গিয়াছে, তাহার মত হতভাগিনী আর কে? যাইবার সময়ে তাহার প্রাণ না জানি কতই কাঁদিয়াছিল। হয়তো সে অবসন্ন চক্ষু দুইটী পুনঃ পুনঃ সবলে খুলিয়া ঐ ভুবনমোহন মুখখানি দেখিতে চাহিয়াছিল! নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, আর পরস্বাপহারকের মত আমি তাহারই ধনে ধনী হইয়া আনন্দে দিশাহারা হইতেছি! আমার এই আনন্দের দিনে, সেই অনাবিষ্কৃত দেশ হইতে দুইটী সজল চক্ষু, ঐ মনোহর মুখ খানির প্রতি চাহিয়া আছে কি না, কে বলিবে? আর আমার উপরে মর্ম্মভেদী, অভিসম্পাতপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বর্ষিত হইতেছে কি না, তাহাই বা কে বলিবে? সে যাঁহাকে জীবনের বন্ধু, সংসারের সহায়, জগতের অবলম্বন বলিয়া প্রাণের প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, হায়! হায়! পাপিষ্ঠা আমি, আজি তাহার সেই সর্ব্বস্ব ধনকে কাড়িয়া লইলাম!—এত দিনে তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইল—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে কি বলে, তাহা জানি না, আমার কিন্তু মনে হয়, মানবের প্রকৃত

মৃত্যু দেহের পতনে নহে, প্রিয়জনের স্মৃতিতে যে জাগিয়া থাকে, সে চিরদিনই অমর। মনুষ্যজাতির ইতিহাসেই এ কথার সত্যতা বুঝা যায়। আজি এ বিস্মৃতি তো আমার জন্যই ঘটনা হইল! —কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি অবলা; কাহারও হৃদয় হইতে প্রিয়জনের স্মৃতি, প্রণয়ের চিহ্ন মুছিয়া ফেলা আমার উদ্দেশ্য নহে; তবে আত্মরক্ষার্থে আমার শক্তিও নাই।—কিন্তু ছি, ছি, পুরুষেরা এত নির্ম্মম কেন? তাহারা কেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে? স্বর্গগত প্রিয়জনের উদ্দেশে প্রীতিবৃত্তি অনুশীলন করিলেও তো প্রণয়লিপ্সা চরিতার্থ হয়, তবে কেন নিষ্ঠুর পুরুষ স্বতন্ত্র পথ অনুসন্ধান করে?

বিবাহরাত্রে বাসরজাগার প্রথা অনেকের অনুমোদিত হইলেও আমার বাসর জাগিবার লোক মিলিল না। কেননা নিমন্ত্রিতা মহিলারা বিবাহের খানিকক্ষণ পরে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং তিনি ও আমি "নিরাপদে" বাসর-বাস করিতে গেলাম।

প্রথম দুই একটী সামান্য কথার পরে যখন তিনি আমার হাতের উপরে হাত রাখিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "সরলা! আমি এ জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, অনেক দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছি; আজি জগদীশ্বরের চরণে নির্ভর করিয়া তোমায় লইয়া আবার সংসারী হইতেছি; তুমিই আমার নিরাশার আঁধারে আবার আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছ! সরলা! তোমার এ হতভাগ্য স্বামীকে লইয়া তুমি প্রকৃত সুখী হইতে পারিবে তো? যথার্থ সহধর্ম্মিণীর মত তোমার স্বামীকে গম্য পথ দেখাইয়া দিবে তো? তখন আমি কি উত্তর দিব? সে স্নেহমাখা সুমধুর বিষাদোক্তি শুনিয়া আমার প্রাণ দ্রব হইয়া গেল; এতক্ষণ মনে যে সব কথার ঢেউ উঠিতেছিল, সে সব কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু মুখে একটী কথাও সরিল না!—বলিতে পারিলাম না যে, তোমাকে লইয়া যদি সুখী হইতে না পারি, তবে এ নারীজীবনে ধিক্! বলিতে পারিলাম না যে, আমার দেবতা তুমি, তোমাকে "গম্য পথ" আমি কিরূপে বুঝাইব? প্রভো! তোমার স্নেহের ছায়ায় এ দাসীকে রক্ষা করিও; তোমার চরণতলে স্থান পাইলেই এ দাসীর চতুর্ব্বর্গ মিলিবে!—তা ছাই, পোড়া মুখে একটী কথাও বলিতে পারিলাম না; কেবল দুইফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজলে সেই পদ্মফুলের মত হাতখানি ভিজিয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল; আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া উনি কি ভাবিতেছেন? —ছি, পোড়া চোখের জল পড়িয়া গেল কেন?

বিবাহের দুই দিন পরে আমি স্বামিগৃহে চলিলাম। মা'কে এবং ভাই দুটীকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ যে কেমন আকুল হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্বামীর সহিত গাড়ীতে বসিলাম। তাঁহার স্নেহের

সান্ত্বনা পাইয়া ক্রমশঃ চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম।

আমার পতিগৃহও কলিকাতায়। বাড়ীর কাছাকাছি হইলে স্বামী বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে তোমার নিজের বাড়ীতেই লইয়া যাইতেছি, সেখানে যাহা কিছু দেখিবে সে সব তোমারই; সরলা, সেই সব লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে তো?" কথাগুলি উনি যেন বড়ই আকুল হইয়া বলিতেছেন—আমার বুকে যেন স্থচ ফুটিল; আমার মুখ দিয়া হঠাৎ কথা বাহির হইল, আমি বলিলাম "আমার সুখের জন্য তুমি অত ব্যস্ত হইও না, আমি ভগবানের নামে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়াছি, তোমার সুখেই আমার সুখ" এই কথা বলিতে বলিতে আমার আবার লজ্জা করিতে লাগিল। উনি কিন্তু বড়ই সুখী হইলেন।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিলে, ওঁর পিসীমা এবং দুই তিন জন সমাগতা মহিলা আমাকে লইয়া উপর তালায় গেলেন। আমার দিকে চাহিয়া পিসীমা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "মা! এস! জন্ম-এয়োতী হও; আমার সুরেন যতীনের মা নাই, তা'দের সু-নজরে দেখ। বাছাকে আমার পোড়া যম টেনে নিয়ে গেল, তার সাধের সংসার প'ড়ে রইল!—কোনও সুখভোগ কত্তে পেলে না—"

পিসীমা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। আর একজন মহিলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন "সুখের কপাল না হ'লে কি কেউ সুখ কত্তে পারে মা? অতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় ছিল বলেই তো ডাক্তার বাবুর অমন সতী লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে মরে গেল।" তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই অন্য একজন রমণী কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার বাবুর আর দুঃখ কিসের?—অমন সুন্দরী স্ত্রী পেলেন; দুদিনেই ডাক্তার বাবুকে ভুলিয়ে নেবে! সুরেন যতীনকে পর করে দেবে! —আমার কাছে বাবু, উচিত কথা— শাস্ত্রে বলে "সত্য কখনো মিথ্যা নয়, সৎমা কখনো আপন নয়" ইত্যাদি।

এই সব সমালোচনা ও মন্তব্য শুনিয়া আমার বুকের ভিতর যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। স্বর্গীয়া সপত্নীর অকাল-মৃত্যু যেন আমিই ঘটাইয়াছি! আমি নীরবে বসিয়া মনে মনে রবি ঠাকুরের একটী কবিতার ভগ্নাংশ ভাবিতে লাগিলাম। কবিতা টুকু এই—

"ফুলের মালা গাছি, বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ!"

সমাগতা মহিলারা বিদায় হইলে, একজন ঝি দুইটী শিশুকে আনিয়া আমার কাছে দিল। ঝি বলিল "এই নাও, মাঠাকুরুণ! তোমার ছেলেদের নাও; তোমার জিনিষ তোমায় দিলুম, আমরা খালাস পেলুম। যা, যা, সুরিন, যতীন, ঐ তোদের মা এসেছে; মা'র কোলে গিয়ে বোস্। মা' এত দিন লুকিয়ে-ছিল, আজ এল। যা! মা'র কোলে যা!"

শিশু দুটীর সুকুমার সৌন্দর্য্যে আমার মন মুগ্ধ হইল। মরি, মরি, স্বর্গবাসিনি! এ সোণার পুতুল দুটীকে তুমি ফেলিয়া গিয়াছ বলিয়াই এ অমরপ্রার্থিত রত্ন "হতভাগ্য" পাইয়াছে। মা আমাকে "মাতৃহীনের মা" হইতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনের সর্ব্বস্ব দিলেও কি ইহাদের মায়ের অভাব ঘুচিবে? আমি হয়তো ইহাদের উপযুক্ত মমতা দিতেই পারিব না; ইহারা যে মাতৃহীন, সেই মাতৃহীনই রহিবে।

দুই ভাই চারিটী সতৃষ্ণ চক্ষু আমার মুখের উপরে স্থাপিত করিল। বুঝি যাহা ভাবিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা মিলিল না, যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে পাইল না, তাহাদের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল!—তাহারা মুখের ভিতর আঙুল পূরিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল।

এতক্ষণ তবু সহিয়া ছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না—দুটী কচি প্রাণ আমার জন্য আঘাত পাইল, এ ব্যথা আমি আর সহিতে পারিলাম না। তখন চোখের জলে ভিজিতে ভিজিতে "বাপ, যাদু" বলিয়া, তাহাদের গলা জড়াইয়া কোলে বসাইলাম।

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে তাহারা আমার কোলে বসিল। যতীন ছোট, তাহার বয়স চারি বৎসর, সে তাহার দাদা সুরেনকে বলিল "এ মা তো সে মা নয় দাদা?" সুরেনের বয়স ছয় বৎসর; যতীনের কথায় সে খুব লজ্জিত হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিল "সে মা নয়, উনি আমাদের মা"। যতীন ভগ্নস্বরে আস্তে আস্তে বলিল "এ মাও কি আবার সে মায়ের মত চলে যাবে, দাদা?"

হরি! হরি! বাপধন! তোরাই স্বর্গের কুসুম। কত লোকে আমাকে তোদের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছে, আর তোরা আমাকে অমৃতময় ভালবাসা ঢালিয়া দিলি! আমি তোদের "সে মা নয়" সত্য, হয় তো তাঁর মত ভালবাসিতে পারিব না, ইহাও সত্য; কিন্তু এ ক্ষুদ্র বুকে যতদূর স্নেহ সম্ভব, তা' তোদেরি দিব। তোরা যাঁহার সেই অঞ্চলের নিধি, নয়নের তারা, বুকজুড়ান ধন, তিনি যে এ জগতে নাই, আর আমি যে বিধাতাকর্ত্তৃক তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, এ কথা আমি কখনই ভুলিব না। দশ জনে আমাকে যাহাই বলুক, তোদের আমি বুকের অতি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিব; যদি তোদের মত সোণার পুতুল দুটীকে "আপনার" বলিয়া মমতা করিতে না পারিব, তবে এ জগতে রমণী হইয়া জন্মিলাম কেন? আর তুমি স্বর্গীয়া দেবি! আমি তোমারই দাসী—এই শিশুদের উপরে তোমার যে সমুদ্রতুল্য অতলস্পর্শ স্নেহরাশি ছিল, তাহারই এক কণা আমাকে দান কর, আমার জীবন সার্থক হউক।

আহা! স্বামীকে ও সন্তানকে তিনি না জানি কতই ভাল বাসিতেন; কতই আদর করিতেন; ইহাদের সুখের জন্য

আমি কি করিব? কি করিলে ইহাদের সুখ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে? হে ঠাকুর! লোকে যাহাই মনে করুক, আমার মনে হয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিশেষতঃ "বিমাতা" হওয়ার চেয়ে নারী-জীবনে গুরুতর দায়িত্ব আর নাই, আর নাই!

৪

আমার বিবাহের পরে অনেক বৎসর গিয়াছে। এখন আমার নিজের তিনটী সন্তান; দুটী মেয়ে ননী ও মণি; একটী ছেলে তাহার নাম ক্ষিতীন্দ্র। আমি সত্য কথা বলিব, ননী, মণি ও ক্ষিতীন্দ্র আমার বড় স্নেহের জিনিস হইলেও আমার সপত্নীপুত্র সুরেন ও যতীনের উপরে আমার প্রাণের টান বেশী। ইহা আমি স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য কপটতা করিতেছি না—আমার সুরেন, যতীন যে মাতৃহীন, পরের মা'র হাতে যে উহাদের লালন পালনের ভার, সে কথা সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে। তাই ঐ দুটীর জন্য আমার মন যেমন করে, আমার গর্ভজাত তিনটীর জন্য সে রকম করে না।

সুরেন খুব শান্ত ও সুবোধ; যতীন ছোটবেলা হইতে কিছু আব্‌দারে ছেলে; কিন্তু সেই জন্যই যতীনের প্রতি আমার মন বেশী আসক্ত।

আমার সুরেন ওকালতী পাশ করিয়া হাইকোর্টে উকীল হইয়াছে। খুব সদ্বংশ-জাতা ও সুলক্ষণা একটী মেয়ে আমার বৌমা হইয়াছেন। বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী; সে দিন ও পাড়ার রাম বাবুর স্ত্রী বৌমাকে না কি বলিয়াছিল "ও গো! তোমার সৎশ্বাশুড়ী তো তোমায় যত্ন মমতা করে?" বৌমা আমার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল, তার পরে বলিল "মা! তুমি ও মাগীকে এ বাড়ী আসিতে দিও না। তোমাকে সৎশ্বাশুড়ী বলে।" বাপের বাড়ীতেও বৌমা থাকিতে চাহে না। সেখানে গেলে আট দশ দিন পরে আমাকে লেখে আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন কবে?" এমন সোণার বউমা কি কাহারও হয়? —উনি তো তামাসা করেন, বলেন "আমাদের মত বৌমাকেও তুমি যাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে ফেলেছ।"

এবার যতীন অনেকদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়াছিল, তাই উনি তাহাকে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে দেওঘরে পাঠাইয়াছেন। আজি যতীন আমাকে পত্র লিখিয়াছে; পত্র এই—

"মা! আমার শরীর অনেক সুস্থ ও সবল হইয়াছে। আমি হাঁটিয়া তপো-গিরিতে ও নন্দন পাহাড়ে উঠিয়াছি। শিবগঙ্গায় সাঁতার দিয়াছি। কিন্তু মা! তুমি এখানে নাই বলিয়া আমার কিছুই ভাল লাগে না। বাবাকে বলিও আমি শীঘ্র বাড়ী যাইব, নচেৎ তুমি এখানে এস। আজি ২ মাস তোমাকে দেখি নাই, ইহাতে আমার মন বড়ই খারাপ হইয়াছে।"

পত্র শুনিয়া আমি চক্ষু মুছিলাম, উনি হাসিলেন। নির্জ্জনে দেখা হইলে

উনি আমাকে বলিলেন "সরলা! কত জন্মের পুণ্যবলে তোমাকে পাইয়াছি, জানি না; সত্য সত্যই তুমি মাতৃহীনের মা হইয়া এ সংসার সোণার সংসার করিয়াছ! আমাকে কৃতার্থ করিয়াছ!"

ছি! ছি! ও কি পোড়া কথা! তাড়াতাড়ি ওঁর পায়ের ধূলা একটু মাথায় দিলাম।

লেখিকা
শ্রীমা।

প্রবাসী পুত্রের মাতা।

১

আপন জীবন-ব্রত করিতে সাধন,
গিয়াছে প্রবাসে তাঁর নয়নের মণি;
না পেয়ে সংবাদ তার, চিন্তাকুল মন,
বিরলে নয়নধারা ত্যজেন জননী॥

২

যে পথে গিয়াছে পুত্র সেই পথ পানে
চাহিয়া জননী দিন করেন যাপন;
উন্মাদিনী সম, আহা! ছুটেন সেখানে
যেখানে পুত্রের নাম করে কোন জন॥

৩

পশি দেবালয়ে কভু, যোড় করি কর,
মাগেন সজল আঁখি সুতের কুশল;
কহিতে পুত্রের নাম রুদ্ধ হয় স্বর,
বিশুষ্ক কপোল বহি ঝরে নেত্রজল॥

৪

কতই নিশীথ মা'র কাটে জাগরণে,
স্বপ্নাবেশে কতদিন কাঁদেন জননী,
কতবার পদশব্দ শুনিয়া অঙ্গনে
জিজ্ঞাসেন দ্বার খুলি, "এলে যাদুমণি!"

৫

পাকিলে উদ্যানে ফল, আসিবে তনয়
ভাবিয়া জননী তুলি রাখেন যতনে,
কত অন্ন জননীর পর্য্যুষিত হয়;
কতবার রচি শয্যা কাঁদেন বিজনে॥

৬

কত দিন, কত মাস, কত সংবৎসর,
এইরূপে গেল চলি; পুত্রের সংবাদ
না আসিল, আঁখি মার ঝরে ঝর ঝর;
ভাবেন বিধাতা বুঝি ঘটা'ল প্রমাদ॥

৭

একদিন জননীর কোন আত্মজন,
কহিল তাঁহারে আসি, "তনয় তোমার
রহেছে যথায়, শুনি পান্থ একজন
আসিয়াছে সেথা হ'তে, পাবে সমাচার॥"

৮

আলু থালু কেশ বাস, ছুটিলা জননী
যথায় পথিক সেই, জিজ্ঞাসিলা তায়,
"হেরেছ কি তুমি মোর নয়নের মণি?
কি বলেছে বাছা তার অভাগিনী মায়?"

৯

উত্তরিলা পান্থবর, তব পুত্র সনে
নাহি ছিল ভদ্রে, মোর পূর্ব্ব পরিচয়,
সংবাদ তাঁহার তবে কহিব কেমনে?
বিশাল সে পুরী, ক্ষুদ্র গ্রামত সে নয়॥

১০

বড় সাধে বাদ বিধি করিল ঘটন,
নিরাশ জননী, তবু প্রবোধিয়া মনে
উথলিত অশ্রুধারা করি সম্বরণ
কহিলা পথিকে ধীর মধুর বচনে ॥

১১

"পরিচয়ে, পান্থবর, নাহি প্রয়োজন,
নিজগুণে পরিচিত তনয় আমার.
যে দেশে যেখানে থাক্ সেথা সর্ব্বজন
চিনিবে তাহারে, জানি ব্যবহার তার ॥

১২

বীরত্বে, ধীরত্বে, প্রেমে, আত্মবিসর্জ্জনে
থাকে যদি পরিচিত সেথা কোন জন,
বল শুনি, কার্য্য তার বিচারিয়া মনে,
বুঝিব সে বটে কি না আমার নন্দন ॥"

১৩

কহিলা পথিক, মনে মানিয়া বিস্ময়,
"হেন বাণী কভু, দেবি, শুনি নাই আর
কোন জননীর মুখে ;—বুঝিনু নিশ্চয়
নহে সে অযোগ্য পুত্র হেন মাতা যার ॥

১৪

হেরিয়াছি সেথা, এবে কহিব তোমায়,
ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে, অশনি সমান
গর্জ্জিছে কামান যথা, বিদ্যুতের প্রায়,
ঘুরিছে ঝলসি আঁখি, উলঙ্গ কৃপাণ ॥

১৫

রুধিরে বহিছে স্রোত, আহত মানব
তৃষায় আকুল কণ্ঠে করিছে চীৎকার,
ছিন্ন অঙ্গ, ছিন্ন দেহ লুটিতেছে শব,
রণমত্ত সেনাদল গর্জ্জে 'মার মার' ॥

১৬

দাঁড়ায়ে সে রণক্ষেত্রে যুবা একজন,
ক্ষতদেহে রক্তস্রোত ছুটিতেছে হায়!
দৃঢ় করে ধরি বীর জাতীয় কেতন
যুঝিতেছে রণে যেন মত্তসিংহ প্রায় ॥

১৭

অগণ্য অরাতিসৈন্য ঘেরি বীরবরে
কাড়িয়া লইতে কেতু করে প্রাণপণ,
কিন্তু হেন শক্তি কার ? বাঁধা বজ্র করে ;
ভঙ্গ দিয়া রণে শেষে ধায় শত্রুগণ ॥

১৮

জয়োল্লাসে বীরবর প্রবেশে নগরে,
হর্ষে মগ্ন পুরবাসী করে যশোগান,
নিজে অগ্রসরি রাজা মহা সমাদরে
জয়মাল্য দিয়া বীরে করেন সম্মান ॥

১৯

সেই কি তনয় তব কহগো জননি,"
জিজ্ঞাসিলা পান্থ ; মাতা করিলা উত্তর,
"এ হেন তনয় যাঁর ধন্য সে রমণী,
কিন্তু, পান্থ, পুত্র মম আর(ও) গুণধর ॥"

২০

বিস্মিত পথিক, কহে, "হেরেছি নয়নে
একদা বৈশাখশেষে নীল জলধর
ব্যাপিয়াছে ব্যোমদেশ, গরজি সঘনে
ছুটিছে অশনি বেগে বিদারি অম্বর ॥

২১

ঝলসিয়া আঁখিযুগ চমকে দামিনী,—
হুহুঙ্কারি ঘোর রবে বহে প্রভঞ্জন,
সন্তাড়িত বায়ুবলে ধায় প্রবাহিণী
উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী করি প্রদর্শন ॥

২২

হেন কালে তরী এক তটিনীহৃদয়ে
করিতেছে টলমল ; পোতারোহিগণ
'সামাল, সামাল' বলি ডাকিছে সভয়ে
গেল বুঝি গেল তরী হ'ল নিমগন ॥

২৩

আসিছে তরঙ্গ ওই রক্ষা নাহি আর,
ডুবিল, ডুবিল তরী, ডুবিল অতলে ;
মাতৃক্রোড়ে ছিল এক শিশু সুকুমার
কোথা দোঁহে? হের ওই ভাসিতেছে জলে!!

২৪

নিমগ্ন, অদৃশ্য তরী ; পোতারোহিগণ
আপন আপন প্রাণ রক্ষিবারে হায়!
রজ্জু, কাষ্ঠ যাহা হেরে করে আরোহণ,
অপরের পানে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥

২৫

কিন্তু, কে যুবক ওই, বদ্ধপরিকর,
বাম হস্তে জননীর বাঁধিয়া বসন,
দক্ষিণে শিশুরে তাঁর তুলি অংস'পর
চলিয়াছে তীরমুখে করি সন্তরণ ॥

২৬

ফেনিল তরঙ্গমালা বক্ষদেশে তাঁর
করিছে আঘাত বলে, তবু অবিরল
সন্তরি চলেছে যুবা, রোধে সাধ্য কার?
ক্লান্ত বাহু, তবু তাহে ঐরাবত-বল ॥

২৭

কূলে উপনীত ক্রমে ;—শত কণ্ঠস্বরে
উঠে চারি দিক্ হ'তে জয় জয় ধ্বনি,
কেহ নমে পদে, কেহ আশীর্ব্বাদ করে,
সেই কি তনয় তব কহগো জননী?"

২৮

চিন্তি ক্ষণকাল মাতা করিলা উত্তর
"না পারি বুঝিতে আমি কেবা এইজন,
সংশয়ে আকুল চিত্ত ; কিন্তু পান্থবর,
আর (ও) কিছু থাকে, বল, করিব শ্রবণ ॥

২৯

কহিলা পথিক ; "দেবি, হেরেছি নয়নে
প্রশান্ত, নিভৃত সেথা, আশ্রম শোভন,
ক্ষুদ্র প্রবাহিণী এক কুলু কুলু স্বনে
বহে সে আশ্রম-অঙ্গ করি প্রক্ষালন ॥

৩০

প্রভাতে মধুরভাষী বিহঙ্গনিকর
গায় সেথা বিভুগুণ হরষিতমনে,
আপনি চন্দ্রমা, নিজে দেব দিবাকর
সাজান সে পুণ্যাশ্রম কনক কিরণে ॥

৩১

মল্লিকা-সুবাসে সেথা দিক্ আমোদিত,
বিভূষিত তরুরাজি মরকতসাজে,
সুন্দর কুটীর কত পর্ণ আচ্ছাদিত,
শোভে শ্রেণীবদ্ধ সেই আশ্রমের মাঝে ॥

৩২

অনাথ আতুর মহাব্যাধিগ্রস্ত জন
সে আশ্রমে করে বাস ; প্রশান্ত-মূরতি
যুবা এক তা সবায় করেন পালন
বিসর্জ্জিয়া নিজসুখ পরহিতে মতি ॥

৩৩

পূতিগন্ধে লোক যার যায়-পলাইয়া,
কৃমি কীটে ক্ষত যার দংশে অনুক্ষণ,
হেন জনে ক্রোড়ে যুবা যতনে তুলিয়া
স্বকরে ঔষধ নিত্য করেন লেপন ॥

৩৪

কত কাল গত, তবু অক্লান্ত যুবক
নীরবে জীবনব্রত করেন পালন;
অনাথের পিতা, প্রভু, সুহৃদ, সেবক;
না জানে, না চেনে তাঁয় জগতের জন॥

৩৫

দ্বাদশ বরষ হেন গত ধীরে ধীরে,
অচিন্ত্য বিধির লীলা বুঝে সাধ্য কার?
প্রবিষ্ট সে রোগ এবে যুবার শরীরে,
কে জানিবে দণ্ড ইহা কিম্বা পুরস্কার!

৩৬

নাহি তাঁর এবে সেই কান্তি নিরমল,
স্ফীত কর, পদ; রোগে জীর্ণ কলেবর;
কর্ত্তব্যসাধনে যুবা তবু অবিচল,
সে সহাস্য মুখচ্ছবি তেমন (ই) সুন্দর॥

৩৭

সঙ্গে লয়ে স্নেহভরে ব্যাধিগ্রস্তগণে
করেন আনন্দে যুবা হরিগুণ গান;
দিবানিশি এই মন্ত্র জপ মনে মনে
'হ'ক্ প্রভো, হ'ক্ এই বিশ্বের কল্যাণ॥'

৩৮

দেবব্রত নাম তাঁর মানবসমাজে
না জানে, না চেনে কেহ; কে করে আদর?
একাকী বিরলে যুবা রত নিজ কাজে,
সাক্ষী মাত্র সুধু সেই ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর॥"

৩৯

নীরব পথিক, মাতা ধ্যানমগ্ন প্রায়
আছিলেন এতক্ষণ, বিষাদ আঁধার
ক্ষণেক সে মুখচ্ছবি ঢেকেছিল হায়!
মেঘমুক্ত শশিসম শোভিল আবার॥

৪০

সম্বোধি পথিকে ধীর মধুর বচনে
কহিলা জননী; "পান্থ, না করি সংশয়;
অপূর্ব্ব চরিত তার শুনিয়া শ্রবণে
বুঝিনু যুবক সেই আমার তনয়॥

৪১

সুখে থাক্ বাছা মোর করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হ'ক্ বাঞ্ছা তার বিধাতার বরে;
এত দিনে বিধি মোর পুরাইল সাধ,
ধন্যা হ'নু হেন পুত্রে ধরিয়া জঠরে॥"

৪২

সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা হরি করিয়া স্মরণ,
নিশ্চিন্ত ফিরিলা মাতা আপন ভবনে;
সেই দিন হতে আর কভু কোন জন
না হেরিলা অশ্রুবিন্দু মাতার নয়নে॥

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

২য় প্রস্তাব।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কতকগুলি শুভ ফলের বিষয় যদ্রূপ বর্ণিত হইল, তদ্রূপ দুই চারিটী অশুভ ফলের বিষয়ও বলা কর্ত্তব্য।

১। সম্যক্ স্বাধীনতার অভাব।

২। কৃতিত্ব ও উপার্জ্জনশীলতা লাভে ঔদাসীন্য।

৩। পারিবারিক দরিদ্রতা।

১। সম্যক্ স্বাধীনতার অভাব—যৌবন-

কালে অনেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী হয়; তখন অভিভাবকের অধীনে বাস করা মঙ্গলজনক। কিন্তু চরিত্র গঠিত হইলেও যদি সমস্ত স্বাধীনভাব পরিবর্জ্জন করিয়া, একমাত্র অভিভাবকের আজ্ঞানুসারেই চলিতে হয়, তবে কার্য্যকরী বৃত্তিসমূহ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

২। কৃতিত্ব ও উপার্জ্জনশীলতা লাভে ঔদাসীন্য।

একান্নভুক্ত পরিবারে প্রত্যেকেই কৃতী ও উপার্জ্জনশীল হইতে সচেষ্ট থাকে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা কোনও অভাব বোধ করিতে পারে না। যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অভাবই উন্নতির প্রসূতি।" মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, অভাবে পতিত হইলে তন্নিবারণার্থ সে অধিক ব্যাকুল হয়। নতুবা শুধু স্বীয় উন্নতিবর্দ্ধনের জন্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প লোকই ব্যগ্র হয়।

৩। পারিবারিক দরিদ্রতা। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবারে দুই কি তিন জন মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি থাকেন। অপরাপর সকলেই পোষ্যবর্গ। একটী বৃহৎ পরিবারে যদি দুই কি তিন জনের উপর জীবিকার সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তবে সে পরিবারে দরিদ্রতা অনিবার্য্য। পরিবারস্থ সুস্থকায় ব্যক্তিমাত্রই যদি উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা না করে, তবে একে অপরের গলগ্রহস্বরূপ হয়। কাজে কাজেই সে পরিবারে ক্রমশঃ দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়।

একান্নভুক্ত পরিবারের শুভাশুভ ফলের বিষয় বর্ণিত হইল। যে পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তি এই অশুভ ফলগুলি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভে ও পরস্পরের উন্নতিকামনায় যত্নশীল হয়, সেখানে নিশ্চয়ই সুখশান্তি বিরাজ করে। যে পরিবারে স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব, সেখানে সুখশান্তি তিষ্ঠিতে পারে না, এবং পরিবার অচিরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

রত্নমালা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন শ্যাম সন্ধ্যাকালে নদীর তীরে জলের অব্যবহিত উপরের সোপানে উপবিষ্ট হইয়া একটী ফুলের মত সুন্দরী বালিকা কি চিন্তা করিতেছিল। পুষ্পসুরভি-সমাকুল সায়াহ্নসমীর-সেবিত নদীতটে সে শান্ত চিন্তাশীলা বালিকাকে প্রকৃত সুরসুন্দরী বলিয়াই প্রতীত হয়।

সম্মুখে অনন্তকাল প্রবাহিণী নদী মৃদু নিনাদ করিতে করিতে অনন্তের

দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, সন্ধ্যাসমীরে উচ্ছ্বসিত লহরীমালা বালিকার পবিত্র পদপ্রান্তে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াই যেন আনন্দানুভব করিতেছে। সেইখানে একটী ছোট বকুল গাছে একটী ছোট পাখী "বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও" বলিয়া সান্ধ্য জগৎকে কম্পিত করিতেছিল। কিন্তু কৈ সে গগনভেদী চীৎকারেও বালিকার সে গভীর চিন্তা ভগ্ন হইল না।

সেই সময়ে বালিকার পশ্চাৎ দেশে একজন লোক দণ্ডায়মান হইয়া বালিকার শ্বেত গোলাপের ন্যায় সুন্দর মুখখানি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিল, বালিকা তাহা জানিতে পারে নাই।

বালিকা অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সেই বকুলবৃক্ষের নীচে গেল, কিন্তু সে দিন আর ফুল কুড়ান হইল না। যে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল, বালিকা তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বকুলতলে একজন সুন্দর যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল, বালিকাকে এই অবস্থায় কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মুখ আপনা আপনি খুলিয়া গেল। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল "বালিকে! তুমি কি কাঁদিতেছ? বল দেখি নদী-সোপানে বসিয়া বসিয়া প্রত্যহ তুমি কেন চিন্তা কর? তুমি কি আমাকে বলিতে পার এ চিন্তা তোমার কাহার জন্য? যুবার সেই করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণে বালিকার সরম সম্ভ্রম কোথায় চলিয়া গেল, বালিকা আনন্দ-বিস্ফারিত নেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সেই মুখেই যেন সে পৃথিবীর সমস্ত শোভা সমাবেশ দেখিতে পাইল, সেই মুখের সম্মুখেই যেন তাহার সপ্তস্বর্গ খুলিয়া গেল, সে যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গিয়া যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে বুঝিল না যে, সে এমনি ভাবে চাহিয়া আছে। যুবা পুনরায় কহিল "তুমি কাহার জন্য চিন্তা কর?"

বালিকা কহিল, "তেজকুমারের জন্য।" সে যে এ কথা কহিল তা যেন সে জানিল না।

তেজ। তোমার নাম কি?

বালিকা। সুভগা।

তেজ। তোমাদের গ্রামের নাম কি?

বালিকা। ছায়াপথ।

তেজ। তেজকুমার তোমার কে? আমি তাহাকে চিনি।

বালিকা কহিল "না না, তুমিই তেজ-কুমার, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি।"

তেজকুমারের হৃদয় ফাটিয়া অশ্রুজল উথলিয়া উঠিল। বালিকার চক্ষুও আবার অশ্রুপূর্ণ হইল, তৎকালে সন্ধ্যার আঁধারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন, সন্ধ্যার শীতল বাতাস বকুলতল দিয়া হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে-ছিল, নবজল-ধৌত শ্যাম দূর্ব্বাদামের উপর ফুটন্ত বকুল ফুল পড়িয়া পড়িয়া বকুলতল ছাইয়া গেল। সেইখানে বসিয়া তেজকুমার ও সুভগা উভয়ে উভয়ের নিকট বহুদিন-কার প্রাণের কথা কহিতে লাগিল।

তেজ। শুভে, তুমি কেমন আছ?

জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়। সুভগা! তোমার কি—

সুভগা। (তেজকুমারকে কথা কহিতে না দিয়া কহিল) জিজ্ঞাসা আর কি করিবে? আমি শুনিয়াছি আমি বিধবা। তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে আমি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। পাত্রস্থ করিলে অন্যের অদৃষ্টে বাঁচিয়া উঠিব, এই আশায় আত্মীয়েরা আমার বিবাহ দিলেন। তখন আমি যথার্থই সুস্থ ও সুখী হইলাম। কিন্তু সে সুসময় আর ফিরিয়া পাইলাম না। শুনিলাম আমার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি বিধবা। তেজকুমার! তুমি বলিয়াছিলে তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, তবে কেন আর ফিরিয়া আসিলে না? তুমি চলিয়া গিয়েছ, সেত অনেক দিনের কথা। আমি সেই অবধি কেবল তোমাকেই ভাবি, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার স্বামী। তবে আমি কাহার দোষে বিধবা হইলাম?

বালিকার সাশ্রুনয়ন দেখিয়া ও কাতরবাণী শুনিয়া উদারচেতা যুবকের হৃদয়ে ঘোর অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। তেজকুমার এই বালিকাকেই ভাল বাসিত—পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলে এই বালিকাকেই বিবাহ করিবে বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল। এই বালিকার সঙ্গে সে পূর্ব্বে সরলভাবে বসিয়া কত কথা কহিত, খেলা করিত, কত সুখের আশা দিয়া ইহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিত, এই বালিকার সঙ্গ-ছাড়া হইয়া সে কত না কষ্ট পাইয়াছে! আজ সেই দশম বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা পঞ্চদশ বৎসরের যুবতী নামে অভিহিত, কিন্তু এখনও তাহাকে ভুলে নাই। যখন নির্জ্জন কুসুমোদ্যানে বা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে ভ্রমরা-ভর-স্পন্দিত শ্বেত পুষ্পের ন্যায় চঞ্চল অমরালোক-সজ্জিত এই বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি চিন্তা করিত, তখন কি ইহা জানিত যে এত অল্প দিনের মধ্যেই এই নিদারুণ ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হইবে? এইরূপ অনেক ভাবিয়া অনেকক্ষণ পরে তেজকুমার কহিল "সুভগা, আমিই তোমার সমুদয় কষ্টের মূল।"

সুভগা। না না, আমার কর্ম্মানুযায়ী ফল আমাকে ভুগিতেই হইবে।

তেজ। সুভগা, তুমি হয়ত কত সময় আমাকে নির্দ্দয় পশু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ। কিন্তু যদি জানিতে ইদানীং আমার সমস্ত সময় কত কষ্টে গিয়াছে, তাহা হইলে এ অভাগার জন্য তোমার চক্ষেও জল বহিত।

আগ্রহে সুভগা কহিল "তেজকুমার! তবে কি তুমি বড়ই কষ্টে ছিলে?"

তেজ। সেই সব পুরাণ কথা আজ তোমার নিকট কহিব, শ্রবণ কর।

আমাদের গ্রামে কৃষ্ণকুমার নামে একজন বিখ্যাত জমীদার বাস করেন। হরিবল নামে তাঁর একজন প্রধান দেওয়ান আছে। আমার পিতা হরিবলের কাছে একটী চাকরী চাহিয়াছিলেন। হরিবল সেই জমীদারের

সংসারে নিজের অধীনে পিতাকে একটী নায়েবি কাজে বহাল করিয়া দিল। কিছুদিন পরেই পিতার এমনি সুযশ সুখ্যাতি বাহির হইতে লাগিল যে, তাহাতে হরিবলের যত্ন-রক্ষিত পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত যশোরাশি ম্লান হইয়া গেল। দিন দিন পিতা সেই জমিদারের প্রিয় হইতেছেন দেখিয়া দুরাশয় হরিবলের পাপহৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। সে তদ্বিরুদ্ধে নানারূপ অমোঘ অস্ত্র-কৌশল প্রয়োগ করিতে স্থিরসংকল্প হইল।

হরিবল সর্ব্বদাই জমীদারের নিকট পিতার মিথ্যা দোষ কীর্ত্তন করিত। তাহার পর যে কি হইল, তাহা আর আমরা কিছু বুঝিলাম না; কিন্তু পিতা ক্রমে ক্রমে জমীদারের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। অবশেষে একদিন তিনি পিতাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দিলেন। পিতা তাঁহার নিকট হইতে আপনার মাহিয়ানার উপরে অনেক টাকা অগ্রিম লইয়াছিলেন। জমীদার এই সুযোগে সেই সব অর্থ পিতার নিকট চাহিয়া বসিলেন। কহিলেন "যদি তুমি তিন দিনে এই অর্থ দিতে না পার, তবে তোমাকে পুলিশের লোক দ্বারা ধরাইব।" আমরা তাঁহারই ভূমিতে বাস করিতাম। তিনি আমাদিগকে হয় টাকা দিতে, না হয় তাঁহার ভূমি হইতে তন্মুহূর্ত্তেই উঠিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা টাকা কোথায় পাইব? তাহার অর্থ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, সুতরাং সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য এক জনের ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। হরিবলের পরামর্শ মত ও তৎপ্রদর্শিত জঘন্য কার্য্যের অনুসরণ করিয়া যাহার ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেও আমাদিগকে আপন ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিল। এই-রূপে হরিবলের তাড়নায় আমরা মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এক দিন রাত্রিকালে হরিবলের এক জন চাকরের অন্য মনুষ্য কর্ত্তৃক আহত রক্তাক্ত শবদেহ আমাদের শয়নগৃহের সম্মুখে পতিত ছিল। আমরা শত্রু কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া মহা ভয়াকুল চিত্তে গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া তৎসমুদয় ভয়াবহ কর্ম্ম দেখাইলাম। হরিবল আমার পিতাকে দোষী করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বার বার চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল "পিনাকী আমাকে ও আমার পুত্রকে হত্যা করিতে না পারিয়া অবশেষে আমার ভৃত্যকেই হত্যা করিয়াছে, অতএব আজই ইহাকে আদা-লতে যাইতে হইবে।"

যে দিন তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যোগী ছিল, সেই দিন আমরা কোন একটী বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়া এই দিকে পলাইয়া আসিয়াছি ও একটী অরণ্যের ভিতর একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বস-বাস করিতেছি। আমরা যাহাতে অন্য দেশে পলাইয়া যাইতে না পারি, এজন্য দুষ্টমতি হরিবল স্থানে স্থানে গুপ্তচর

প্রেরণ করিয়াছিল। পথিমধ্যে দৈব-দুর্য্যোগে যখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই সময় কোন নৃশংস আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। বোধ হয় সে হরিবলের চর হইবে, কিন্তু তখনও আমরা দৈব অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছিলাম। এই জমীদারের কাজেই পূর্ব্বে পিতা আমদিগকে লইয়া ছায়াপথ আসিয়াছিলেন। এইখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানারূপেবিপদে পতিত হই। সুভগা, এই কষ্টই আমাদের চরম সীমা নহে। আবার সেফালি সেই হরিবলের পুত্র মুকুলকে ভালবাসে, এদিকে পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, এ বিবাহ কিছুতেই হইতে দিবেন না। ওদিকে সেফালির সেই পাণ্ডুমুখ ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য।

সুভগা। আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কি, সেফালি সেই হরিবলের পুত্রকে ভালবাসে?"

তেজ। হাঁ মুকুলকে পূর্ব্বে আমরা এক-জন সাধু লোক বলিয়াই জানিতাম। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার যেন ধর্ম্মানুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত।

সুভগা। না না, সে বিষম ধর্ম্মান্ধ, না হইলে এমন অবস্থায় সে নিরপেক্ষ রহিবে কেন?

তেজ। সেফালি তাহাকে ভালবাসে, সেও সেফালিকে ভালবাসিত, কিন্তু এই সব ঘটনার পর হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আমাদের কুটীর হইতে ছায়াপথ এত কাছে। হঠাৎ এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে এই দিকে আসিয়া পড়িলাম। প্রথমে একটী আম্রবৃক্ষের নীচে তোমার মাতার সহিত আমার দেখা হয়। সে দিন ফিরিয়া গেলাম, কিন্তু তাহার পর দিনই আবার আসিলাম। এই বকুলতলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমায় দেখিতাম, যথাসময়ে আবার ফিরিয়া যাইতাম। সরলে, এত দিন তোমাকে পাইব আশা ছিল, আজ তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া সুভগা কহিল, "তেজকুমার! বিধির বিধান কি কেহ খণ্ডন করিতে পারে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন তোমার জীবনের সুখের পথ দেখ।"

তেজ। সুখের কথা আর মুখে আনিও না, আমা হইতেই তোমার এ দুর্দ্দশা, তাহা কি এ জীবনে ভুলিব?

সুভগা। আমি বিধবা, বিধাতার অভিপ্রায় আমাকে সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতেই হইবে। তুমিও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

তেজ। সুভগা, বিধবা বিবাহ—

তেজকুমারের কথায় বাধা দিয়া সুভগা কহিল, ছি ছি! স্ত্রী জাতির একটী মাত্র বিবাহ, বিধাতার কি ইহাই নিয়ম নহে?

তেজ। তোমার সমস্ত জীবন দুঃখময় হোক্ বিধাতার কি ইহাই ইচ্ছা?

সুভগা। হাঁ, তাঁহার তাহাই ইচ্ছা

না হইলে এই বয়সে এরূপ হইবে কেন? অবলা জাতি দুর্ব্বলা হইলেও বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য পালনে পরাঙ্মুখ বা ভীত নহে। সধবার স্বামিসেবাই শ্রেষ্ঠতম সুখ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই সার স্বর্গ-সুখ। এই ধর্ম্মই বিধবাদের ধ্রুব সত্য ধর্ম্ম। অতএব তেজকুমার আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমি আর বিবাহ করিব না।

তেজ ভগ্নহৃদয়ে কহিল "তবে তুমি কি ভাবে কোথায় থাকিবে?"

সুভগা। বিবাহ ছাড়া নারীজীবনে অনেক কাজ করিবার আছে। তেজ-কুমার, আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি। আজ কি তুমি আমাকে সৎ উপদেশ দিবে না? রমণী বিধবা হইলে সমস্ত মানব-জগতের হেয় হয়, কিন্তু তখনও প্রাণের দেবতার নিকট মনের বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি তেজকুমার,—

সুভগাকে কথা কহিতে না দিয়া তেজ-কুমার কহিল, সুভগা, সুভগা, আমি হিন্দুবিদ্বেষী নহি, বা নৃশংস নহি, তুমি স্বর্গের পরী। আমি জড়জগতের কীটাণু-কীট, তোমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার আমার অধিকার কি? আশীর্ব্বাদ করি তুমি দেববলে তেজস্বিনী হও, ক্ষুদ্র মানবের প্রেম বিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর নিষ্কাম প্রেমে নিমগ্ন হও। তোমার সমস্ত জীবন অদ্ভুত আনন্দরসে পরিপ্লুত হোক্। জানিও আমি কখনও তোমাকে ভুলিতে পারিব না। সুভগা, তুমি মহামহিমাময়ী, সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টা কুসুমময়ী দেবী; নিগূঢ়তম অন্তর প্রদেশে, প্রতিষ্ঠা করিয়া সদ্যপ্রসূত অশ্রুসলিলে ধৌত করিয়া আমি তোমাকেই পূজা করিব। বাহ্য জগতে উভয়ের সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইল—হোক্, তাহাতে ক্ষতি নাই।

সুভগা দৃঢ় স্বরে কহিল, তেজকুমার তবে তাহাই হোক্; তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আত্মরূপ উঠাইয়া লও। মন করায়ত্ত করা সহজ কাজ নহে, তুমি মানব, মানব চিরকালই আত্মবিরোধী, অস্থিরচেতা।

তেজ। তোমার কথায় আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সম্মতি জানিবে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, আমি চলিলাম, চিরদিনের মত চলিলাম। তেজকুমার তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুভগা মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনায় মুমূর্ষুবৎ সেই বকুলতলে বসিয়া রহিল, তাহার পরে অনেক রাত্রে "শুভ ইচ্ছার ও সাধু সঙ্কল্পের ঈশ্বর সহায় হইবেন" বলিয়া উঠিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

এই ঘটনার পর হইতেই সুভগা পরহিত-ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

যোদ্ধা পরিবার।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে স্পেনরাজ্য মুর বা আফ্রিকাদেশীয় যবনদিগের হস্তগত হইয়াছিল। সীড্ নামে প্রসিদ্ধ স্পেন-দেশীয় এক বীরপুরুষ ইহাদিগকে দেশ হইতে বারবার দূরীভূত করিয়া দেন, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া দেশের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। সীড্ অর্থে পরাক্রমশালী অসমসাহসী যোদ্ধা। মুরেরা আপনাদিগের বিপক্ষ সেনাপতির বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম রডেরিগো ডায়েস্। ১০৪০ এক হাজার চল্লিশ সালে বীডার্ দুর্গের নিকট বর্গোনামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়, এবং ১০৯৯ সালে ভালেন্সিয়া নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মুরদিগের সহিত যুদ্ধে ইহাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়, এবং মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইনি তাহাদিগের হস্ত হইতে ভালেন্সিয়া নগর উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রতি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করাতে তাঁহার নাম মুরদিগের নিকট অত্যন্ত ভীতিজনক হইয়াছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ সমর-সজ্জায় সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ মহোৎসাহে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পত্নীও বীরাঙ্গনা ছিলেন। জীবদ্দশায় স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অনেক যুদ্ধে তিনি তাঁহার সহকারিতা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণী ভালেন্সিয়া নগর তিন বৎসর কাল স্বীয় অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন; অবশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাষ্টাইল নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, এবং তথায় ১১০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বীর দম্পতীর দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল। ইহাঁদের সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সন্তানেরাও অনুপ্রাণিত হইয়া মুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং দেশের উদ্ধার সাধনে আপনাদিগের প্রাণ আহুতি দিয়াছিল। ইহাঁদিগের উপাখ্যানে সত্যের সহিত অনেক কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। যাহাহউক সীড্ আদর্শ খৃষ্টীয় বীর বলিয়া দেশবাসীদিগের নিকট প্রসিদ্ধ। তিনি যেমন যুদ্ধে অজেয় ছিলেন, সেইরূপ চরিত্র অংশে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

তাসের ঘর।

বালকেরা তাসের ঘর প্রস্তুত করিয়া খেলিয়া থাকে, তাহাতেই তাদের অপার আনন্দ—তাহাতেই তাহারা এককালে মগ্ন হইয়া যায়। সেই তাসের ঘরকে প্রকৃত ঘরের ন্যায় ভাবিয়া তাহারা সেই ঘর নির্ম্মাণ করে ও অতি যত্নে তাহার মধ্যে পুতুল শোয়াইয়া রাখে। যাহাতে সেই ঘরে বিন্দুমাত্র বাতাস না লাগে, যাহাতে সেই ঘর অতি সন্তর্পণে রক্ষিত হয়, তাহারা সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করে। একটু বাতাস বা ধাকা লাগিয়া যদি তাহাদের সেই সাধের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ত্রস্তে ব্যস্তে তাহার সংস্কার করে ও আবার যাহাতে না পড়িয়া যায় তাহার চেষ্টা করে। যদি পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গে, তবে তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না—তাহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আমাদের এই সংসার—এই ভবের খেলা—ইহাও কি ঠিক্ সেইরূপ নহে? বালকেরা যেমন তাসের ঘর ও পুত্তলিকা লইয়া মাতিয়া থাকে ও তাহাতে ডুবিয়া যায়, আমাদের অবস্থাও জ্ঞানের চক্ষে চাহিয়া দেখিলে ঠিক্ সেই-রূপ বোধ হইবে। আমরাও ভবের খেলায় মত্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকি, স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি যে, কোন ক্রমেই তাহা হইতে মুক্ত হইবার আশা থাকে না। যদি সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আমাদের তাসের ঘর একটু নড়িয়া উঠে, তবে ভয়ের ও ভাবনার সীমা থাকে না—চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাহার রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করি। যদি দৈবক্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে দুঃখে যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়ি,—জীবনের আর অবলম্বন থাকে না। বালক বালিকাদের তাসের ঘর ভাঙ্গিবার পর তাহাদিগকে রোদন করিতে দেখিলে তখন আমাদের হাসি পায়। তাহাদের অসার অকারণ রোদন প্রায় আমাদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। কিন্তু ভুলিয়াও ভাবি না যে, আর এক মুহূর্ত্ত পরে আমাদের তাসের ঘরের জন্য হয়ত আমরা সেইরূপ বা ততোধিক ব্যাকুলান্তরে কাঁদিব। তখন একবারও নিজের হাস্যের কথা মনে হয় না। কেহ যদি আমাদের ক্রন্দন দেখিয়া তদ্রূপ হাস্য করে, তাহার অমানুষিক ব্যবহারে তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণাই জন্মে। একবার ভাবিয়াও দেখি না কেন এ ক্রন্দন, কেন এ ব্যাকুলতা? ইহাও কি শিশুর তাসের ঘর ভাঙায় ক্রন্দনের সমতুল্য নয়? যদি তাহাই হইল, তবে এ ব্যাকুলতাও ত হাস্যকর। কিন্তু এ মায়াই বা কেন? এ মোহই বা কেন? ইহার

কারণ কি, তাহা কে বলিবে? আর ভগবান্‌ই বা এ ক্রীড়া পুত্তলি ও তাসের ঘর দিয়া মানবকে মজাইলেন কেন, তাহাই বা কে বলিবে? তবে কি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত? অভিপ্রেতই যদি হইবে, তবে ইহাতে এত দুঃখ কষ্ট হতাশার যন্ত্রণা কেন? এবং এই সুখকর মোহে যে ডোবে, সে তাঁকে পায় না কেন? যিনি মানবের সর্ব্বসুখদাতা ও সর্ব্বমঙ্গলের আকর, তাঁহাকে লাভ করাইত মানবের মোক্ষসুখ। যে ক্রীড়া তাঁহাকে লাভ করার পক্ষে অন্তরায়, সে ক্রীড়ায় প্রয়োজন কি? কেন এ তাসের ঘর—কেন এ ভবের খেলা? ইহাতে স্বতঃই মনে হইবে যে, এই ক্রীড়ায় অবশ্য তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত আছে। তাহা কি? তাহা বুঝিবার জন্য ত কত জ্ঞানী, কত মনস্বী ব্যক্তিরা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বুঝিয়াছেন এই যে, এই তাসের ঘরে পুতুলক্রীড়ায় একবারে আত্মহারা না হইয়া, আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এই ভবের খেলা খেলিবে, এই মায়া মোহের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়াও যে ইহার বিষময় বায়ুতে বিষাক্ত না হইবে, সেই তাঁহাকে পাইবে। তবে এই তাসের ঘরও মানবের পক্ষে কর্ত্তব্যসাধনের প্রকৃষ্ট পথ। এই তাসের ঘরে থাকিয়া ও পুতুল খেলা খেলিয়া যাহাতে শুধু ইহাতে না ডুবিয়া যাই, দৈববশে তাসের ঘর ভাঙ্গিলে মুহ্যমান হইয়া না পড়ি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ইহা অন্তরে জাগরুক রাখিলে কালে আমরা কি মোক্ষসুখ লাভে সমর্থ হইব না?

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

গৃহ-কর্ম্ম।

বোঁদের পায়স।

দ্রব্য।

ছোলার ডালের বেশনের চিনিহীন বোঁদে	।৷৷৹ সের
খাঁটি দুগ্ধ	।৩ সের
চিনি দোবারা	।৵৹ পোয়া
বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, ছোট এলাচচূর্ণ, কর্পূর	সম্ভব মত।

প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

যদি ঘরে বোঁদিয়া প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভালই, নতুবা ময়রার দোকান হইতে আল বোঁদে (অর্থাৎ চিনির রসে না ফেলা) টাটকা ভাজাইয়া আনাইয়া প্রস্তুত রাখ। দুধ জ্বালে ফুটিয়া ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে ঐ সকল বোঁদিয়া ঢালিয়া দেও। অল্প-ক্ষণ ফুটিলে তাহাতে চিনি দেও, তাহার

পর সমস্ত উপকরণ দিয়া নাড়িতে থাক। যখন পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিতে দেখা যাইবে, তখন তাহাতে এলাচিচূর্ণ এবং কর্পূর নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া রাখ। ইহা অম্লোষ্ণ সেবন করিলে অনুপম আস্বাদন অনুভূত হয়। রসনা-পরিতৃপ্তিকর দ্রব্যের মধ্যে ইহা একটী প্রধান সামগ্রী।

দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিক সভা ১৯শে ফেব্রুয়ারি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বড়লাট উপস্থিত থাকিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডি এল উপাধি দিয়া সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাস্থলে অনেকগুলি ইংরাজ ও বাঙ্গালী রমণী উপস্থিত ছিলেন। কুমারী হেমপ্রভা বসুর এম্ এ এবং আইডা ডিক্রুজের বি এ উপাধি লইবার সময় বিশেষ আনন্দধ্বনি হয়। বাইস চ্যান্সেলার ট্রিবেলিয়ান সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

২। বেথুন কলেজের পারিতোষিক দান সভারও খুব সমারোহ হইয়াছিল। লেডী এলগিন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩। মেঃ বি, এল গুপ্ত জেলা ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

৪। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ মহীমোহন ঘোষের সহিত স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রমীলার শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। সিন্ধু ও কটুরী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণার্থ ষ্টেট সেক্রেটারী ২১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৬। রাজপ্রতিনিধি আগামী ২৯শে মার্চ কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করিবেন।

৭। বিলাতে ৬৪টী ছাত্র বারিষ্টার হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ১৫টী এ দেশীয়।

৮। গত ৮ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় ভারতের অনেক কথা আছে। দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ, মড়ক বৃদ্ধির জন্য আক্ষেপ, সীমান্ত যুদ্ধের বীরদিগের বীরত্বের ধন্যবাদ আছে।

৯। ডাক্তার এ ফরার নেপাল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তুর আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

১০। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে আজি কালি সাহেব বিবী এবং বাঙ্গালী বাবুদের বাইসিকেলভ্রমণ দেখা যায়। কলিকাতায় নাকি ৪০০০ বাইসিকিলের আমদানী হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ম্যাজিক কালী—পি এল মুখার্জ্যির প্রস্তুত কালী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নূতন পেনে জলের মত এই কালী লইয়া কাগজে লিখিলে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু তাহা শুকাইয়া আগুন তাতে ধরিলে দিব্য সবুজ রঙের লেখা বাহির হয়। ইহার মূল্য প্রতি শিশি।৵০ ছয় আনা।

সারস্বত পঞ্জিকা—ঢাকা হইতে প্রকাশিত ১৩০৫ সালের এই পঞ্জিকার একখণ্ড উপহার পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহাতে জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ আছে। মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

বামারচনা।

আমার খুকু।

আয়রে আয়রে মোর হৃদয়-রতন।
শান্তিরূপা খুকুরাণী দেব-দরশন॥
হাসির লহরী ছুটে তোর মুখ দিয়ে।
আনন্দ ঢালিয়া দেয় হৃদয় ভরিয়ে॥
অমৃত-মাখান মুখ নাহিক তুলনা।
যত দেখি তত হয় দেখিতে বাসনা॥
ধরিয়া তোমারে বুকে স্বর্গসুখ পাই।
মর্ত্ত্যে কি ত্রিদিবে আছি ভুলিয়া তা যাই॥
ধরাতলে যত কিছু আছে মনোহর।
আমার খুকু রে! তুমি তা'হতে সুন্দর॥
লোকে না বলুক ভাল তাহে নাই ক্ষতি।
মোর চক্ষে খুকুরাণী ভুবনের জ্যোতি॥
ঈশ্বরের করুণার এক বিন্দু লয়ে।
গঠেছে বিধাতা তোরে একফোঁটা মেয়ে॥
নাহিক তুলনা তোর—জগতে অতুল।
দেবতার কৃপাকণা আশীর্ব্বাদি ফুল॥
পৃথিবীর পাপ তাপ দুঃখ ও যন্ত্রণা।
ছুঁইতে না পারে তোরে ইহাই কামনা॥
দেব-আশীর্ব্বাদ লয়ে চিরজীবী হও।
দুঃখময় হৃদে মোর শান্তি ঢেলে দাও॥

শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী,
ঝিনাইদহ।

সরলা সুন্দরী।

মুছিয়া ফেলেছে তার সীমন্তে সিন্দূর,
কাড়িয়া লইয়া গেছে বাজু, বালা, হার,
মুড়াইয়া দিয়া চারু চাঁচর চিকুর,
যৌবনে যোগিনী-বেশ করিয়াছে তার।
একাহার, হবিষ্যান্ন, দিনান্তে বিধান,
একাদশী, ব্রহ্মচর্য্য সব তারি তরে;
নাহি সুখ, নাহি শান্তি, মরুময় প্রাণ,—
সরলা বিধবা আজ ভারত-ভিতরে!

পথের ভিখারী যেই, সেও আশা করে
ভবিষ্য জীবনে সুখী হ'তে একবার;
সংসার পুড়িয়া ছাই সরলার তরে,
তাহার সুখের দিন আসিবে না আর!

হা সরলা! হা বালিকা! দেখে ফাটে প্রাণ!
হা বিধি! করুণাময় কার এ বিধান?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
ময়মনসিংহ।

বাসি ফুল।

একদিন পড়িয়া ভূতলে।
বাসিফুল কেঁদে শুধু বলে
"বসিয়া কোমল বৃন্তকোলে,
ভাসিতাম সোহাগ-হিল্লোলে,
ধীরে আসি মলয় পবন
করিত রে আদরে চুম্বন,
মধুকর গুণ গুণ স্বরে
কত গান শুনাইত মোরে।
এবে কেহ ফিরে নাহি চায়
বাসিফুল ব'লে চলে যায়।
ধন ছিল রূপ ছিল আগে,
চাহিত সকলে অনুরাগে।
এবে মোর ফুরায়েছে সব,
তাই কেহ করে না গৌরব!!

শ্রীমতী কিরণময়ী দেবী।

শোক-অশ্রু।

(কোনও বিধবা বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

১

চোখের সম্মুখে এসে ভাসে বারে বারে
কাহার ভাবনা-ক্লিষ্ট কাতর বদন;
শ্রবণ-কুহরে এসে বাজে অবিরাম,
কাহার মরমস্পর্শী করুণ ক্রন্দন?

২

সহসা খুলিয়া গেল স্মৃতির অর্গল,
অতীতের কথা পুনঃ মনে উঠে জেগে;
অবশ হৃদয় পুনঃ জাগে গভ শোকে—
অজস্র অশ্রুর ধারা বহে নব বেগে!

৩

হৃদয়ের তন্ত্রিচয় গিয়াছে ছিঁড়িয়া;
(ছিন্ন তন্ত্রী যোড়া দে (ও) য়া?—সেত বিড়ম্বনা!)
অতীত মধুর গীতি মনে জাগাইতে
বেসুরা গাহিছে শুধু ছিন্ন হৃদি বীণা।

৪

বিগত দিনের কথা কখনো ভুলিনি,
(যে দিন হইতে মোর ভঙ্গ আশা খেলা)
তবে কেন পোড়া হৃদে স্মৃতি কুহকিনি!
খেল চাতুরীর খেলা—কেন হেন ছলা?

৫

যতই যতন স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে,
ততই উজ্জ্বলতর হেরি সে প্রতিমা,
ততই নেশায় যেন হই আত্মহারা—
মোহঘোরে হেরি আরো কত মধুরিমা!

৬

আমাকে ত্যজিয়া যেতে যদ্যপি গো তোর
হৃদয়ের প্রান্তদেশে লাগিল না ব্যথা,
তবে কেন তোর তরে—নিঠুরা পাষাণি—
বকে মরি বলে আমি এত শত কথা?

৭

কিন্তু যবে বাতায়নে দাঁড়াইয়া হেরি,
পশ্চিমে রক্তিম ভানু প্রায় অস্তমিত ;
বিষাদে অভুক্ত পাখী ধায় নীড় পানে,
অবসাদে ফুলদল হয় বৃন্তচ্যুত,—

৮

তখন মনের বাঁধ হয় গো শিথিল,
তখন মনেতে বহে ঝটিকা-উচ্ছ্বাস,
ভগ্ন, জীর্ণ ক্লান্ত হিয়া, আরো ভগ্ন করি—
ঝরে কয় বিন্দু অশ্রু—উঠে দীর্ঘশ্বাস !!

শ্রীশৈলজা সুন্দরী দেবী।

"সেই দেশ"।

কেন আজ মনে পড়ে কথা সে দেশের ?
রোগ, শোক নাই যথা,
পরাণে নাইকো ব্যথা,
যে দেশে গাহে না কেউ গান বিষাদের।
যে দেশে বসন্ত বায়,
সুরভি মাখিয়া গায়
বয়ে যায় দিবানিশি নাহিক বিরাম।
না জানি সে দেশে গেলে কতই আরাম।

ভাবি মনে একাকিনী বিরলে বসিয়া,
দুঃখে তাপে ম্রিয়মাণ,
অবসন্ন যেই প্রাণ,
তৃষিত যে তুচ্ছ হৃদি সে দেশ লাগিয়া,
সেথা গেলে পাবে শান্তি,
ঘুচিবে সংসার-শ্রান্তি,
পাইবে অনন্ত সুখ অমরে সেবিয়া,
গাইবে স্বরগ গীতি—প্রাণ মোহনিয়া।

সে দেশ কেমনতর বলিব কি করে ?
সেথা দেববালাগণ,
করে সদা বিচরণ,
কোকিল হরষে বসি গায় কুহুস্বরে।
সেথা কঠোরতা নাই,
নীরব, নিস্তব্ধ ঠাঁই,
যেথায় দুঃখেতে নাহি তপ্ত অশ্রু ঝরে।
সে দেশে বসন্ত রাণী সদাই বিহরে।

তুচ্ছ প্রাণ যেতে চায় যে দেশের পানে ;
তাপিত হৃদয় মোর,
ভেঙ্গে চুরে মোহ ঘোর,
ধায় সে দেশের লাগি, পরাণের টানে।
শত বাধা এড়াইয়া,
ক্ষুদ্র হৃদি বিকাইয়া,
চলে আজ দেবদেশে আশাপূর্ণ প্রাণে,
যথায় অমরবৃন্দ গায় একতানে।

কবে হবে শুভদিন জীবনে আমার,
ছাড়িব মরতধাম,
গাব সদা বিভুনাম,
দূরে যাবে ভয়, দুঃখ, নয়ন-আসার।
দেবতার আশীর্ব্বাদে,
থাকিব গো নির্ব্বিবাদে,
করিব সার্থক জন্ম তুচ্ছ রমণীর
হ'ক হেন শুভদিন বরে বিধাতার।

কুমারী সুকুমারী দাস।

No. 398. March, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৮ সংখ্যা।	ফাল্গুন ১৩০৪—মার্চ্চ, ১৮৯৮।	৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির রাজধানী ত্যাগ—আগামী মাসের শেষে লর্ড এলগিন সদলে সিমলা শৈলাবাসে গমন করিবেন। এই বৎসর ইহাঁর রাজত্বের শেষ বৎসর। আমরা প্রার্থনা করি, রাজপ্রতিনিধি পর্ব্বতের শীতল বায়ুতে বসিয়া ভারতের স্থায়ী কোনও মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইবেন।

অকালে শীত—কবিবর মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী চণ্ডীতে গাইয়াছেন "ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা," এবার তাহাই ঘটিয়াছে। বসন্তের হাওয়া বহিয়া ও রৌদ্র প্রখর হইয়া ফাল্গুনে হঠাৎ দ্বিগুণ শীত পড়িয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝটিকা ও অতিরিক্ত বরফপাত ইহার কারণ।

হত্যাকারীর আপিল—দামোদর হরিচোপকার প্লেগ কমিসনরের হত্যাকারী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, এখন তাহার আপীল শুনা হইতেছে। সে আপনার মুখে আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এখন বলে পুলিসের ভয়ে মিথ্যা এজাহার দিয়াছে, সে হত্যাকারী নয়।

মৃত্যু—(১) গত ৭ই ফাল্গুন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জগবন্ধু বসুর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নব-প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারি কলেজের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইহাঁর বিয়োগে উক্ত কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। (২) ১৮ই ফাল্গুন স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের গুণবতী পত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। (৩) কুমারী ফ্লোরেন্স ইবা মর্গান বিলাত হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পুনা প্লেগ হাঁসপাতালে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন, হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

পারিতোষিক দান—(১) গত ১৫ই ফাল্গুন বেথুন কলেজের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ লেডী এলগিন দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে চিফ জষ্টিস ম্যাক্লিন সাহেব কলেজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষের একখানি ছবি বক্তৃতা সহকারে সাধারণ সমক্ষে মুক্তাবরণ করেন। (২) ১৬ই ফাল্গুন চিফ জষ্টিস পত্নী লেডী ম্যাক্লিন গড়ের মাঠে স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে ব্যায়াম পরীক্ষার পুরস্কার দান করেন।

মহারাণীর ভ্রমণ—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইউরোপের দক্ষিণাংশ ভ্রমণে আগামী গ্রীষ্মকাল অতিবাহন করিবেন।

সন্ধি—আবিসিনিয়ার রাজা মারিলকের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট হারিংটন ব্রিটিষ দূত স্বরূপ ঐ রাজ্যে থাকিবেন।

প্লেগ—বোম্বাইয়ের মহামারী আবার বাড়িয়া উঠিতেছে। পঞ্জাবেও দিন দিন ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

গ্লাডষ্টোনের সংবাদ—ইনি ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। ইঁহার আশ্চর্য্য লিপিদক্ষতায় সকলে চমৎকৃত। ইনি এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিবর্ষে অসংখ্য সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ৪।৫ হাজার চিঠি পত্র লেখেন। এ পর্য্যন্ত ২৯৯ খানি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। জগদীশ এরূপ মহাত্মাকে আরও দীর্ঘায়ু করুন।

গরিব লোকদের জন্য রাজপ্রাসাদ—গ্লাসগো নগরে লর্ড রোজবরী এই গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গরিবদিগকে ভাল ঘরে রাখিবার, ভাল খাদ্য খাওয়াইবার, রাজভোগ্য নানা উৎকৃষ্ট সুখে সুখী করিবার জন্য ইংলণ্ডের অনেক নর নারী ব্যস্ত। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" ইঁহারা এই বাক্যের সার্থকতা করিতেছেন।

প্রাচীন ভ্রম।

অনেকে কথায় কথায় বলিয়া থাকেন,—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যিনি যেরূপ ভাবেন, তাঁহার সিদ্ধি সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলেনঃ—কাচ পোকায় তেলা পোকা (আর্শুলা) ধরে। তেলা পোকা প্রাণের ভয়ে কাচ পোকাকে নিরন্তর ভাবিতে থাকে। ঐ ভাবনা নিবন্ধন কিছু দিন পরে তেলা পোকা কাচ পোকা হইয়া যায়। পৌরাণিক দৃষ্টান্ত—ভরতের হরিণ-যোনি-প্রাপ্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

যাহা ভাবিতে ভাবিতে জীব দেহ-ত্যাগ করে, দেহান্তে তৎপ্রাপ্তি হয়। ইহা শাস্ত্রের কথা। ইহা পরীক্ষা করিবার উপায় না থাকিলেও হিন্দুগণকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, কেননা শাস্ত্রে বিশ্বাসই হিন্দুত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া, "যাদৃশী ভাবনা যস্য—" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় শ্লোকের পর যিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? ঐ শ্লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে তেলা-পোকা কাচপোকার ইতিহাস অনেকেই বর্ণন করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ঐ ইতিহাস বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন যখন তখন অনেক অভিজ্ঞ বক্তার মুখেও ঐ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কথাটীর মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ভ্রম আছে।

প্রাণিমাত্রেই ডিম্ব, বা শাবক প্রসব করে; কিন্তু কোন কোন প্রাণীর ডিম্বাদি পালন করিবার শক্তি নাই। অনেকেই জানেন, কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে এবং কাকের ডিম্বগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। কাক আপনার ডিম মনে করিয়া কোকিলের ডিম পালন করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, কাচপোকার ডিম্ব রক্ষা করণোপযোগী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার ও ডিম পালিবার শক্তি নাই। কাচপোকার ডিম্ব প্রসবের সময় হইলে সে একটী তৈলপায়িকা ধরে এবং তাহার উদর ভেদ করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করে। ডিম্ব প্রসব এবং তৈলপায়িকার উদরমধ্যে ঐ ডিম্বের আধান, এই দ্বিবিধ ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে, কাচ পোকা তৈলপায়িকাকে পরিত্যাগ করে। এই সময়ে তৈলপায়িকার একটু যন্ত্রণা হয় বটে, কিন্তু সে প্রাণে মরে না—কাতর ভাবেই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে উদরস্থ ডিম্ব সকল স্ফুটিত হইয়া কাচপোকার শাবক-রূপে পরিণত হয়, এবং তৈলপায়িকার গর্ভস্থ মাংসাদি ভোজন করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তৈলপায়িকা যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিয়া ২।১ দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। তখন কাচ-পোকার শাবকগণও তন্মধ্য হইতে বহির্গত হয়।

কোন কোন জাতীয় কাচপোকা, ডিম্ব প্রসবের পর তৈলপায়িকাকে পরিত্যাগ করে না, তাহাকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া, বা আর্দ্র মৃত্তিকাবরণে বদ্ধ করিয়া রাখে। তৈলপায়িকার উদর হইতে কাচপোকার সৃষ্টিপ্রকরণটী যেরূপ, তদ্দর্শনে কাচপোকাধৃত তৈল-পায়িকা ভাবিয়া ভাবিয়া কাচপোকা হইয়া যায়, স্থূলদর্শী জনগণের এরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে।

এক পদার্থ অন্য পদার্থ সহ মিলিত হইয়া স্ব স্ব গুণ, বা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণান্তর বা ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম সম্বন্ধ বা রাসায়নিক ক্রিয়া। এই সম্বন্ধের বা রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ

প্রদর্শনকালে অনেকেই চূর্ণ হরিদ্রার কথা উত্থাপন করেন। চূর্ণ শুভ্র ও হরিদ্রা পীত; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে,—অতএব ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া। অনেক গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ উহা রাসায়নিক দৃষ্টান্ত নহে;—উহা পরমাণু-গণের বিভিন্নপ্রকার নিবেশ মাত্র। রাসায়নিক ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ এই যে, পদার্থগণের মিলনকালে উত্তাপের সমাগম বা অপগম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চূর্ণ হরিদ্রার মিলনকালে উহার অন্যতর কিছুই হয় না।*

এইরূপ কত বিষয়ে কত ভ্রম কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমাদের লক্ষ্য নাই। বোধ হয়, সকলের অভিনিবেশ থাকিলে মধ্যে মধ্যে এক একটী প্রাচীন ভ্রম আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে এবং তাহার নিরা-করণও হইতে পারে।

প্রকৃত স্ত্রী।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩২২ পৃষ্ঠার পর)

পতির প্রতি রমণীর যাহা কর্ত্তব্য গত সংখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত স্ত্রীর আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, এক্ষণে তাহাই বলিব।

পতি যেমন রমণীর পরমাত্মীয়, পতির আত্মীয়গণও তদ্রূপ রমণীর আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত; সুতরাং পতির পিতা মাতাকে স্বীয় পিতা মাতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা রমণীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলেই সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। কৌশল্যা সীতার ন্যায় আদর্শ শাশুড়ী বধূরও মনোমালিন্য বশতঃ অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছারখার হইতে দেখা যাইতেছে। এ স্থলে একপক্ষ বিচারক শাশুড়ীদিগের ও আর একপক্ষ বধূদিগের স্কন্ধে দোষভার ন্যস্ত করেন। এমতে প্রকৃত দোষী কে, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমরা নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া একটী প্রবাদ বচন দ্বারাই ইহার আলোচনা করিব। আমাদেব দেশে যে সকল প্রবাদ বচনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক নহে।

"বৌ ভাঙলেন সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা॥"

অর্থাৎ বধূর ক্ষুদ্র দোষটুকুও প্রকাণ্ডাকার ধারণ করিয়া পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে এবং গিন্নির প্রকাণ্ড দোষটুকু ঘরের বাহিরও হয় না। এই প্রবাদ বচনটিতেই শাশুড়ীর স্বার্থ-পরতার ছবি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

---

* চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রণে যে পাটলবর্ণ হয়, ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া কি না, এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। বা,বো,স।

হিন্দু সমাজে রমণীগণ বিবাহের পুর হইতেই শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ স্থলেই তখন বালিকা-দিগের বয়স চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে না। তখন তাহারা কর্ত্তব্যের কি বুঝে? জীবনের শিক্ষা শেষ না হইতেই তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করে, এমতে শ্বশুরালয়ে সৎশিক্ষা লাভ না করিলে আর তাহাদের শিক্ষার স্থান কোথা? কিন্তু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, এই সময় হইতে শাশুড়ীগণ বধূ-দিগের কার্য্যকলাপ লইয়া খুঁটি নাটী আরম্ভ করিয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যভাবে একটী বধূর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া অন্যের হৃদয়ে ঈর্ষ্যার দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া সোণার সংসার ভস্মীভূত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। অধিকাংশ স্থলে নাবিকের দোষে যেমন তরণী জলমগ্ন হইয়া আরোহীদিগকে বিপন্ন করে, গৃহিণীর দোষে তদ্রূপ সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া তৎসহযোগিগণ সেই অনলে ভস্মীভূত হয়। প্রবাদ-বচনেও আছে—

"গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট"

অতএব গৃহিণীর উদারচিত্ত হইয়া সকলকে সমান স্নেহ যত্ন প্রদান করাই কর্ত্তব্য। মৃদু ও মধুর বাক্যে বধূ-দিগকে উপদেশ প্রদান করা শাশুড়ী-দিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বনের পাখী ধরিয়া আনিলে আগে তাহাকে আদর যত্ন সহ লালন পালন করিতে হয়, পরে সে পোষ মানিয়া থাকে। একটী অপরিচিতা অবোধ অবগণ্ড বালিকাকে গৃহে লইয়া আসিয়া, সমুচিত আদর যত্ন না করিলে সে বশীভূত হইবে কেন? এ সম্বন্ধে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভূদেব বাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠে বেশ সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়।

অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, প্রাচীনকালে বিশেষরূপে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। প্রাচীনা রমণীগণ কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমর-প্রাঙ্গণে, কি সংসার-ধর্ম্মে, সকল স্থলেই আবশ্যক-মত নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও রমণী-হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা খোদিত রহিয়াছে। মধ্যে কিছুকাল স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, স্ত্রীজাতি মনুষ্যজাতি মধ্যে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত জীবন গঠিত হয় না, অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাই সমাজে মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমশিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। মধ্য সময়ের লোক ইহা বুঝিতেন না, সুতরাং ঐ সময় হইতে বধূদিগের প্রতি শাশুড়ী-দিগের অযথা অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এখন সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সংবাদ পাওয়া যায়। হা দুর্দ্দৈব! কৌশল্যা, কুন্তী প্রভৃতি দেবীগণ, তোমরা এখন কোথা!!

"গতস্য শোচনা নাস্তি" সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখনও স্ত্রীজাতি শিক্ষা লাভ করিলে সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা তিরোহিত হইয়া সংসারে শান্তির আলোক দেখা যাইতে পারে।

রমণী জননী জাতি, সুতরাং উদার-চিত্তে জগতে প্রেমার্পণ করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণই আত্মপর বাছাবাছি করিয়া থাকেন, উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশ্বে আপনাকে মিশাইয়া সর্ব্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়েন। যিনি বিশ্বসেবারূপ মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়খানিই প্রকৃত স্বর্গ। এইরূপ স্বর্গ লাভের চেষ্টা করা রমণীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ক্ষমাশীলতা স্ত্রীজাতির একটী প্রধান ভূষণ। যিনি ক্ষমাশীল, নশ্বর জগতের জীবের কথা কি, তিনি দেবতাদিগেরও আদরণীয়। যথা—

> অতিবাদং ন প্রবদেন্ন বাদয়েৎ,
> যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
> হন্তুশ্চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ
> তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়।"
>
> উদ্যোগ ৩৫।১২৭০।

শাস্ত্র প্রকৃত স্ত্রীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> "দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
> শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং করোতি হি।
> বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
>
> অনুশাসন ।১৪৬।৬৭৮৫।

অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকিয়া দেববৎ স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া সুখ-দর্শনা হয়েন, সেই প্রকৃত স্ত্রী। আবার,—

> সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
> মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥
>
> আদিপর্ব্ব।

অর্থাৎ তিনিই ভার্য্যা, যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষ ও পুত্রবতী এবং যাঁহার হৃদয় বাক্য ও কার্য্য সকল পবিত্র ও যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

রমণীমাত্রেরই প্রকৃত স্ত্রী হইবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃত চেষ্টার পুরস্কার শ্রীভগবান্ অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যথোচিত-রূপে পালন করিতে পারি না, সেই জন্যই আমাদের এত অধঃপতন ঘটিতেছে।

> "যাতাধোধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
> কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যচ কারকঃ"।

অর্থ—কূপখননকারী যেরূপ ক্রমে নিম্নগতি এবং প্রাচীরগাথক উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, মানব সেইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে উচ্চতা ও নীচতা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিজ উচ্চতা লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমরাও সফলকাম হইতে পারিব।

নশ্বর জীবন কয় দিনের জন্য? সৎ-কীর্ত্তিই প্রকৃত জীবন। ভগিনীগণ! আইস আমরা সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত জীবন লাভের চেষ্টা করি। ভারত আবার সীতা সাবিত্রীর পবিত্র ছবি লইয়া ধন্য হউক্।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

রত্নমালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেফালি একদিন ফুল তুলিতে তুলিতে গুণ গুণ করিয়া গাইতে গাইতে কুটীরের নিকটবর্ত্তী একটী গিরিবর্ত্ম ধরিয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিল না। সেই সময় তাহার উপর দিয়া একটী বসন্তের কাল কোকিল দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার করিয়া চলিয়া গেল। সেফালি চমকিত ভাবে আকাশের দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিপাশে বৃহৎ শ্বাপদ-সমাকুল ঘোর অরণ্যানী। সেফালি মহা ব্যস্ত হইয়া কুটীরে ফিরিতে চাহিল, কিন্তু পথ নাই। সে অনেকবার পথের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে পথ যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার সেই নির্জ্জন কুটীরের শ্যাম সৌন্দর্য্যের কথা মনে হইল। ধীরে ধীরে পিতার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি মনে হইল, তেজকুমারের কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একখানি মুখ তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হইল। বালিকার কুসুম-কোরকোপম নয়নে অশ্রুজল বহিয়া গণ্ড ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বালিকা তাহাতেও অধীর হইল না, হৃদয়ের বল হারাইল না, কারণ সে জানিত ভগবান্ বিপদভঞ্জন। সম্মুখেই একখানি শ্বেত শিলাখণ্ড, বালিকা তাহার উপর বসিয়া ভগবানের ধ্যানে মনোনিবেশ করিল। সেই ধ্যানমগ্না বালিকার শিথিল অঞ্চল বাতাসে উড়িতেছিল, মুদ্রিত নেত্রে প্রেমাশ্রু পড়িতেছিল, যুক্ত-কর-পল্লব ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। সেই অরণ্যে সনাতন ধর্ম্ম-দ্বেষী কয়েকজন দৈত্যপ্রকৃতি মানব বাস করিত; অচিরাৎ সেই ধ্যানমগ্না বালিকা তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহারা গভীর গর্জ্জন করিয়া সেফালির কেশাকর্ষণ করিতে করিতে শূন্যে উঠাইয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য লইয়া গেল। সেফালি কি তদবস্থায় অচেতন? না না, সেফালি প্রাণের কাতরতায় মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়া কহিল "তাহাই হউক, যাঁহার ইচ্ছায় এই অনন্ত বিশ্বজগৎ শাসিত হইতেছে আজ তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" "ভগবান সহায় হও, ভগবান সহায় হও"—অসুরদিগের বিকট চিৎকার ধ্বনির মধ্যেও সেফালির কর্ণে এই গম্ভীর মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল। "ভগবান্ সহায় হও! ভগবান্ সহায় হও" কি মধুর কণ্ঠ, কি পবিত্র স্বর! মুহূর্ত্তমধ্যে অসুরদল লণ্ড ভণ্ড হইয়া কে কোথায় পলাইয়া গেল। সেফালি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে

দীর্ঘাকৃতি এক মনুষ্যমূর্ত্তি, তাঁহার বাম হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি। সেফালি অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে চিনিল, তিনি সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তখন উৎপীড়িত ধূল্যবলুণ্ঠিত কল্পলতিকা তুল্য সেফালিকে অতি যত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া কুটীরে রাখিয়া আসিলেন। এই স্পর্শে সেফালির মনোমধ্যে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় একরূপ অনল জ্বলিল, সেফালি সন্ন্যাসীর হস্ত ধরিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল "দেবতা, আবার যেন দেখা পাই।"

একদিন সন্ধ্যাকালে তেজকুমার ও সেফালি বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে মালতী বৃক্ষের উপরে সোণার চাঁদ হাসিতেছিল, শিশিরসিক্ত নৈশসমীর গাছ পাতা দুলাইয়া দুলাইয়া যেন ঘুম পাড়াইতেছিল, চারি পাশে ফুলে ফুলে স্তব্ধ জ্যোৎস্নার ঢেউ বহিতেছিল। তেজকুমার কহিল "সেফালি, তুই মুকুলকে ভুলিয়া যা।" অনাহূত চক্ষের জলে সেফালির মুখখানি প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি বালিকা তৎক্ষণাৎ অশ্রুজল মুছিয়া হাসিয়া উঠিল।

তেজ। ভুল্‌বি না? এমনি করিয়া অনর্থক কষ্ট পাবি?

সেফালি। আচ্ছা, যদি কোন দিন কষ্ট বোধ করি, তবে তাহাকে ভুলিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব।

তেজ। তোর চির কালই ঐ এক কথা।

সেফালি হাসিয়া কহিল "তবে কি দুই কথা বলিতে বল? এক মুখে দুই কথা বলা কি ভাল?"

তেজকুমার কিছুতেই সেফালিকে দুঃখের পথ হইতে সরাইতে না পারিয়া কাতর হইয়া কহিল "সেফালি, যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিল, তুই তাহাকে ভাল বাসিবি?"

এবার সেফালির মুখ গম্ভীর হইল। সেফালি গম্ভীরস্বরে কহিল "তিনি কাহাকেও কষ্ট দেন নাই।"

তেজ। তাহার ধূর্ত্তামি তুই কি বুঝিবি? এই ভাষণ দোষ তাহার উপর অর্পিত হইবে বলিয়াই সে নিরুদ্দেশ হইয়া আছে। তুই জানিস্ সে তোকে ভাল বাসে না?

গম্ভীর স্বরে সেফালি কহিল "তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া নিশ্চেষ্ট রহেন নাই। তাঁহার ভালবাসা সেফালির ভালবাসা হইতেও উচ্চ, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া তেজকুমার কহিল "সেফালি, তুই কি তাহাকে ইতিমধ্যে দেখিয়াছিলি?"

কম্পিতকণ্ঠে সেফালি কহিল, "হাঁ আমার এমনি বিশ্বাস"। তেজকুমারের পিতা হইলে কহিতেন এত প্রেম নয়, এ হরিবোলের রোষবহ্নি আমাকে বিদগ্ধ করিবার জন্য এ সুন্দর বনপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। তেজকুমার তাহা কহিল না। সে নিজে প্রেমিক, প্রেমের

অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাহার অবিদিত ছিল না, অতএব সে ছোট রকমের একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সেফালি তোকে আর কত বুঝাইব? যদি মুকুলকে ভুলিতে না পারিস, তবে চিরকালের মত জীবনের সুখের আশা পরিত্যাগ কর্। বোধ হয় পিতার জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞার কথা চিরকালই তোর মনে জ্বলিবে।

সেফালি সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, তাহার অনাহূত চোখের জলই সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছিল।

সহসা পিনাকীর রুদ্ধ কণ্ঠের একটী বিকট চিৎকার তাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা দ্রুতপদবিক্ষেপে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সংন্যাস রোগে পিতার মুমূর্ষু অবস্থা।

নিরতিশয় ব্যাকুলতার সহিত ভ্রাতা-ভগ্নী পিতার শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল, এবং চিকিৎসায় কিছু হইল না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ঘন ঘন বজ্রপাতের সঙ্গে ঘোর শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সমস্ত অরণ্য সহ ক্ষুদ্র কুটীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। বিপদের উপর বিপৎপাত! তেজকুমার ভয়বিহ্বলচিত্তে, ব্যাকুল হইয়া ডাকিল—ভগবান্! ভগবান্!! "আমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য আসিতেছি; ভয় নাই, ভয় নাই!" তেজকুমার দেখিল—সেফালি দেখিল, সেই বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়া এইরূপ বজ্রগম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী তাহাদের কুটীরে উপস্থিত হইল। সে যাত্রা তেজকুমারের পিতা আর রক্ষা পাইলেন না, তেজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেফালিকে কহিলেন "সেফালি! আজ মুমূর্ষু পিতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর্ কখনও হরিবোলের পুত্রকে বিবাহ করিবি না।" পিতার এই কঠোর আদেশ সেফালির ক্ষুদ্র হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বাজিল। সেফালি কম্পিত অধর খুলিতে না খুলিতেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই দুঃখের সময়ে সন্ন্যাসী এই বিপন্ন পরিবারের যে মহোপকার করিয়াছিল, তাহা তাহারা সমস্ত জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

ইলিয়ড।

(গত প্রকাশিতের পর)

এতেক বলিয়া যবে নীরবিলা বীর,
এইরূপে নরপতি উত্তরিলা তারে—
"ভেবেছ কি মনে তুমি, শান্ত মনে আমি
ত্যজিব ও বন্দিনীরে মম, আর তুমি
রবে অধিকার করি সুখে নারী তব?
হও না হে বলী, সমরে অমর সম,

বীরত্বে প্রধান ; কিন্তু ভাবিও না কভু—
সৈনিকের অধিকার অবাধে দুর্বৃত্ত
তুমি করিবে হরণ। তব প্রার্থনায়
অর্পিব যাজকে আমি ক্রুসিসা বালায়ে,
কিন্তু অগ্রে উপযুক্ত মূল্য তার সবে
করহ প্রদান, হেন মূল্য নরপতি
পারেন যাচিতে যাহা, আর যোগ্য তাঁর।
নতুবা এ মম রাজ-অধিকার বলে,
এই হস্ত মোর অন্য কোন বন্দিনীরে
করিবে গ্রহণ। অতুল প্রতাপশালী
বীরেন্দ্র এজাক্স, ত্যজিতে হইবে তাঁরে
বন্দিনীরে তাঁর, কিম্বা ইউলিসিসের,
কিম্বা বীর তোমার সে হইবে আমার।
যার ইথে হবে ক্ষতি-বোধ কিম্বা ক্লেশ,
পারে সে করিতে অভিযোগ, কিম্বা পারে
হইতে কুপিত, কিন্তু সেই রোষ তার
তুচ্ছ বলি গণি। থাক্ এ সকল কথা,
যথাকালে ইহা মোরা করিব সাধন,
সাধিতে হইবে শীঘ্র মোদের এখন
দেবকার্য্য শুভ—ক্রাইসিস উপকূলে
উজানি জলধি, দ্রুত সঞ্চালি ক্ষেপণি
মনোনীত কয়জন নাবিক সহিত,
প্রেরিত হইবে চারু তরণী মোদের,
সহ যত বলি আর নৈবেদ্য-সম্ভার।
করুক্ সে তরীপরে ক্রুসিসা সুন্দরী
ত্বরা আরোহণ, আর তাহার সহিত
প্রতিনিধি নৃপ কেহ করুন গমন।
ক্রিটাসের অধিপতি, কিম্বা উলিসিস
কিম্বা বীরেন্দ্র এজাক্স, মোদের এ ইচ্ছা
করুন্ পূরণ। কিম্বা যদি রাজ-ইচ্ছা
হয় অর্পিবারে আকিলিস বীরবরে
এই কার্য্য-ভার, প্রচণ্ড কুপিতচিত্ত,
সে বীর প্রধান, রাজাদেশ শিরে ধরি
স্বয়ং এ কার্য্য সাধি করুন্ প্রসন্ন
দেব আপোলোরে, আর নিবারুন্ ত্বরা
কালমৃত্যুরূপী এই ভীষণ মড়ক।”

কঠোর ভ্রূকুটি করি গর্জিয়া গভীরে
এইরূপে পিলিডাস* করিলা উত্তর—
“হে যথেচ্ছাচারী! গর্ব্ব ঔদ্ধত্যের বলে
বলী তুমি শুধু, আর, নীচ স্বার্থ-দাস,
চাতুরী ও ছলনায় নিরত নিয়ত,
নহ যোগ্য তুমি উচ্চ রাজ-হৃদয়ের।
উদারহৃদয় কোন্ গ্রীক বীর, আজ্ঞা
তব নৃপাধম! করিবে পালন আর
গুপ্ত রণব্যূহ হায়! করিবে রচিত,
কিম্বা তরবারি তীক্ষ্ণ উঠাইবে আর
হানিতে অরিরে? কি কারণে বল আজি
প্রবৃত্ত দুর্বৃত্ত মোরা করিতে সমর
তবাদেশে হেথা? দূরদেশবাসী এই
ট্রয়বাসিগণ কভু মোর কোন ক্ষতি
করেনি সাধন,কিম্বা দূর থিয়টিসে
বিপুল বাহিনী সহ কভু শত্রুভাবে
করেনি গমন। চরিত নির্ভয়ে তার
উপত্যকামাঝে, সমরকুশলী মম
অশ্বগণ যত, রক্ষিতেছে নিরাপদে
যে দেশ সতত গভীর কল্লোলময়
অকূল জলধি আর শৈলের প্রাচীর ;
যাহার উর্ব্বরা ভূমি আছয়ে পূর্ণিত
ফল শস্যে আর মহাযোদ্ধৃবীরদলে।
হেথা মোরা আসি নাই সাজি দলবলে
শত্রুতা সাধিতে, সর্ব্ব গ্রীকগণ পরে

*একিলিস।

ট্রোজানগণের কোন অন্যায়াচরণে,
কিন্তু হে একের পরে, আচরিত ঘোর
অন্যায়ের যথোচিত প্রতিবিধানিতে,
স্ব-ইচ্ছায় হেথা মোরা আসিয়াছি সবে।
হে কৃতঘ্ন! তব আর তব ভ্রাতৃতরে
আসিয়াছি মোরা হেথা সসৈন্য সদলে,
নতুবা কি অন্য হেতু, এ ট্রয় নগরে
সমবেত গ্রীকগণ ছাড়ি রাজ্যবাস?
মোসবার রণশ্রম শোণিতপাতের
এই কিহে উপযুক্ত প্রতিফল দান?
কি দুঃখ! যাঁহার কার্য্যে ব্রতী মোরা সবে,
সেই জন হতে অপদস্থ ক্ষতিগ্রস্ত
হইব এরূপে? কাড়ি নিতে বন্দিনীরে
মম, হে দুর্বৃত্ত ধরিছ সাহস,
দেখাইছ ভয়? বহু ঘোর মহাহবে
প্রাণপণে যুঝি লভি জয় পুরস্কার
কদাচও যাহা, জেন হে গর্ব্বিত, তাহা
অধিক সামান্য তব পুরস্কার হতে,
মোর বীরকীর্ত্তি যেইরূপ সর্ব্ব অংশে
তব হতে শ্রেষ্ঠতর, দেখ তুলনীয়া।
প্রতি রণজয়ে হও পুরস্কৃত তুমি
বিনা শ্রমে হে দুর্বৃত্ত! শ্রেষ্ঠ উপহারে;
আর মোর ভাগ্যে শুধু পরিশ্রম সার।
শুধু হে সামান্য কোন উপহার আমি
লভি ঘোরতর রণশ্রম বিনিময়ে,
কিম্বা লভি শূন্যগর্ভ অসার সুখ্যাতি।
কিন্তু জেনো, হে গর্ব্বিত, তব দাস আমি
নহি আর এবে। ত্যজি ট্রয় উপকূল
উজানি জলধিজল যাইব চলিয়া।
ইলিয়ন ভূমে লব্ধ রণজয়ে যত
বিলুণ্ঠিত ধন, পূরাউক সব এবে
আট্রিডিস নৃপতির ভোগ-অভিলাষ।"

(ক্রমশঃ)

দেবী না মানবী।

(১)

"মরণ মঙ্গল গণি তবু কদাচন
নারিব পরকে দিতে স্বামী হেন ধন।"

এইত বঙ্গবামাগণের প্রাণের কথা। বঙ্গীয়া সাধ্বীগণ মরণকে মঙ্গল গণিতে পারেন,—অনায়াসে মরিতে পারেন,—তবু স্বামী সদৃশ অমূল্য ধনকে পরের ভোগ্য করিতে পারেন না। কথাটা শুনিবামাত্র প্রাণ চমকিয়া উঠে,—বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, তথাপি উহা কামগন্ধ-বর্জ্জিত নহে। কেননা—

"আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা তার নাম কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

চৈঃ চঃ।

যতক্ষণ আত্মসুখে বাঞ্ছার তৎপরতা থাকিবে, ততক্ষণ তাহার নাম কাম। আর সেই বাঞ্ছা কৃষ্ণসুখপরা হইলে প্রেমাখ্যা ধারণ করে। এখানে কৃষ্ণশব্দে আত্মেতর জীব মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। কেননা—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্
সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।"

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে জানা যায়, পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে বিরাজমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিরাজমান হইলেও আপনাকে ব্রহ্মভূত মনে করা নিষিদ্ধ ;—কেননা সেরূপ মনে করিলে সেব্য সেবক তত্ত্বে বাধা উপস্থিত হয়। এইরূপ বাধা দ্বারা ভক্তিহানি হয়। এইজন্য উপরিভাগে "আত্মেতর" কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ আত্মসুখ কামনা বর্জ্জিত হইয়া পরের সুখান্বেষণ করাই প্রেমধর্ম্ম। ধর্ম্মরাজ্যে এই প্রেম-ধর্ম্মেরই উচ্চাসন। কিন্তু আধুনিক ধার্ম্মিকমণ্ডলে, বিশেষতঃ রমণীসমাজে এই ধর্ম্মের বড়ই বিরল প্রচার। এই জন্য রমণীচরিত্রে প্রেমধর্ম্ম সন্দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। এইজন্য প্রেমময়ী রমণীকে দেবী কি মানবী বলিব, ঠিক্ করিতে পারি না।

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণজাতীয়া একটী প্রাচীনা রমণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পূর্ণ যৌবনকালের সত্য বিবরণ বিবৃত করিব বলিয়াই উপরে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করিতে হইল। তিনি নিজে পরমা সুন্দরী এবং ঐশ্বর্য্যশালী ও মহাকুলীন কোন সাধুচরিত্র সুন্দর পুরুষের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। স্ত্রী পুরুষে সুদৃঢ় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অপার দাম্পত্য-সুখ অনুভব করিতেন। সংসারে কোন অভাব, বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। অসুখের মধ্যে যথাসময়ে পুত্র কন্যার মুখদর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। যদিও হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্র ব্যতিরেকে পুন্নাম-নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর নাই, তথাপি এই পুরুষটীর তজ্জন্য কোন ক্ষোভ ছিল না। যথাকালে পুত্র সন্তান না জন্মিলে সঙ্গতিমান্ হিন্দু প্রায়ই দারান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের এই পুরুষটী যদিও সঙ্গতিমান্ ও মহাকুলীন ছিলেন,—অনায়াসে আর একটী বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু পতিপরায়ণা সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে সাপত্ন্যদুঃখ প্রদানপূর্ব্বক দারান্তর পরিগ্রহের সঙ্কল্প স্বপ্নেও করিতেন না। পত্নী মধ্যে মধ্যে পতিকে বলিতে লাগিলেন, "আমার পুত্র হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, আমার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনাও নাই ;—অতএব আপনি পিতৃবংশ রক্ষা হেতু আর একটী বিবাহ করুন।" পতি, এ বাক্য, পত্নীর মৌখিক মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। পত্নী কখন বলিতেন,—"আমার মনে দুঃখ হইবে বলিয়া আপনি বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছেন না, কিন্তু আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, আপনি আর একটী বিবাহ করিলে, সেই পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া আপনার যত সুখ হইবে,—আপনার সুখে আমিও ততই সুখিনী হইব,—সে পুত্রকে আমি আপনার গর্ভজাত মনে করিব। নববিবাহিতা পত্নীকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় লালন পালন করিব। আমার

সংসার অধিকতর সুখের হইবে। অতএব আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, আপনি আর একটী বিবাহ করুন।” পতি মহাশয়, পত্নীর এই কথা শ্রবণে কেবল হাস্য করিতেন। কখন বা বলিতেন,—

“সতীনের জ্বালা জান না বলিয়াই এখন এত সতীত্ব প্রকাশ করিতেছ। আমাদের বংশলোপ পাউক,—পুন্নাম-নরকে আমার বাসস্থান হউক, তথাপি প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে সতীনের জ্বালা দিতে পারিব না। অতএব তুমি এরূপ বৃথা কথা আর আমাকে বলিও না। দুই জনে পরম সুখে সংসার করিতেছি, এমন সুখের সংসারে কেন অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছ?”

পতির এইরূপ কথার পর হইতে পত্নী বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলেন নাই।

(২)

আমরা যে সামাজিক ইতিহাসের কিয়দংশ প্রথম পরিচ্ছেদে বিবৃত করিলাম, তন্মধ্যে একটী পুরুষ ও একটী রমণীর উল্লেখ আছে। পুরুষটীর নাম রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্ত্রীটীর নাম যোগেশ্বরী দেবী। অতঃপর স্ত্রী পুরুষের নামোল্লেখে গল্প বলিব।

রসময় বাবু কৃষ্ণনগরের জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। কৃষ্ণনগরের জজ আদালত গোয়াড়িতে। গোয়াড়ী হইতে নবদ্বীপ তিন ক্রোশেরও কিঞ্চিৎ দূর। সুতরাং রসময় বাবু প্রায়ই বাটী হইতে আদালতে যাতায়াত করিতেন। নিজের গাড়ী ঘোড়া ছিল,—গোয়াড়ীতে একটা নামমাত্র বাসাবাড়ীও ছিল। কালে ভদ্রে ঐ বাসায় অবস্থান করিতেন।

একদা যোগেশ্বরী স্বামীকে প্রাতে ৮টার সময় ভোজন করাইবেন, পূর্ব্বদিন রাত্রে সেই কথা তাঁহাকে বলিলেন। রসময় কহিলেন,—“রোজ ৯টায় আহার দাও, কল্য ৮টায় কেন?”

যোগেশ্বরী কহিলেন,—“কল্য মধ্যাহ্ন-কালে আমার একটু কাজ আছে,—তুমি যতক্ষণ কাছারী না যাইবে, আমি ততক্ষণ সে কাজ পাইব না।”

“উত্তম” বলিয়া রসময় নিদ্রা গেলেন। পরদিন রসময় বাবু ভোজন করিয়া গোয়াড়ি যাত্রা করিবামাত্র যোগেশ্বরী সত্বর আহার সারিয়া লইলেন। পরে যেন বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন, এইরূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইল। দাস দাসীকে আবশ্যক মত উপদেশ দানপূর্ব্বক যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে সংবাদ পাইলেন, বহির্দ্বারে একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—

“ঘটক মহাশয়, মেয়েটী আমার পছন্দ মত হইবে ত?”

ঘটক মহাশয় কহিলেন,—"এ মেয়ে যদি পছন্দ না হয়, তবে পছন্দ হইবার মেয়ে জগতে নাই।"

"বাবু বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমরা ফিরিতে পারিব ?"

"যে অসুরের ন্যায় যোল জন বেহারা ও দুইখান পালকী দরজায় উপস্থিত হইল, আমাদের যাতায়াত ও সেখানকার কার্য্য সারিতে বোধ হয় চারি ঘণ্টার অধিক লাগিবে না।"

"তবে কোন চিন্তা নাই,—যাত্রা করুন,—আমি প্রস্তুত" বলিয়া যোগেশ্বরী আপনি এক পাল্‌কীতে আরোহণ করিলেন, এবং ঘটক মহাশয় অন্য পাল্‌কীতে চড়িয়া বসিলেন। যোজন-কর্ত্তা ঘটকগণের পাত্র-কন্যার যোজনা করিবার জন্য হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের বন্ধন ছিন্ন ও পদতল কাঁকুড়ফাটা হইয়া যায়। আজ সেই ঘটক মহাশয় পাল্‌কীতে চড়িয়া অপূর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। বাহকগণ "হুঁ হুঁ" শব্দে তীরবেগে ছুটিল।

যোগেশ্বরী পুনঃ পুনঃ স্বামীকে বিবাহের অনুরোধ করিয়া যখন কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন অন্য উপায় চিন্তনে ব্যাপৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই চিন্তার ফলে মধ্যে মধ্যে রসময়ের আত্মীয় স্বজনগণ বংশলোপের ও পুন্নাম-নরকবাসের ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দার-পরিগ্রহে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ২।৪টী ঘটক রসময় বাবুর সম্মুখে মধ্যে মধ্যে পরমা সুন্দরী অনূঢ়া কন্যাগণের রূপ যৌবন বর্ণন করিতে লাগিলেন। রসময় স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের পুত্র ; সুতরাং অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের রূপ যৌবনের প্রলোভন, ভূরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য রজত মুদ্রার ভারে ভারায়মান হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট কামিনী কাঞ্চন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। "বিবাহ করিলে যোগেশ্বরীর মনে দুঃখ হইবে" এই যুক্তির স্রোতে সকলই ভাসিয়া গেল। রসময় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে কোনরূপেই সম্মত হইলেন না। তখন যোগেশ্বরী বলপূর্ব্বক স্বামীর বিবাহ দিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আজ ঘটকের সহিত স্বামীর জন্য নিজে মেয়ে দেখিতে যাত্রা করিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া পাত্রী দেখিলেন। আপনি পরম রূপবতী হইয়াও পাত্রীর রূপে মুগ্ধা হইলেন। ভাবিলেন,—

"এই স্ত্রীরত্ন পাইলে আমার প্রাণেশ্বর পরম সুখী হইবেন।" স্বীয় গাত্র হইতে একখানি বহুমূল্য আভরণ উন্মোচন করিয়া তদ্দারা পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর কন্যাকর্ত্তার দ্বারা একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করাইলেন। বিবাহের দিন মধ্যাহ্নকালে কন্যাকর্ত্তা পাত্রীকে লইয়া অতি গোপনে যোগেশ্বরীর ভবনে উপস্থিত হইবেন, সেই দিন ইহাও স্থির

হইল। যোগেশ্বরী ঘটক সমভিব্যাহারে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

যোগেশ্বরীর যোগচক্রে পতিত হইয়া রসময় বাবু নির্দ্দিষ্ট দিনের রজনীযোগে স্বভবনস্থ শয়নগৃহে দ্বিতীয় দারের পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইবামাত্র যোগেশ্বরী সেই সম্প্রদান আসনে উপবেশন ও গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক নবোঢ়া সপত্নীর দুই পাণিতল আপন বাম হস্তে ধরিলেন এবং স্বামীর দুই পাণিতল দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া "প্রিয় ভগি, আমি চিরজীবনের জন্য আমার এই রাজা স্বামী তোমাকে সমর্পণ করিলাম। আজ হইতে তুমি ইহাঁর ভোগ্যা ধর্ম্মপত্নী হইলে এবং আমি তোমাদের উভয়েরই সেবাদাসী রহিলাম।" এই বাক্য বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত সপত্নীর যুগল করে অর্পণ করিলেন।

রসময় বাবুর পদ্মপলাশ নয়নযুগল হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল;—কিন্তু যোগেশ্বরীর সহাস্য বদন,—অতি মহান্ ধর্ম্ম কার্য্যসম্পাদনের পর মানবমনে যেরূপ আত্মপ্রসাদ হইয়া থাকে,—যোগেশ্বরীর বদনকমল সেইরূপ আত্মপ্রসাদে সুপ্রসন্ন!

রমণীগণ আপন গর্ভজাত কন্যা, বা কনিষ্ঠা সহোদরাগণকে যেরূপ স্নেহ ও মমতার সহিত লালন পালন ও তাহাদের বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, যোগেশ্বরী নবীনা সপত্নীকে সেইরূপ লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সপত্নী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। যোগেশ্বরী যেন পূর্ণিমার চাঁদ হাতে পাইলেন। এতদিনে যোগেশ্বরীর যোগ সিদ্ধ হইল।

গর্ভধারিণীর সহিত এই বালকের কোন সম্বন্ধ ছিল না। যোগেশ্বরী সূতিকাগারেই বালককে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে গর্ভধারিণীর স্তনপান করাইয়া লইতেন। এই শিশুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদিন গর্ভধারিণী শিশুর গায় হাত তুলিয়াছিলেন। যোগেশ্বরী দাস দাসী সত্বেও স্বহস্তে গো-শালা পরিষ্কার করিতেন। তখন ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালকের রোদনধ্বনি শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। রোদনের কারণ অবগত হইবামাত্র সেই গোবরহস্তে সপত্নীর কপোলে একটী চপেটাঘাত করিলেন এবং কহিলেন,—

"তুই আমার ছেলে মারিবার কে? তুই জানিস্ না যে, এই ধন পাবার জন্য চিরজীবন স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়াছি? এই শিশু আমার স্বামিকুলের বংশধর,—ইহার জন্যই আমার প্রাণের অধিক প্রিয়বস্তু তোকে বিলাইয়া দিয়া তোর দাসীত্ব করিতেছি?" এই কথা বলিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শিশুকে শান্ত করিলেন এবং সত্বর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন।

এই সকল ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের মুখে শ্রবণ

করিয়াই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। অতএব ইহা,দুর্গেশনন্দিনীর হস্তে আয়েসার জগৎ সিংহ সমর্পণের ন্যায় কল্পিত কথা নহে এবং এতাদৃশ উৎকট অসাধ্য সাধনের পর অনুতাপানলে, অথবা সপত্নী-বিদ্বেষের মুর্ম্মুর দাহে দগ্ধ হইয়া যোগেশ্বরী স্বকীয় জীবনের মধ্যে কখনই হীরকাঙ্গুরীয় ভক্ষণ করিতে যান নাই;—চিরকাল সমান সুখে ও পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রাণেশ্বরের সহিত চিরকাল এক গৃহে বাস করিয়াছেন,—অথচ সপত্নীহস্তে স্বামী সমর্পণের সময় হইতে একদিন ভ্রমেও স্বামীর শয়নগৃহে গমন, কি স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। সপত্নীর দ্বারা সযত্নে স্বামিসেবা সাধন করিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—"দেবী, না মানবী?"

আদর্শ হিন্দু পরিবার।

(গত প্রকাশিতের পর)

ভগিনীর বিবাহে ব্রাহ্মণ স্ত্রীর অলঙ্কার উৎসর্গ করিয়াও কিছু ঋণগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু স্ত্রীর গুণে ও ভগবানের কৃপায় সে দায় হইতে শীঘ্র মুক্ত হইলেন। গৃহিণী স্বামীর ঋণ পরিশোধ জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্বে যে ভাবে পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহার দ্বিগুণ করিতে লাগিলেন। যতদূর সাধ্য অল্প ব্যয়ে সংসার চালাইতে লাগিলেন। বাজারের শাক সবজি ক্রয় করিতে বেশী পয়সা ব্যয় হয় বলিয়া চারি টাকা বেতনে একজন মালী রাখিলেন, ইহাতে বাড়ীতেই সকল শাক সবজি ও আলু বেগুণ হইত। এবং ধান কিনিয়া তাহাতে চাউল প্রস্তুত করাইলেন। এইরূপে সংসারের সকল ব্যয় কমিয়া গেল। প্রথমতঃ বাগান প্রস্তুত করিতে যদিও কিছু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সেই ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইল। পরিবারের আহারের উপযোগী ফল মূল রাখিয়া মাসে প্রায় ৫।৬ টাকার ফল মূল বিক্রয় হইত ও গৃহিণী অল্পব্যয়ে সংসার চালাইয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঋণের দায়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি কায়মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেন। এইরূপে তাঁহাদের ঋণের সামান্য কিছু পরিশোধ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে, কোন সাংঘাতিক রোগে ব্রাহ্মণের ভগ্নীটি মারা গিয়াছে, এবং সে নিঃসন্তান থাকায় তাহার সেই মাতৃদত্ত সম্পত্তি সমস্ত ভ্রাতাকে দানপত্র করিয়া দিয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এমন কি প্রায় মাসাবধি তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্নজল গ্রহণ করেন নাই এবং শোকে সর্ব্ববিধ সুখ ও আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে এই

দুরবস্থার সময় এত সম্পত্তি পাইলেন, সেজন্য কিছু মাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না বা তাহা আপনাদের সচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিলেন না। উক্ত সম্পত্তি দ্বারা একটী ছোট অতিথিশালা ভগিনীর স্মরণার্থ প্রস্তুত করাইলেন। সেই অতিথিশালাতে প্রত্যহ ১০টি দীন দরিদ্র অন্ন পাইত।

ভগ্নীর পরকালের হিতার্থ এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিয়া গ্রামবাসী সকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা ও তাঁহার ভক্তের প্রতি করুণা! যে তাঁহাকে একবার কায়মনে ডাকে, তিনি তাহার প্রতি সদয় না হইয়া থাকিতে পারেন না এবং সত্বর তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। এই জন্য ভগবানের নাম বিপদভঞ্জন। এই ব্রাহ্মণ কায়মনে ভগবানে ভক্তি করিতেন, অধর্ম্মাচরণে কখনও অগ্রসর হইতেন না, সেইজন্য ঈশ্বর ইহাঁর উপর এত দয়া করিয়াছিলেন। এই অতিথিশালা প্রস্তুত হইবার দুই মাস পরেই ইহাঁর বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা চারি গুণ বাড়িল। ইহাঁর বিশ্বস্ততা ও ধর্ম্মভীরুতা এবং পরোপকারিতার কথা অনেকেই জানিতেন এবং অনেকগুলি সন্তান অল্প আয়ে প্রতিপালন করিতে হয় ও তাহাতে ইহাঁদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, ইহা সকলেই জানিতেন; এবং যাহাতে ইহাঁর কিছু বেশী আয় হইয়া একটু সচ্ছলতা হয় এজন্য সকলেই চেষ্টা করিতেন। ভাগ্যক্রমে যে স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করিতেন, সেই স্থানে একটী উচ্চ বেতনের কর্ম্ম খালি হওয়াতে অনেকেই ইহাঁর পক্ষ সমর্থন করিলেন। ব্রাহ্মণের চেষ্টা ও পরিশ্রমে এবং ঈশ্বরের কৃপায় এক কালে ১৫০ টাকা বেতনের কর্ম্ম তাঁহার হইল। তাঁহাকে এই কর্ম্ম দিতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষেরা কোন আপত্তি করিলেন না, বরং উপযুক্ত লোককে এই কর্ম্ম দেওয়া হইল বলিয়া সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলেন।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এত দিনে ইহাঁদের কষ্টের কিছু লাঘব হইল। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা আয় চতুর্গুণ হইল বলিয়া ইহাঁরা গর্ব্বিত হইলেন না। পূর্ব্বে গৃহিণী যেরূপ শ্রমশীলা, নম্র ও পরদুঃখকাতরা ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিলেন। উচ্চ বেতনভোগী স্বামীর স্ত্রী বলিয়া গর্ব্বিতা অথবা বিলাসপ্রিয়া হইলেন না। পূর্ব্বে যেরূপ শত কষ্ট হইলেও স্বামীকে জানাইতেন না, এখনও সেইরূপ নিজ সুখের জন্য অথবা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য একটী কথাও স্বামীকে বলিতেন না। যদিও স্ত্রী স্বামীকে কখনও নিজের বিষয়ে কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামী সকলই জানিতে পারিতেন। আয়ের অল্পতা হেতু স্ত্রীকে যে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিতে হইত, এমন কি তাঁহার দুই সন্ধ্যা ভাল করিয়া আহার পর্য্যন্তও হইত না, ইহা স্বামী জানিতেন। সেইজন্য মনে মনে বড় কষ্ট ছিল। এমন পতিব্রতা ও সর্ব্বগুণ-

শালিনী স্ত্রীকে যে তিনি সুখে রাখিতে পারিতেছেন না, সেজন্য বড়ই দুঃখিত ছিলেন ও সেই দুঃখ কেবল ভগবান্‌কে জানাইতেন। এখন বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে স্ত্রীর কষ্টের লাঘব জন্য ২।৩ জন দাস দাসী রাখিয়া দিলেন এবং অল্প দিন মধ্যে পূর্ব্বের ঋণ সকল পরিশোধ করিলেন। দাস দাসী দ্বারা সাংসারিক অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল, ইহাতে গৃহিণী অবসর লাভ করিলেন। কিন্তু সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া আলস্যে তিলমাত্র কাল কাটান নাই। তাস পাশা খেলিয়া এবং পাড়া বেড়াইয়াও বেড়ান নাই, অথবা সকল কর্ম্ম ভৃত্যদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার কার্য্যের নূতন প্রণালীর বিষয় পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের উপায় সম্বন্ধে নানা জনের নানা প্রকার মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ইচ্ছুক; কেহ কেহ তাহাদিগকে স্বাবলম্বন-পরায়ণা করিয়া জীবিকার উপায় বিধানে অভিলাষী। আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহাদিগের জীবিকালাভের যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বিধবাগণ উপবীত কাটিয়া, এবং অন্যান্য বিধবা ও অনাথা স্ত্রীগণ ধান ভানিয়া, চরকা দ্বারা সূতা কাটিয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা ও অন্য প্রকারে শরীর খাটাইয়া, কষ্টে স্মষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আজ কাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও সামাজিক নিয়মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান রুচি ও সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সমাজসম্মত হইতে পারে, এমন ভাবেই উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষায় যেমন জীবিকালাভের পথ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেয়, এমন আর কিছুতেই নয়। শিক্ষা যে কেবল জীবিকা বিধান করিয়াই নিরস্ত হয়, এমন নহে; ইহাতে চরিত্র গঠিত এবং শারীরিক মানসিক, ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ব প্রকার সুখ সাধিত হইতে পারে। যাহা হইতে উপজীবিকা ও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে, এমন সুখের বাণিজ্য কে

পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? দুঃখের কথা কি বলিব? সুপ্ত ভারতে দুঃখ-দুন্দুভি বাজাইয়া আর কি করিব ? যে ভারতবাসীর হৃদয় থাকিয়াও নাই, স্ত্রীলোকের সুখ দুঃখ— বিশেষতঃ বিধবা নারীর সুখ দুঃখ "সুখ দুঃখ" বলিয়া যাঁহাদের ধারণা নাই, তাঁহাদের নিকট স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা করিলে কি হইবে ? যাহাহউক ভারতে আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষা কথঞ্চিৎ প্রচলিত হওয়াতে আমরা আশ্বস্ত হইতেছি এবং যে ভাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথ স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের উপায় সংগৃহীত করিব, তাহাতে আশা করি সমাজ আমাদের প্রতি কোনরূপই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধেও নানা জনের নানা মত। ইহার মধ্যে সমাজের যে মত, অনেকটা তন্মতেই চলিতে হইবে। আমরাও বলি না যে, স্ত্রীলোকে কেরাণীগিরি করিবে। তাহারা শিক্ষিতা হইয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, পত্রিকা-সম্পাদিকা, গ্রন্থকর্ত্রী, প্রসবাদি-কার্য্যের ধাত্রী ও স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসিকা হইলে, তাহাদের জীবিকা-লাভের উপায় অতি সহজেই হইতে পারে এবং ইহাতে সমাজেরও কোন অনিষ্ট বা দোষের কারণ দেখা যায় না।

ইহার পরেই শিল্পবিভাগ। শিল্প-ক্ষেত্রে উক্তবিধ স্ত্রীলোকের জীবিকা-লাভের যতগুলি উপায় আশা করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই না। শিল্পজাত দ্রব্যে যেরূপ আয় হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আসামে এরেণ্ডীনামক এক প্রকার বিখ্যাত শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা আসামীয়া স্ত্রীলোকদের নির্ম্মিত। এক এক খানা এরেণ্ডীর দাম ১০৲, ১৫৲, ২০৲ টাকা, কি তদধিক হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মুগার কাপড়, সূতার বড় কাপড়া নামক গাত্র বস্ত্র তাহাদের হস্তে নির্ম্মিত হইয়া যথেষ্ট লাভ হয়। ব্যাধ বা ডোম এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। তাহারা সস্ত্রীক নানা স্থানে যাইয়া বাঁশের কার্য্য করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, একটী বাঁশে ৫৲ টাকা আয় না হইলে, তাহারা আর সে স্থানে থাকে না। ফলতঃ বাঁশনির্ম্মিত সামান্য ডালা, চুপড়ী, সাজি ইত্যাদিতে তাহাদের যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ প্রবাদ কখনও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীগণ সকলেই এইরূপ আসামীয়া স্ত্রীলোক ও ব্যাধ-রমণীর অনুকরণ করিলে, জীবিকা-লাভের জন্য কখনই তাহাদিগকে হাহাকার করিতে হয় না। নিম্নলিখিত শিল্প সকল হইতে ভারতের বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের উপজীবিকা লাভ হইতে পারে ; যথা,—বস্ত্রবুনন,কাপড়ে বুটা উঠান, পিরাণ চাপকান ইত্যাদি সূচীকর্ম্ম ; মোজা, টুপি, কম্ফোর্টার নির্ম্মাণাদি উলের কাজ ; কাগজে নানা প্রকার ছবি অঙ্কনাদি চিত্রবিদ্যা ও ঝাড় লতা পাতা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে কাগজ কাটা ; মাটী দ্বারা

নানা প্রকার খেলনা ও বাসন তৈয়ার; পাটি নির্ম্মাণ, ঝুড়ি, ডালা, কুলা, সাজি, ধূচনী, ইত্যাদি বাঁশের জিনিশ প্রস্তুত করা। কা, চ, ভ।

জীবনবিকাশ।

স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জীবনবিকাশ সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই আমাদের অধিকার নাই সত্য; কিন্তু একবারেই যে কোন অধিকার নাই, কিছু করিবার নাই, কোন যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। জীবনবিকাশেও আমাদের যত্ন চেষ্টা, চিন্তা ও পরিশ্রম প্রয়োজন। নিজ যত্ন চেষ্টা ভিন্ন জীবনের আশানুরূপ বিকাশ অসম্ভব। আমি যদি যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম পূর্ব্বক আহার সংগ্রহ না করি এবং সেই আহার গ্রহণে যদি বিরত থাকি, তবে কি স্বভাবের প্রভাবে শরীরের বিকাশ হইতে পারে? তাহা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি নিজ জীবনের জন্য নিজে পরিশ্রম না করিলে, নিজের উন্নতির জন্য নিজের যত্ন চেষ্টা না থাকিলে, কেবল স্বভাবের প্রভাবেই জীবনের উপযুক্ত বিকাশ ও উন্নতি হইতে পারে না। স্বভাবের প্রভাব ভিন্ন যেমন আমার দেহ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও বর্দ্ধিত হয় না, তেমনি নিজ যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম ভিন্নও দেহমন প্রাণের উন্নতি সম্ভবপর নহে। পার্থক্য এই যে, আপন যত্ন চেষ্টার অভাবে দেহের মৃত্যু সংঘটিত হয়, কিন্তু তদভাবে আত্মার মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে না। তাহাও এইজন্য যে আত্মা অমর। আমাদের চেষ্টা যত্নের অভাবে আত্মা জীবিত থাকে, কিন্তু তাহার বিকাশক্রিয়া ভালরূপে চলিতে পারে না।

শরীর বিকাশের জন্য প্রধানতঃ তিনটী কার্য্যের প্রয়োজন—(১) আহার গ্রহণ, (২) তাহা জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করণ অর্থাৎ দেহ-পোষণোপযোগী রক্ত মাংসে পরিণত করণ, (৩) আপন শক্তি বিকিরণ অর্থাৎ বিবিধ কার্য্যে শক্তি চালনা। ইহার কোনও ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই দেহের বিকাশ হয় না। মানবজীবন সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ। গ্রহণ, ধারণ ও বিতরণ এই তিন ক্রিয়া সুন্দররূপে না চলিলে আত্মার বিকাশ সাধিত হইতে পারে না।

তাই, দেখিতেছি জীবনের বিকাশে আমাদের প্রথম কার্য্য আহার গ্রহণ। আমরা জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা দ্বারা গঠিত, সুতরাং আমাদের আহার জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা। যে সত্য—যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি একবার চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব জীবনোপযোগী কত সত্য—কত

শিক্ষা, কত সময় কত ভাবে পাইয়াছি, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা অতি অনুন্নত অসম্পূর্ণ; তবুও যে সকল শিক্ষা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও যদি গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে জীবন আজ এত বিকৃত ও অগঠিত থাকিত না। চারি দিকে আত্মার যে সকল আহারীয় বস্তু ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যত আমরা কোন চেষ্টাই করি না। আমাদের কোনওরূপ চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াও যে সকল জ্ঞান আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, আলস্য ও উদাসীনতা বশতঃ তাহাও গ্রহণ করি না। এই অবস্থায় জীবনের বিকাশ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল অল্পাহারজনিত ক্ষীণতা ও অসম্পূর্ণতা। এই শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটির অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের হীন মলিন অবিকশিত জীবন।

জীবনবিকাশের প্রথম উপায় "গ্রহণ" সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল গ্রহণ করিলেই হইবে না, তাহা পোষণোপযোগী হওয়া চাই। গ্রহণের অভাবে যেরূপ মৃত্যু, মন্দ বস্তু গ্রহণেও সেইরূপ মৃত্যু। অনিষ্টকর জল বাতাস ও খাদ্য যদি গ্রহণ করি, তবে আমার শরীর পুষ্ট হইবে না, বরং বিনষ্ট হইবে। মন্দ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মানবাত্মা বিকাশের পথে না যাইয়া বিনাশের পথেই যায়। আত্মার স্বভাবই গ্রহণ করা—ভাল হউক মন্দ হউক, সে কিছু গ্রহণ করিবেই। এই দুইয়ের ফল অবশ্য দুই বিভিন্ন প্রকার। অতএব সর্ব্বদা আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে ভাল মন্দ বিচারশক্তি পাইয়া, কিসে ইষ্ট আর কিসে অনিষ্ট হয় তাহা জানিয়া কে মন্দ বিষয়—অনিষ্টকারী বস্তু গ্রহণ করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় আপাত-মধুর সুখে ভুলিয়া আমরা অধিকাংশ সময়েই অহিতকর বস্তু আস্বাদন করি, কুশিক্ষা গ্রহণ করি। অসার অনিষ্টকর বস্তু গ্রহণ করিতে করিতে সে সকল বস্তুই আমাদের প্রিয় ও তৃপ্তিকর হইয়াছে, সারগ্রাহিতা শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা জানিয়া শুনিয়াও মন্দ বস্তুই অধিক গ্রহণ করিতেছি এবং এই কুশিক্ষার ফলে জীবন বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বস্থান হইতে যাহা কল্যাণকর তাহাই গ্রহণীয়। সূর্য্য যেমন পঙ্কিল দূষিত স্থান হইতেও কল্যাণপ্রদ নির্ম্মল সলিল-কণা গ্রহণ করে, আমরা যদি সেইরূপ সকল অবস্থা হইতে, সকল মানব-জীবন, সকল গ্রন্থ এবং জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে নির্ম্মল সার বস্তু গ্রহণ করিতে পারি, সৎশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, তবে কতই না উপকৃত হইতে পারি, তাহাতে জীবন কতই না উন্নত ও বিকশিত হইতে পারে!

কেবল পোষণোপযোগী বস্তু গ্রহণ করিলেই হইবে না, তাহা আপনার উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, নতুবা

পোষণ অসম্ভব। যদি খাদ্য শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা শরীরের প্রধান উপাদান রক্ত মাংসে পরিণত না হয়, তবে শুধু পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে শরীর কখনও পুষ্ট হয় না। জীবন-বিকাশ সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধু সাধ্বী নর নারী দর্শন, তাঁহাদের জীবনী অধ্যয়ন, সদ্গ্রন্থ পাঠ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব, জগৎ হইতে অপরাপর প্রকারে বিবিধ শিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে কি ফল হইবে, যদি তাহা আমার আয়ত্ত করিতে না পারি, জীবনের রক্তে—আপনার বস্তুতে পরিণত করিতে না পারি? কত জ্ঞান আমরা উপর উপর শিক্ষা করি, কত তত্ত্ব কথা ভাসা ভাসা মুখে বলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা আমাদের জীবনের মূলে প্রবেশ করে না। সুতরাং ইহাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না, বিকশিত হয় না। পল্লবগ্রাহিতা আমাদের জীবন-বিকাশের প্রধান অন্তরায়।

আবার কেবল গ্রহণ ও ধারণ ক্রিয়া সুন্দররূপে চলিলেই উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না, বিতরণ আবশ্যক। শরীর-চালনা না করিলে—শক্তি ব্যয় না করিলে শরীরের বিকাশ হয় না—শরীর পুষ্ট ও সবল হয় না। আত্মার পক্ষেও বিতরণ প্রয়োজনীয় এবং তাহাই আত্মার স্বভাব। আমি জগৎ হইতে কেবল গ্রহণ করিব, কিন্তু কিছু দিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না—এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেও পারি না। তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, কারণ এই স্বাভাবিক কার্য্যে বাধা দিবার শক্তি ও অধিকার আমার নাই। বিতরণ আমার স্বভাব, তাই যাহা গ্রহণ করিব, তাহাইত দিতে সক্ষম হইব। যাহা গ্রহণ করি নাই, তাহা কিরূপে দিব? এই স্থানেই সমস্ত জগতের সহিত,—সমস্ত মানবমণ্ডলীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ এবং এই স্থানেই নিজের উন্নতির সহিত অপরের উন্নতি গ্রথিত। আমি যদি কল্যাণকর পদার্থ গ্রহণ করি, আমা দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না। আর যদি নিজে অকল্যাণকর পদার্থ গ্রহণ করি, নিশ্চয় অপরের অমঙ্গল সাধন করিব। নিজের পাপে কেবল নিজেই বিনষ্ট হইব না, অপর সকলকেও বিনষ্ট করিব। সূর্য্য নির্ম্মল সলিল গ্রহণ করে বলিয়া পৃথিবীর এবং প্রাণিগণের এত মঙ্গল সাধন করিতে পারে। যদি উহা দূষিত বিষাক্ত জল গ্রহণ করিত, তবে এই কল্যাণের পরিবর্ত্তে ঘোরতর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত। যেখানে দূষিত পদার্থ নাই, সেখানেও দূষিত-বারি বর্ষণ করিয়া জগৎকে মরু তুল্য করিত। তখন পৃথিবী আর "সুজলা সুফলা" থাকিত না। তবেই দেখিতে পাই আমার জীবনের অবনতিতে কেবল যে আমার নিজেরই অবনতি তাহা নহে, সমস্ত জগতের অবনতি। যে হৃদয়ে হয়ত কত সুন্দর সদ্গুণ ফুটিতে পারিত, আমার সংস্পর্শে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কি ভয়ানক কথা! নিজে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে পারি, কিন্তু সে কুঠার যে কত প্রিয় বৃক্ষকে ছেদন করিবে তাহা কি একবার ভাবি?

তাহাদিগকে ছেদন করিবার আমার কি অধিকার আছে? যাহাদের কোনরূপ কষ্ট হইলে প্রাণে বিষম আঘাত পাই, তাহাদের জীবনের মূল আমাদের দ্বারা এরূপ আহত হইতেছে এবং হইবে ইহা জানিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তবে প্রেম কিসের? মায়া মমতা কিসের? কেবল কি নশ্বর শরীরের জন্যই মায়া? ইহারই কি এত মূল্য? অনন্ত জীবনের —অক্ষয় নিত্য জীবনের কি কোন মূল্য নাই? পৃথিবীর কোন মূল্যবান্ পদার্থের সহিত যে জীবনের মূল্যের তুলনা হয় না, এমন অমূল্য জীবন কি আমাদের নিকট এতই তুচ্ছ? তাহা হইলে কেন না জগৎ আমাদিগকে অসার বলিয়া তুচ্ছ করিবে?

শক্তি চালনা দ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। কোন এক অঙ্গ চালনা করিলে কেবল তাহারই উন্নতি ও বিকাশ হয়। যে অঙ্গের বিতরণ ক্রিয়া বন্ধ করি, ক্রমে তাহার পোষণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া আইসে এবং তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য ও বিকল হইয়া যায়। যাঁহারা উর্দ্ধবাহু হন, তাঁহাদের শুষ্ক হস্ত দেখিয়া আমরা ইহার ফল প্রত্যক্ষ করি। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, দীর্ঘকাল অন্ধকারপূর্ণ কুঠরীতে থাকিয়া অনেকে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে শক্তি অপরের জন্য ব্যয় করিব, তাহাই বৃদ্ধি পাইবে, তাহারই বিকাশ হইবে; আর যাহার চালনা করিব না, পোষণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া তাহা কার্য্যের অযোগ্য ও বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তি অপরের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যত আমরা অপরের জন্য খাটিব, ততই বিকাশ প্রাপ্ত হইব—উন্নত হইব। পরের সেবাতে আপনারই সেবা, পরের স্বার্থ সাধন করিতে যাইয়া আপনার স্বার্থ সাধনই করি। বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য নিয়ম! যে ব্যক্তি শরীরক্ষয় হইবে ভয় করিয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিবে, তাহার শরীর অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আর যে আপন শরীরক্ষয়ের ভয় না করিয়া পর-সেবাতে শরীরপাত করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারই শরীর রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। যে আপন সুখ—আপন সুবিধা অন্বেষণ করিয়া চলিবে, তাহার সব সুখ বিনষ্ট হইবে। আর যে আপনাকে ভুলিয়া অপরের জন্য জীবন বিসর্জন করিবে, তাহার জীবনই রক্ষিত ও বিকশিত হইবে—তাহার আনন্দ শান্তিই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত হইবে। এইজন্য মহাত্মা যিশু বলিয়াছেন "যে জীবন চাহিবে, সে জীবন হারাইবে, আর যে জীবন হারাইবে, সে জীবন পাইবে।" মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার এইরূপই বিধি।

গ্রহণ, ধারণ ও বিতরণ ইহার একটী ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে সকল ক্রিয়া বন্ধ হয়। ইহাদের পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং আমাদিগকে তিনটি উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। কোনটী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

বিকাশ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞানের কোনও অভাব নাই। নিজে অসম্পূর্ণ ও জীবনের বিকাশ বিষয়ে উদাসীন হইলেও কোন্ জীবন উন্নত, কোন্ জীবন কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বেশ বুঝি। বিকাশের উপায়ও আমরা জানি। জ্ঞান প্রেম পবিত্রতায় উন্নত—ধৈর্য্য, ক্ষমা, সরলতা, সহিষ্ণুতা,তেজস্বিতা, স্বাধীনতা, কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত জীবনকে কে না সম্মান করে? ইহা লাভ করিতে যে সকল সাধন প্রয়োজন, তাহাই বা আমরা কে না জানি? কিন্তু শুধু বুঝিলে বা জানিলে কি হয়? কেবল কি কোন্ খাদ্য দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, কাহার শরীর সুস্থ ও সবল ইহা জানিলেই আমার দেহ পুষ্ট, সুস্থ ও সবল হইবে? তাহা নহে। আমি যাহাতে সে সকল খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যাহার ক্ষুধা নাই—অভাব বোধ নাই—অসুস্থ বিকল দেহ বহন করিয়া কোন কষ্ট নাই, সে আহার গ্রহণ করিতে যাইবে কেন? স্বাস্থ্যলাভ করিতে যত্ন করিবে কেন? রুগ্ন বিকল দেহ লইয়া যদি কেহ আপনাকে সুখী ও সচ্ছন্দ মনে করে, তবে তাহাকে কি আমরা প্রকৃতিস্থ মনে করি? কখনই না। কিন্তু আমরাত সর্ব্বদাই রুগ্ন বিকল জীবন লইয়া সুখী আছি। তবে আমরাও কি অপ্রকৃতিস্থ নহি? আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নাই, ক্ষুধা নাই, অভাব ও কষ্ট বোধ নাই, ইহা অসম্পূর্ণ বিকল জীবনের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে। জীবনের উপযুক্ত বিকাশ যেরূপ সুস্থ অবস্থার লক্ষণ, ক্ষুধা ও অভাব বোধও সেইরূপ সুস্থাবস্থার একটী প্রধান লক্ষণ। ক্ষুধাতেই দেহ সুস্থ ও সবল হয় এবং সুস্থ ও সবল ব্যক্তিরই ক্ষুধা প্রবল। অভাববোধজনিত ব্যাকুলতাতেই আত্মার বিকাশ হয় এবং আত্মার বিকাশে আবার অভাব বোধ বৃদ্ধি হয়। এই ব্যাকুলতা হইতেই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মজীবনই প্রকৃত বিকশিত জীবন। সুতরাং এই অভাবজনিত ব্যাকুলতা বা ক্ষুধা আমাদিগের জীবনবিকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

আমরা জীবনের জন্য না ভাবিলেও এমন একজন আছেন, যিনি জীবনের জন্য সর্ব্বদা ভাবিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন। জীবনের দিকে দৃষ্টি গেলেই যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের জন্য কার্য্য করিতেছেন, জীবনের মূলে 'জীবনের জীবন' হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কাছে না যাইয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন জীবনের গঠন, জীবনের উন্নতি ও বিকাশ সাধন অসম্ভব। নিজের দুর্ব্বলতা ও উদাসীনতার জন্য নিরাশ হইবার বিষয় নাই, তিনি সর্ব্বদা সহায় আছেন। সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া সকল শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার করুণাতেই জীবন বিকাশ প্রাপ্ত

হয়—সুস্থ সবল ও সুন্দর হয়। যাঁহার করুণার ছায়ায় প্রতি মুহূর্ত্তে কত যত্নে রহিয়াছি, তিনিই জীবন পরিবর্দ্ধন ও তাহার উন্নতি সাধন করিবেন। তিনিই সকল বাধা দূর করিবেন। যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিবেন। আমরা তাঁহাতে আশা ও নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক আমাদের কাজ করিয়া যাই, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করিয়া যাই, ফলদাতা তিনি সময়ে ফল প্রদান করিবেন। তিনি আমাদের সহায় হউন। আমরা সকল ভগিনী তাঁহার করুণায় জীবন প্রাপ্ত হই; সুখী হই। তাঁহার করুণাচ্ছায়ায় ও স্নেহ-সলিলসেকে আমাদের জীবনতরু দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তিনিই জয়যুক্ত হউন।

দেবী জগন্মোহিনী।

ভারত-গৌরব স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী পতিবিয়োগের পর প্রায় ১৪ বৎসর কাল বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গত ১৮ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার সময় মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে স্বামীদেবের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর তিনি স্বামীদেবের ন্যায় বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন। পরিশেষে পৃষ্ঠদেশে এক সাংঘাতিক বিস্ফোটক হইয়া ইহাঁর প্রাণাত্যয় সংঘটন করিল। ইনি ৫টী পুত্র ও ৫টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র সেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি। মাতৃবিয়োগে সন্তানগণ এককালে পিতৃমাতৃবিয়োগ-শোকের উচ্ছ্বাসে মগ্ন হইয়াছেন। আমরা এই ঘটনায় তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া অন্তরের শোক প্রকাশ করিতেছি।

জগন্মোহিনী দেবী বালীনিবাসী ৺চন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইনি যেরূপ রূপবতী, সেইরূপ সরলা, সহৃদয়া ও সদ্‌গুণবতীও ছিলেন। ইহাঁর বয়স যখন নয় বৎসর, আঠার বৎসর বয়স্ক যুবক কেশব চন্দ্রের সহিত ইহাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। ইনি নিজের রচিত পদ্যে আপনার যে বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"বাল্যকালে হয় মনে আনন্দ কতই,—
পাতায়েছিলাম গঙ্গাজল আর সই
আতর গোলাপ আর বেগুনের ফুল।

* * * *

কুড়াতে যেতাম প্রাতে কুল আর ফুল,
দাঁড়াইয়ে হাসিতাম যথা বৃক্ষমূল।
মনসাধে খেলিতাম খেলাঘর করি,
দিতাম পুতুল-বিয়ে কত ঘটা করি।
জামাতা বধূরে লয়ে বড়ই পছন্দ,

ধূলা কাদা লয়ে খেলা এতই আনন্দ।
গুরুজনে বলিতেন কি তোদের খেলা,
নাহিক বুঝিস্ তোরা প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলা।
বাড়ীতে পূজার ঘটা অতি ধুমধাম,
কি পরিব কি খাইব এই মনস্কাম।
নব বস্ত্র অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত,
বালিকা বয়সে আমি নব-বিবাহিত।
ছাগবলি হেরি প্রাণ হত কম্পমান,
ভাবিতাম ইহাদের নিষ্ঠুর পরাণ!
অঞ্জলি দিবার সাধ বড় ছিল মনে,
ছোট বলি কেহ নাহি লইতেন সনে।
যাইত যখন সবে পুকুরের ধারে,
বলিতাম লয়ে যাও মোরে পর পারে।
আত্মীয় স্বজনে লয়ে যেত পিঠে করে,
পিসী মাসী সবে মিলে আমারে আদরে।
কুমারী ছিলাম যবে বালিকা হইয়া,
মনসুখে বেড়াতাম সঙ্গিনী লইয়া।
ফুলমধুপান করি মিলি সখীদলে,
ছিটেমাত্র পানে তৃপ্তি হেসে মরি গ'লে।
করিতাম ভক্তি পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে,
তাঁহাদের পদধূলি লইতাম শিরে।
আশীর্ব্বাদ করিতেন তাঁহারা সকলে,
'মহাদেব স্বামী তব হবে মহীতলে।
চিরসুখী হবে তুমি ভাগ্যবতী নারী,
সুলক্ষণা মূর্ত্তি দেখে চিনিতে যে পারি।'
একমনে বাল্য ব্রত করিতাম যবে,
মহাদেব স্বামী আমি পাই যেন ভবে।
পুকুরে মাছের গাঁদি লাগিয়া কিনারে,
লোক সব জড় হত তার চারি ধারে।
সরোবরতীরে গিয়া ধরি ছোট মাছ,
যাই নাক বেশী জলে থাকি তীর কাছ।
হাত চাপি ধরিবারে যাই আশা করে,
পিছলিয়া যায় মাছ জলের ভিতরে।
কভু করিতাম যাত্রা সকলে সাজিয়া,
মাতিতাম নৃত্যগীতে দ্বারে খিল দিয়া।
প্রাতে উঠি বেড়াতাম মিলে সখীদলে,
বেড়াতাম বাগানে তুলিতে ফুল ফলে।
লুকোচুরি খেলা করি মিলিয়া সকলে,
ছুটাছুটি করিতাম বুড়ী ছোঁব বলে।
আঁধি হলে হার হোত বড় দুঃখ মনে,
বুড়ি ছুঁলে জিত হত আনন্দ বদনে।
চড়িভাত করিতাম রাঁধিতে জানি না,
মনেতে হইত কত রাঁধিতে বাসনা।"

এই পদ্যগুলি জগন্মোহিনীর অন্তরের অকপট সরলভাব, আমোদপ্রিয়তা এবং হিন্দুবালিকোচিত ব্রতনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক। জগন্মোহিনী দেবী বাল্যকালে সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগ পান নাই। তাঁহার স্বামী প্রথম বয়স হইতেই যেমন ধর্ম্মানুরাগী, সেইরূপ স্ত্রী-শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। দেশহিতকর সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পত্নীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে যে ভারত-মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে পত্নীকে ছাত্রীরূপে প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং স্বতঃপরতঃ তাঁহার বিদ্যোন্নতির সহায়তা করেন। পত্নী অল্প বয়সে অনেকগুলি সন্তানের জননী এবং গৃহকার্য্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পতির বা আপনার বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে

পারেন নাই, এজন্য তিনি সততই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তথাপি তিনি সুন্দর চিটী পত্র লিখিতে এবং গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরিচারিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "প্রেম কুসুম" নামে তাঁহার রচিত একখানি কবিতা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। পতিও তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা লইয়া "স্ত্রীর প্রতি পতির উপদেশ" নামক একখানি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ১২৭৭ সালে যখন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন, তখন অনেকগুলি ইংরাজ রমণীর সহিত তাঁহার পত্নীর পত্রালাপ চলিয়াছিল। কুমারী সার্প, কুমারী কলেট, বিবী হিক্‌সন ও স্পিয়ার্স প্রভৃতি তাঁহাকে যে সকল পত্র লেখেন, তৎকালে বামাবোধিনীতে তাহা প্রকাশিত হয়। পাঠিকাগণের কৌতূহল বিনোদনার্থ তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

জগন্মোহিনী কুমারী সার্পকে যে পত্র লেখেন, তাহার উত্তরে উক্ত ইংরেজ মহিলা লেখেন :—

"ফলতঃ আপনার পত্র যে আমাকে কি পরিমাণে আহ্লাদিত করিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। পৃথিবীস্থ সকল জাতির নরনারী যে নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার সহিত যে সকলেরই এক সাধারণ সম্বন্ধ আছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রকাশের নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই যে সেই একই প্রকার হৃদয় আছে ও বাহ্য বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও সেই একই প্রকার আত্মা যে সকলের রহিয়াছে, আপনার পত্র পাঠ করিয়া এই সত্যগুলি আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। উহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের বিষয় চিন্তা করিতে আমার হৃদয় এত প্রশস্ত ও গাঢ়ভাবযুক্ত হইল। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে এক বার আমার বড় ইচ্ছা হয়, কিন্তু উহা বহু দূরে স্থিত এবং ইংলণ্ডে আমি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত, তজ্জন্য কখন যে আমি যাইতে পারিব এমন বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভারতবর্ষীয় ভগ্নীদিগের নিমিত্ত এক এক সময় আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তাঁহাদের জন্য কোন কার্য্য করিতে বড় ইচ্ছা হয়। আপনার পত্রের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিয়াছি। আপনি বিদ্যার অভাব জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনার কন্যাদিগের যাহাতে উত্তম শিক্ষা লাভ হয়, আপনি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি ! আমি অনুরোধ করি আপনি এরূপ নিরাশ হইবেন না। কারণ আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার এরূপ বোধ হইল না যে, যাহাকে আমরা অশিক্ষিত বলি উহা এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য অনুভব ও দোষ গুণ আলোচনা করিবার আপনার শক্তি আছে এবং আপনার অনেক সৎ ও গভীর চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ আপনি যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আরো জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ইংলণ্ডে যখন কোন রমণী বিবাহিত হইয়া সন্তানের মাতা হয়েন, তখন তাঁহার পক্ষে যাহাতে সেই সন্তানগণের নম্রতা, বাধ্যতা ও ভালবাসা শিক্ষা হয় এবং সৎ বিষয় সকল শিখিবার জন্য তাহাদের প্রবল প্রবৃত্তি জন্মে, সেইরূপে তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য। কারণ স্নেহময়ী জননীরাই সন্তান পালন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্রী। প্রকৃত

নম্রতা, সাবধানতা এবং প্রীতি যে কিরূপ তাহা তাঁহারাই উপদেশ, এবং বিশেষতঃ আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। অতএব আপনি যখন সেই মহাব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন, তখন এই অবনীমধ্যে কে বলিতে পারে যে, আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতেছেন না? সন্তান প্রতিপালনের গুরু কার্য্যভার যখন আপনি বহন করিতেছেন, তখন অপর কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যে আপনার আর অল্পই অবকাশ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্তান প্রতিপালন করা যে কিরূপ মহৎকার্য্য তাহা এক-বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। জননীর জীবনের দৃষ্টান্ত সন্তানের মনে এমন প্রবলরূপে কার্য্যকারী হয় যে, আমরা ইংলণ্ডে এরূপ বলিয়া থাকি, যে ব্যক্তি মহৎ ও সদ্গুণবিশিষ্ট, তাহার মাতা নিশ্চয়ই সেইরূপ কোন অসামান্য গুণবতী হইবেন। আপনার সন্তানেরা এখন শিশু রহিয়াছে, তাহারাই আবার ভবিষ্যৎ বংশের স্ত্রী ও পুরুষ হইবে এবং উহাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত আবার অন্যের জীবনের উপর প্রভাব প্রকাশ করিতে থাকিবে।"

ভারতহিতৈষিণী বিদুষী মিস কলেট লেখেন :—

"তুমি যদি এতদূরে না থাকিতে, আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতাম। তাহা হইলে কত আনন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতাম। তোমার অন্তঃপুরস্থ জীবন কিরূপ জানিতাম এবং তোমার সন্তানদিগের আকৃতি প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতাম, কিন্তু আমি গতিশক্তি-হীন, দুর্ব্বল ও দুঃখিনী এবং লেখনী চালনা ব্যতীত আর কোনও কার্য্য করিতে পারি না। অতএব আমি গৃহে বসিয়া ও লিখিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব। ভারতের, বিশেষতঃ তত্রত্য অবলাকুলের কোন প্রকারে উপকার করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র। আমি যদি তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়ে কোন সাহায্য করিতে পারি, অত্যন্ত সুখী হইব। ভারতীয় নারীগণকে প্রতিদিন অনেক প্রকার আত্মবঞ্চনা ও নিরুৎসাহজনিত কষ্ট পাইতে হয় আমি জানি, কিন্তু হে ভগিনি, ঈশ্বর তোমাকে এ প্রকার স্বামী দিয়া অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে চিরকাল পরম পিতার সাহায্য ও স্নেহলাভে নিশ্চয় আশান্বিত হইবে। * * কুমারী সার্পকে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। তাহা পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। আমি ত্বরায় বাঙ্গালা শিখিতে পারিব, আশা করিতেছি, তাহা হইলে তোমাকে তোমাদের ভাষাতেই পত্র লিখিতে পারিব। কুমারী এস্, ডি, কলেট।"

"আমার প্রিয় ভগ্নি,

আপনার স্বামীর ন্যায় উদারচেতা, সহৃদয় এবং সাধু লোকের সহিত আলাপ হওয়ায় আমি যে কত আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি এবং তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া আমি যে কিরূপ দুঃখিত হইতেছি তাহা বলিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিতেছি। তাঁহাকে পুনরায় আপনি দেখিতে পাইবেন এই চিন্তাটী আপনার কত আনন্দজনক হইবে এবং তিনি ইংরাজদিগের হৃদয়ের যেরূপ প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি কেমন উল্লসিত হইবেন! আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, তিনি আমার যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রতিক্রিয়া আমি কখনও করিতে পারিব না। * * আমি আশা করি, আপনি এই পাশ্চাত্য ও অনুরক্ত ভগ্নীকে সময় সময় মনে করিবেন। আপনারাই

মে, হিক্‌সন্।"

"আমরা কেশব বাবুর গমনে সম্পূর্ণ বিষণ্ণ হইয়াছি। কারণ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। আমার ভগ্নী এবং বন্ধুরা

তাঁহার কথা বলিবার সময় চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন এবং আমার স্বামী যখন তাঁহাকে বিদায় দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ সজল দেখিলাম। * * * আমরা ভরসা করি এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহাকে এবং আপনাকে স্মরণপথে রাখিব, নিয়ত পত্র লিখিব এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি এখানে যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিলে আপনি মহা আনন্দিত হইবেন। রবিবার দিবস মিষ্টার স্পিয়ার্স তাঁহার জন্ম উপাসনালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আপনারই

ই. স্পিয়ার্স।"

জগন্মোহিনী অতি স্বাধীনপ্রকৃতি ও অভিমানিনী ছিলেন। তাঁহার মত স্বামি-ভাগ্য কয়জন রমণীর হয়? কিন্তু স্বামী যেমন এক দিকে তেজস্বী,সম্পূর্ণ আপনার মতে স্ত্রীকে আনিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; স্ত্রীও সেইরূপ তেজস্বিনী, আপনার সংস্কার ও রুচি অনুসারে চলিতে দৃঢ়ব্রতা। এই জন্ম প্রথম অবস্থায় সময় সময় স্বামী ও স্ত্রীর মত ও রুচির সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত। স্বামী সাধারণ হিতকার্য্যে রত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ভর্ত্তার ন্যায় স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও সাংসারিক সুখ সাধনের জন্ম চেষ্টা করিতেন না, ইহাতে ভার্য্যার সময় সময় দুঃখ ও অভিমানও হইত। তিনি মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির প্রতি ঔদাস্য করেন। কিন্তু তিনি প্রেমিকা ও ভাবময়ী বলিয়া তাঁহার অভিমান স্থায়ী হইত না এবং স্বামী তাঁহার আন্তরিক ভাব ও সদ্‌গুণ সকলে বশীভূত হইয়া স্ত্রীপ্রকৃতির মধুরতাই অনুভব করিতেন এবং তাঁহার প্রতি আপনার কর্ত্তব্য সাধনে অধিক মনোযোগী হইতেন। আপনার স্ত্রী হইতেই স্ত্রীজাতির প্রতি কেশব বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং তিনি আজীবন স্ত্রীপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের মাতৃ-প্রকৃতি বলিয়া তাহার স্বাধীনতার সম্মান করিয়া গিয়াছেন।

জগন্মোহিনী প্রাচীন সংস্কারে দীক্ষিত ও স্বাধীনপ্রকৃতি হইলেও স্বামীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধিনী ছিলেন না, তাই তাঁহার গুণবান্ স্বামী আপনার ইচ্ছামতে জীবনপথে চলিতে পারিয়াছেন এবং উৎসাহ সহকারে দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য যাহা সৎ বলিয়া বুঝিতেন, তাহাতে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যখন অল্পবয়স্কা বালিকা, তখন স্বামী মাঘোৎসবে সস্ত্রীক ব্রাহ্ম-সমাজে যাইবেন বলিয়া বাটীর কর্ত্তৃপক্ষের অমতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন, স্ত্রী গৃহ ধন জন পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মীয়দিগের তাড়না গঞ্জনা সকল অগ্রাহ্য করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। সে গৃহের দ্বার তাঁহাদিগের প্রতি রুদ্ধ হইল, রমণী স্বামীর সহিত পরগৃহকে আপনার গৃহের মত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বিধবা-বিবাহে

অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সমাজসংস্কার প্রথম প্রথম স্ত্রীর অভিমত ছিল না, কিন্তু স্বামীর উদার ভাব তিনি ক্রমে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে নানা শ্রেণীর নানা বর্ণের ও নানা প্রকৃতির পরিবার সকল এক পরিবার হইয়া বাস করিতে লাগিল, তিনিও সেই পরিবারভুক্ত হইয়া স্বামীর মহোদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা ও সদ্ভাবে অপর রমণীগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি যদিও কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ এবং চিরকাল অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন, তথাপি সময় সময় অবরোধপ্রথা অগ্রাহ্য করিতেও সাহসী হইয়াছিলেন।

জগন্মোহিনী অতি ধৈর্য্যশীলা ও স্থির-প্রকৃতি ছিলেন। "সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ"—সুখ উপস্থিত হইলে তাহার সেবা করিবেক, দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক, তাঁহার জীবনে এ কথার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাণীর জননী হইয়া কোন্ সুখ সম্পদ্ তিনি ভোগ করেন নাই? মাতৃভক্তা কন্যা আপনি যেরূপ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যেরূপ অবস্থায় থাকিতেন, মাতাকেও সেইরূপ অবস্থায় রাখিতে ক্রটি করিতেন না। পতি বিদ্যমানে জগন্মোহিনী যথার্থ রাজপত্নীর ন্যায় সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু যে দিন হইতে পতিধন হারাইলেন, সেই দিন হইতে বৈরাগিণীর জীবন সচ্ছন্দচিত্তে অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে মহিলা পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"আচার্য্যদেবের সঙ্গে আচার্য্যপত্নী ক্রমে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রাত্যহিক উপাসনায় তিনি নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন। শেষ জীবনে আচার্য্যদেব তাঁহাকে বিশেষরূপে ধর্ম্ম-পথের সঙ্গিনী করিয়া লন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আচার্য্য কয়েক দিন যুগল ব্রত সাধন—যোগসাধন করিয়াছিলেন, অনেক সময়ে বিশেষ ব্রত বিধি সাধনে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। তিনি নিস্তব্ধ রজনীতে ছাদের উপর নির্জ্জনে বসিয়া একতন্ত্রিযোগে সঙ্গীত ও যোগ-ধ্যানে রত থাকিতেন। সেই সময় তিনি বিশেষ বিশেষ প্রচারক বন্ধুকে নিকটে ডাকিয়া সদ্‌গ্রন্থ শ্রবণ ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। সাংসারিক আমোদ আহ্লাদে তাঁহার স্পৃহামাত্র ছিল না, তখন সৎপ্রসঙ্গে ও উপাসনাদি যোগে ব্রাহ্মিকাদিগের সেবা করার স্পৃহা তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। * * আর্য্যনারী সমাজের উপা-সনাদি কার্য্য আচার্য্যপত্নীই চালাইতেন। মাঘোৎসবের সময় আর্য্যনারী সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য তিনিই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনায় আচার্য্যের প্রার্থনা

পাঠের পর প্রায়ই তিনি প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইত। সেই প্রার্থনা শুনিয়া প্রায় সকলে মনে বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন। মহিলাদের মন তাঁহার মধুর উপাসনা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িত। আচার্য্যের অনেকগুলি প্রার্থনা তাঁহা কর্ত্তৃক পদ্যে পরিণত হইয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।"

জগন্মোহিনীর মন অতি উচ্চ এবং হৃদয় অতি উদার ছিল। তিনি কোনও ধর্ম্মের লোককে ঘৃণা করিতেন না—এমন কি নববিধানবাদীদিগের অনেকে যে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়াছিলেন। সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মগণের মুখে ভগবৎ-নাম কীর্ত্তন তিনি অনেক সময় আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন এবং ইহাঁদের নগর-সংকীর্ত্তনের দল তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া যায় এজন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার এরূপ উদার প্রেম ও সৌজন্যে ঘোর বিপক্ষেরাও মুগ্ধ হইয়াছেন।

দেবী জগন্মোহিনী যেদিন পতিধনকে হারাইয়াছিলেন, "হায়! এমন গুণের স্বামীকে হারাইলাম" তাঁহার সেই দিনকার এই কাতর আর্ত্তনাদ আজিও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। আজি তিনি নিত্যধামে সেই হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তুকে পাইয়া কতই না আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেছেন। জগৎ-চিন্তামণি নাম করিতে করিতে তিনি ইহজীবন পরিহার করিয়াছেন, এখন সেই চিন্তামণিকে লইয়া তাঁহার জীবন অনন্তকাল সুখ শান্তি কল্যাণ ও উন্নতি লাভ করিতে থাকুক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

আর্কিমিডিস ও তাঁহার মৃত্যু।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধকালে সিসিলি দ্বীপে যখন রোমক ও কার্থেজীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর সমর চলিতেছিল, তখন সিসিলির গ্রীকগণ কার্থেজীয়দিগের পক্ষ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ আর্কিমিডস ইহাদের মধ্যে একজন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক কৌশলে রোমীয়দিগের জয়-চেষ্টা অনেকবার ব্যর্থ করিয়া দেন। এক সময় তিনি আতসী পাথরের আগুনে দূরস্থ রোমীয় জাহাজ সকল ভস্মসাৎ করেন। রোমক সৈন্যগণ সিরাকুজ নগর অধিকার করিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এই সময় আর্কি-মিডিস ঐ নগরে আপনার গৃহে বসিয়া গণিত অনুশীলনে এত গভীররূপে নিমগ্ন ছিলেন যে, নগরময় যে বিপ্লব, চিৎকার ও ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতেছিল, তাহার কিছুই তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই এবং

তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এক ভীষণমূর্ত্তি সৈনিক পুরুষ যে গৃহে তিনি অঙ্ক কসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং এক শাণিত তরবারি তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ধারণ করিল। কথিত আছে, তিনি তখন জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞাপূরণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন; সৈনিককে বলিলেন "বন্ধো! এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমার প্রমাণ শেষ হইয়া আসিয়াছে।" কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ সৈনিক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখনই তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিল, তাঁহার সে গণনা ইহ জীবনে আর পূর্ণ হইল না। রোমক সেনাপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিলেন এবং সেই গুণবান্ ব্যক্তির দেহ যত্ন সহকারে সমাধিস্থ করিলেন। উত্তরকালে সমাধির উপর একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। বাগ্মী সিসিরো তীর্থস্থান বলিয়া এই স্থান দর্শন করিতে যান, কিন্তু তাহা আগাছা ও কণ্টকে আবৃত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

আর্কিমিডিস সিসিলির অন্তর্গত সিরাকুজ নগরে খ্রীষ্টের জন্মের ২৮৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১২ খৃষ্টাব্দে হত হন। সিরাকুজের রাজা হায়ারো তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও সহায় ছিলেন। এক সময় রাজা এক স্বর্ণকারকে অনেক টাকা দিয়া আপনার জন্য এক স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করিতে দেন। স্বর্ণকার তাহা প্রস্তুত করিয়া রাজার নিকট আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিয়া রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, ইহার মধ্যে রৌপ্য মিশাল আছে। তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আর্কিমিডিসকে কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য নিরূপণ করিতে বলিলেন। পণ্ডিতবর দিবানিশি এই বিষয় চিন্তা করেন, কিন্তু সমস্যা পূরণের কোনও উপায় স্থির করিতে পারেন না। একদিন প্রকাশ্য স্নানাগারে স্নান করিতে গিয়াছেন। টব জলে পরিপূর্ণ আছে। যেমন তিনি তাহাতে নামিয়াছেন, টব উছলাইয়া জল পড়িয়া গেল। তাঁহার দিব্যজ্ঞানে তখনই এক আশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কৃত হইল—তাঁহার দেহ-পরিমিত জল টব হইতে বাহিরে পড়িয়াছে, এই জল পরিমাণ করিতে পারিলে দেহের ভার পরিমাণ করিতে পারা যাইবে,—এইরূপে প্রত্যেক বস্তু জলে ডুবাইয়া পরিমাণ করিলে তাহার প্রকৃত ওজন এবং জলমগ্ন অবস্থার ওজনের প্রভেদ বুঝা যাইবে। তবেই ত সমস্যা পূরণ হইয়াছে, সোণার প্রকৃত ওজন ও জলমগ্ন অবস্থার ওজন কখনও সমান হইবে না। সোণার মুকুট আর মিশ্র ধাতুর মুকুট এইরূপে ধরা পড়িবে। এই সকল চিন্তা বিদ্যুতের মত তাঁহার মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে মহানন্দে উন্মত্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যেমন উলঙ্গপ্রায় হইয়া স্নান করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় টব হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাজপথে গেলেন এবং

নের উচ্ছ্বাসে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইউরিকা, ইউরিকা"—আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি। লোকে এই মহাপণ্ডিতের স্বভাব জানিত, এইজন্য পাগল বলিয়া তাঁহাকে ধরিল না। তিনি উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে গিয়া ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, রাজার সন্দেহ অমূলক নহে। পরে রাজা যে পরিমাণ সোণা দিয়াছিলেন, জলমধ্যে তাহার ওজন এবং এই ভাঁজাল স্বর্ণমুকুটের ওজন করিয়া যে অনেক পার্থক্য হয়, তাহা রাজাকে দেখাইয়া দিলেন। রাজা স্বর্ণকারকে ডাকাইলে সে আপনার অপরাধ স্বীকার করিল এবং দয়া প্রার্থনা করিয়া রাজার পদতলে পড়িল।

আর্কিমিডিসের এই পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহাতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহা এই যে "কোন বস্তু দ্রব পদার্থের মধ্যে মগ্ন করিলে তাহার কতক ভার কমিয়া যায়, আর ঐ বস্তু যত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেই স্থান-পরিমিত ঐ দ্রব বস্তুর ওজন এই হৃত (কম্‌তি) ভারের সমান।"*

* That a body plunged in a fluid loses as much of its weight as is equal to the weight of an equal volume of the fluid.

জীবনের দশ নিয়ম।*

১। আজি যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না।

২। যাহা নিজে করিতে পার, তাহার জন্য অন্যকে খাটাইয়া ক্লেশ দিও না।

৩। টাকা হাতে না আসিতে তাহা ব্যয় করিও না।

৪। যে বস্তুর প্রয়োজন নাই, সস্তা বলিয়া তাহা কিনিও না, কিনিলে তোমার পক্ষে ইহা মহার্ঘ হইবে।

৫। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতে আমাদিগকে যত ক্লেশ দেয়, অহঙ্কার তদপেক্ষা অধিক।

৬। কম আহার করিলাম বলিয়া কখনও অনুতাপ করিতে হয় না।

৭। যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করি, তাহা কখনও কষ্টকর হয় না।

৮। যে সকল বিপদ ঘটে নাই, তাহার ভাবনায় আমরা কত ক্লেশ পাইয়াছি!

৯। কোনও বস্তু ধরিবার সময় তাহার যে দিক্ মসৃণ, তাহা ধর।

১০। রাগ হইলে পুনরায় কথা কহিবার পূর্ব্বে দশ গণনা কর; যদি বেশী রাগ হইয়া থাকে, ১০০ গণনা কর।

* আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বহুদর্শী জাফার্সনের এই উপদেশগুলি "জাফার্সনের দশ নিয়ম" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হেঁয়ালী।

আমরা অনেক দিন আর হেঁয়ালীর উত্তর পাই নাই বলিয়া নূতন হেঁয়ালী প্রকটনে ক্ষান্ত ছিলাম। বৎসরের শেষে আর কয়েকটী প্রকটন করিয়া এ বৎসরের মত আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিব।

আশ্বিনের হেঁয়ালীর উত্তর।

(১) বাদাম। (২) নাসিকা। (৩) ভ(অক্ষর)। (৪) কেরাণী। (৫) পাতাল।

ফাল্গুনের হেঁয়ালী।

বিবাহ হাতীর সঙ্গে একি বিড়ম্বনা,
না পারি বহিতে ভার আপনি আপনা। ১
আদি দুই বর্ণে যন্ত্র পাক করিবার,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বাসনা অপার,
ছাড়িলে প্রথম বর্ণ পীড়া গুরুতর,
কে আমি ভূতের মধ্যে বসি নিরন্তর? ২
চিনদেশ হতে আসি পড়িলাম বাঁধা
লতাপাশে; চাল উড়ে গেল একি ধাঁধাঁ—
ডিম ফুটাইতে পাখী আসি দেখা দিল,
অম্লরস-ভরা মোরে দেখে পলাইল। ৩
গলায় পা দিয়া মোরে বানাল বাতুল,
বুদ্ধিশুদ্ধি যাহা ছিল সব হলো ভুল। ৪
প্রথম দ্বিবর্ণে আমি সন্ন্যাসীর জায়া,
দ্বিতীয় দ্বিবর্ণে একেশ্বর শতকায়া,
এক বর্ণে মাতৃসম পালি জীবগণ,
তিন বর্ণে মাতৃক্রোড়ে যাদু বাছাধন। ৫

নূতন সংবাদ।

১। ছোটলাট সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জী পীড়াবশতঃ পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন।

২। কলিকাতায় গ্যাসের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক আলোক দিবার ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৩। মড়ক উপলক্ষে বোম্বাই নগরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া কয়েকটী ইউরোপীয় ও অনেকগুলি দেশীয় হতাহত হইয়াছে।

৪। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার রাজত্বকালে ২৮৫ জনকে লর্ড করিয়াছেন।

৫। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্ষুর পীড়া বশতঃ হাইকোর্টের প্রধান গবর্ণমেণ্ট উকিলের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৬। বিশ্বহিতৈষী জর্জ মুলারের বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার অনাথাশ্রম

সকলের অধিবাসিসংখ্যা ১৭০০। তাঁহার কার্য্যের সাহায্যকারীর সংখ্যা ২০০।

৭। আমাদের বড় লাট লর্ড এল্‌গিনের জননীর ৮০ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। জগদীশ্বর ইহাঁর শোকের সান্ত্বনা করুন্।

৮। গত ১৪ই ফাল্গুন যোধপুরের যুবরাজ পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

৯। পারিসে নূতন দুইখানি দৈনিক পত্র স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

১০। দিল্লীতে উর্দ্দু ভাষায় একখানি পত্রিকা বাহির হইবে, একজন উচ্চবংশীয় মহিলা ইহার সম্পাদনের ভার লইয়াছেন।

১১। রুষীয় রাজকোষের আয় ১৪ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। আর কোন রাজ্যের রাজস্ব ইহার সমতুল্য নহে।

১২। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের নৈহাটী হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত ডবল লাইন হইবে।

১৩। সেলোরা কেসিনা নাম্নী এক মার্কিন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা। চিলি ও পেরু প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ তামার খনি তাঁহারই। তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন কোটী টাকা। সমুদয় সম্পত্তির মূল্য কত, বিবেচনা কর!

১৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিবি পি, হার্ষ্ট বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য এক কোটী টাকার অধিক দান করিয়াছেন।

১৫। রুষীয় সম্রাট সৈন্যগণকে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

১৬। আফ্রিকাতে প্রতিবৎসর হস্তিদন্তের জন্য প্রায় ৬০ হাজার হস্তী নিহত হয়।

১৭। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু মিশর রাজ্যে ইহার বিপরীত। তথায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক।

১৮। এ বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী স্ত্রীলোক বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম কুমারী কমলা রত্যাং কৃষ্ণগমা। তিনি এক হিন্দু সব-জজের কন্যা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

কবিরাজি-শিক্ষা—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ সঙ্কলিত। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত এবং অধুনাতন হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসা পুস্তক সকলের রচনা ও বিষয়-সন্নিবেশ প্রণালীর অনুরূপ অভিনব প্রণালীতে লিখিত। ইহা আট খণ্ডে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য অতি বিশদ ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় দক্ষতার সহিত লিখিত। ইহাতে প্রত্যেক রোগাধিকারে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিখ্যাত বিখ্যাত পরীক্ষিত

ঔষধসমূহ, উহাদের সেবন, প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবদেহতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির ডাক্তারী ও কবিরাজী মত স্থানে স্থানে চিত্র দ্বারা বিশদ করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে পূর্ণাবয়ব করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাবলীর উপাদানসমূহের শাস্ত্রীয় নাম, দেশী চলিত নাম. লাটিন ভাষায় নাম ও গুণাদির তালিকা দিয়া গ্রন্থের উপকারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাপ্রণালী-শিক্ষার্থীদিগের এবং সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপযোগী ও আদরের বস্তু হইবে। পুস্তকখানির আয়তন হিসাবে ইহার মূল্য সুলভ করা হইয়াছে বলিতে হইবে এবং নগেন্দ্র বাবু বিস্তর গবেষণা ও বহু পরিশ্রম করিয়া অভিনব প্রণালীতে রচিত এই সুবৃহৎ চিকিৎসাগ্রন্থখানি অতি সুলভ মূল্যে প্রচার করিয়া সহজে কবিরাজি-শিক্ষার পথ প্রসারিত করিয়াছেন। এজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইতিমধ্যে গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে, ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আশা করি উৎসাহী গ্রন্থকার মহাশয় ইহার ষষ্ঠ সংস্করণে মুষ্টিযোগ অধ্যায় বিস্তৃত করিয়া এবং দ্রব্যগুণাদির এক নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে ত্রুটি করিবেন না। এই স্বাস্থ্যহীন দেশে এইরূপ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপাদেয় গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সকল গৃহে রক্ষা করা এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত।

বামারচনা।

অনন্ত বিষাদ।

(দেবী জগন্মোহিনীর বিয়োগে)

এ কি শুনি অকস্মাৎ, কঠিন কুলিশপাত
আমাদের ভগ্নপ্রাণ দুঃখী পরিবারে,
কমল-কুটীর হতে, শত যোজনের পথে
বিষাদে ব্যথিত সবে শোক-সমাচারে।
ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ, সবে বিষাদিত মন,
সকলের মুখে আজি বিষাদের রেখা ;

জননীর সম যিনি, আমাদের শিরোমণি,
আর তাঁরে এ সংসারে নাহি যাবে দেখা।
সে দিন কেশব তরে, সবে মোরা ঘরে ঘরে
কেঁদেছি কাতর প্রাণে বিষাদে বিরলে,
কোন্ অপরাধে আজ, বজ্রের উপরে বাজ
পড়িল, কাঁদাতে সবে তীব্র অশ্রুজলে ?

মিলে ভাই ভগ্নী সবে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে ক্ষুণ্ণভাবে
চল যাই দেখি আজ জননী-শ্মশান,
শোকপূর্ণ অশ্রুজলে, জননী সমাধিস্থলে
চল সবে, অশ্রুজলে ভাসাই সে স্থান।

প্রাণভরে ডাকি তাঁরে, স্মরিলে অন্তরে যাঁরে
হৃদয়ের দুঃখরাশি হয় নিবারণ,
যাঁহার আদেশক্রমে, পবিত্র স্বরগভূমে
গেছেন জননী ত্যজি সংসার-গহন।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।

বিদায়।

১

বিষাদের দিন, হায়! সদাই যে পড়ে মনে,
মনোব্যথা, অশ্রুজল প্রবাহে তাহার সনে,
নিশিদিন সেই ছবি, জাগিছে হৃদয়-মাঝে,
মরণের নাহি সাধ্য মুছাতে হৃদয়রাজে
নবীন এ প্রেম-স্মৃতি হ'তে।

২

নিকটে প্রেমের ছায়া, নেহারি নিকটতর,
দীর্ঘ অদর্শনে, প্রেম, ধরে রূপ মনোহর,
ভাষা মরে, স্মৃতি জাগে, মরণ-ভীষণ-শরে
ঊর্দ্ধশির, পড়ে লুটাইয়া, যাতনার ভরে
সুশীতল বিভু-পদ-প্রান্তে।

৩

হে মাতঃ বসুধে! তব অভাগিনী তনয়ার
কেহ নাহি এ জগতে আপনার বলিবার;
সুকোমল ক্রোড়ে তব, লভিব বিরাম সুখে;
ব্যথা পেলে, শ্রান্ত হলে, লুকাব মা তোরি
বুকে—
তুই মোর জীবন-আধার।

৪

শূন্য গৃহ, শূন্য হৃদি, জগত এ মরুময়,
একের অভাবে সব 'শূন্য শূন্য' নিরথয়,
দয়াময়! বিধান তোমার, বুঝে সাধ্য কার,
তুমি বিনা কেবা পারে, লাঘবিতে হৃদি-
ভার,
তুমি মাত্র ভরসা আমার।

৫

নীরব বসুধা যবে, রজনীর স্তব্ধ বুকে,
নিরমল শিশুপ্রায়, ঘুমায় মনের সুখে,
স্বপনেরা, ক্ষণেকের তরে, শ্রান্ত আঁখিতলে
কি মধুর ছবি আঁকে, ভুলায় কতই ছলে,
তৃষিত এ তাপিত পরাণ।

৬

আধেক ঘুমের ঘোরে, আধেক স্বপনে
ভুলি,
ফিরে পাই আগেকার সুখের সে দিনগুলি।
পিপাসু প্রেমের দৃষ্টি শুনিবারে সে মধুর
ভাষা,
আকুলিত প্রাণে মোর, জাগায় নূতন আশা,
অতীতেরে ভাবি বর্ত্তমান।

৭

প্রেম-ডোরে বাঁধা, সে যে দূরে যাইবার নয়,
অন্তরের নিধি মোর, অন্তরে লুকান রয়;
আমি যদি দূর ভাবি, তবেই সে দূরে যায়,
নয়নে অদৃশ্য,—কিন্তু, অন্তর দর্শন পায়,
প্রেম-বক্ষে অমর আত্মার।

৮

বর্ষ দুই হ'ল, সেই তনু লয়েছে বিদায়,
প্রেমের কলিকা তিন, রেখে গেছে এ ধরায়.
কালেতে তাহারা যেন, গোলাপ কুসুম সম,
বিতরে সৌরভ, বিকাশি লাবণ্য অনুপম,
ঘুচায় সকল হৃদি-ভার।

৯

শূন্য হৃদি?—না, না, সে যে পূর্ণ এবে পরব্রহ্ম জ্ঞানে,
ভবের অসার সুখে মন শান্তি নাহি মানে।
তরুবর গেছে দেব-লোকে, দিব্য রূপ ধরি,
ফেলে গেছে ছিন্ন লতিকারে, ধূলায় ধুসরি
জড়াইতে ব্রহ্মতরু-শাখে।

১০

ভুলিয়া অসার কথা, সাধু-অমরাত্মা সনে
থাকি যেন মগ্ন সদা পরব্রহ্ম-যোগ ধ্যানে;
পথ বলে দিয়ে গেছ, কিসের ভাবনা তবে?
ঠিক্ পথে চলি যদি, মিলন হবেই হবে—
সাধ্য কার, মোরে দূরে রাখে?

শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত, চুঁচড়া।

সরোজিনীর খুকী।

(জন্ম ৭ই মাঘ—মৃত্যু, ৩০এ মাঘ, ১৩০২)

১

কেন বিধি এমন পাষাণ?
মানব মানবীগণে কেন দহে হুতাশনে
করুণা-মমতা-হীন দেবতার প্রাণ!
আশায় নিরাশা-মাখা স্নেহ হতাশ্বাসে ঢাকা,
আনন্দে বিষাদ মেলা,—বিচিত্র বিধান!
এমন কঠিন কেন দেবতার প্রাণ?

২

অফুটন্ত সে কলিকা, (শরতের সেফালিকা)
ভাল করে সোণামুখে না ফুটিতে হাসি,
কেন রে পড়িল ঝরি? কেরে রাহু বেশ ধরি
প্রতিপদে এ চন্দ্রমা ফেলিল গরাসি?

৩

কত সাধ, কত আশা ছিল মোর মনে;
একটী পলকে হায়! শেষ হ'ল সমুদায়,
একটী নিঃশ্বাস ভেদ জীবনে মরণে!
এই ছিল ইহলোকে, এই কাঁদাইয়া শোকে
চলে গেল পরলোকে বুঝি না কেমনে!
জীবনে মরণে খেলা প্রভাত সায়াহ্ন বেলা
সময়াসময় নাই,—দয়া নাই মনে।

৪

যখন প্রথম মেয়ে দেখিল ভূতল,
নিরানন্দ সমুদয়, কত ভবিষ্যৎ ভয়,
কত যেন হতাশ্বাস, কত অশ্রুজল,
কত ঘৃণা, কত ছি ছি করে সবে মিছামিছি
একটু আহ্লাদ নাই,—বিষাদ কেবল!
দেখিয়া সোণার খুকী কেহই হলনা সুখী,
সবাই ভাবিল মেয়ে মহা অমঙ্গল!
তাতেই চরণে ঠেলি গেল সে সকলে ফেলি,
দারুণ মানিনী মেয়ে,—জলন্ত অনল!

সবারি ঘুচিল ভার, চিন্তা দূর সবাকার,
মায়ের পরাণভরা শ্মশান কেবল!
তারি শুধু সর্ব্বনাশ, তারি শুধু হতাশ্বাস,
আমরণ তারি শুধু নয়নের জল!

৫

কোথা সুরপুর?—
কই সে নন্দনবন, সুশীতল সমীরণ,
কোথা শান্তি-নিকেতন অনন্ত মধুর?
কোথায় অমরাবতী মন্দাকিনী স্রোতস্বতী,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুধামাখা সুর?
হায় সে একাকী মেয়ে কোন্ পথে গেল ধেয়ে?
আহা! সে অজানা দেশ কোথা?—কত দূর?

৬

আর কি হবে না দেখা আহা! তার সনে?
জলন্ত উল্কার মত বেড়াইব অবিরত
খুঁজিয়া সে বালিকায় ভূতলে গগনে!
দীনা কাঙ্গালিনী বেশে বেড়াইব দেশে দেশে,
দেখিব আমার খুকী গেল কোন্ খানে।
তুলিয়া করুণ তান গাইয়া খেদের গান
করিব করুণা ভিক্ষা সবার চরণে,
আমার সোণার মেয়ে দেয় কিনা দেখাইয়ে
কোন্ পথে গিয়াছে সে,—রয়েছে কেমনে।
কার বুকে শুয়ে থাকে, "মা" বলে কাহারে ডাকে,
ঘুচায় পিপাসা তার কার স্তন পানে?

৭

ডাকিয়া নিয়াছে বিধি বালিকা আমার,
সবারি মনের ভয়— দূর হ'ল সমুদয়
তাহার কারণে কারো খেদ নাই আর।
যার মেয়ে সে নিয়াছে সকলেই বাঁচিয়াছে,
খুঁজিতে হবে না "বর" এ জগতে তার।
স্বরগে বিবাহ হবে, দেবদেশে সুখে রবে,
পাইবে স্বর্গের শিক্ষা সুর-অঙ্গনার!
'অনূঢ়া কুমারী মেয়ে কাঁদিবে না বর চেয়ে'
ভাবিয়া হবে না কারো হৃদয় অঙ্গার!
সবারি ভাবনা ভয় দূর হ'ল সমুদয়,
স্বরগের খুকী গেছে স্বরগে আবার!
একটী মাসের তরে এসেছিল এ সংসারে
কেবল বুঝিতে স্নেহ মমতা সবার!
যাক্ মেয়ে দেবদেশে দেব-বালিকার বেশে,
আমিও যাইব ত্বরা নিকটে তাহার—
না হয় না হ'ল ভবে, সেইখানে দেখা হবে,
অবসান হবে সব জ্বালা যন্ত্রণার,
ঘুচিবে জন্মের মত এই হাহাকার।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
ময়মনসিংহ।

শেষ নিবেদন।

এই নিবেদন বিভো! শেষ-নিবেদন,
নেবে যদি ভগবান্,
মম এ অধম প্রাণ,
নেও তারে প্রেম বাহু করি প্রসারণ,
দেখাইয়ে তারে তব মূরতি মোহন।
মরিব তোমারি নামে ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
ছাড়িয়া তোমারি ধরা
যাব সে অমৃত-ভরা,

সেই তব দেব-দেশ—যথা শোকভয়
না করেহে বিচরণ—সদা সুখময়।
এই নিবেদন বিভো শেষ নিবেদন,
যেন হে আমার তরে
কেহ শোক নাহি করে,
ঐহিকের সুখ আর জীবন চাহে না,
লভি মৃত্যু আলিঙ্গন,
সুখে করিব গমন,—
অমৃতে—অমৃতে পূর্ণ সে দেব-সদন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।
এ সংসারে সুখ দুঃখে,
যাঁহারে ধরি এ বক্ষে,
কৃতার্থ মেনেছি, আজ সেই প্রিয়ধন
রাখিবে হে সযতনে,
সে মুখ হেরি নয়নে,
সুখেতে লভিব মম অন্তিম শয়ন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন,
তব নাম স্মরি হরি!
ভব ধাম পরিহরি,
সুখেতে লভিব চির-শান্তি-নিকেতন।
তোমারি অমৃত-বুকে
ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালি সুখে
ঘুমাব অনন্ত কাল অনন্ত জীবন,
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

No. 399. April, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৯ সংখ্যা। চৈত্র ১৩০৪ – এপ্রেল, ১৮৯৮ ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-পরীক্ষক—লক্ষ্ণৌ আড্‌বোকেট লন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য ীক্ষায় (এফ এর তুল্য) বিবী জেনিংস ীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে া এক নূতন দৃষ্টান্ত, ইহা দ্বারা শুভ-লের আশা করা যায়।

জেনানা হাঁসপাতাল—লেডি ডফরিণ নানা হাঁসপাতালের জন্য ইতিমধ্যে য় দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সিমবাজারের বাবু আশুতোষ নাথ রায় ০০,০০০ এক লক্ষ টাকা, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী(২য় বার) ৮০০০ টাকা, গিধোড়ের রাজা ২০০০ টাকা এবং কুমার ক্ষণেশ্বর মালিয়া ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

কাউন্টেস ডফারিণ ফণ্ড—গত ২২শে র্চ টাউনহলে ইহার ত্রয়োদশ বার্ষিক ধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক গণ্য মান্য লোক সভাস্থ হন এবং স্বয়ং রাজপ্রতি-নিধি সভাপতির কার্য্য করেন। বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত যে এই ফণ্ডের অধীনস্থ হাঁসপাতাল সকলে অধিবাসী রোগীর সংখ্যা ১৮৯৬ সালে প্রায় ৩০ হাজার ছিল, ১৮৯৭ সালে ৩৩ হাজার হইয়াছে এবং বহিরাগত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ স্থানে ১৩৷৷ লক্ষ হইয়াছে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষ অপেক্ষা দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে রোগীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে, ইহার কারণ অনু-সন্ধেয়। এই ফণ্ডের অধীনে এখন ৩৩টী ১ম শ্রেণীর লেডী ডাক্তার, ৭০ জন আসিটাণ্ট সার্জন এবং ১১৭জন হাঁসপাতাল আসিষ্টাণ্ট আছেন। লেডী ডফরিণের পর লেডী লান্সডাউন ও তৎপরে লেডী এলগিন লেডী-প্রেসিডেণ্ট হইয়া ফণ্ডের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

সেই তব দেব-দেশ—যথা শোকভয়
না করেহে বিচরণ—সদা সুখময়।
এই নিবেদন বিভো শেষ নিবেদন,
যেন হে আমার তরে
কেহ শোক নাহি করে,
ঐহিকের সুখ আর জীবন চাহে না,
লভি মৃত্যু আলিঙ্গন,
সুখে করিব গমন,—
অমৃতে—অমৃতে পূর্ণ সে দেব-সদন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।
এ সংসারে সুখ দুঃখে,
যাঁহারে ধরি এ বক্ষে,
কৃতার্থ মেনেছি, আজ সেই প্রিয়ধন
রাখিবে হে সযতনে,
সে মুখ হেরি নয়নে,
সুখেতে লভিব মম অন্তিম শয়ন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন,
তব নাম স্মরি হরি!
ভব ধাম পরিহরি,
সুখেতে লভিব চির-শান্তি-নিকেতন।
তোমারি অমৃত-বুকে
ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালি সুখে
ঘুমাব অনন্ত কাল অনন্ত জীবন,
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

No. 399. April, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৯ সংখ্যা। | চৈত্র ১৩০৪ – এপ্রেল, ১৮৯৮ | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-পরীক্ষক—লক্ষ্ণৌ আড্‌বোকেট বলেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য পরীক্ষায় (এফ এর তুল্য) বিবী জেনিংস পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে ইহা এক নূতন দৃষ্টান্ত, ইহা দ্বারা শুভ-ফলের আশা করা যায়।

জেনানা হাঁসপাতাল—লেডি ডফরিণ জেনানা হাঁসপাতালের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কাসিমবাজারের বাবু আশুতোষ নাথ রায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (২য় বার) ৮০০০ টাকা, গিধোড়ের মহারাজা ২০০০ টাকা এবং কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ড—গত ২২শে মার্চ টাউনহলে ইহার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক গণ্য মান্য লোক সভাস্থ হন এবং স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করেন। বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত যে এই ফণ্ডের অধীনস্থ হাঁসপাতাল সকলে অধিবাসী রোগীর সংখ্যা ১৮৯৬ সালে প্রায় ৩০ হাজার ছিল, ১৮৯৭ সালে ৩৩ হাজার হইয়াছে এবং বহিরাগত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ স্থানে ১৩॥ লক্ষ হইয়াছে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষ অপেক্ষা দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে রোগীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধেয়। এই ফণ্ডের অধীনে এখন ৩৩টী ১ম শ্রেণীর লেডী ডাক্তার, ৭০ জন আসিটাণ্ট সার্জন এবং ১১৭জন হাঁসপাতাল আসিষ্টাণ্ট আছেন। লেডী ডফরিণের পর লেডী লান্সডাউন ও তৎপরে লেডী এলগিন লেডী-প্রেসিডেণ্ট হইয়া ফণ্ডের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

ভারত বিজ্ঞান-সভা—গত ২১শে মার্চ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের স্থাপিত বিজ্ঞানসভার বার্ষিক অধিবেশনে ছোট লাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী সভাপতিত্ব করেন। তিনি দেশীয়দিগের বিজ্ঞান চর্চ্চার বন্ধু বলিয়া আপনার পরিচয় দেন এবং সভার ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করেন।

স্ত্রী-সৈন্য—আমেরিকার আট্‌লাণ্টা, জর্জিয়া, ডুবার এবং কলরেডো প্রদেশে কেবল রমণীদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের অধ্যক্ষ ইহাদের শিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া বলিয়াছেন "যে সকল অস্ত্র ইহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার ইহারা করিবে এবং ইহাদের জন্য যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সুফল জগৎকে দেখাইবে।" প্রাচীনকাল হইতে বীরাঙ্গনার কীর্ত্তি জগতে বিদিত, সমরকৌশল-শিক্ষিতা নারীদিগের অভাব বর্ত্তমান কালেই বা কেন হইবে? তবে ইহাঁরা জগতের কি মঙ্গল সাধন করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

ফুলে রঙ্গ করা—জলের সহিত এনিলাইন রঙ মিশাইয়া তাহাতে ফুলের বোঁটা ডুবাইলে ফুলে নানা বর্ণ উৎপন্ন হয়। দুই প্রকার রঙ একত্র মিশ্রিত করিলে ফুলে চিত্র বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হয়।

বিলাতে দেশী রন্ধনশালা—পুনার প্রসিদ্ধ সোরাবজীর ভগিনী লঙ্গরাথা লণ্ডন নগরে এক বাবুর্চ্চিখানা খুলিয়া দেশীয় সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জনে ইংরাজ-রসনা বেশ তৃপ্ত করিতেছেন এবং অর্থোপার্জ্জনেরও এক পথ পাইয়াছেন।

মুসলমান বালিকাবিদ্যালয়—গত ২৩শে মার্চ রবিন্‌সন ষ্ট্রীট ১নং ভবনে এই বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চিফ-জষ্টিস-পত্নী লেডী ম্যাক্লিন স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সার জন উডবরন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন। এক বৎসরে ৪৬টী বালিকা ভরতি হইয়াছে এবং মুরসিদাবাদের নবাব বেগমের বদান্যতায় ইহার অর্থাভাব নাই। মুসলমান বালিকাদের জন্য কলিকাতায় এই একমাত্র বিদ্যালয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

দোষের পরীক্ষা।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যেরূপ দৈব উপায়ে দোষীর দোষ সাব্যস্ত হইত, ইউরোপের অন্ধকার-যুগে অনেকটা সেইরূপ হইত। এ বিচার যদিও মনুষ্যদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যাজকগণ নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ

ও ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতেন, সেইজন্য ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিচার বলিয়া অভিহিত হইত এবং লোকেও তাহাই বিশ্বাস করিত। দোষী বলিয়া যাহার উপর সন্দেহ হইত, বস্ত্রে চক্ষু বন্ধনপূর্ব্বক লাঙ্গলের তপ্ত ফালের উপর তাহাকে দাঁড়াইতে হইত। কখনও আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে হইত। কখনও জ্বলন্ত লৌহদণ্ড হস্তে ধারণ করিতে হইত, কখনও তপ্ত জলের মধ্যে সমুদয় হস্ত ডুবাইয়া ধরিতে হইত। এই সকল অগ্নি-পরীক্ষা। এ দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অগ্নি স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী দেবতা, দোষী তাহার স্পর্শে দগ্ধ হয়, কিন্তু নির্দ্দোষী নিরাপদে অব্যাহতি পায়। ইউরোপের লোকে অগ্নিকে সেরূপ চক্ষুতে না দেখিলেও মন্ত্রপূত অগ্নি দ্বারা দোষ ধরা পড়ে বিশ্বাস করিত। অগ্নি দ্বারা যাহার দেহ ক্ষত হইত সে দোষী, যাহার দেহ অক্ষত থাকিত, সেই নির্দ্দোষী। অগ্নির প্রভাব থর্ব্ব করিবার জন্য নানা প্রকার যাদুবিদ্যা এবং মন্ত্র তন্ত্র ও কল কৌশলও অবলম্বিত হইত, তাহা দ্বারা কত দোষীও নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইয়া যাইত।

অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পরীক্ষা ছিল। অভিযোগকারী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিত। বলবান্ লোক দুই পক্ষেরই প্রতিনিধি হইতে পারিত; যুদ্ধে যে পক্ষের জয় হইত, সেই নির্দ্দোষী এবং যে পক্ষের পরাজয় হইত সেই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। মধ্য যুগের ইউরোপীয়েরা ডাইনে বিশ্বাস করিতেন। যে স্ত্রীলোককে ডাইন বলিয়া সন্দেহ হইত তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলে যদি সে ডুবিয়া মরিত, তবে নির্দ্দোষী; যদি সাঁতার দিতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃত ডাইন বলিয়া প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইত। উভয় স্থলেই মৃত্যু ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। ডাইনকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিবার পদ্ধতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

কোনও বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে তাহারও দৈব বিচার হইত। একটী ক্রুসকাষ্ঠ পুতিয়া তাহার সম্মুখে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় বা তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তির ন্যায় বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইতে হইত। যাহার বাহু অগ্রে ভারাক্রান্ত হইয়া অবনত হইত, সেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত এবং মোক-দ্দমা হারিত। এক সময়ে এক মঠের স্বত্ব লইয়া পারিসের ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং সেণ্ট ডেনিসের সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিবাদ হয়। বিচারক কোন প্রকারে তাঁহাদের বিবাদের মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্রুসের বিচার অবলম্বন করেন। বাদী প্রতিবাদী আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক ব্যক্তিকে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুই ব্যক্তি ক্রুস-কাষ্ঠে যীশুর ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল। চারি দিকে বহু লোক সমবেত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি

এক পক্ষের—কতকগুলি অন্য পক্ষের জয় কামনা করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান রহিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতিনিধির বাহু অগ্রে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেল, ইহাতেই ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরাজয় হইল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থির ছিল না। পিতার সন্তানেরা অনেক স্থলে পিতার বিষয় সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইত,কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে কোনও সন্তান পুত্রাদি রাখিয়া মরিয়া গেলে এই পুত্রাদির স্বত্ব লইয়া গোলযোগ হইত। এক সময় এইরূপ এক বিবাদ মীমাংসারজন্য এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যবস্থা হইল। পিতৃহীন পৌত্রদিগের পক্ষীয় যোদ্ধা জয় লাভ করিল। সেই সময় হইতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইল যে, পিতৃহীন সন্তানেরা খুড়া জেঠাদিগের সহিত পৈতৃক বিষয়ের সমাধিকারী হইবে। একাদশ শতাব্দীতে দুইটী উপাসনা-পদ্ধতির কোন্‌টী অবলম্বনীয় ইহা লইয়া বিবাদ হয়। তখনি দুই পক্ষের দুই বীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সুসজ্জিত হইলেন এবং যে পদ্ধতির পক্ষীয় বীর জয়ী হইলেন, তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইল। কোনও ভূমির সীমা লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে জজের আজ্ঞানুসারে সীমানার এক চাপড়া মাটী আদালতে আনা হইত। পরে জজের আদেশে দুই পক্ষ ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্ব স্ব তরবারীর অগ্রভাগ দ্বারা সেই মাটী স্পর্শ করিত। অতঃপর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইত।

চোর ধরিবার অপূর্ব্ব উপায় ছিল। চুরি অপরাধে অপরাধী বলিয়া যাহার উপর সন্দেহ হইত, তাহাকে যারলীর প্রস্তুত রুটী গিলিয়া ফেলিতে বলা হইত। সে যদি গিলিতে পারিত, তবে নির্দ্দোষী, নতুবা দোষী সপ্রমাণ হইত। রুটির সহিত খানিকটা পণির দিয়া এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। এই রুটী পবিত্র রুটী এবং পণির পবিত্র পণির নামে উক্ত হইত। এই রুটী ও পণিরের উপর সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যবের পাঁযরুটী বিনা তাড়িতে প্রস্তুত হইত এবং যে দুগ্ধে পণির হইত, তাহা মে মাসে ভেড়ীর স্তন হইতে দোহন করিয়া সংগ্রহ করা হইত। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এইরূপ এক পরীক্ষায় রুটী গিলিতে না পারিয়া সুপ্রসিদ্ধ গডউইনের মৃত্যু হয়। এই প্রথা হইতে "এই রুটী যেন আমার কণ্ঠরোধ করে" ইংরাজীতে ইহা একটী প্রবচনরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সাধনা।

১

কে জানে এ কিসের সাধনা
সাধিতেছি জনম ভরিয়া,

চুম্বক উত্তর-মুখে, চেয়ে থাকে কোন্ সুখে,
সূর্য্যমুখী রহে কেন
তপনে চাহিয়া ?

২

দিবা যায় নিশা আসে ফিরে,
আসে যায় মাস তিথি বার,
বিশ্বে আসে সেই প্রীতি, প্রাণে জাগে সেই স্মৃতি,
আমারি সে দিন শুধু
আসে না আবার!

৩

বসি সেই তরুর শাখায়
বিহগেরা গায় কত গান,
সেইতো সায়াহ্ন-রবি, তেমনি রক্তিম ছবি,
ডুবায় সাগর-তলে
সোণার বয়ান!

৪

তেমনি হাসিয়া আসে শশী,
সাথে শত তারা সহচরী;
সেই বেলী যুঁই ফোটে, দক্ষিণ-অনিল ছোটে,
বসন্ত উছলে সেই
মোহন মাধুরী!

৫

তেমনি আনন্দরাশি মাখা,
প্রকৃতির সাধের আগার;
সেই কপোতাক্ষী-কূলে, ঢেউগুলি ঢুলে ঢুলে,
মৃদুল-সমীর-ভরে
চুমে দুই ধার।

৬

শুধু সেই আসে না মিশিতে,
জগতের আনন্দ শোভায়;
তারি পানে চেয়ে পাখী, হরষে উঠে না ডাকি,
মলয় বাতাস আজি
লাগে না সে গা'য়।

৭

শুধু সেই আসে না হাসিতে,
মরতে যে "মৃত সঞ্জীবনী"—
তাতেই সকলি শূন্য, সারা বিশ্ব অসম্পূর্ণ,
আলোক, উদ্যমহীন
যেন রে অবনী!

৮

তাই আমি ভাবি মনে মনে,
সে কেন এ অশরীরী প্রায়?—
কোথায় কেমনে রহে, একটী কথা না কহে,
মনে ভেসে উঠে শুধু
নব জ্যোছনায়?

৯

এত ডাকি, এত সাধি, তবু
শুনে না সে, এমনি নিদয়,
মহত্ব—দেবত্ব, আর, কত কি যে আছে তার।
তবে কি বিধাতা তার
গড়েনি হৃদয়?—

১০

—না না সে হৃদয়-হীন নহে
জানি আমি, খুলিয়া বলিব;
ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে, মানসে লুকায়ে সেবে,
আমি কেন দেবতারে
বাহিরে দেখিব?

১১

এ ধরা যে ধূলা মাটী ভরা,
হেথা বহে কলুষ বাতাস,
এখানে অমর মূর্ত্তি, পারে কি পাইতে স্ফূর্ত্তি,
নিত্য হেথা স্বার্থ, দ্বেষ,
বিষাদ, হতাশ!

১২

কে পাষাণ, চাহে ফুটাইতে
মরুদেশে স্বরগ-মন্দার ?
লেগে সে তপত বায়, কুসুম শুকায়ে যায়,
থাকে না পবিত্র ছটা
ত্রিদিব-শোভার !

১৩

তবে,
দেবতা কি প্রাপ্য নয়নের?
তা হ'লে "দেবত্ব" আর কই ?—
মোর সে পরমারাধ্য, ইন্দ্রিয়ার্থে নহে সাধ্য,*
হয় না সে দেব-পূজা
মনে মনে বই !

১৪

এমনি মরত-তলে তারে
পূজি যেন জনমে জনমে ;
যদি সে মানুষ হয়, মর ব্যবহার লয়,
তা হ'লে যে ম'রে যাব
দারুণ সরমে।

১৫

অকলঙ্ক চন্দ্রমার মত,
বিরাজে সে সুদূর আকাশে,
আমি চকোরের মত, এ ভূতলে অনাহত।—
পোহাই তাহারি আলো
মনের উল্লাসে !

১৬

অপূর্ণ ও অশান্ত মানব,
শুদ্ধ-সত্ব, সম্পূর্ণ দেবতা ;
সেই পদ করি ধ্যান, দুর্ব্বল, চঞ্চল প্রাণ,
দেব-বলে বলী হবে,
নাহিক অন্যথা ;
বিভুর আশীষে তবে, এ তপস্যা পূর্ণ হবে,
মুছি যাবে মরমের
লুকানো হীনতা !
তখন এ ক্ষুদ্র হিয়া, বিশ্বে দিব মিশাইয়া,
পাব অনাসক্তা ভক্তি, পাব পবিত্রতা,
পাব সে নির্ব্বাণ মুক্তি, আর অমরতা।†

বঙ্গমহিলা।

অর্থই অনর্থের মূল।

১

অর্থ স্বর্গ সুধার ন্যায় সঞ্জীবনী শক্তিতে নির্জীব জগতের সজীবতা সম্পাদন করে, অনাথ অনাথার নয়নাশ্রু বিমোচন করিয়া হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত চির-সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করে ; আবার বিষম হলাহল স্রোতে জগৎকে জর্জ্জরিত করে, পরম আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, সোদর সোদরার সস্নেহ মূর্ত্তি বিষময় করিয়া তুলে।

মাধবনগরনিবাসী গৌরীশ-চন্দ্রের পিতা

---

*সাধ্য—সাধনীয়।

† এই কবিতাটি আমার ব্রহ্মচারিণী ভগিনীদিগের হস্তে প্রীতি উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

লেখিকা।

স্বার্থবুদ্ধি হরিভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি কয়েক বিঘা জমি ও তৈজস পত্রাদি আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় সহোদর জয়হরিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। জয়হরি ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জ্ঞান করিয়া প্রথমে সস্ত্রীক গ্রামস্থ এক ধনীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন; পরে উক্ত ধনী মহোদয়ের অর্থসাহায্যে ও স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে পৈতৃক বাস্তর এক অংশে সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়া যৎসামান্য বাণিজ্যের উপস্বত্বে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

হরিভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া মনে করিয়াছিল, সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে; কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি বিমুখ, সে অচিরেই পীড়াক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। পৈতৃক সম্পত্তির যে আয় ছিল, তাহাতে সাংসারিক ব্যয় সংকুলান ও পীড়ার চিকিৎসা এতদুভয় হওয়া অসম্ভব, সুতরাং উহা প্রথমে বন্ধক দেওয়া হইল, পরে বিক্রীত হইয়া গেল। তৈজস পত্রাদি যাহা কিছু ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে বিক্রীত হইতে লাগিল। হরিভূষণের কষ্টের অবধি রহিল না। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা স্ত্রী পুত্র সহিত অনশনে দিন কাটিত। জয়হরি ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু হরিভূষণ যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। জয়হরি ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া ভ্রাতার দুর্গতি-হরণার্থ ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত ঔষধ পথ্য না পাওয়াতে হরিভূষণের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। পত্নী ও একমাত্র অপগণ্ড পুত্রকে দুঃখ দারিদ্র্যে নিমগ্ন করিয়া হরিভূষণ ইহলোক ত্যাগ করিল। হরিভূষণপত্নী নিঃস্ব—তাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই, কিন্তু তাহাতেও সে তত দুঃখিত নয়—তাহার ভয়, পাছে স্বীয় দেবরের নিকট নীচতা স্বীকার করিতে হয়, পাছে তাহার অন্ন জল গ্রহণ করিতে হয়। সন্তান সমস্ত দিন উপবাস করিত, তবুও সে জয়হরি-প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী খাইত না বা গৌরীশকে খাইতে দিত না। এক দিন মাতার অমতে গৌরীশ জয়হরি-প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মাতার নিকট এরূপ প্রহারিত হয় যে, অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহার পর সে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বরং আম্র বা পেয়ারার পত্র চর্ব্বণ করিত, তবুও খুল্লতাত-প্রদত্ত কোন খাদ্য দিলে স্পর্শও করিত না।

২

গৌরীশের মাতা বড়ই কলহপ্রিয়া ও দাম্ভিকা, এই হেতু কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না। কিন্তু নিরাশ্রয় বিধবা ও বালকের গ্রাসাচ্ছাদন কষ্ট দূর করণাভিপ্রায়ে জয়হরির আশ্রয়দাতা মহাত্মা বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়ের স্ত্রী গৌরীর মাকে আপনার বাটীতে পাচিকা রাখিবার

প্রস্তাব করেন। গৌরীর মা ইহাতে অগ্নি অবতার হইয়া বৈদ্যনাথ বাবুর বাটীতে আসিয়া "আমি কি বুনিয়াদী ঘরের মেয়ে নই? আমার স্বামী কি হাভেতে লক্ষীছাড়া ছিল, তাই আমি রাঁধুনী থাকিব" এই বলিয়া তুমুল কন্দল আরম্ভ করিল। বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী স্বভাবসুলভ মিষ্ট ও নম্র বাক্যে কহিলেন,—"দিদি! তুমি রাগ করিও না। তোমাকে রাঁধুনী থাকিতে কে বলিতে পারে? তবে কি জান—আমার শরীর বড় অসুস্থ, তাহাতে অরুচি। তোমার রন্ধন বড়ই চমৎকার, একবার মুখে দিলে আর ভুলিতে পারা যায় না, তাই বলিতেছিলাম যদি দয়া করে দুই এক দিন রসুই করিয়া দেও, তবে বড় উপকার হয়।"

গৌরীর মা ভাল পাক করে বা সে বেশ শিল্প কার্য্য জানে, এ কথা বলিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে বলিল, তাই বল না কেন, আমার রান্নার যে না সুখ্যাতি করে, সে মানুষই নয়। আচ্ছা, কাল থেকে যতদিন না তোমার অসুখ সারিবে, আমি পাক করিয়া দিব।

একদিন দুদিন এক মাস দু মাস করিয়া এক বৎসর গৌরীর মা বৈদ্যনাথ বাবুর বাটীতে রন্ধন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী অতি সহিষ্ণু ও মিষ্টভাষিণী, তাই তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন। গৌরীর মাও বিলক্ষণ সুবিধা বুঝিয়া—পরোপকার-ব্যপদেশে সপুত্রে নির্ব্বিঘ্নে বৈদ্যনাথ বাবুর অন্নে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু গৌরীর মা এ সুবিধা বেশী দিন ভোগ করিতে পারিল না। অসময়ে বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী গতাসু হইলেন। গৌরীর মারও অন্ন উঠিল। বাবুর বাটীর আর কাহারও সহিত তাহার বনিবনাও হইল না। কেবল দুবেলা ঝগড়া বচসা গালাগালি হয় দেখিয়া বৈদ্যনাথ বাবু গৌরীর মাকে বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে সংস্কার না হওয়াতে গৌরীর মার গৃহখানির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। চালে খড় না থাকায় বৃষ্টির জলে দেওয়ালের অধিকাংশ স্থান ধসিয়া গিয়া ঘরখানি পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ইহার উপর আবার মূষিকে মৃত্তিকা তুলিয়া গৃহখানিকে একেবারে অব্যবহার্য্য করিয়াছে। গৌরীর মা গৃহের দুরবস্থা দেখিয়া প্রথমে দেবরকে গ্লানি দিতে লাগিল, পরে স্বীয় পিতৃবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

জয়হরি রোরুদ্যমানা ভ্রাতৃজায়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক তাহাকে নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন। এই সময় হইতে দেবরের সহিত গৌরীর মার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। জয়হরি ও তাঁহার পত্নী প্রাণপণে গৌরীর মার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

জয়হরি গৌরীশকে আপন পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। আপনি কষ্ট সহ্য করিয়াও ভাল খাদ্য সামগ্রী গৌরীশকে খাইতে দিতেন, আপনি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়াও গৌরীশকে ভাল কাপড় পরাইতেন, আপনি ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিতেন, কিন্তু গৌরীশের জন্য সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুতঃ যাহাতে গৌরীশের কোনও বিষয়ে কিছু-মাত্র কষ্ট না হয়, তজ্জন্য জয়হরি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। গৌরীশের বয়স ৮।৯ বৎসর হইল দেখিয়া জয়হরি তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে প্রেরণ করিলেন। গৌরীশ বেশ বুদ্ধিমান্, কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিল।

৩

মাধব নগরের জমিদার গোবিন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীসদয় বাবুর মাধব নগরস্থ নায়েব হরমোহন বাবু জয়হরি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরীশকে আপনার অধীনে একজন সামান্য মোহরার নিযুক্ত করিলেন। গৌরীশ নানা প্রকারে তোষা-মোদপ্রিয় নায়েবের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। একদিন উক্ত নায়েব গৌরীশকে কহিলেন, "তুমি জামিন দিতে পারিলে আমি তোমাকে তহশীলদারী কার্য্য দিতাম।"

গৌরীশ এই কথা স্বীয় খুল্লতাতের নিকট ব্যক্ত করিল। গৌরীশ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাবী উন্নতির আশায় পরম পুলকিত হইয়া উক্ত নায়েব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমার স্বোপার্জ্জিত যে সামান্য বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা জামিন দিলে যদি গৌরীশের চাকরী হয়, তবে আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। হরমোহন বাবু জয়হরির বিষয় সম্পত্তি জামিন রাখিয়া গৌরীশকে তহ-শীলদারী কর্ম্ম দিলেন।

গৌরীশ বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। আপনি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মাতাপুত্রে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। জয়হরি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া এক সুন্দরী পাত্রীর সহিত গৌরীশের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। যথাকালে বিবাহ হইল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে জয়হরির সহিত গৌরীশ ও তাহার মাতার বাক্যালাপ বন্ধ হইল।

জয়হরি যে গরীব তাহাই রহিলেন, কিন্তু গৌরীশ দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। হরমোহন বাবু বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হওয়াতে কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। গৌরীশ সুযোগ বুঝিয়া লক্ষ্মী-সদয় বাবুর সদর কাছারির প্রধান কর্ম্ম-চারীকে যথেষ্ট উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক মাধব নগরের নায়েবী পদ গ্রহণ করিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে জমিদারের নায়েব মফঃস্বলের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল। এক্ষণকার মত পুলিশের সুবন্দোবস্ত না থাকায় জমিদারের কর্ম্ম-চারিগণ নিরীহ প্রজাগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিত।

৪

নায়েবীপদ প্রাপ্ত হইয়া গৌরীশ চন্দ্রের অর্থলালসা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান তাহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। প্রজাদিগের দেয় খাজনা একবারের পরিবর্ত্তে পাঁচবার আদায় করিয়া লইয়াও আবার তাহার জমি জমা, বাস্তবাটী, প্রভৃতি বাকী খাজনার দায়ে বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিল। প্রজাগণ তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু গৌরীশ একে দুষ্টবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তাহাতে আবার অর্থবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে দণ্ডিত করিতে গিয়া অনেক সরলবুদ্ধি নিরীহ প্রজা আপনারাই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া আসিল। কোন কোন প্রজা তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মাধব নগর পরিত্যাগ করিল, কেহ জমি জমা বিক্রয় করিয়া তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক হইল, কেহ বা অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরকে জানাইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

গৌরীশ চন্দ্রের মাটির ঘরের পরিবর্ত্তে সুন্দর ইষ্টকালয় হইয়াছে, প্রচুর অর্থ সামর্থ্য হইয়াছে, লোকসমাজে বিলক্ষণ সম্ভ্রমও হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও তাহার মনে শান্তি নাই। অশান্তির একমাত্র কারণ,—জয়হরি আজিও গতাসু হয় নাই। জয়হরির অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহার মাটীর ঘর, তিনি যার তার সহিত মিশিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা কন; এই সকল কারণে গৌরীশ তাঁহাকে খুড়া বলিয়া ডাকা দূরে থাকুক, আদৌ তাঁহার সহিত কথা কহিত না। জয়হরি তাহার খুড়া, এ কথা কেহ বলিলে গৌরীশ তাহার উপর অন্তরের সহিত বিরক্ত হইত। জয়হরি মৃত বা দেশান্তরিত না হইলে স্বীয় ভূতপূর্ব্ব দুঃখ দারিদ্রোর কথা লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইবে না, স্থির করিয়া গৌরীশ তাঁহাকে মাধব নগর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য স্থিরসংকল্প হইল। গৌরীশের আজ্ঞামতে কয়েকজন দুষ্ট লোক আসিয়া জয়হরির গৃহের একখানি চাল কাটিয়া দিল। জয়হরি প্রথমে নিবারণ করিল, পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহারা চাল কাটিতে নিরস্ত হইল না। তাহারা বলিল,—বাবুর (গৌরীশের) পথ চলিবার অসুবিধা হয়, তাই চাল কাটিয়া দিলাম।

গৌরীশের এই অন্যায় আচরণের কথা তাহার মাতাকে জ্ঞাত করিবার জন্য জয়হরি গৌরীশের অট্টালিকায় পদার্পণ করিল। গৌরীশ-পত্নী বৃদ্ধকে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, —"বুড় শাপের মেজেতে উঠলি কেন, খুর পিছলে যে পড়ে যাবি।" জয়হরি বধূর এই বিদ্রূপবাক্যে যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ব্যথিতস্বরে কহিলেন, "বাছা, তোমার কথা ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত নয়। আমি না তোমার শ্বশুর!"

গৌরীশের মাতা নিকটেই ছিল। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সে রোষ-কষায়িত স্বরে কহিতে লাগিল, "কি! আমার বৌ ভদ্রলোকের মেয়ে নয়। তোর্ এত বড় স্পর্দ্ধা, যা মুখে আসে তাই বলিস্। লক্ষ্মীছাড়া হাভেতে, আমার বাড়ী থেকে দূর হ, তোরে দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়।"

জয়হরি বড় আশা করিয়াছিলেন গৌরীশের মাতার কাছে কিছু না কিছু সান্ত্বনা পাইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে অধিকতর বিমর্ষ ও ব্যথিত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

৫

গৌরীশ প্রতিদিনের ন্যায় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কাছারি হইতে বাটী আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মুখে বস্ত্রা-চ্ছাদন করিয়া রোদন করিতেছে। গৌরীশকে দেখিয়া তাহার মাতা সক্রোধে কহিতে লাগিল,—"আমরা আর এ বাটীতে থাকিতে পারিব না। তুমি যা হয় বন্দো-বস্ত কর।" গৌরীশ ব্যগ্রভাবে কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে গৌরীশ-জননী সজল-নয়নে কহিল, "হা! অদৃষ্ট আমার! আমার বৌমাকে যে সে যা তা বলিবে! এর চেয়ে আমার মরণ ভাল। ঐ জয়হরে বুড় আজ আমার বাড়ী এসে বৌমাকে কি না বলে গেল! অজেতের মেয়ে, অসৎ বংশ, লক্ষ্মীছাড়া, আর কত কি বল্‌লে—সব মনে হয় না। এমন কি মারিতেও উদ্যত। এর কোন ব্যবস্থা কর ত ভালই, নচেৎ আমরা খাশুড়ী বৌ গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

গৌরীশের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। বাবু রাগান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে কাছারিতে গেল। গৌরীশের মূর্ত্তি দেখিয়া কাছারির সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল, না জানি আজি কার সর্ব্বনাশ হয়! বাবু মছলন্দে উপবিষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়াবস্থার একমাত্র রক্ষক জয়হরিকে কান ধরিয়া কাছারিতে আনিবার আজ্ঞা প্রদান করিল। দুইজন দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ধরিয়া বাবুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। জয়হরিকে দেখিবামাত্র গৌরীশ হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া পঞ্চাশৎ পাদুকা প্রহারের আজ্ঞা দিল।

জয়হরি, যে গৌরীশ চন্দ্রকে অন্তরের সহিত স্নেহ করেন, যাহার মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করেন, যাহার সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন, সস্ত্রীক উদর জ্বালা সহ্য করিয়াও কষ্টোপার্জ্জিত অন্ন পানীয়ে যাহার জীবন রক্ষা ও দেহ-পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, পৌষের দুরন্ত শীত ও ভাদ্রের প্রবল ধারা অক্লেশে সহ্য করিয়াও যাহাকে সুবেশ ভূষায় সুশোভিত করিতেন, অদ্য সেই গৌরীশ চন্দ্র তাঁহাকে পাদুকা প্রহারের অনুমতি করিল!

জয়হরির এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান হইল না। বর্ষার প্রবল বন্যার ন্যায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সজলনয়নে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বাপ গৌরীশ!" তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—দুঃখে অভিমানে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

আজ্ঞামত কার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গৌরীশ স্বীয় পাদুকা ছুড়িয়া একজন দ্বারবান্‌কে প্রহারপূর্ব্বক সগর্ব্বে কহিল, কি, আমার আজ্ঞা অমান্য!

দ্বারবান্‌দ্বয় ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু বাবুর ভীতিব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া অগত্যা তাহারা স্ব স্ব পায়ের নাগরা খুলিয়া বাবুর হুকুম তামিল করিতে লাগিল।

অহো কি হৃদয়বিদারক বীভৎস দৃশ্য! জয়হরি একে অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহাতে আবার দুঃখ দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নে জীর্ণ শীর্ণ ও হীনবল। সলৌহ নাগরার বিষম আঘাতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, কেবল ভীষণ যন্ত্রণা-সূচক এক প্রকার অস্পষ্টস্বর উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে স্বর মৃদু হইতে মৃদুতর ও মৃদুতম হইয়া অবশেষে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও বাবুর আজ্ঞামত পূর্ণসংখ্যক আঘাত করা হয় নাই বলিয়া দ্বারবান্‌দ্বয় পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া প্রহার করিতে লাগিল। জয়হরি হত-চেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আজ্ঞা-মত কার্য্য শেষ করিয়া দ্বারবান্‌দ্বয় প্রস্থান করিল। গুণধর গৌরীশ চন্দ্রও সগর্ব্বে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

জয়হরির তনয়গণ এই লোমহর্ষণ সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাছারিতে উপস্থিত হইল। অনেক শুশ্রূষা করিয়া পিতার চৈতন্য সম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে বহন করিয়া লইয়া গেল। জয়হরির বাটীতে কেবল হাহাকার। সকলেই অশ্রুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছে। জয়হরি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা বৃথা রোদন করিতেছ কেন? আমরা দীন হীন নিঃস্ব, আমাদের সহায় নাই, সম্পদ্‌ নাই, আশ্রয় নাই, এ কথা মনে করিও না। সর্ব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর আমা-দিগের পরম বন্ধু। তাঁহাকে দুঃখ জানাও, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ কর, দুঃখ দূর হইবে, হৃদয় শান্ত হইবে, মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে।"

৬

গৌরীশের অত্যাচার উৎপীড়নের কথা জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীসদয় বাবুর কর্ণে উঠিল। তিনি মাধব নগরের প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ধন, সম্পত্তি, মান, মর্য্যাদা বিচ্যুত অনন্যোপায় প্রজা-

গণের দুঃখ দুর্গতির কথা শ্রবণ ও কাতরতা-ব্যঞ্জক অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি গৌরীশের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া সুন্দররূপ অবগত হইতে পারিলেন যে, সে প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে তদ্‌ভিন্ন তাঁহার (জমীদারের) নিজের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। লক্ষ্মী-সদয় বাবু রাজবিধির সাহায্যে গৌরীশের স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলেন। গৌরীশ যে পথের ভিখারী, পুনরায় তাহাই হইল; তবে বিশেষের মধ্যে এই হইল, পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলে কেহ কেহ দয়া প্রকাশ করিত, কিন্তু এক্ষণে সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করে, নরকের কীট—মূর্ত্তিমান্ মহাপাতক বলিয়া তাড়াইয়া দেয়।

মানসিক অশান্তিতে গৌরীশ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী স্বামীর অসময় দেখিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। উন্মাদগ্রস্ত পুত্রকে লইয়া বৃদ্ধা মাতা দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে দেখিয়া জয়হরি যারপর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি গৌরীশ ও তাহার মাতাকে সযত্নে আপনার কুঠিরে লইয়া গেলেন এবং অকপটহৃদয়ে যথাসাধ্য তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

জয়হরি নরজগতে অমরের আদর্শ। তাঁহার ক্ষমা ও পরদুঃখ-কাতরতার তুলনা ইহ জগতে একরূপ অসম্ভব। তিনি যথার্থই ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি।

কদর্থিতস্যাপিচ ধৈর্য্যবৃত্তে
বুদ্ধের্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো
নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥*

সুখ দুঃখের হিসাব।

এ ভবের বাজারে যিনি সুখদুঃখের হিসাব খতাইতে জানেন, তিনিই প্রকৃত ব্যাপারী। তুমি আমি, রাম, শ্যাম, গোবিন্দ, গোপাল যে চারি দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি, নানা প্রকার বিকি কিনি করিতেছি, আমাদিগকে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারী বলিতে পারি না। আমরাও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত বটে, আমাদিগেরও লাভ লোকসানের খাতা আছে বটে, আমরাও সুখদুঃখ খতাইয়া থাকি বটে, কিন্তু তবু আমরা প্রকৃত ব্যাপারী নহি। যিনি প্রকৃত ব্যাপারী, তাঁহার হাতে

* ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির বুদ্ধিকে হেয়জ্ঞান করিলেও তাহা বিনষ্ট হয় না, অগ্নির শিখাকে অধঃকৃত করিলেও তাহা অধোমুখ হয় না।

পড়িলে, আমাদিগের খাতার লাভ কিছু-মাত্র দাঁড়ায় না—ঋণ ও লোকসানের অঙ্কেই খাতা ভরিয়া যায়। রহস্যের ব্যাপার এই যে, আমরা নিজে খতাইতে গেলে সে লোকসানের অঙ্কটা প্রায়ই দেখিতে পাই না। নিজের ব্যাপরে ত নয়ই—কদাচিৎ পরের ব্যাপারে এ কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া আসিতেছে, অথচ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহাকে কি প্রকৃত ব্যাপারী বলিতে পারা যায়? তাই বলিতেছিলাম, এ ভবের বাজারে আমরা সকলেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত বটে, কিন্তু অনেকেই প্রকৃত ব্যাপারী নহি।

সুখদুঃখের হিসাব বড় শক্ত ব্যাপার—অথচ আমরা প্রত্যেকেই তাহা রাতদিন খতাইতেছি। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনবান্, মধ্যবিধ, দরিদ্র, কে না এই হিসাব খতাইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন? সকলেই খতাইতেছি, সকলকেই খতাইতেও হয়, কিন্তু খতাইতে ভাল করিয়া কেহ শিখিতে পারিতেছি না। শিখিবই বা কিরূপে? ইহাত লেখা পড়ার কাজ নহে যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই দশ পনর টাকায় রাশি রাশি গ্রাজুয়েট, পণ্ডিত বা মুন্সী আসিয়া হাজির হইবে। এ শিক্ষার গুরু অতি কম মিলে—এ ব্যাপারে পরিপক্ক অতি কম লোকই দেখিতে পাই। আর যদিই বা গুরু পাইতে পারি, আমরা পাইতে যে চাহি না। সকলেই মনে করি, আমরা এ হিসাবে পাকা হইয়াছি—পরের কাছে এ হিসাব যে প্রাণান্তেও শিখিতে চাহি না, তাই গুরু থাকিতেও গুরুকে বরণ করিবার ইচ্ছার অভাবে এ শিক্ষা আমরা পাইতে পারিতেছি না। এমন একটা প্রধান বিষয়ের শিক্ষায় লোকে এমন উদাসীন—এ একটা বিশেষ রহস্যের ব্যাপার বটে। সম্প্রদায়বিশেষ ইহাকেই "অবিদ্যা"—বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যেমন বাজারের পণ্য দ্রব্যের, তেমনই এই সুখদুঃখের নানা প্রকার শ্রেণী আছে। যেমন আম. কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি সকলই ফল বটে, কিন্তু একজাতীয় ফল নহে, যেমন ন্যাংড়া,ফজলি, বোম্বাই, দেশী সকলেই আম বটে, কিন্তু এক রকমের আম নহে—সেইরূপ এক সুখ-দুঃখ কথার মধ্যে নানা প্রকার জাতি আছে—আবার এক জাতির মধ্যেই নানাপ্রকার 'রকম' আছে। যিনি আম কাঁঠালের বিভিন্নতা জানেন না, যিনি ন্যাংড়া, ফজলীর বিভিন্নতা বুঝেন না, তিনি কি ফলের কারবারে লাভবান্ হইতে পারেন? হয়ত দুই আনার কাঁঠালটীকে তিনি এক টাকা মূল্যের আমের সহিত বিনিময় করিলেন—হয়ত তিনি একটা দেশী টক আম পাইয়া একটা সুমিষ্ট বোম্বাই আম হারাইলেন। এমন করিয়া কি ব্যাপার চলে? আম কাঁঠালের তত্ত্ব আমরা অল্পাধিক সকলেই জানি বলিয়া, এমন ভুল হয় না সত্য, কিন্তু সুখদুঃখের ব্যাপারে এ ঘটনা অনুক্ষণই ঘটিতেছে। এ ব্যাপারে

কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাঁচ কয়জন না পাইতেছে? অমৃত উদ্গিরণ করিয়া কয়জন না হলাহল পান করিতেছেন! তাই বলিতেছিলাম, বড়ই শক্ত ব্যাপার এই সুখদুঃখের হিসাব খতান—বড়ই কঠিন কার্য্য এই লাভ লোকসানের নিকাশ করা।

সুখ-দুঃখের প্রকৃতি অতীব কঠিন। যিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই সংসারে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। যাহাকে আমরা 'পদস্খলন' বলিয়া থাকি, তাহার মূলে এই সুখদুঃখের প্রকৃতি বিষয়ক অনভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সুখ ও দুঃখটাকে চিনিতে না পারাই লোকের প্রকৃত পতনের কারণ।

প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সুখদুঃখের কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুখদুঃখের হিসাবে পরিপক্ক হইবার জন্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করার হানি নাই। গীতার প্রামাণিকতা নাই বা মানিলাম, কথাগুলি যদি ভাল হয়, তাহা শুনিতে দোষ কি?

গীতাকার সুখকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) সাত্বিক, (২) রাজস, (৩) তামস। ক্রমান্বয়ে তাহার লক্ষণগুলি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃত সদৃশ, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ, সেই সুখকে 'সাত্বিক' সুখ বলে।"

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন, অগ্রে অমৃতোপম পরে বিষসদৃশ যে সুখ, তাহাকে রাজস সুখ বলে।"

"যাহার অগ্র ও অনুবন্ধ মোহজনক, নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখকে 'তামস' সুখ বলে।"

ইহাতে দেখিতে পাইতেছি গীতাকার দুই প্রকার অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া এই ত্রিবিধ ভাগ করিয়াছেন।

(১) সুখপ্রাপ্তির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ভাব।
(২) সুখের উৎপত্তিস্থল।

প্রথম হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাত্বিক সুখে অগ্রে কষ্ট, পরে সুখ; রাজস সুখে অগ্রে সুখ পরে কষ্ট; তামস সুখের অগ্রে মোহ, পরেও মোহ। দ্বিতীয় হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন, সাত্বিক সুখের উৎপত্তি আত্মবুদ্ধি হইতে, রাজস সুখের উৎপত্তি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে; তামস সুখের উৎপত্তি আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি হইতে।

এই সকল লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে গেলে, একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে হয়। আমরা ইহার উল্লেখমাত্র করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

যিনি ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ, তিনি দুই চারি দিন কারবার করিয়াই সুখদুঃখের এই লক্ষণগুলি চিনিতে পারেন। চিনিয়া তিনি যথাসাধ্য রাজস ও তামস লক্ষণাক্রান্ত সুখগুলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্বিক লক্ষণাক্রান্ত সুখটাই বেশী আমদানী করিতে চেষ্টা করেন। এই আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে আরও একটা রহস্য আছে। গুদাম প্রায়ই খালি রাখা যায় না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রহস্যের ব্যাপার

এই যে, এইরূপ সাত্বিক সুখের বেশী আমদানী করিতে করিতে, পরিপক্ক ব্যাপারী শেষে দেখিতে পান যে, রাজস ও তামস সুখের আমদানী অপেক্ষা সাত্বিক সুখের আমদানী বেশী লাভজনক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহার সকল দ্রব্যেই লোকসান দিতে হয়। খতাইয়া খতাইয়া যখন তিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তখন তিনি গুদাম একবারে বন্ধ করিয়া দেন—আর কোন প্রকার আমদানি রপ্তানির ধার ধারেন না। ক্রমে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মহাজন হইয়া পড়েন।

তাই বলিতেছিলাম যে, এ সুখ দুঃখের লাভ লোকসানটা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুখটাকেই যদি লাভজনক দ্রব্য ধরা যায়, এবং দুঃখটাকেই যদি লোকসানের মধ্যে ধরা যায়, তথাপি দেখিতে পাই যে, সব দ্রব্যেই কিছু না কিছু লোকসান দিতে হয়। যে সুখের লক্ষণ দেখিলাম, তাহা ত দুঃখ ছাড়া নহে—বিবেচনা করিয়া দেখিলেও ত সুখের ভাগ নহে দুঃখেরই ভাগ—উহাতে সুখের লক্ষণ নাই, দুঃখেরই লক্ষণ। কিন্তু এ ত কথাতেই বুঝিতেছি। আমাদের এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস কই? এ বিশ্বাস যে দিন হইবে, সেই দিন একবারে এ ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়া প্রকৃত ব্যাপারী হইতে পারিব। নতুবা যেমন করিয়া আমরা সুখ দুঃখের হিসাবটা খতাইতেছি, এমন করিয়া খতাইয়া যুগযুগান্ত কারবার করিলেও, আমরা প্রকৃত মহাজন হইতে পারিব না। তাই বলিতেছিলাম, সুখ দুঃখের হিসাবটা একটু ভাল করিয়া খতাইতে শিখিলে হয় না?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

রত্নমালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদিন শুক্লা রজনীর প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নায় বসিয়া সেফালি চিন্তা করিতেছিল। যদিও রজনীর শৈত্য আর শীতল শিশিরবিন্দুনিচয় তাহাকে স্নিগ্ধ করিতেছিল, তথাপিও তাহার নির্ম্মল ললাট-ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। আজ তাহার পাণ্ডুমুখ উজ্জ্বল, মলিন নেত্র-পদ্ম বিস্ফারিত, হৃদয়ের সমুদয় শিথিল ভাব উচ্ছ্বসিত। সে আজ অজস্র অশ্রুজলে হৃদয়ের দুর্ব্বহ দুঃখভার প্রশমিত করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সহসা কে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল "সেফালি"! সেফালি-মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

সম্মুখে সেই সন্ন্যাসী—একটা তড়িৎপ্রবাহ তাহার হৃদয় কম্পিত করিয়া তখনই চলিয়া গেল। তাহার সেই বিষণ্ণ ভাবের মধ্য দিয়া তাহার সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরে গিয়া নিপতিত হইল। সন্ন্যাসী কহিলেন "সেফালি! চল, তেজকুমার তোমার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছেন।" সেফালি যেন নিজের অজ্ঞাতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তেজকুমারের নিকট দাঁড়াইল।

তেজকুমার কহিল "সেফালি! হরিবোলের পুত্র আবার আমাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে, অতএব আবার আমাদিগকে দেশে যাইতে হইতেছে। সেফালির আরক্ত কপোল আরও রক্তাভ হইল। সে কষ্টে উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া অর্দ্ধ-স্ফুরিত-স্বরে কহিল "যাইব, কিন্তু সে পূর্ব্বের ভাব কোথায়?"

সাশ্রুনয়নে তেজকুমার কহিল—আর নাই—এ জীবনে আর সে সময় ফিরিবে না। বৃদ্ধ পিতার সেই শান্ত গভীর মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর প্রাণ ফাটিতেছিল। তেজকুমার ও সেফালি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আপনাদের পূর্ব্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। হরিবোলের মৃত্যু হইয়াছে। জমীদার মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন।

তেজকুমারের পিতা জমীদারের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ যে অগ্রিম অর্থ লইয়াছিলেন, জমীদার মরিবার সময় সে সমুদায় মাপ করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার ভূমি তেজকুমারকে চিরকালের জন্য বাস্ করিতে দিয়া গিয়াছেন।

হরিবোলও সেইরূপ করিয়াছে। আপনার গচ্ছিত ধনের অর্দ্ধাংশ তেজকুমারের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে। তেজকুমার এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মুকুলকে জিজ্ঞাসা করিল "একি?" অবনতমস্তকে মুকুল কহিল "যাহা দেখিতেছ তাহাই, অধিক আর কি?"

তেজ। তাহাদের হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন কিসে হইল?

মুকুল। আমার অনুরোধে।

তেজ। সে মোকদ্দমার কি হইল?

মুকুল। আমি সে মোকদ্দমা করিতে দিই নাই। আপনারা মাঝে মাঝে যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসীই আমি।

তখন সেফালির কথা তেজকুমারের স্মরণ হইল। সে বুঝিল মুকুল নিরুদ্দেশ হইয়া যথার্থই নিশ্চেষ্ট ছিল না, তাহাদের জন্য অনেক সময় দিয়াছে।

একদিন জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত মধুর কানন-ছায়াতলে মুকুল প্রস্তরাসনে অর্দ্ধ-শয়নাবস্থায়, আর সেফালি এক অদূর শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট।

মুকুল কহিল "সেফালি!" সেফালির অশ্রুহীন চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি মুকুলের অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিমিলিত হইল। মুকুল আবার ডাকিল "সেফালি"। সে সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া সেফালির সমস্ত প্রকৃতি ম্রিয়মাণ

হইয়াছে। মুমূর্ষু পিতার সে দৃঢ়স্বর সেফালির মনে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। সে আর মুকুলকে কিছু বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অঞ্চলে চক্ষু আবরণ করিয়া রহিল। সেফালির পিতার শেষ আজ্ঞা মুকুলের মনেও স্পষ্টরূপে জাগরূক ছিল। সে করুণকণ্ঠে কহিল "সেফালি, স্বর্গে উঠিয়া আবার নিপতিত হওয়া বড় কষ্টকর। তোমাকে পাইব বলিয়া কত না আশা ছিল, কিন্তু সে প্রাণভরা আশা ভরসা তীব্র নিরাশার গভীর কূপে নিমজ্জিত হইল। কালের কি চঞ্চল ভাব! সেফালি! একবার তুমি কথা বল, আমার ভগ্ন প্রাণে বল সঞ্চারিত হোক, ঐ যন্ত্রণা অসহ্য।" মুকুলের সেই করুণ কণ্ঠস্বর, সেই মর্ম্মোত্থিত কাতর বাণী মুহূর্ত্তকালের জন্য সেফালিকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল, সেফালি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সংযত হইয়া কহিল "কি আর কহিব? তুমি অনেকানেক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, তোমাকে আর কি কহিব? এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমাদের উভয়ের এই সুন্দর ব্যবধান পরলোকের অনন্ত মিলনের কথা কহিয়া দিতেছে।"

মুকুল ক্ষত বিক্ষত শোণিতাক্ত হৃদয়ে কহিল "পরকাল সে দূর ভবিষ্যতের কথা, সে দূরবস্তু দর্শনে মানব চির-অন্ধ।"

সেফালি তখন মধুর বাক্যে মুকুলকে অনেক বুঝাইল। সেফালির তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুলের মনের প্রনষ্ট বল পুনরুজ্জীবিত হইল। মুকুল বুঝিল, এ জগৎ নশ্বর—এ জীবন নশ্বর; সেফালিকে পিতার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, নচেৎ ঘোর অধর্ম্ম হইবে—অধর্ম্মে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, আর ধর্ম্মপথে সুখ সুনিশ্চিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তেজকুমার হরিবোল-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিল, কিন্তু নিজের জন্য নহে, সে সমুদায় ধনই পরের সেবার জন্য ব্যয়িত হইল। তেজকুমার যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল—শ্রদ্ধার সহিত চিরজীবন সুভগাকেই পূজা করিয়া কাটাইল, আর কখনও দার-পরিগ্রহ করিল না। আর মুকুল কি করিল—মুকুল পিতার ধন সম্পত্তি সমুদায় ভগ্নীর নামে লিখিয়া দিয়া নিজে উদাসীনের ন্যায় দেশত্যাগ করিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা চিরকালের মত আমিত্বহীন ভাবে অণু-পরমাণুবৎ অনন্ত জগতের মধ্যে লুকাইয়া থাকিবে।

সেফালিরও তাহাই সঙ্কল্প—সে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল এবং চিরজীবন ভ্রাতার আশ্রয়েই কাটাইয়াছিল। কিন্তু দেশের সমস্ত স্থানে ভগিনী ডোরা হইতে তাহার পদমর্য্যাদা ন্যূন ছিল না। তাহার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রুত হইয়া আর কেহই তাহাকে বিবাহের

জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। আর সুভগার কি হইল?—তেজকুমার ফিরিয়া আসিলে কিছুদিন পরে তাহার মাতা পরলোকগত হইল। তাহার পর হইতে কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু স্বদেশবাসী পরিচিত লোক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ কামাখ্যাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় একটি নির্ঝর-মুখরিত পর্ব্বতগুহায় একটী রমণীর কণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীতটী শুনিয়াছিল—

"সংসার অনলে, তাপিত হইয়ে,
এলাম শান্তি-নিকেতনে,
আমায় দাও শান্তিবারি, সে তাপ নিবারি,
শীতল করি আজ পাপজীবনে।
বিষয় বাসনা আশায়, ভুলায়ে তোমায়;
রাখে সদা নানা প্রলোভনে,
জান্‌লাম অনিত্য সংসার, তুমি সারাৎসার,
দেখা দাও সন্তানের হৃদাসনে।
নিজ-দাসের অভিলাষ, পূরাও স্ব-প্রকাশ,
প্রকাশ হয়ে একবার হৃদি ভবনে।
আমি অনুতাপাঞ্জলি, ধর পিতা বলি,
পুষ্পাঞ্জলি দেই তব চরণে।" *

সকলেই সে রমণীকে দেখিত, কাহারও কাহারও আবার সেই গুহা-বাসিনী বিদেশিনীকে 'সুভগা' বলিয়া ভ্রম হইত।

অম্বুজা।

বশিষ্ঠ শিষ্য সংবাদ।

শিষ্য। দীর্ঘ রোগ কি?
বশিষ্ঠ। ভবব্যাধি।
শি। ইহার ঔষধ কি?
ব। সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্ব বিচার।
শি। সকল ভূষণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ কি?
ব। শীলতা।
শি। তীর্থ কি?
ব। বিশুদ্ধ মন।
শি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি?
ব। সৎসঙ্গ, ইন্দ্রিয়দমন, তত্ত্ববিচার ও সন্তোষ।
শি। সাধু কাহারা?
ব। অখিলভোগবাসনাত্যাগী মোহ-বিকার-হীন শিবতত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।
শি। প্রাণীদিগের জ্বর কি?
ব। চিন্তা।
শি। মূর্খ কে?
ব। নির্ব্বিবেক ব্যক্তি।
শি। আমার কর্ত্তব্য কি?
ব। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরে ভক্তি।
শি। বিদ্যা কি?
ব। যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে।
শি। বোধ কি?
ব। যাহা মুক্তির হেতু।

* ব্রহ্মসঙ্গীত।

শি। লাভ কি?

ব। আত্ম-স্বার্থত্যাগ।

শি। জগৎকে কে জয় করিয়াছে?

ব। যে আপনার মনকে জয় করিয়াছে।

শি। সর্ব্বদা দুঃখী কে?

ব। বিষয়ানুরাগী।

শি। কে ধন্য?

ব। যিনি সর্ব্বদা পরোপকারে রত।

শি। সংসার মূল কি?

ব। অবিদ্যা।

শি। দিব্য ব্রত কি?

ব। সম্পূর্ণ দৈন্য ব্রত।

শি। প্রাণীদিগের পক্ষে দুস্ত্যাজ্য কি?

ব। দুরাশা।

শি। পৃথিবীতে পশু কাহারা?

ব। যাহারা বিদ্যাহীন।

শি। কাহাদের সহিত সঙ্গ অকর্ত্তব্য?

ব। মূর্খ, পাপিষ্ঠ, খল ও নীচ যাহারা।

শি। মুক্তিপ্রার্থীদিগের ত্বরিত কর্ত্তব্য কি?

ব। সৎসঙ্গ, ঈশ্বরভক্তি এবং সংসারে নির্ম্মমতা। (ক্রমশঃ)

লবঙ্গলতা।

(চরিত্র-সমালোচন)

বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাসখানি পাঠকালে পাঠকের মন এক সদানন্দময়ী গৃহিণীর চিত্রদর্শনে মোহিত হয়। সে চিত্র লবঙ্গলতার। লবঙ্গলতার মাধুরিতে আমরা হঠাৎ যতদূর আকৃষ্ট হই, গভীরতর প্রণয়ের বিচিত্র চিত্রে "রজনীতে" ততটা হই না। বিচিত্রসৌন্দর্য্যশালিনী চিরানন্দময়ী লবঙ্গের চরিত্র আলোচনা করিতেও মনে এক প্রকার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

প্রণয়বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রদর্শনার্থই বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকাগুলির সৃষ্টি। প্রণয়ের জঘন্য-ভোগলালসা-বিবর্জ্জিত উৎকৃষ্টতম চিত্রগুলিই বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্য। "চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জনে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে।" ইহাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণয়ের সংজ্ঞা। এই ভালবাসা-তুলিতে তাঁহার লবঙ্গচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

লবঙ্গ বহুমূর্ত্তিময়ী। লবঙ্গ গৃহিণী, জননী, লবঙ্গ সুরসিকা, লবঙ্গ দাতা, লবঙ্গ সুচতুর। আমরা একবার অন্ধ পুষ্পনারীর কথায় লবঙ্গের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

"রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর, ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের

আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। * * শুনিয়াছি তিনি রূপসী। তা রূপ যাউক—গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্ত-হস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটী এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহ তুল্য সেই বৃদ্ধ স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কিনা সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিল পেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন, মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রাগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত, লবঙ্গলতা তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চস্মাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া ঝমঝম ঝম্ ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গ আমাদের ফুল কিনিত। চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত 'এমন কদর্য্য মালা আমায় দিস কেন?' কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত; ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত 'ও আমার টাকা নয়।' দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। * * * সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত।"

এই পরিচয়েই লবঙ্গচরিত্র বোঝা যায়। বহুমূর্ত্তিময়ী লবঙ্গের আর এক প্রধান মূর্ত্তি আছে—সেটী তিনি প্রেমিকা! এই সকলের মূলে তাঁহার সেই অকপট ভালবাসা, তাই লবঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রেমিকা!

বাস্তবিক "শৈশবের ভালবাসায় একটা অভিশাপ আছে।" লবঙ্গ শৈশবে অমরনাথকে ভালবাসিতেন, সেই ভাল বাসা কিন্তু সফল হইল না; অমরনাথের সহিত বিবাহ না হইয়া বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। শৈবলিনী শৈশব-সখা প্রতাপের জন্য কুলত্যাগিনী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর লবঙ্গ অমরনাথের কথা মুখে আনিলেন না—বরং এক সময়ে অমরনাথকে কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন।

ভালবাসা যে কি, লবঙ্গ তাহা বেশ জানিতেন, আর প্রকৃত মহত্ব যে কিসে, লবঙ্গ তাহাও বুঝিতেন। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া,নিজ সুখের আশা পর্য্যন্তও পদদলিত করিয়া অপরের সুখবর্দ্ধনের জন্য আত্মত্যাগে যে কি সুখ, লবঙ্গ তাহা জানিতেন। তাই তিনি শৈশবের মোহময় প্রণয় হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া কঠিন পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া শৈশব-সখাকে ভুলিয়া, কর্ত্তব্যস্রোতে ধর্ম্মপথে গা ঢালিতে পারিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর-প্রথা-বিবর্জ্জিত প্রদেশে লবঙ্গের ন্যায় রমণীরত্ন বড়ই আদরের সামগ্রী এবং সর্ব্বতোভাবে আদর্শ-চরিত্র। যে বৃত্তি শৈবলিনীকে পরাস্ত করিয়াছিল, অমানুষিক হৃদয়বলে—ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অতুল ঐশ্বর্য্যে লবঙ্গ সেই বৃত্তিকে পদদলিতা দাসীর ন্যায় করিয়াছিলেন।

লবঙ্গলতা নিষ্কাম প্রণয়ের প্রতিকৃতি, আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত! শৈশবের সুখ-পূর্ণ প্রণয় পদদলিত করিয়া, ভোগেচ্ছা জলাঞ্জলি দিয়া, পিতামহ তুল্য বৃদ্ধ স্বামী লইয়া সুখী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। সেই প্রতাপ আর এই লবঙ্গ। দুইটীই যেন এক বৃন্তের দুটী ফুল, সাহিত্য কানন আলো করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

ঘাত প্রতিঘাতে লবঙ্গ-হৃদয়ের প্রণয় খুলিবার তত অবসর পায় নাই। কিন্তু সেই আনন্দ-প্রস্রবণ হৃদয়খানির মাঝে একখানি কালো বিষাদ-মেঘের অস্পষ্ট ছায়া বেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই "কাণি, তুই ভালবাসার কি জানিস্? তুমি লবঙ্গলতা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী"এই কথাগুলির মধ্যে লবঙ্গের হৃদয়-নিহিত প্রচ্ছন্ন বিষাদ ব্যক্ত হইয়াছে।

লবঙ্গলতা অমরনাথকে ভালবাসিতেন, তবে স্বহস্তে তাঁহাকে এমন শাস্তি দিলেন কেন? আমরা বলি এই শাস্তি-প্রদানেও লবঙ্গের অমরনাথের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা এবং গূঢ় ধর্ম্মানুরাগ পরিব্যক্ত হইতেছে। (১) *। আমার ভালবাসার পাত্র যে সামান্য বিরহযন্ত্রণায় অধীর ও ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া আমাকে পাইবার জন্য পাপ কার্য্য করিতে যাইবেন এবং কলুষিতচরিত্র হইবেন ইহা প্রকৃত প্রেমিকের অসহ্য। বিশেষতঃ নিজের ভালবাসার পাত্রকে অপরের দ্বারা দণ্ডিত করিতে রমণী প্রাণ থাকিতে পারে না। আর এই শাস্তি দ্বারা লবঙ্গ অমরনাথকে স্বীয় প্রকৃতি চিনাইয়া দিলেন, সেই গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রতিজ্ঞার ন্যায় পরস্পরের মন ফিরাইলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে মনকে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত নিযুক্ত করিলেন। প্রতিভাশালী কবি বড়ই কৌশলে এই শাস্তি ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন।

লবঙ্গ অমরনাথকে কতদূর পর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অমরের নিকট হইতে রজনী কাড়িবার ব্যাপারে

(১) এখানে সেই পতিপ্রাণা হিন্দু-পত্নী "ভ্রমরকে" মনে পড়ে।

প্রকাশিত। চিরদগ্ধ হৃদয় জুড়াইবার আশায় অভাগা অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। "চিরকাল যে অন্ধকারময় গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সে যদি চন্দ্রকিরণ-সমুজ্জ্বল তরু-পল্লব-কুসুম-শোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ" অমরনাথ সেই আনন্দ উপভোগ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু লবঙ্গ তাহাতেও বাদ সাধিলেন। অমরনাথ সুখী হইলে লবঙ্গের কত সুখ! কিন্তু লবঙ্গ সে সুখ অগ্রাহ্য করিলেন। অমরনাথ অপেক্ষা শচীন্দ্র এখন ধর্ম্মতঃ তাঁহার আপনার। শচীন্দ্র তাঁহার স্নেহের সপত্নীপুত্র। শচীন্দ্রের মঙ্গল তাঁহার অধিকতর আকাঙ্ক্ষণীয়। শচীন্দ্রের রক্ষার উপায় বিধান তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তাই তিনি অমরনাথকে চির অসুখী করিয়া, রজনী কাড়িয়া লইয়া শচীন্দ্রের সহিত বিবাহ দিলেন। কর্ত্তব্যের শাণিত ছুরিকায় আত্মসুখের চরম আশা পর্য্যন্তও ছেদন করিলেন।

শৈশবের ভালবাসায় বাধা পাইয়া লবঙ্গের প্রেম একপ্রকার বিশ্বব্যাপিনী হইয়াছিল। ক্ষুদ্র স্রোতোমুখে বাধা পড়িলে স্রোতের জল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রভাবেই লবঙ্গ পাকা গৃহিণী। সংসারের সকলকে স্নেহ করিতে না জানিলে প্রশংসা নাই। লবঙ্গ স্নেহময়ী জননী; শচীন্দ্রের পীড়ার সময় লবঙ্গের মুখে "আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে আমি মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র বাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।"—এ প্রকার কথাও সেই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রণোদিত। বৃদ্ধ স্বামীকে প্রফুল্লিত ও সুখী করিবার জন্য লবঙ্গের যে রসিকতা, তাহারও মূল—এই ভালবাসা। লবঙ্গ যে দয়াময়ী পরোপকারিণী, তাহাও এই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রভাবে। অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় লবঙ্গের হৃদয়ে ভালবাসা স্রোত প্রবাহিত। সেই জন্যই বলিতেছি, প্রণয়বৃত্তিই লবঙ্গচরিত্রের মেরুদণ্ড।

বঙ্কিম বাবুর প্রধান লক্ষ্য স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত চরিত্র চিত্রণ করা। তাই এক এক স্থলে লবঙ্গচরিত্র বুঝিতে আমাদিগকে একটু ভাবিতে হয়। লবঙ্গ যতই হৃদয় কঠিন করুন না কেন, তিনি মানবী। সাধারণ রমণীর অতিরিক্ত অনেক মানসিক বৃত্তির বিকাশ তাঁহাতে আছে বটে, কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক মনোভাব দ্বারা সুন্দররূপে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রকার সামঞ্জস্য অসামান্য শিল্পকারের অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়!

আমরা এখানে লবঙ্গ ও অমরনাথের বিদায়-দৃশ্যটি উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই দৃশ্যে লবঙ্গের হৃদয় যেমন ফুটিয়াছে—সমগ্র লবঙ্গচরিত্র এই দৃশ্যে যেমন পরিষ্কার হইবার অবসর পাইয়াছে, গ্রন্থমধ্যে আর কুত্রাপিও তদ্রূপ নহে।

"লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?'

অমর। যাইব।

লবঙ্গ। কেন?

অমর। যাইব না কেন? আমাকে বারণ করিবারত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

অ। যদি লোকান্তর থাকে, তবে?

ল। আমি স্ত্রীলোক সহজে দুর্ব্বলা! আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অ। সে কথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটী কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চির দিনের মত এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না, কখন মুছিলে যাইবেও না।

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল 'তুমি কু-কাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা-বুদ্ধিতেই কু-কাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড বিধাতা তাহার বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার, কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?'

অমর। তুমি না বলিতেই ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি, উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আজি আর আসিব না, আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি যদি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু অণুমাত্র স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী নহি। তোমার এই সমুদ্র তুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" * * লবঙ্গ কাঁপিতে লাগিলেন। অতি কোমল সকরুণ কাতর ভিক্ষার প্রত্যুত্তরে কি কঠোর উক্তি! ধর্ম্মের কঠোরতা, কর্ত্তব্যের কঠোরতা, এমনই নির্ম্মল বটে। যে বাঁধ একবার শিথিল হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা এমনই কঠিন করিয়া কঠোর পাষাণ দিয়া বাঁধিতে হয় বটে।

উদ্ধৃতাংশ স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত চিত্রের উজ্জ্বল দৃশ্যপট। সেই

নির্ব্বাণপ্রায় শৈশবের প্রণয়-পাবক সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া আবার নিবিল। সেই চির-সংযত হৃদয় সহসা প্রবৃত্তির প্রাবল্যে বিচলিত হইয়া আবার কর্ত্তব্য-পাষাণের গুরু চাপে স্থির হইল। হিন্দুনারীর ধর্ম্ম-জ্ঞান—ধর্ম্মভয় অসীম প্রভাবে লবঙ্গের আলোড়িত হৃদয়-সমুদ্র প্রশমিত করিল।

এমন লবঙ্গলতার চিত্র যে দেশের কবি চিত্রিত করিতে পারেন, সেই দেশ ধন্য! এমন চিত্র যে ভাষা সুশোভিত করে, সেই ভাষা ধন্য! আর যে চিত্রকর এমন চিত্র চিত্রিত করেন, তাঁহার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

ম।

গার্হস্থ্যপ্রবন্ধ।

(৩৯৭ সংখ্যা ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রাচীন কালের গৃহপ্রণালী যেরূপ শান্তিপ্রদ ছিল, সেইরূপ প্রীতিকরও ছিল। তৎকালে হিন্দুদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা অতিশয় আদরণীয় ছিল। হিন্দুগণ সকলেই একান্নভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। সন্তানগণ সর্ব্বদা জনক জননীর সহিত মৃদু বাক্যে কথা কহিতেন, তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেন ও আজ্ঞাবহ থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য সমাদৃত হইতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে পুত্রবধূর ন্যায় স্নেহ করিতেন। খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণ পিতামাতার ন্যায় পূজিত হইতেন। দাস দাসীবর্গ ছায়া স্বরূপ এবং পরম বিশ্বাসপাত্র ছিল।

গৃহস্থ যদি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতেন, তবে গলবস্ত্র হইয়া যোড়হস্তে তিনি স্বয়ং আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যেরূপ বিনীতভাবে সাদরে সম্ভাষণ করিতেন, তাহা ভাবিলে, আনন্দে প্রাণ পুলকিত হয়।

প্রত্যেক গৃহেই সাদরে অতিথিসেবা সম্পাদিত হইত। তৎকালে অতিথি-সৎকার একটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরি-গণিত ছিল। পাছে কোনও অতিথি বিমুখ হন, এই ভয়ে গৃহস্থগণ সতত সন্ত্রস্ত থাকিতেন। গৃহে কোনও অতিথি সমা-গত হইলে, গৃহস্থ পরম আপ্যায়িত হইতেন। অভ্যাগত ব্যক্তিকে কোন্ শান্তিপ্রদ স্থানে উপবেশন করিতে দিবেন, কোন্ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা পরিতৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করাইবেন—তজ্জন্য ব্যাকুল হইতেন। নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হইত না। অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাদরে সন্তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং

তাহার বিশ্রামের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহস্থ শেষে স্নানাহার করিতেন। প্রাচীনকালে এদেশীয় ললনাগণও প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় নারীগণ অপেক্ষা উচ্চ স্থলে অবস্থাপিত ছিলেন। তাঁহারা গুরুজনদিগের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণা ছিলেন। আত্মীয়মণ্ডলী ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি এরূপ প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহাদের গুণে সকলে বশীভূত হইত। তাঁহারা গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহারা এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত গৃহ-কার্য্য সমাধা করিতেন যে, কোনও বস্তুর অভাব বোধ হইত না। তাঁহারা সর্ব্বদা গৃহের লক্ষ্মীরূপে বিরাজমান থাকিতেন। তজ্জন্যই বোধ হয় "স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন"—স্ত্রীতে ও শ্রী (লক্ষ্মী)তে কোনও বিশেষ নাই—এই বাক্য প্রসিদ্ধ।

আর্য্যনারীগণ অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অত্যদ্ভুত ও অনন্ত পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় ললনাগণের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন।

বিদ্যা ও তত্ত্বালোচনায় ইহাঁরা প্রাচীনকালে কত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রাচীনতম মহাগ্রন্থসমূহ তাহার পরিচয় দান করিতেছে। অনেকানেক বিদুষী নারী বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে ঋগ্বেদ ও আর্য্যজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন ইহাঁদের নাম বিলুপ্ত হইবার নহে।

তাঁহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রানু-লোচনাতেও ন্যূন ছিলেন না। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্যামহিলা রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের ন্যায় রাজসভায় ও তপোবনে গভীর জ্ঞান ও শাস্ত্রানুলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুধু গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, সতীত্বে সর্ব্বদেশীয় ললনাগণের শীর্ষস্থানীয়া, বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনে পারদর্শিনী ছিলেন এমন নহে; তাঁহারা আশ্চর্য্য স্বদেশানুরাগিণীও ছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতব্রতে স্বকীয় অঙ্গ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ আপনাদের মস্তকের কেশগুচ্ছ অনায়াসে কাটিয়া দিতেন। তাঁহারা একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকেও সমরক্ষেত্রে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। পুত্রকে উদ্দীপনা-বাক্যে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক হস্তে করবাল দিয়া যুদ্ধযাত্রাকালে বলিতেন—"যাও পুত্র যাও, হয় যুদ্ধে জয়লাভপূর্ব্বক এই করবাল হস্তে জয়োৎসাহে জননীর পাদবন্দনা করিও; অথবা রণে হত হইয়া করবালোপরি জননীর নিকট আনীত হইও।" কি আশ্চর্য্য স্বদেশানুরাগ! এই কার্য্যে বীরত্বের পরিচয় যত, স্বদেশ-

প্রেমের পরিচয়ও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃত বীরত্ব—পুরুষোচিত বীরত্ব ভারতরমণী যেরূপ দেখাইয়াছেন, এমন আর পৃথিবীর কোন্ জাতির রমণী দেখাইয়াছেন?

প্রাচীন কালের ভারতরমণীগণের কার্য্যসমূহের বিষয় চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান, খনা ও লীলাবতীর গণিত ও জ্যোতিষ-জ্ঞান, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর পতি-প্রেম ইত্যাদি পূর্ব্বকালের ভারতললনা-গণের কীর্ত্তিকলাপ অবিনশ্বর নক্ষত্ররূপে মানবরাজ্যের হৃদয়াকাশে অনন্তকাল দেদীপ্যমান রহিবে। প্রাচীনকালে এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একরূপ ছিল। তখন পুরুষগণ ভার্য্যা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইলে পূর্ব্বে স্বীয় জননী ও দুহিতাকে স্মরণ করিয়া তাহার দিকে চাহিতেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে ভারতে পারিবারিক ও নৈতিক উৎকর্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করিত। আহা! প্রাচীনকালের গৃহচ্ছবি কেমন পবিত্র ও সুন্দর ছিল। গৃহে গৃহে নিয়ত কীদৃশ সুখ শান্তি বিরাজ করিত। চিন্তা করিলে এক দিকে যেমন প্রাণ আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই আবার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রাণ দুঃখসাগরে ডুবিয়া যায় ও নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

পুরাণ জ্বর প্লীহা ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক পাঁচন।

চিরেতা	... ...	২০ তোলা।
মঞ্জিষ্ঠা	... ...	২০ তোলা।
রক্তচন্দন চূর্ণ	...	২০ তোলা।
অতইচ	... ...	১০ তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী—ইহাদের মধ্যে চিরেতা ও মঞ্জিষ্ঠাকে দা দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ২০ তোলা পরিমাণে ওজন লইয়া বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন, তৎপরে ভাল রক্ত-চন্দন কাষ্ঠকে দা দ্বারা চাঁচিয়া চাঁচিয়া, কিম্বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছেদন-পূর্ব্বক রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া হামামদিস্তা দ্বারা চূর্ণি করিয়া ঐরূপ পরিমিত ২০ তোলা লইয়া হাঁড়ির মধ্যে প্রদান করিবে। পরে অতইচ। ইহা হরিদ্রাবৎ মূল বিশেষ, চেষ্টা করিলে বণিকের নিকট প্রাপ্তব্য, দুষ্প্রাপ্য নয়, কিঞ্চিৎ বিষাক্ত; আর অধিক দিনের পুরাতন হইলে পোকা ধরে, ফলে পোকা ধরা অতইচ না হয়, এইরূপ উত্তম ১০ তোলা অতইচ লইবে। ইহাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা করিয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক ১৬ সের জলে

ভিজাইয়া ৬।৭ ঘণ্টা রাখিয়া পরে চুল্লির উপরি হাঁড়ি বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে। এইরূপ পাক হইতে হইতে যখন ৯ সের আন্দাজ জল থাকিবে, সেই সময়ে হাঁড়ি নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ১২টী বোতলে পূরণ করিবে। তৎপরে "ষ্ট্রং নাইট্রিক য্যাসিড" ৩০ বিন্দু (ফোঁটা), আর "ষ্ট্রং মিউরেটিক য্যাসিড" ৩০ বিন্দু (ফোঁটা)—এই ৬০ বিন্দু য্যাসিড দ্বারা ৪০ গ্রেণ "সলফেট্ অফ্ কুইনাইনকে" দ্রবীভূত করিয়া উহার মধ্যে একটি বোতলে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বোতলে ষ্ট্রং নাইট্রিক ও মিউরেটিক্ য্যাসিড্ এবং সলফেট্ অফ্ কুইনাইন যোগ করিয়া বোতলগুলি কর্ক ও গালা মোহর করিলেই পুরাতন জ্বর প্লীহা ও যকৃতাদি জঠররোগনাশক পাঁচন প্রস্তুত হইল। ইহা সেবনের ব্যবস্থা ও ফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক ছটাক পরিমাণে দুইবার; ৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্ক বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুইবার; ৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্ক-শিশুর পক্ষে দেড় কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুইবার; তদপেক্ষা অল্পবয়স্কের পক্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা; সকলকেই জ্বরবিরাম-কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ দ্বারা জ্বরাদির নিবৃত্তি হইলেও কিছু দিন ইহা অর্দ্ধমাত্রায় সেবন করা বিধেয়। সেবনকালে বোতল নাড়িয়া কাঁচের বা প্রস্তরের কিম্বা মৃন্ময় পাত্রে ঢালিয়া পান করিবে।

ইহার আরোগ্যফল কলিকাতায় প্রচলিত ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধ কয়েকটী অপেক্ষাও অধিক। এই অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা দুর্জ্জয় প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, পাণ্ডু, কামল, হলীমক, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সংযুক্ত জ্বর, কুই-নাইনের পুনর্জ্বর, একদিন বা দুইদিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষমজ্বর, এবং প্রমেহ পর্য্যন্ত অতি সত্বর, এমন কি তিন চারি দিনের মধ্যেই নিবৃত্ত হইবে। পরে দিন দিন যত সেবন করা হইবে, ততই ইহা পূর্ব্বোক্ত দুর্জ্জয় প্লীহাদি জঠররোগের বিশেষরূপে সঙ্কোচ বিধানপূর্ব্বক অগ্নি ও বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন করিবে। রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে প্রতি বোতলে সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্‌নিসিয়া ৫ আউন্স পরিমাণে যোগ করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধ বোতলমধ্যে সংস্থাপন-পূর্ব্বক কর্ক আঁটিয়া ও গালা মোহর করিয়া রাখিবে।

দ্রব্য পরিপাক।

যে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হইতে যে সময় লাগে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রব্য	সময়
এরারুট	২॥০ দণ্ড

দ্রব্য	সময়
খইয়ের মণ্ড	২॥০ দণ্ড
সাগুদানা	২॥০ ,,
পুরাতন তণ্ডুলের মণ্ড	৩ ,,
যবের মণ্ড	৪ ,,
পাণিফলের পালো	৩ ,,
ধানের খই	৩ ,,
মুড়ি	৬ ,,
মুড়কি	৫ ,,
ভাজামুগের ডাইল	৬ ,,
মসুর ডাইল	৫ ,,
ছোলা মটর ও অড় হর ডাইল	৭॥০ ,,
মাসকলাইয়ের ডাইল	৫ ,,
পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন	৫ ,,
নূতন তণ্ডুলের অন্ন	৮ ,,
রুটী	৭॥০ ,,
লুচী, কচুরি, মিঠাই, জিলাপী ও মোহনভোগ	৯ ,,
গুড় ও সন্দেশ	৭॥০ ,,
মিছরী, বাতাসা ও চিনি	৫ ,,
বেগুন ও ডুমুর	৫ ,,
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি	৮ ,,
পালং ও নটে শাকাদি	৭॥০ ,,
গোল আলু ও রাঙ্গা আলু	৭॥০ ,,
মুল, শালগাম ও গাজরাদি	৭॥০ ,,
পক্ক কাঁঠাল	৯ ,,
পটোল, ঝিঙ্গা, কাঁচকলা, থোড় ও কুষ্মাণ্ডাদি	৭ দণ্ড
তরমুজ ও ফুটি	৬ ,,
আতা ও নোনা	৪ ,,
লিচু ও গোলাপজামাদি	৭॥০ ,,
পক্ক আম্র	৬ ,,
কাঁচা আম্র ও শসা	৭॥০ ,,
ডাব নারিকেলের শস্য	৫ ,,
কিসমিস্	৫ ,,
বিল্ব বা শ্রীফল	৫ ,,
দাড়িম্ব	২॥০ ,,
আঙ্গুর	৪ ,,
বাদাম ও পেস্তা	৯ ,,
ছাগদুগ্ধ	৫॥০ ,,
গব্যদুগ্ধ	৫ ,,
ঐ ছানা	৮ ,,
ক্ষুদ্র মৎস্য	৫ ,,
গল্দাচিঙ্গড়ি ও অন্যান্য বৃহৎ মৎস্য	৭॥০ ,,
শামুক ও গুগ্‌লী	৮ ,,
সুসিদ্ধ ডিম্ব	৯ ,,
সুসিদ্ধ ছাগ, হরিণ, মেষ ও কচ্ছপাদির মাংস	৮ ,,
কপোত, হংস ও কুক্কুট মাংস	৮ ,,
কালিয়া (ঘৃত ও মসলা সংযোগে পাক)	১০ ,,
পলান্ন (পোলাও)	১২ ,,

মৃত্যু।

১

মরণের নামে কেন গো সকলে
সভয়ে এমন শিহরে উঠে ?
কেন হয় মুখ মলিন তাদের
হৃদয়ে দারুণ আতঙ্ক ছুটে ?

২

মৃত্যু কভু নহে শত্রু মানবের,
মৃত্যু যে বিধির অমূল্য দান!
মৃত্যুর জনম—নর নারী সবে
শোক দুঃখ হ'তে করিতে ত্রাণ!

৩

মৃত্যু স্বরগের এক মাত্র দূত,—
বিধির আদেশে নিযুক্ত হেথা,
হাত ধরে সে যে নিয়ে যায় সবে
চির সুখ শান্তি বিরাজে যেথা!

৪

যার কেহ নাই হেথা আপনার,
সহায় সম্বল নাহিক ভবে,
যাহার হৃদয় জ্বলে যাতনায়,
যা'রে ঘৃণা করে জগতে সবে ;—

৫

তারেও যে মৃত্যু করে না অবজ্ঞা,
যায় না ফেলিয়া দু পায় ঠেলে ;
সম্ভাষি যতনে ভালবেসে তায়
কোলে লয় যেন কোলের ছেলে।

৬

মুছায়ে তাহার নয়নের জল
শোক দুঃখ ভার করিয়া দূর,—
সাদরে সান্ত্বনা দিয়ে যায় লয়ে
চির সুখময় স্বরগপুর!

শ্রীব, না, ম।

বৎসর শেষে চিন্তা।

অ নন্ত কাল সাগরে ডুবিল বৎসর,
আ ত্ম চিন্তা করিবার এই অবসর।
ই হ লোক ছায়া—পরলোক নিত্যধাম,
ঈ শ্বর সহায়, সদা জপ তাঁর নাম।
উ ন্নতি কল্যাণ শান্তি—প্রসাদ তাঁহার,
ঊ র্দ্ধ দৃষ্টি করি চাহ, মিলিবে অপার।
ঋ ষি মুনি ধ্যানযোগে সদা সচেতন,
৯ প্ত নন এ সংসারে প্রমুক্ত জীবন।
এ পারে মৃত্যুর রাজ্য, ওপারে অমৃত,
ঐ হিক ক্ষণিক সুখে হৈওনা ব্যাপৃত।
ও মন! আপন হিত করহ সন্ধান,
ঔ ষধ এ ভবরোগে নামসুধা পান।

ক বলে কপট ভাব করহ বর্জ্জন,
খ ল সঙ্গে নরকেতে নিশ্চয় পতন।
গ তস্য শোচনা কেন বর্ত্তমান ভুলে ?
ঘ টনার স্রোতে ভেসে যেওনা অকূলে।
ঙ বলে ভাঙিয়া ঘুম দেখ আঁখি তুলে।

চ ঞ্চল সম্পদ সুখ জীবন যৌবন,
ছ লনায় ছাই লয়ে ভুল না কাঞ্চন।
জ প তপ মিছা যদি না জান মরিতে,
ঝ টিতি কর্ত্তব্য কাজ হইবে সাধিতে,
ঞ. বলে গোঁসাঞ্‌ দড় হিসাব বুঝিতে।

ট লিলে পাপের পথে অশেষ দুর্গতি,
ঠ কিবে আপনি হবে পাপের মূরতি।
ড ঙ্কা মেরে সাধুজন ভবপারে যায়,
ঢ ক্কা রবে ধর্ম্ম তার সুচরিত গায়,
ণ বলে মরণে রণে সে কি ভয় পায়?

ত পস্যায় সর্ব্ব সিদ্ধি নাহিক অন্যথা,
থ র হরি কাঁপে যম উগ্রতপা যথা,
দ য়া জীবে, নামে ভক্তি, সাধু সহবাস,—
ধ র্ম্ম-তত্ত্ব সার এই, জানিবে নির্য্যাস।
ন র নারী এই ধর্ম্মে করহ বিশ্বাস।

প র-হিতে আত্মস্বার্থ কর বলিদান,
ফ লাফল চিন্তা মনে দিওনাকো স্থান।
ব ল বুদ্ধি সুখ শান্তি উন্নতি কল্যাণ,
ভ গবান্ ভকতের করেন বিধান।
ম ঙ্গলময়ের কার্য্য মঙ্গলনিদান।

য তো ধর্ম্মস্ততো জয় নাহিক সংশয়,
র তন যতনে মিলে জানিও নিশ্চয়।
ল ক্ষ্য রাখি বিভুপদে হও আগুয়ান,
ব দন ভরিয়া কর তাঁর গুণগান।

শ ব করি ত্রিসংসার বসো যোগাসনে,
ষ ড় রিপু জয় করি লভ নিত্য ধনে।
স দানন্দ নাম গাও সদানন্দ মনে।
হ রি বল দিন গেল হও সচেতন,
ক্ষ ণেক বিলম্বে আয়ু গ্রাসিবে শমন।

সাধ্বী কৈলাসকামিনী।

চৈত্রের বামাবোধিনী এবার চৈত্রের মধ্যে প্রচার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিলম্ব হইয়া পড়িল। তাহার একটী প্রধান কারণ উপরি-উক্ত মহিলার দেহত্যাগ ঘটনা। ইনি বামাবোধিনীর সম্পাদক-পত্নী। এত দিন পাঠিকাদিগের নিকট অপরিচিতা থাকিয়াও তাঁহাদের সেবায় অর্থ-সামর্থ্য অনেক ব্যয় করিয়াছেন। বামাবোধিনী-সম্পাদকের গুরুতর পীড়া এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ ১২৮৫ সালে পত্রিকা যখন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইনি নিজের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বামাবোধিনীর পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেন। তদবধি ২০ বৎসর কাল ইনি বামাবোধিনীর কার্য্যভার বহন ও প্রকৃত অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন পাঠিকারা অবগত আছেন, অনেক কাল বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু আশুতোষ ঘোষের নামেই পত্রিকার কার্য্য চলিত, এ সময় এই মহিলাই তাঁহার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে স্বয়ং কার্য্য সকল চালাইতেন। কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইলেও আমৃত্যু তিনি পত্রিকার কার্য্য সকলের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন।

আজি বামাবোধিনী গভীর শোকপূর্ণ হৃদয়ে পাঠকপাঠিকাগণের নিকট শ্রীমতী কৈলাসকামিনীর পরলোকগমনের সংবাদমাত্র দিতেছেন, ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। ইনি গর্ভাবস্থায় হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকষ্ট কিছু দিন মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেন। গর্ভাবস্থায় ঔষধসেবনে ইতিপূর্ব্বে একটী সন্তান নষ্ট হয়, এজন্য ঔষধাদি সেবনে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সকল ক্লেশ দূর হইবে আশা করিতেছিলেন। গত ১৫ই চৈত্র হইতে রাত্রিকালে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইত, অধিকক্ষণ শয়ানাবস্থায় থাকিতে পারিতেন না, ভাল নিদ্রা হইত না। ঈশ্বরের নাম বা পরমার্থ সঙ্গীত করিয়া অনেক রাত্রি কাটাইতেন। প্রভাতে গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্য করিয়া স্নানানন্তর স্বহস্তে যথাবিধি রন্ধনপূর্ব্বক পরিজনদিগকে খাওয়াইতেন এবং সমস্ত দিবস আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পরিশ্রমসহ সম্পন্ন করিতেন। রাত্রিতে অসুখ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রজনী যাপন করিতেন। ইঁহার আত্মীয়গণ ইহাতে ইঁহার পীড়ার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। গত ২৯শে চৈত্র রজনীতে শ্বাসকষ্টের অত্যন্ত আধিক্য হইয়া হঠাৎ প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার নাম করিতে করিতে ও ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধ সেবনে সে দিন প্রাণ রক্ষা হয়। ডাক্তারেরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, যন্ত্রসাহায্যে শীঘ্র প্রসব না করাইলে মহা বিপদের সম্ভাবনা। রোগী তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন চৈত্র মাসের আর একদিন আছে যাউক, বৈশাখ পড়িলে যাহা হয় হইবে। ঈশ্বরেচ্ছায় ৩০এ চৈত্র সমস্ত দিন এবং কতক রাত্রি সচ্ছন্দে যায়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইতে হইতে আবার দারুণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধ সেবনে পূর্ব্বদিনের মত উপকার বোধ হইল না। রোগী রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রভাত হইলেই স্বামীকে বলিলেন ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া প্রসব করাও। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার জে, এন মিত্র এবং ধাত্রী থাকমণি ঘোষ ও অন্য এক প্রাচীনা ধাত্রী ১লা বৈশাখ বেলা প্রায় ৭॥ টার সময় উপস্থিত হইলেন এবং ৯টার সময় সুপ্রসব করাইলেন। ডাক্তারেরা যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও কৌশলপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া শেষ করা যায় না। প্রসবে কোনও কষ্ট হইল না এবং রোগী একটু সুস্থ হইলেন। আশা করা গেল এইবার একপ্রকার নিরাপদ হইলেন। কিন্তু শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়াতে আবার শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হইল। ডাক্তারেরা ঔষধ ও

শুশ্রূষার যতদূর সাধ্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলেও রোগীর অবসন্নতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অপরাহ্ণ ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও উচ্চারণ করিতে করিতে ইঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল এবং অমর আত্মা অমরধামে প্রস্থান করিল।

ইঁহার স্বামীর নগরস্থ বন্ধুগণের অধিকাংশ ইঁহার পীড়ার সংবাদ কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, হঠাৎ ইঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া দত্তপ্রবাস ৯নং আণ্টনিবাগান গৃহে সমবেত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ৬০।৭০ জন লোক উপস্থিত। ইতিমধ্যে শবদেহের একটী ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। পরে দেহ সধবোচিত সিন্দুর, অলঙ্কাদিতে বিভূষিত এবং নববস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইলে সময়োচিত ঈশ্বরোপাসনা হইল। রাত্রি ৯টার সময় দেহ শ্মশানঘাটে নীত হইল। অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য বন্ধুগণ আনন্দে শবদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যান, ইহা মহিলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। শ্মশানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করেন। সৎকারের পূর্ব্বে ও পরে সময়োচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। রাত্রি ৩টার সময় দেহ ভস্মাবশেষ হয়। তাঁহার চিতাভস্ম এবং মস্তকের কেশ যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

কৈলাসকামিনী স্বামী, ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা এবং দুইটী সহোদর রাখিয়া ৪০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার জন্য তাঁহারা এবং প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শোকার্ত্ত। বামাবোধিনীও শোকার্ত্তহৃদয়ে ইঁহার আত্মার চির শান্তি ও সদ্‌গতির প্রার্থনা করিতেছেন, বিশ্বজননী তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে ইঁহাকে রাখিয়া কৃতার্থ করুন। বামাবোধিনী ইঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং ইঁহার বিয়োগে ইহার যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবার নহে।

হেঁয়ালী।

ফাল্গুনের হেঁয়ালীর উত্তর।

(১) বেহাতী, (২) আকাশ, (৩) চাল্‌তা, (৪) পাগল, (৫) গোপাল।

চৈত্রের হেঁয়ালী।

মিষ্ট রস মধ্যে সদা করে বিচরণ,
কভু করিল না তার আস্বাদ গ্রহণ। ১

বাদ বিবাদেতে পাবে মম দরশন,
বিবাহক্ষেত্রেতে আমি মধ্যস্থ ব্রাহ্মণ,

বাসর আসরে আগে স্থান মোর হয়,
আমা ছাড়া বাবার অস্তিত্ব নাহি রয়। ২
আদি শেষ দু-অক্ষরে বাজী চমৎকার,
শেষ ছাড়ি আস্বাদনে বড়ই বেতার।
আদি বর্ণ ছাড়িলে মূল্যের নিরূপণ,
তিন বর্ণে কোন্ বস্তু বস্ত্রের বন্ধন ? ৩

অঙ্গে নই, বঙ্গে নই—কলিঙ্গেতে ঘর,
চারি সহোদরমধ্যে কনিষ্ঠ সোদর। ৪
রাজা প্রজা কাঁপে সবে প্রতাপে আমার,
আদি শেষ বর্ণে হই ওজনে ব্যাভার,
শেষ দুই বর্ণে হই ভীষণ ঘটনা,
তিন বর্ণে কিবা নাম আমার বলনা ? ৫

নূতন সংবাদ।

১। আলিগড়ের সার সায়েদ আমাদ খাঁ বাহাদুরের ৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। আলিগড় কলেজ ইহাঁর অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারতের মুসলমান সমাজ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২। মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের পীড়া অচিকিৎস্য বলিয়া ডাক্তারেরা জবাব দিয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

৩। সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জীর স্থলে সার জন উডবরন্ বঙ্গের ছোট লাট হইয়াছেন। ইনি একজন মহাশয় লোক।

৪। ব্রিষ্টল অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রেবরেণ্ড জর্জ মূলার নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। হৃদ্‌রোগই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

৫। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম মেঃ বি এল গুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

৬। মান্দ্রাজের ধনী নরসিংহ রাও মৃত্যুকালে বিশাখাপত্তনের কলেজের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৭। কানপুরের তামাক-বিক্রেতা হাজি হাসেন কানপুরের অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

৮। ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট সেসন জজ বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র পূর্ণিয়ার সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর দ্রুত পদোন্নতি ইহাঁর বিচারদক্ষতার পরিচায়ক।

৯। বরদার গুইকুমারের পুত্রকন্যাগণ জাপানদর্শনে গিয়াছেন।

বামারচনা।

সকলি স্বপন ॥

১

গুরুশ্রেষ্ঠ দেবোপম, সেই যে জনক মম,
ঠাকুর খুড়ার স্নেহ অমূল্য রতন !
আজি মম সকলি স্বপন !

২

সেই যে স্নেহের নদী,রাঙ্গা দিদি, মেজো দিদি
স্নেহের প্রতিমা সেই ভাই দুইজন,*
আজি মম সকলি স্বপন !

৩

শোভিত হৃদয়তল, সেই যে অতি উজ্জ্বল,
পবিত্র স্নেহের ফুল কালীপদ ধন,
আজি মম সকলি স্বপন !

৪

স্বর্নদীর ঢেউ সম, সেই যে পবিত্রতম,
প্রাণের জানকী ভাই হৃদয়রঞ্জন,
আজি মম সকলি স্বপন !

৫

স্বরগের দেবী সম, সেই যে শাশুড়ী মম,
স্নেহস্বরূপিণী বিশ্বজননীর মত,
সব আজ স্বপ্নে পরিণত !

৬

পবিত্র কুসুম থর, পদ্মপূর্ণ সরোবর,
সেই যে ভাগিনী হেম লক্ষ্মীর মতন,
আজি সব হয়েছে স্বপন।

৭

সেই যে দিদি-মা দেবী, শান্তি করুণার ছবি,
দয়াধর্ম্মে ছিল যাঁর মহৎ জীবন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

৮

কত ভাল বাসিয়াছে,তারাও ছাড়িয়া গেছে,
ছোট মামা, ছোট মাসী কত দিন যায়,
সব আজ স্বপ্ন সম হায় !

৯

পবিত্র ফুলের মত, সৌরভ ঢালিত কত
হৃদয়ের রক্ত সম শৈলজা রতন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

১০

এই যে ক'দিন হ'ল, বুকে মারি তীক্ষ্ণ শেল
গিয়েছেন ছোট দাদা† ভেঙ্গে দিয়ে মন,
তাও আজ হয়েছে স্বপন।

১১

সে কৃষ্ণ মথুর দাদা ‡ কহিত মধুর কথা,
যেমন আছিল দয়া ভক্তিও তেমন,
আজি মম সকলি স্বপন।

অমূল্য সুন্দরী দাস।

পিসিমার উপহার।

(২৭শে ফাল্গুন—১৩০৪ সাল)

এস এস মা ! আমার,
আজ দশ মাস ধরে
রয়েছে আকুল আঁখি
তোমার প্রতীক্ষা করে।
হৃদয় কুসুমময়
আগে হতে তব তরে

---

* ৺বরদা কান্ত সেন, বি, এ, ও ৺ কালী কুমার সেন, এম, এ, বি, এল।
† উমাশঙ্কর সেন, যাঁহার মৃত্যুতে 'বিষাদ ও বেদনা' লিখিত হইয়াছে।
‡ পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্যদ্বয়।

সাজায়েছে, সযতনে,
স্নেহফুল থরে থরে!
হাসায়ে হৃদয়-ইন্দু
শুভ আগমনী তোর
ঢালিছে জোছনারাশি
আজি এ মরমে মোর!
অন্তঃশীলা স্নেহনীর
উচ্ছ্বসিত, খুকুরাণি!
না হেরেই মা! আমার
তোর ও আননখানি!
এ সুখ জলধি-জলে,
কিন্তু মম হৃদিতরী
কাঁপিতেছে, মাঝে মাঝে,
আতঙ্ক তরঙ্গ স্মরি—
পাছে মা! আঁধারি ধরা
নন্দনেতে যা'স ফিরে,
স্নেহভরা বক্ষঃগুলি
ভাসায়ে নয়ননীরে!
কোথায় সে বাছুমণি?
আজিয়ে পড়িছে মনে—
চিরবিসর্জ্জিত সেই
স্নেহের প্রতিমা-ধনে!
জনক জননী অঙ্ক
তুই মা জুড়ায়ে থাক্,
স্নেহের ত্রিদিবে তোর
ভাইটিয়ে পুনঃ ডাক্;
নিরখি কৃতার্থ হব
কুসুম আনন দুটি,
বিভুর মহিমা গাথা
গাবে এক বৃন্তে ফুটি।
বিধাতার কৃপাকণা

পড়ুক্ তোমার পরে,
হওমা! রমণী-মণি
করুণাময়ের বরে!
ধর মা! কোমল হৃদে
স্বরগ ভূষণরাজি,
বিরাজ এ ধরামাঝে
মনোরম দেবী সাজি!
লভুক তোমার ক্রোড়ে
জীবগণ অসহায়
করুণ-আশ্রয়ভূমি
স্নেহের শীতল ছায়।
নির্ম্মল মানসখানি
হোক্ আরো নিরমল,
উদ্ভাসিত জ্ঞানে ধর্ম্মে,
প্রেমভরে সমুজ্জ্বল!
পিতার পরাণ প্রিয়
আশার লতিকাচয়,
একক তোহতে বাছা
হোক্ কালে ফুলময়!
জননী-হৃদয়ে নিতি
নব নব প্রীতিজল
সেচি, সে তপত হিয়া
কর তুমি সুশীতল।
সুখে তোর হোক্ তোর
সারাটি জীবন রাতি,
ছড়াক পুণ্যের শশী
ধরাময় যশোভাতি!
উদ্দেশে সস্নেহাশীষ,
পরম পিতার স্মরে
দিনু তোর ক্ষুদ্র শিরে
সমগ্র হৃদিটি ভরে;

প্রভাত হইলে নিশা
পুলকে ভরিবে বুক,
খুলিবে সুখের উৎস,
হেরি ও নলিন মুখ !
দীনা আমি, কোথা পাব !
রত্নভূষা, অলঙ্কার,
দেখিব মু'খানি তাই
দিয়ে এই উপহার !

ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ—মেদিনীপুর।

বন্ধু

কাঁপিছে নয়ন কাঁপিছে হৃদয়
চরণ কাঁপিছে সঘনে ওই,
হৃদয়ের ভাব লুকাব ভেবেছি
লুকাতে সে ভাব পারিনু কই ?
যাঁহার লাগিয়ে হৃদয়-কাননে
পবিত্র কুসুম সোহাগে ফুটে,
জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে ধীরে
মলয় পরশে বিকাশি উঠে।
(যদিও) ছাড়িয়া গিয়াছে, ফিরি ফিরি চায়,
ঘুরি ঘুরি আসে দেখিতে পুনঃ।
(সে) যাইতে পারে কি বেন্ধেছি শিকলে,
ভালবাসা ! মরি তোর কি গুণ !

শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১৩০৪ সালের বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

১২। পুস্তকাদি সমালোচনা।

১৩। বামারচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৬ বর্ষ। ৪০০ সংখ্যা। | বৈশাখ ১৩০৫—মে, ১৮৯৮ | ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০৫ সাল।

ইং ১৮৯৮-৯৯।

সংবৎ ১৩৫৫-৫৬, শক ১৮২০,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৯-৭০।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
শু	র	বু	শু	সো	বৃ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

*কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
শ	ম	বৃ	র	বু	বু
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ	তারিখ					কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বু	শ	ম	শ	ম	শু	‡১	৮	১৫	২২	২৯	সো	বু	বৃ	শ	র	ম
বৃ	র	বু	র	বু	শ	২	৯	১৬	২৩	৩০	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	৩	১০	১৭	২৪	৩১	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	৪	১১	১৮	২৫	৩২	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৫	১২	১৯	২৬		শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৬	১৩	২০	২৭		শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৭	১৪	২১	২৮		র	ম	বু	শু	শ	সো

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	২০	১৯	১৭	১৪	১৩	১১
পূঃ	২৪	২২	২০	১৮	১৬	১৪
কৃঃ এঃ	৫	৩	১|৩১	২৯	২৭	২৬
অঃ	৮	৬	৫	৩	১|৩১	৩০

শুঃ এঃ = শুক্ল একাদশী। কৃঃ এঃ = কৃষ্ণএকাদশী। পূঃ = পূর্ণিমা। অঃ = অমাবস্যা।

**পরীক্ষা—২৪এ বৈশাখ শুক্রবার, ২২এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ৮ই বৈশাখ বুধবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

*বৈ—বৈশাখ বুধবারে আরম্ভ, ৩১শে শেষ। †এপ্রেল শুক্রবারে আরম্ভ, ৩০শে শেষ। *কা—কার্ত্তিক সোমবারে আরম্ভ ৩০ শে শেষ। অ—অক্টোবর শনিবারে আরম্ভ ৩১ শে শেষ।

‡১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা বৃহস্পতি ইত্যাদি। ১লা জ্যৈ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি। বৈ বুধ—১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ জ্যৈ শুক্র—১, ৮, ১৫, ২২, ২৯; ১৩ই, ২০এ, ২৭এ এপ্রেল বুধবার এবং ৪, ১১, ১৮ মে বুধবার ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ	৯	৯	৯	৯	১০	১০
পূঃ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৪	১৩
কৃঃ এঃ	২৫	২৪	২৫	২৪	২৫	২৪
অঃ	২৮	২৭	২৮	২৭	২৮	২৭

*পরীক্ষা ৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার এবং ৯ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্ল একাদশী। ২৫এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার এবং ২৪এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নব বর্ষ।

নব বর্ষ! খুলি স্বর্গদ্বার
দেখাইলে অদ্ভুত ব্যাপার—
এ সংসার ছায়াময়, ক্ষণে জন্ম স্থিতি লয়,
বিধির বিধান চমৎকার।

জীবনের মৃত্যু পরিণাম,
বহে স্রোত সদা অবিরাম;
ভাসে জীব শত শত, সংযোগ বিয়োগ কত,
কোন্ ধামে সবার বিশ্রাম?

ঘর বাড়ী ধন পরিজন,
সব হেথা নিশার স্বপন!
এই আছে নাই আর, আমার নহে আমার,
অহমের * সবংশে নিধন।

এ পারের গণ্ডগোলচয়,
"হরিবোল" দিয়া শেষ হয়,
গোলে হরিবোল দিয়া, পাছু যারা আগুড়িয়া,
খেলায় মাতিয়া তবু রয়।

ও পারে সত্যের মহাদেশ,
মরণের নিষেধ প্রবেশ,
নিত্য প্রাণ নিত্যালোক, নাহি রোগ জরা শোক,
নাহি চিন্তা ভয় দুখ ক্লেশ।

অমৃত পুরুষ জ্যোতির্ম্ময়,
সদানন্দ মঙ্গল-আলয়,
সে দেশেতে স্বপ্রকাশ, দরশ পরশ আশ
পুরান সে নিত্য লীলাময়।

অমরদিগের মহামেলা,
প্রেমের অপূর্ব্ব দেব-খেলা;
প্রেমে নাচে প্রেমে গায়, প্রেমানন্দে সবে ধায়,
প্রেমচন্দ্রে দেখে সারা বেলা।

সবাই পবিত্র-দরশন,
সুপবিত্র বসন ভূষণ,
অমরের তৃষা ক্ষুধা, দূর হয় পিয়ে সুধা,
অমৃতেতে পূর্ণ সে ভুবন।

কল্পতরু-মূলে করি বাস,
মিটে সব প্রাণের পিয়াস;
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুর অভাব নাই,
প্রাণভরা আনন্দ উল্লাস।

অক্ষয় শাশ্বত সুখধাম,
ভাণ্ডার পূরিত রত্ন-দাম,
অনন্ত কালের তরে, পুণ্য শান্তি সুধা ক্ষরে,
ভুঞ্জি জীব হয় পূর্ণকাম।

মরতে বিকার বিবর্ত্তন,
নববর্ষ হবে পুরাতন;
চল যাই নিত্য দেশে, নবীন নবীন বেশে
বিকশিত হইবে জীবন।

নিত্য নব লীলা-রসময়,
পূর্ণরূপে যেখানে উদয়
নব জ্ঞান নব প্রেমে, নব সত্য নব ক্ষেমে,
নববর্ষ অনন্ত অক্ষয়।

* অহমের—অহং শব্দে আমি, আমার, আমা দ্বারা ইত্যাদি আমি সম্বন্ধীয় সকলের।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নববর্ষের ফল—পঞ্জিকার মতে নববর্ষে রাজা বৃহস্পতি, মন্ত্রী রবি, জলাধিপ বুধ। মন্ত্রীটী ভাল নয়, আর সব ভাল।

মহাযুদ্ধ—আমেরিকার কিউবা দ্বীপ স্পেনের অধীনস্থ ছিল। স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে দেশবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহাদের পক্ষীয়। এই কারণে যুক্তরাজ্যের সহিত স্পেনের মহাযুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ এই যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের শুভ চেষ্টা সফল হউক।

বঙ্গের নূতন গবর্ণর—সার জন উডবরণ বঙ্গের নূতন ছোট লাট হইয়া পরিশ্রমপূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ৫ বৎসরের জন্য তাঁহার নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি মে মাসে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন।

যুদ্ধজয়—আফ্রিকার সুদান দেশে দরবেশদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজপক্ষ জয় লাভ করিয়াছেন।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা—১৮৯৫ পর্য্যন্ত যে ১৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৪৮ কোটী, পূর্ব্বে ১৩৯ কোটী ছিল। ৯ কোটী বৃদ্ধি কম নয়।

মড়ক—নববর্ষে মড়কের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। বোম্বাই, করাচি, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমে ইহা অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে। আবার বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতাতেই ইহার প্রবেশ হইয়াছে সন্দেহ করিয়া নগররক্ষকগণ মহাভয়াক্রান্ত। লোকে দলে দলে পলাইতে ব্যস্ত।

বাঙ্গালীর গৌরব—বাবু সুরেশচন্দ্র মহলানবিশ বিলাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া কার্ডিফ কলেজে শারীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি এডিনবরার রয়াল সোসাইটীর একজন ফেলোও হইয়াছেন।

বহুরূপী পুষ্প—আমেরিকার মেক্সিকো দেশে একজাতীয় পুষ্প প্রাতে শুভ্রবর্ণ, মধ্যাহ্নে রক্তবর্ণ এবং রাত্রিকালে নীলবর্ণ হয়।

প্রাণদণ্ড—গত ১৮ই এপ্রেল বোম্বায়ের দামোদর চাপেকারের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। সে ধর্ম্মবীরের মত ধর্ম্মপুস্তক হস্তে নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। আত্মীয়েরা তাহার যথাবিধি সৎকার করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—১৮৯৮ সালের ৬ই মার্চ্চ প্রবেশিকা এবং ২১ এ

মার্চ্চ এফ এ, বি এ পরীক্ষা হইবে। আগামী এম এ বি এল প্রভৃতি পরীক্ষা ১৮৯৮ সালের ২৮এ নবেম্বর গৃহীত হইবে।

সম্পাদকের মৃত্যু—বোম্বাই সমাচার ৭৫ বৎসর কাল প্রচারিত হইতেছে। ইহার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৪০ বৎসর কাল এই কাগজ চালাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সকল সংবাদপত্রই ইহাঁর বিয়োগে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

কাশ্মীরে ভূমিকম্প—গত ১২ই এপ্রেল কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া অনেক ইষ্টকালয় ভূমিসাৎ হইয়াছে। কাছাড়, ঢাকা এবং কলিকাতাতেও কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

শোকোচ্ছ্বাস।*

(স্বর্গগামিনীর প্রতি।)

এ কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল! মা! বুক যে ফাটিয়া গেল, কলিজা যে ছিঁড়িয়া গেল, জগতের সব আলো যে নিবিয়া গেল. এ কি হইল মা? আজি নববর্ষের প্রথম দিন, আজি আমরা নব বল, নবোদ্যম, নব আশা, নব মঙ্গল এবং নবজীবন পাইবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিব, দেবতার কাছে প্রার্থিত বর পাইব, এমন শুভ দিনে সহসা এ কি সর্ব্বনাশ হইল মা? ও মা, তুমি নাকি আমাদিগকে এ জনমের মত ফাঁকি দিয়া যাইতেছ? তোমার স্নেহমাখা মুখ নাকি আমরা আর দেখিতে পাইব না, তোমার মধুমাখা কথা নাকি আর শুনিতে পাইব না, তোমার অমৃতমাখা স্নেহ নাকি আর উপভোগ করিতে পারিব না? ও মা, তুমি নাকি আর আমাদের সাথে মিলিতে মিশিতে আসিবে না? ও মা, পৃথিবী যে আঁধার হইয়া গেল, বাতাস যে থামিয়া গেল' ধারণাশক্তি যে হারাইয়া গেল, এ কি সর্ব্বনাশ হইল মা?—পৃথিবী আবার মেরুদণ্ডে ঘুরিবে, আকাশে আবার রবি, শশী, তারা জ্বলিবে, আবার মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ ছুটিবে, আবার গাছে গাছে পাখী ডাকিবে, নর নারী আবার হাসিবে কাঁদিবে, নিত্য যে সব হয় নিত্য সে সব হইবে, কেবল তুমিই নাকি মা, কেবল তুমিই নাকি আনন্দময়ী মা, তোমার সাধের ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইবে না? জগতে নাকি কত নিশা "সু-প্রভাত" হইবে, আর তোমার জন্য যে সব হৃদয় আঁধার, আঁধার, ঘোর আঁধার হইয়াছে, সে অন্ধকার নিশা নাকি আর পোহাইবে না? জগতে কত আগুন জ্বলিয়া নিভিবে, আর তোমার উপাস্য

---

*আমার মাতৃস্থানীয়া দেবী কৈলাসকামিনী দত্তজায়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত। ১লা বৈশাখ বুধবার—১৩০৫ সাল।

দেবতার—সতীকুল-গৌরব তুমি, তোমার যিনি উপাস্য দেবতা তাঁহার বুকে যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহা নাকি আর নিবিবে না? লতায় পাতায় কত ফুল ফুটিবে, আর তোমারি স্নেহের ফুল কয়টী নাকি আর সে হাসি হাসিতে পারিবে না? বুক যে ফাটিয়া গেল! বিশ্বজগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাউক, বিধাতার বিধি উল্‌টিয়া যাউক, মানবের জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যাউক, এ নিদারুণ কথা মানুষে বিশ্বাস করিবে কি করিয়া? বিশ্বাস করিলে বা বাঁচিবে কি করিয়া? যতক্ষণ আশা থাকে; ততক্ষণ মানুষের প্রাণে সবই সহিয়া থাকে, যখন আশা ফুরাইয়া যায়, তখন কেবল সহিষ্ণুতা কেন, বুঝিবা মানুষের পরমায়ুও ফুরাইয়া যায়! তাই বলিতেছি এ অগ্নিময় নিরাশার কথা, এ দারুণ সর্ব্বনাশের কথা বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই।

এ ভয়ানক কথা বিশ্বাস করিব না বলিয়াই তো তোমাকে ডাকিতেছি মা, তুমি ফিরিয়া বাড়ী এসো। স্নেহময়ী মা! আনন্দময়ী মা! করুণাময়ী মা! গৃহলক্ষ্মীর জীবন্ত প্রতিমা মা! তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া এসো। যাইও না মা, তুমি গেলে যে তোমার আনন্দপুরী দুঃখের ভরা হইবে, তোমার দেবতা স্বামী "গৃহশূন্য" হইবেন, তোমার স্নেহের সন্তানেরা "হতভাগা" হইবে, তাদের সঙ্গে শত শত লোক "মাতৃহীন" হইবে, শত শত দুঃখী-জন ব্যথার ব্যথী হারাইবে, ফুলবন শ্মশানে পরিণত হইবে, আর সেই বুক-ভাঙ্গা কথা, সেই সর্ব্বনাশের কথা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাই সাধিতেছি মা! তুমি ফিরিয়া এসো।

তুমি কোথায় যাইতেছ মা, স্বর্গে যাইতেছ? কেন যাইতেছ মা, তোমার কিসের অভাব যে তাহা পূর্ণ করিতে স্বর্গে যাইতেছ মা? তোমার সুখের অপেক্ষা স্বর্গসুখ কিসে শ্রেষ্ঠ মা? যাহাদের সুখ নাই, শান্তি নাই, যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ পূর্ণ হইবার উপায় নাই, তাহারাই এ জগতে থাকিতে চায় না, তাহারাই সকল জ্বালা জুড়াইতে স্বর্গে যাইতে চায়; তুমি নারীকুলের ভূষণ-স্বরূপা দেবি! ভগবান্, তোমাকে অনন্ত সুখ ও সৌভাগ্য দিয়াছেন, তুমি আবার কিসের জন্য স্বর্গে যাইবে মা? তোমার পিতৃকুল, পতিকুল সৌভাগ্য ও সাধুতায় পরিপূর্ণ, তুমি যাঁহার সহধর্ম্মিণী তিনি নরদেবতা, তোমার শিশুগুলি আজিও দেবশিশু, তোমার বালিকাগুলি আজিও দেববালা; তোমার সোণার সংসারে বিবাদ কলহ নাই, হিংসাদ্বেষ নাই, অভাব দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, অবিচার অধর্ম্ম নাই; তোমার গৃহে পীড়িত সেবা পাইয়া থাকে, বিপদ্‌গ্রস্ত সু-পরামর্শ পাইয়া থাকে, ব্যথিত প্রাণ-জুড়ানো কথা শুনিয়া থাকে, ত্রিতাপদগ্ধ ভগবানের নামামৃত পান করিয়া থাকে। রমণীর যাহা জাতীয় অলঙ্কার, তাহা সবই তোমার হৃদয়ে শোভিত হইয়া আছে; তোমার ধর্ম্মভাব, সতীত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুবিবেচনা, লজ্জা,

দৈর্য্য, করুণা, সহিষ্ণুতা, তোমার পতিপ্রেম সন্তানস্নেহ, ভ্রাতৃবাৎসল্য, দীনে দয়া, বিশ্বময়ী মমতা, সুগৃহিণীপনা, সবই পরিমার্জ্জিত, সবই উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে দেবীরূপে সাজাইয়াছে! তোমাকে ভগিনী পাইয়া তোমার সহোদরেরা কৃতার্থ, তোমাকে সহধর্ম্মিণী পাইয়া তোমার দেবতা স্বামী কৃতার্থ, তোমাকে জননী পাইয়া তোমার সন্তানেরা কৃতার্থ, তোমাকে "মাঠাকুরাণী" পাইয়া তোমার দাসদাসীগণ কৃতার্থ, তোমাকে "সাম্রাজ্ঞী" পাইয়া তোমার সংসার কৃতার্থ, তোমাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়া আমাদের শত শত প্রাণও কৃতার্থ! কত পুণ্যবলে এত সুখ এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারা যায় তাহা কে বলিবে?—তাই বলিতেছি মা, এ অনির্ব্বচনীয় সুখ, অপরিসীম সৌভাগ্য রাশি, পঠিত গ্রন্থের মত, শিশুর পুরাতন খেলানার মত, সংযমীর ভোগ সুখাকাঙ্ক্ষার মত অনাদর করিয়া, উপেক্ষা করিয়া, অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইও না মহানবমীর দিনে বিজয়া দশমী ঘটাইও না, মা, তুমি ফিরিয়া এসো। তুমি আসিলে আবার চাঁদ উঠিবে, আবার তেমনি ফুল ফুটিবে, তোমার জন্য যে সকল বুকে সূচীভেদ্য নয় অন্ধকার ছাইয়া গিয়াছে, সেখানে আবার উষা হাসিবে, তাই বলি মা, তুমি ফিরিয়া এসো। স্বর্গে তোমার কি সুখ বাড়িবে মা? তুমি স্বর্গের মেয়ে, তুমি যেখানে থাক, সেইখানেই তো স্বর্গ; তোমার ঐ দেব-হৃদয়খানি লইয়া যেখানে দাঁড়াইবে, সেইখানেই তো অমরাবতী হইবে; তুমি তোমার স্নেহ প্রীতি যেখানে বিলাইবে, সেই খানেই তো কনক পারিজাত ফুটিবে; তোমার ধর্ম্ম ভক্তি যেখানে প্রকাশিত হইবে, সেই খানেই তো অমৃত-স্রোত উথলিয়া উঠিবে, তুমি স্বতন্ত্র স্বর্গে কেন যাইবে মা? আচ্ছা, এত দিন তো তুমি যাইতে চাহ নাই। যে দিন দরিদ্রতার প্রতিকূলে যুঝিয়াছিলে, যে দিন তোমার পতি দেবতাকে শুশ্রূষা করিয়া দারুণ রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে, যে দিন তোমার গর্ভস্থ শিশু মৃত দেহে জগতে আসিয়াছিল দেখিয়া "আমার ত্রুটিতে বা এমন হইল" ভাবিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়াছিলে, সে রকম দুর্দ্দিনে তো তুমি পলাইতে চাহ নাই; আর আজি ভগবদ্ভক্তির মহিমা জানাইয়া, সহিষ্ণুতার গৌরব দেখাইয়া, বীরাঙ্গনার মত পতি, পুত্র কন্যা সকলকে নিরাপদে রাখিয়া চলিয়া যাইতেছ কেন মা? তোমার সাধের ফুলবাগানে বজ্রাঘাত করিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ কেন মা?—আমি বুঝিয়াছি, তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি মা, এতগুলি প্রাণ কাঁদাইয়া, প্রাণের জিনিস সব ফেলিয়া দিয়া, তুমি সাধ করিয়া যাইতেছ না, তোমার মত কোমলপ্রাণা রমণীরত্ন তাহা কখনই পারে না। তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়াই তুমি যাইতেছ, না গিয়া থাকিতে পারিতেছ না, তাই তুমি যাইতেছ। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ করিয়া কে

তোমাকে লইয়া যাইতেছে মা? মৃত্যু? সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের নাম মৃত্যু? এ রাঁধা ভাতে ছাই দিতে, এ পাকা ধানে মই দিতে, এ দেবতার বুকে আগুন জ্বালিতে, এ কচি কচি প্রাণে দারুণ আঘাত করিতে, এ সোণার পুরী আঁধার করিতে, সে পাপিষ্ঠের প্রাণে একটু কি মমতা হইল না? তার পোড়া চোখে কি এক ফোঁটা জল আসিল না? হা ভগবান্! এমন নির্ম্মম মৃত্যুকে তুমি মারিয়া ফেল—এমন হৃদয়হীন পাষণ্ডকে তুমি পর্ব্বতে আছাড়িয়া, আগুনে পোড়াইয়া মারিয়া ফেল; নৃশংস শাস্তি পাউক, তোমার দয়া ধন্য হউক!—

না না, আমার ভুল হইয়াছে! মাগো! তোমার এই অকাল শোকে, অভাবনীয় শোকে আমার স্মৃতি বিভ্রম ঘটিতেছে!—কেন ঘটিবে না মা, আমি আমার নিজের কথা বলিতেছি—আমি তোমার গর্ভজাতা না হইলেও তোমার কন্যা; আমি তোমার নিকটে রোগে শুশ্রূষা পাইয়াছি, শোকে সান্ত্বনা পাইয়াছি, সুখে দুঃখে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি পাইয়াছি, তোমার গর্ভজাতা কন্যাদিগের মত মা, এ অভাগিনীকেও তুমি শত প্রকারে আদর, স্নেহ, যত্ন ও পরিচর্য্যা করিয়াছ। হায়! ভবিষ্যৎ-অন্ধ মর মানব আমি তোমাকে দেবী বলিয়া চিনিতে পারি নাই—স্নেহময়ী মা বলিয়া ভাবিয়াছি; তাই আর এ জীবনে তোমাকে দেখিতে পাইব না জানিয়া আমার স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিতেছে! কিন্তু এখন আবার মনে পড়িতেছে—ভগবান্ মনে করাইয়া দিতেছেন—তিনি অসময়ে মানবকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া তিনি মনে করাইয়া দিতেছেন, তাই আমার মনে পড়িতেছে, মৃত্যুই মর মানবকে অমৃতধামে লইয়া যায়; তুমি সেই মৃত্যুর জন্যই আজ অজর, অমর, শান্তিময় আনন্দপুরে পৌছিয়া সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি সতীগণ সহ মিলিত হইয়া, বিশ্বজননীর স্নেহের কোল অধিকার করিতেছ! এত দিন তুমি সহস্র সৌভাগ্যবতী হইলেও, এ জরা-মরণ-পাপ-সঙ্কুল জগতে তোমার অনেক দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা হইত, অনেক দুর্ভাবনা হইত; আজি সেই ভয় ভাবনা ঘুচিয়া গেল, আজি তুমি স্বর্গের মেয়ে স্বর্গে গেলে! তাই বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এ আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য ও উন্নতির মূল যে মৃত্যু, তাহার মরিয়া কাজ নাই। এখন তুমি মা, তোমার এ অধম সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ঐ কথাটা ভুলিয়া না যাই মৃত্যুই মর মানবকে অমৃতধামে, বিশ্বজননীর স্নেহের কোলে লইয়া যায়, আমি যেন ঐ কথাটী ভুলিয়া না যাই;—তাহা হইলে যখন এই ভয়ানক দিন মনে পড়িবে, যখন নিমতলার মহা-শ্মশান মনে পড়িবে, যখন সুবর্ণ প্রতিমা-বিধ্বংসী-চিতানল মনে পড়িবে, যখন সতী দেহ-ভস্ম-প্রক্ষালন-কারিণী পবিত্রা জাহ্নবী মনে পড়িবে, যখন বিজয়াদশমীর চণ্ডী মণ্ডপের মত তোমার স্নেহ ভবনের শূন্য-

মমতা মনে পড়িবে, যখন তোমার আঁচলের মাণিক, নয়নের পুতুল শিশুগুলি তোমারি জন্য আবদার করিতেছে মনে পড়িবে, যখন তোমার জন্য প্রাণ পুড়িবে, যখন তোমার জন্য বড় কান্না পাইবে, তখনই মনে করিব, মৃত্যু সেই স্নেহময়ী মা'কে অমরধামে লইয়া গিয়াছে; সেখানে তিনি, মা' বিশ্বজননীর স্নেহের কোলে অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ আর অনন্ত শান্তি লাভ করিতেছেন! তখনই মনে করিব, এত দিন মা মানবী ছিলেন, এখন দেবী হইয়াছেন, এত দিন তিনি বাহিরের জিনিষ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিলেন, এখন ভিতরের পদার্থ্য ধ্যানপ্রাপ্য। হইয়াছেন; সন্তান যখনই মনে করিবে, তখনই তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন এই রকম আপনা ভুলিয়া তোমাকে ভাল বাসিতে পারি, এ দারুণ শোক বুকে চাপিয়া, তোমারই (অদৃশ্য) সুখে যেন সুখী হইতে পারি, তাহা হইলে এ মরু-ভূমিতেও ফুল ফুটিবে, এ দগ্ধ প্রাণেও আরাম আসিবে।

একজন হতভাগিনী কন্যা।

মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণে

"মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্র হৃদয়া শিবা।
দেবী ত্রিভুবনী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা।
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া।"

একি শুনিলাম মাগো! প্রাণ ফেটে যায়,
তোমারে পাব না আর খুঁজি এ ধরায়!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো মাগো অকস্মাৎ,
ফাঁকি দিয়ে গেলে তুমি ফেলি অভাগায়,
শেষ দেখা একবার হল নাক' হায়!
আবাসে ঘুমায়েছিলে সুখের শয়নে,
স্বপনে প্রবাস বলি পড়িল কি মনে?
তাই মা ঘুমের ঘোরে তাড়াতাড়ি স্নেহডোরে
ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলে বিমুক্ত বিমানে,
বর্ত্তমান ডুবে গেল অতীতের ধ্যানে।
তাই নাকি ফেলে গেলে প্রাণের পুতুলি—
অধীর অধীরা এই পুত্র কন্যাগুলি।
তাই কিগো বিসর্জ্জন দিলে প্রিয় পরিজন,
ক্ষণ না ফিরিলে—নাহি চে'লে মুখ তুলি,
অম্বরে অদৃশ্য হ'লে সকলেরে ভুলি।
জগৎ-রহস্য চিত্র এতদিন পরে
কে খুলিল ধ'রে তব চক্ষের উপরে?
তাই মাগো বেলাবেলি ব্যস্ত হয়ে গেলে চলি,
সঞ্চিত অক্ষয় ধন পুটুলিতে করে,
অসার অনর্থ যত র'ল হেথা পড়ে।
সংসার বড়ই প্রিয় ছিল যে তোমার,
আদর্শ করিয়াছিলে তব পরিবার;
রোগে শোকে হয়ে ক্ষীণ তবু মা একটী দিন
দেও নাই কারো হাতে সংসারের ভার,
সব দিক্ দেখিয়াছ একা অনিবার।
ধরম করম দুয়ে অপূর্ব্ব মিলন

তোমাতে দেখাল বিধি করি সংঘটন।
প্রাণ দিয়ে পরমেশে সুখে দুখে কায় ক্লেশে
সতত গৃহীর ব্রত করেছ পালন,
একদিন (ও) অবসাদে করনি শয়ন।
তাই কি গ্রাসিল আসি চির অবসাদ—
তাই কি ঘটিল আজি এই পরমাদ—
মনে হলে হায় হায়! প্রাণ যে মা ফেটে যায়,
আর না ঘুচিবে কভু এ ঘোর বিষাদ,
কি পাপে সাধিল বিধি হেন বিসম্বাদ?
ভাবিতে পারি না মাগো তব অন্তর্ধান,
এই যে তোমার চিত্র দেখি মূর্ত্তিমান।
এই যে স্নেহের স্বরে সকলে আহ্বান করে
কত মতে করিতেছ সন্তোষ বিধান,
এই যে জীবন্ত মূর্ত্তি দেখি বর্ত্তমান।
ওই যে তোমার কথা পশিছে শ্রবণে,
অই যে তোমার ছবি ভাসিছে নয়নে।
ওই যে মা ঘরে বসে প্রিয় পুত্র কন্যাপাশে
দিতেছ তাদেরি খেলা আনন্দিতমনে,
ডুবিল কি এসকল জাগ্রত স্বপনে?
জানিতাম স্নেহভরা হৃদয় তোমার,
এই কি দেখালে মাগো নিদর্শন তার?
স্নেহের পুতুলি সম কন্যা পুত্র প্রিয়তম
কেমনে ত্যজিলে মায়া বল সে সবার,
কার কাছে দিয়ে গেলে তাহাদের ভার?
কেঁদে কেঁদে দিদিদা দিদিদা যন্তি(১) ব'লে
ডাকিতেছে কতবার কোথা লুকাইলে?
আনন্দ(২) আনন্দহীন কেঁদে কেঁদে হ'ল ক্ষীণ
শৈশবে কেন মা তারে মা-হারা করিলে,
মায়ের উচিত কার্য্য এই কি দেখালে?
রোগে ভুগে অদ্বিগার সন্তোষ(৩) তোমার,
তার দিকে ফিরে মাগো চাও একবার;
তোমার বিহনে এবে কে পথ্য ঔষধ দিবে
কে দিবে সময়ে বল তাহাকে আহার,
কে আর রহিল বল মুখ তাকাবার?
দু দণ্ড চোখের আড়ে রাখিতে না যায়,
আজি সে প্রাণের 'সুকু'(৪) ব'ল মা কোথায়?
আর সে দুদিন পরে সুখের সংবাদ ঘরে
আনিয়ে মা বলে ডেকে শুনাইবে কায়?
ভাবিলে তাহার দুঃখ প্রাণ ফেটে যায়।
এ সুখ ঐশ্বর্য্যভার প্রদানি কাহায়
চিরদিন তরে মাগো লইলে বিদায়?
মা-হারা সন্তান গুলি বল মাগো মুখ তুলি
তাকাবে কাহার পানে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়?
কে বল ব্যথার ব্যথী রহিল ধরায়?
আত্মীয় সজন বন্ধু দেশবাসিগণ
আজি যে সকলে কাঁদে তোমার কারণ।
একবিন্দু অশ্রুপাতে প্রাণে কত ব্যথা পেতে,
আজি এ শ্রাবণ ধারে নাহি উদ্বোধন,
এমন সম্বিত-হারা হলে কি কারণ?
পূর্ব্বাপর সব কথা করিয়া স্মরণ
দুধারে ঝরিছে ধারা কে করে বারণ?
এই দুঃখ পাব বলে বুঝি বিধি তব কোলে
করেছিল অভাগার স্থান নির্ব্বাচন?
আজি মনোবাঞ্ছা তাঁর হইল পূরণ।
শেষ দেখা দেখে সেই নিমেষের তরে
কি কুক্ষণে বাড়ায়ে পা এসেছিনু ঘরে!
এ জনমে মা তোমায় দেখিব না আর হায়!
গভীর প্রাণের দুঃখ কি বলিব আর?
শুকাইল আশালতা অন্তরে আমার!
সুশীতল বটচ্ছায়ে পথিক উত্তপ্ত কায়ে

(১) দৌহিত্র। (২) কনিষ্ঠ পুত্র। (৩) মধ্যম পুত্র। (৪) সুকুমার—জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জুড়াব যেমতি, মাগো! আমি যে তোমার
পদছায়ে রেখেছিনু তপ্ত দেহ ভার;
ভেবেছিনু একদিন হইবে শীতল
ও পদ পঙ্কজ-চ্যুত লভি পরিমল,
তোমার আশীষ বলে সব দুঃখ যাবে চলে
পুনঃ এই ভগ্ন প্রাণ হইবে সবল।
হায়! অভাগার ভাগ্যে সকলি বিফল।
ভবিষ্যে নির্ভর করি আশার ছলনে
উপেক্ষা করেছি হায় সদা বর্ত্তমানে।
আমি যে যতনে তুলি একদিনও পদধূলি
লইতে পারিনি মাগো! এ সন্তাপ মনে
পোড়াইবে চিরদিন—সবে না জীবনে।
যদিও নয়ন হতে হলে মা অন্তর,
পিতৃদেব প্রার্থনায় শুনিয়াছি মনে হয়
এলোক সে লোক নহে অধিক অন্তর,
দেখো মাঝে মাঝে মাগো জুড়াও অন্তর।

তোমার ভরসা করি পিতা উদাসীন
আছেন সংসার ভার ছাড়ি চিরদিন।
বুঝিয়া কি অবসর সব ভার তাঁর পর
প্রদানি নিশ্চিন্ত মাগো হইলে এখন,
বিরাম লভিতে গেলে শান্তি-নিকেতন?
অক্ষয় আনন্দধাম হতে কোন্ জন
এসেছিল নিতে তোমা করি অন্বেষণ,
এত তাড়াতাড়ি তার, দণ্ড বিলম্ব আর
সহিল না—শুনিল না কাতর ক্রন্দন!
কাঁদে কি তোমার লাগি সুরাঙ্গনাগণ?
নববর্ষে নবগৃহে করিতে প্রবেশ
আনন্দে পরিয়ে মাগো অভিনব বেশ,
আনন্দময়ের দেশে আনন্দে গিয়েছ ভেসে
সংসারের দুঃখ জ্বালা সব হলো শেষ,
আনন্দে রাখুন তোমা প্রভু পরমেশ।

স্বর্গারোহণ।

তোমরা কেউ ছুঁয়োনা
এ রথে যাবেন মা,
সকলে চাহিয়া থাক,
এ অপূর্ব্ব শোভা দেখ,
কেউ কিছু বলো না।
নারী-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,
আগমন অবনীতে,
পতিব্রতা কুলাচার,
সত্য নিষ্ঠাব্রত যার,
পরমেশ পদে মন,
ধর্ম্মে রতি অনুক্ষণ;
আদর্শ অবলা কুলে

ধন্য মাগো জন্মেছিলে,
ধন্য মোরা সন্তান তোমার।
পালিয়াছ মাতৃধর্ম্ম,
সাধিয়াছ নিত্যকর্ম্ম,
তাই এ প্রবাস ছাড়ি
চলেছ আপন বাড়ী
পরি অপার্থিব বেশ
ত্যজি দুঃখ তাপ ক্লেশ
আজি মা আনন্দময়ী
মোরা তব গুণ গাহি
পাশরিব সব দুঃখ ভার।
সুখ উঠিল গগনে,

চলে পবন স্বননে,
আমরি আশ্চর্য্য কিবা
মায়ের উজল বিভা
দশ দিক্ আলো ক'রে
উঠিল স্বরগ দ্বারে,
আসি যত সুরাঙ্গনে
তুলি লয় সযতনে
বন্ধ হল স্বরগের দ্বার।
কর যোড়ে মা তোমায়
বন্দি পদ শতবার,
তব আশীষের বলে
যেন এই কর্ম্মস্থলে
হয়ে পাপ-তাপ-হীন
কর্ম্ম করি অনুদিন ;
তোমার আদর্শ ধরি
সংসার গহনে ঘুরি
হতে পারি ভবার্ণবে পার।
এস ভাই সবে মিলি
হরি হরি হরি বলি ;
ডেকেছেন মাকে আজ
জগতের মা,
আমরা আর
কাঁদিব না।

একটী বিশেষ কথা।*

আমরা গত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে "দেবী না মানবী" শীর্ষক একটী সুন্দর গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী সত্যঘটনা-মূলক। এক জন বঙ্গ মহিলার স্বামীর বংশ রক্ষার্থে স্বামীর পুনর্ব্বিবাহ সংঘটন, স্বপত্নী-হস্তে আনন্দে স্বামীকে সমর্পণ, জন্মের মত স্বামীর সহিত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ, সপত্নী-পুত্রকে পুত্রবৎ পালন, ইত্যাদি ঘটনা বঙ্গদেশের অদৃষ্টে অবশ্য নূতন নহে।—যে জাতির মেয়েরা গঙ্গায় শিশু ভাসাইতে পারিত, মৃত স্বামীর সহিত চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারিত, সে জাতির মেয়েদের ত্যাগস্বীকার ও সহিষ্ণুতার আদর্শস্থানীয় গল্পও ইহা অবশ্য নহে, তথাপি আজিকার দিনে গল্পটী "নূতন" বলিয়াই মনে হয়। লেখকের ভাষাও সুমধুর। উক্ত গল্পের লেখক কে তাহা আমরা জানি না ; তবে তিনি "প্রেমধর্ম্ম" রূপে বঙ্গমহিলাদিগকে যে নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে স্ত্রীজাতির একজন "শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ" বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে ; সেই ভরসাতেই আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইলাম।

গল্পাংশের অর্থাৎ যোগেশ্বরী দেবীর কার্য্য সমালোচনা, তিনি "দেবী না

* শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিলে আমরা কৃতার্থ হইব। প্রঃ লেঃ।

মানবী" তদ্বিষয়ক পর্য্যালোচনায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে জন্য সে কাজে বিরত রহিলাম। আমাদের একটী বিশেষ কথা এই যে, আমাদিগের আলোচ্য লেখক মহাশয় এ দেশের রমণীগণের একটী বড় দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সে দোষটী অনেকেই দোষ বিবেচনা করেন না, সুতরাং সে বিষয় লইয়া প্রকাশ্য আন্দোলনও হয় না; উক্ত লেখক মহাশয়ের চিন্তাশীলতা, ভাবপ্রবণতা বা অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। দোষটী এই যে "বঙ্গীয়া সাধ্বীগণ মরণকে মঙ্গল গণিতে পারেন, তবু স্বামিসদৃশ অমূল্য ধনকে পরের ভোগ্য করিতে পারেন না।" লেখক মহাশয়ের মতে ভার্য্যাদিগের এইরূপ ভাবে স্বার্থপরতার গন্ধ আছে। সেই জন্যই তিনি বলিতেছেন, "আত্ম সুখকামনা বর্জ্জিত হইয়া পরের সুখান্বেষণ করাই [illegible]। ধর্ম্ম-রাজ্যে এই প্রেমধর্ম্মেরই উচ্চাসন।" এই কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি যোগেশ্বরী দেবীর আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বঙ্গ মহিলাদিগের সামাজিক শিক্ষক, তাঁহাদিগের উপদেশ ও আদেশ বঙ্গ মহিলাদিগের শিরোধার্য্য করাই উচিত।—তবে এখন আর বলিতে দোষ কি, প্রিয় বঙ্গীয় ভগিনি! লক্ষ্মীরূপিণী গৃহলক্ষ্মি! কেবল বংশ লোপের সম্ভাবনা স্থলে কেন, তোমাকে বিবাহ করিয়া তোমার স্বামী যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকেন, তোমার বিশেষ গুণ নাই বলিয়া, বিশেষ ক্ষমতা নাই বলিয়া, তুমি মেঘনাদ বধের প্রমীলার মত বীরাঙ্গনা নহ বলিয়া, দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্লের মত সুশিক্ষিতা নহ বলিয়া, সকলের উপরে তুমি তিলোত্তমার মত সুন্দরী নহ বলিয়া, তোমার পতি দেবতার মন যদি খুঁত খুঁত করিতে থাকে —অথবা তাঁহার মনে সেরূপ হউক বা না হউক তোমার মনে যদি সেই রকম একটু আশঙ্কা হইয়া থাকে, তবে তুমি স্বামীর সুখের জন্য সেই ভগবদ্গীতার "সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি" বাক্য স্মরণ করিয়া, স্বামীর জন্য সুযোগ্যা পাত্রী খুঁজিয়া আন। তার পরে তাঁহাকে চেলীর কাপড় পরাইয়া, টোপর মাথায় দিয়া, সেই সুলোচনার হস্তে তোমার সর্ব্বস্ব স্বরূপ পতি দেবতাকে সম্প্রদান কর; এই কাজে তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম সার্থক হইবে। কিন্তু দোহাই ঠাকুরাণি! আমাকে "আক্কেল" দিও না—তোমাদের ঘরে যাহা অতি সুলভ, আমার এ পোড়া কপালে সেই "সম্মার্জ্জনী"র ব্যবস্থা করিও না। আমি তোমাদিগকে সুপরামর্শ দিতেছি—তোমাদের মঙ্গল হউক, স্বার্থপরতা গন্ধ মুছিয়া যাউক, তোমরা উদারচিত্তে স্বামীরত্ন পরকে বিলাইয়া ধন্যা হও; আমি শত মুখে তোমাদের সুখ্যাতি গাহিব।

কিন্তু এ তো রহস্য; আমাদের বিশ্বাস এই যে এ রকম কথা আজিকার দিনে বহুতর যুক্তিযুক্ত করিয়া বলিলেও

অনেকে অনুমোদন করিবেন না। বঙ্গ মহিলাদিগের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত যে তাঁহারা অনুমোদন করিবেন না, তাহা নহে। অন্ত যে কারণে তাঁহারা পতিব্রতাকর্ত্তৃক নিজ পতি অন্তাকে "অদেয়" মনে করেন, তাহাই আমাদের অন্তকার আলোচ্য।

এই প্রবন্ধ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহা-দিগের অনেকেই জানিতেছেন যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল।—প্রচলিত ছিল বলিলে [illegible]

জাতির জন্ত বহু বিবাহের পথ মুক্ত ছিল; কেন না জিতেন্দ্রিয়, আত্মসংযমী, ভোগ সুখ বিরত আর্য্য পুরুষেরা বিশেষ কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতেন না। যাঁহার প্রথমা ভার্য্যা ব্যসনাসক্তা, অধর্ম্ম-চারিণী, রোগাতুরা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কন্যা মাত্র প্রসবিনী (অর্থাৎ গৃহস্থের সহ-ধর্ম্মিণীত্বে এবং সুপুত্র প্রসবে পত্নী অযোগ্যা হইলে) তাঁহাকে দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণের অনুমতি ছিল *। পুত্রের জন্ত যাঁহাদিগের দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণের আবশ্যক হইত, সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতীক্ষা করিতে হইত (১)।

অধর্ম্মচারিণী এবং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা পত্নীর সহিত যে গৃহস্থধর্ম্ম রক্ষা হয় না, তাহা সকলে বোঝেন।—তবে জ্ঞানী দূরদর্শী আর্য্যগণ সন্তান না জন্মিলে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের ব্যবস্থা কেন করিতেন, পুত্র লাভকে বিবাহের এক প্রধান উদ্দেশ্য কেন ভাবিতেন, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমরা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এ বিষয়ে যতটুকু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে বাস্তবিক "পুন্নাম নরক" হইতে মুক্তি [illegible] এরূপ [illegible]

করিয়াছেন, তাহা নহে। সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, গুরুতর অথচ মঙ্গলজনক কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে নিয়োজিত করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে বহু কৌশল অবলম্বন করিতেন। সেরূপ কৌশল অবলম্বন করা ভাল কি মন্দ, সে কথা এখন থাকুক। আর্য্যগণ যাহা করিতেন, আমরা তাহাই বলিতেছি। আমরা যতটুকু বুঝি তাহাতে বোধ হয় যে "পুন্নাম নরক" হইতে উদ্ধার হওয়াও সেই রকম একটী কৌশল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যগণ তখন এদেশে উপনিবেশী। লোকসংখ্যায় তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহার মধ্যে আবার অনেক লোক জ্ঞানধর্ম্মার্জ্জন জন্ত ভোগ সুখ বিরত—দার পরিগ্রহে বিমুখ। অবশিষ্ট গৃহস্থগণ মধ্যে অন্ততঃ প্রত্যেক ব্যক্তির একটী করিয়া পুত্র না জন্মিলেও দিনে দিনে আর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা।

*মদ্যপাংসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাচার্থঘ্নী সর্ব্বদা॥ মনু

(১) বন্ধ্যাষ্টমে অধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা,
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ মনু।
(অপ্রিয় বাদিনীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্ত এ কথা না কি?)

আরও তাঁহারা শিশুদিগকে যেরূপ সুশিক্ষিত, যেরূপ ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বিদ্বান্, চরিত্রবান্ এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুদক্ষ করিয়া গঠন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধির সহিত জগতের ভবিষ্য-উন্নতি সাধিত হইত। সেই জন্যই অপুত্রকাদি স্থলে তাঁহারা বহুবিবাহ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তখন আবশ্যকও ছিল।

সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম চন্দ্র বলিয়াছেন "তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে সকল বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক্ সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন 'না তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।' হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর, চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। আমরা সকলেও একটু চেষ্টা করিলে এ কথা বুঝিতে পারি যে আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্য ধর্ম্ম চিরদিন অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, সামাজিক আচার ও বিধি গুলির অনেক অংশের দেশ, কাল এবং পাত্র ভেদে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেই হয়; নচেৎ মানবের জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এই কারণে আমাদের ধারণা এই যে প্রাচীন কালে বহু বিবাহের আবশ্যকতা ছিল বটে, কিন্তু এক মাত্র কারণ ব্যতীত অন্য স্থলে বহু বিবাহের আবশ্যকতা নাই। সেই এক মাত্র কারণ এই যে কাহারও স্ত্রী যদি ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী হয়, তাহাকে যদি ধর্ম্ম পথে ফিরাইবার উপায় না থাকে, তবে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য স্থলে বহুবিবাহের "আবশ্যকতা" হইতে পারে না; তবে এ কথা সত্য যে ইচ্ছা হইলে "আবশ্যক" হইয়াই থাকে, আমরা বলি সে ইচ্ছার কাজ নাই, সে "আবশ্যকে" আবশ্যক নাই।—কেন তাহা বলিতেছি।

যে যে কারণে আর্য্যগণ বহুবিবাহ বিধিবদ্ধ করেন, তাহা আমরা ইতাগ্রে বলিয়াছি। সে কালের জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা, নিষ্কাম ধর্ম্ম-পরায়ণ আর্য্যদিগের মধ্যে যে বহু বিবাহে বিশেষ কোনও অনিষ্ট হইত না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় *। কিন্তু আজিকার আত্মসংযমবিমুখ, ভোগ-সুখস্পৃহ, বিলাসী বাঙ্গালী বাবুদের পক্ষে বহু বিবাহ প্রথাকে সর্ব্বনাশিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা

* আর্য্য-ভারতে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রাজা প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, যখন অসংযত ও আপাত সুখ স্পৃহ হইয়া পড়েন, তখনই তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতায় বহু বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সকল পাপেই ভারতের কপালে আগুন লাগিল।

দ্বারা তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি, আত্মার পবিত্রতা, পারিবারিক শান্তি, সামাজিক সভ্যতা, এই সকল মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত হইয়া থাকে। এ কথা আমরাই আজি নূতন বলিতেছি তাহা নহে, বোধ হয় আমাদের জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে বহু বিবাহের কুফল আলোচিত হইয়াছে, ও এ দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহার কুফল বুঝিয়াছেন; সেই জন্যই মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই এ দেশে বহুবিবাহ, সর্ব্বজন নিন্দিত এবং সর্ব্বজন ঘৃণিত প্রথাস্বরূপ ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমাজের কোন্ কার্য্য সাধন করিবার জন্য এ দেশে বহু বিবাহ আবশ্যক হইতে পারে? যাহা সমাজের মঙ্গলকর কার্য্য, তাহা ভগবানেরই কার্য্য; সেই জন্য তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আবশ্যক। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা এমন প্রয়োজন কি?—

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-মনুষ্য পরিবার বর্দ্ধন করা, ঈশ্বরের অভিপ্রায়; তাহাই সৃষ্টি রক্ষার মূল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার জন্য এ দেশে বহু বিবাহের আবশ্যক হইবে না। কেননা (সেন্সস) লোকসংখ্যা গণনানুসারে এ দেশে লোকসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন। এ দিকে সমাজ মধ্যে বোধ হয় শতকরা এক জন স্ত্রীলোকও বন্ধ্যা দোষে দূষিতা হয় না, যদি তাহাও হইত, তথাপি এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সময়ে, শত মনুষ্যের মধ্যে এক ব্যক্তি নিঃসন্তান হইলে সমাজের কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না। যাঁহার পত্নী রোগাতুরা, তিনি মনে করিতে পারেন, স্বামী ঐরূপ পীড়িত হইলে, স্ত্রী তাঁহার সেবাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে; এস্থলে স্বামীও সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার নিজ দুর্ভাগ্য বহন করিবেন। ইহাতে সাংসারিক কিছু ক্ষতি হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ কার্য্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষকে ক্ষতির অধিক লাভবান্ করে। সুরাপায়িনী (বাঙ্গালীর ঘরে তাহা হয় কি?) প্রতিকূলা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী প্রভৃতি দোষ দুষ্টা রমণীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য এই যে ভার্য্যার সে সকল দোষ সংশোধন করিয়া, তাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করেন। যদি কোনও হতভাগিনী স্বামীর উপদেশ, তাড়না, শাসন প্রভৃতি অগ্রাহ্য করে—সংশোধনের অতীতা হইয়া পড়ে—স্বামীর কোপন স্বভাবের জন্য বা অসহিষ্ণুতার জন্য সেরূপ বিবেচিতা না হইয়া, সত্য সত্যই তাঁহার স্বামী যদি তাহাকে গৃহস্থ-ধর্ম্মের অযোগ্যা মনে করিয়া, অধিবেদন কামনা করেন, তবে তাঁহাকে করযোড়ে বলা যাইতে পারে নিজের নশ্বর সুখের জন্য মাতৃভূমির 'মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা' কেন দিবে ভাই? তুমি যে কি জ্বালায় জলিয়া

ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতেছ, অপেক্ষাকৃত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা কখনই বুঝিবে না; কেবল তোমাকে "নজীর" স্বরূপ দেখাইয়া, স্বেচ্ছাচারিতায় অনেকে অধঃপাতে যাইবে! অতএব যে মানব-জীবন জলবিম্বের মত, এই আছে এই নাই, তাহাকে তৃপ্ত করিবার জন্য—তাহাকে একটু খুসি করিবার জন্য তোমার বহু শতাব্দী স্থায়ী সমাজের উন্নতি, মঙ্গল, আরও দশবৎসর পিছাইয়া কেন দিবে ভাই? গৃহস্থাশ্রমে তোমার আর কাজ নাই—সে কাজ করিবার জন্য অন্য লোক কত শত আছে। পুরুষ তুমি, পুরুষের যোগ্য কাজ কর; পত্নীর অসদ্ব্যবহারে যদি মনঃপীড়া পাইয়া থাক, সে পত্নীকে সৎপথে আনিবার, সহধর্ম্মিণীত্বে নিযুক্ত করিবার উপায় যদি না থাকে, তবে তোমার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, জাতীয় উন্নতির জন্য সংসার-সুখকামনা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের এবং পরোপকারের জন্য আপনাকে উৎসর্গ কর। অন্যের পক্ষে এ কাজ কিছু কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার সংসারে সুখ নাই, তাঁহার পক্ষে এ কাজ সহজ। একবার এই রকম কাজ অভ্যাস করিয়া দেখ, দেখিবে সংসারের সুখ হইতে এই সুখ কত তীব্র, কত উচ্চ, কত পবিত্র! তাই বলিতেছি এ দেশে বহু বিবাহের আবশ্যক নাই (১) এ দেশে কেবল সমাজ সেবকদিগেরই আবশ্যক।

আমাদিগকে এই সকল কথা বলিতে শুনিয়া বোধ হয় অনেকে বলিতেছেন এ সব তো বহুবিবাহ নিবারক, বহু পুরাতন কথা। এখন, যাহা বলিতেছিলে—সেই যে, স্বার্থপরতা না থাকিলেও পতিব্রতা রমণী কর্ত্তৃক নিজ স্বামী অন্যকে অদেয় কেন, সে কথা বলিবে কবে? আমরা তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি যে আমরা (অর্থাৎ বঙ্গবাসীগণ) অদৃষ্টদোষে পুরাতন কথা বড়ই ভুলিয়া যাই, সে জন্য মাঝে মাঝে পুরাতন কথা সকল মনে করা ভাল। আর এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে বহুবিবাহ যে মানবের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক অশুভকরী প্রথা তাহা সকলে বুঝিয়াছেন।

এখন কথা এই যে, অনেকেই জানেন, এ দেশে বিবাহক্রিয়ার উদ্দেশ্য—প্রধান উদ্দেশ্য ভগবানের নামে দুইটী প্রাণের মিলন সম্পাদন। জ্ঞান ও ভক্তির মিলন; স্বামী জ্ঞান; স্ত্রী ভক্তি; এই উভয়ের সমবায়েই সম্পূর্ণতা। সেই একতা সম্পাদনের জন্য গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রী স্বামীর সহভোগিনী, সহযোগিনী এবং সহধর্ম্মিণী। ইহার অন্যথায় অধর্ম্মাচরণ হয়। অতএব যে পুরুষ উদ্বাহ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিবাহের উদ্দেশ্য অবহেলা করিয়া এবং সহভোগিনী সহধর্ম্মিণীকে অতিক্রম করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহন করেন তিনি (পুরুষ

(১) আমরা এই প্রবন্ধে "বহুবিবাহ" শব্দ জীবিত ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করিতেছি; মৃতদার ব্যক্তির প্রতি নহে।

বলিয়া) দেশাচারের চক্ষে যাহাই হউন ধর্ম্মের চক্ষে অবশ্য পতিত। পতির ধর্ম্মের এতাদৃশ ক্ষতি করা পত্নীমাত্রেরই অকর্ত্তব্য। পতির সুখান্বেষণ এবং তাঁহার প্রকৃত সুখেচ্ছা পরিতৃপ্ত করা ভার্য্যার অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কাহারও অন্যায্যা-কাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা বা কুকাজের সহায়তা করা মানবমাত্রেরই অকর্ত্তব্য। স্বামী যদি আচারভ্রষ্ট হন, পথ-ভ্রষ্ট হন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য—কিন্তু অন্যায় কাজে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা অতি অকর্ত্তব্য। রোগী কু-পথ্য খাইতে চাহিলে, তাহাকে নিবারণ করা যেমন উচিত, স্বামী কোনও কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কুপথে গমনোদ্যত হইলেও তাঁহাকে সেইরূপ নিবারণ করা স্ত্রীর উচিত *। অতএব দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করা স্বামীর যখন প্রকৃত সুখের কার্য্য নহে, ধর্ম্মের চক্ষে যখন উহা নিন্দিত এবং যখন কুপ্রবৃত্তি বা কুসংস্কার-বশে তিনি তাদৃশ কর্ম্মে ইচ্ছুক, তখন উহার সহায়তা করা পত্নীর ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আর বংশলোপ-ভয়ে যে ভার্য্যা স্বামীর দ্বিতীয়া ভার্য্যা সংঘটন করেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকার প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার সদ্‌জ্ঞান ও সহধর্ম্মিণীত্ব প্রশংসনীয় নহে। আমরা আগেই বলিয়াছি, এই বিশাল বঙ্গভূমিতে, বহু জনাকীর্ণ জনপদে শত ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির সন্তান না জন্মিলে, জনসমাজের কি ক্ষতি হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। তবে একটা কথা এই যে, যাহার অপত্য-স্নেহ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হয় নাই, সে কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু নিজের সন্তানেই যে অপত্য স্নেহ-বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা নহে; নিঃসন্তান ব্যক্তি যদি অন্যের শিশু প্রতিপালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার অপত্য-স্নেহ ঐ পালিত শিশুতেই বিকসিত ও চরিতার্থ হয়। সেই জন্য নিঃসন্তান ব্যক্তির ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি কোনও আত্মীয়ের শিশুকে প্রতিপালন করা উচিত। তথাপি যে দম্পতী বংশলোপ-চিন্তায় কাতর, তাঁহারা কোনও দরিদ্র-শিশুকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বংশরক্ষার উপায় করিতে পারেন। যে ঐশ্বর্য্যশালী দম্পতীর ধনোপভোগের জন্য উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, তাঁহারা যদি (ব্রাহ্মসমাজের) অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ, ভক্তিভাজন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মত, অনাথ নিরাশ্রয় শিশুদিগকে প্রতিপালন করিয়া মানুষ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধনেরও যথার্থ উপভোগ হয়, মানবজন্মও সার্থক হয়। এতদ্ভিন্ন যদি সত্য সত্যই কেহ অপুত্রতা-নিবন্ধন পুন্নাম-নরক-ভয়ে ভীত থাকেন, তবে তিনি ভার্য্যান্তর গ্রহণ না করিয়া যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিবেন। কেননা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলেন, ব্রহ্মচারী

* কুপথ-গমনোদ্যত বা কুপথগামী স্বামীকে সহধর্ম্মিণী কিরূপে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিবেন, তাহা সবিস্তর এক দিন বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যক্তিগণ অপুত্রক অবস্থাতেও স্বর্গে যাইবার অধিকারী। আমরাও বলি, যেখানে প্রবৃত্তি-সাধনা হইতে নিবৃত্তি-সাধনা শুভ-ফলদায়িনী, সেখানে নিবৃত্তি-সাধনা করিতেই হইবে। অতএব এই সকল শ্রেষ্ঠতম উপায় অবহেলা করিয়া, পথ ছাড়িয়া স্বামীকে বিপথে লইয়া যাওয়া কি সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য? আমাদের সমাজ-শিক্ষক মহাশয়েরা কি তাহাই অনুমোদন করেন?

আমাদের আজিকার শেষ কথা এই যে, স্বামী যাহাই হউন, তন্মগ্নচিত্তে তাঁহাকে ভক্তি করা, তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতি বিকাশের সহায়তা করা এবং তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাওয়া, সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্য। আর ভার্য্যা যাহাই হউন, তাঁহাকে আপনার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তাঁহারই সহিত চতুর্ব্বর্গ উপভোগ করা সাধু পতির কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথা অধর্ম্ম। যাহা অধর্ম্ম, তাহা সকলেরই পরিত্যাজ্য। সেই জন্য পতিপ্রাণা রমণীর স্বামী সদৃশ অমূল্য ধন অন্যাকে অদেয়—স্বার্থপরতার জন্য অদেয় নহে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য অদেয়।

আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে, "দেবী না মানবী" প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য সৎ এবং তিনি যে বঙ্গ মহিলাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহা আমরা বুঝিতেছি। সেই জন্য তিনি ভ্রমসঙ্কুল পথে গিয়াছেন বলিয়া আমরা দুঃখিত। ভরসা করি, তিনি আমাদের উপরে বিরক্ত না হইয়া অধিকতর উৎসাহে "প্রেম ধর্ম্ম" বিষয়ক, সুবিচারপূর্ণ উপদেশ দিবেন; বঙ্গমহিলা-গণ নতশিরে সেই উপদেশ গ্রহণ করিবেন; গ্রহণ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ এবং সুখী হইবেন। শ্রী

চুট্‌কি গল্প।

(১)

নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি ও রঘু-মণি বিদ্যারত্ন সংস্কৃত অধ্যাপক বলিয়া ভারত-বিখ্যাত। নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরো-মণি স্ব-সমকালে নবদ্বীপের একপত্রী ছিলেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জলাশয় ও দেব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের নিমন্ত্রণ পত্র কোন গ্রামে একখানি মাত্র আসিলে সেই পত্রখানি তত্রত্য যে অধ্যাপক প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে একপত্রী কহে। নবদ্বীপে একখানি পত্র আসিলে তাহা শ্রীরাম শিরোমণি পাইতেন। শ্রীরাম ও রঘুমণি দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র এখন স্বপ্নের ঘটনা হইয়াছে। এক দিকে তাঁহাদিগের যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, অন্য দিকে তেমনি ঔদার্য্য, সরলতা ও পরস্পরের ভ্রাতৃস্নেহ দৃষ্ট হইত। এই আখ্যায়িকা দ্বারা বোধ হয়

শ্রীরাম অপেক্ষাও রঘুমণির হৃদয় উচ্চ ও সরল ছিল।

কোন সময়ে শ্রীরাম রঘুমণিকে কহিলেন, "ভাই, আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইবে; নতুবা সংসারে বিবিধ গোলযোগের সম্ভাবনা।" রঘুমণি কহিলেন—

"সে কি! দাদা, ভাইতে ভাইতে পৃথক্! অন্য গৃহে, ছোট লোকের মধ্যে যাহা হয়, হউক, তুমি আমি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, তোমায় আমায় পৃথক্ হওয়া কি উচিত? তাহা কথনই হইতে পারিবে না।" তখন শ্রীরাম পুনরায় কহিলেন,—

"না,—না,—তোমায় আমায় পৃথক্ হইব কেন? মনে কর আমার তিনটী পুত্র, তোমার একটী পুত্র। তোমায় আমায় যেমন প্রণয় আছে, উহাদের মধ্যে তেমন না থাকিতে পারে। তখন বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ হইবে। পরস্পর মনোবাদে না হইতে পারে কি? তখন মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া উহারা সর্ব্বস্বান্ত হইবে। অতএব তোমাতে আমাতে প্রণয়পূর্ব্বক উহাদিগের মঙ্গলের জন্য অগ্রেই বিষয় ভাগ করিয়া রাখিলে ভাল হয় না কি?" তখন রঘুমণি কহিলেন,—

"দাদা, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী, ও পণ্ডিত আর কে আছে? আমি অনেক স্থলে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, কাহাকেও পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিতে হইলে, লোকে বলিয়া থাকে,—'ইনি যেন শ্রীরাম শিরোমণি'। দাদা, তুমি যে সুন্দর যুক্তি দেখাইলে, উহার উপর আমার কোন প্রতিবাদ নাই। তুমি এখনি ধন বিভাগ করিয়া পৃথক্ হও।"

শ্রীরাম রঘুমণির অনুমোদন লইয়া সমস্ত সম্পত্তি হিন্দু "দায়ভাগ" মতে দুই ভাগ করিলেন। বিভক্ত সম্পত্তির দুইটী তালিকা প্রস্তুত হইল। দেখিবার জন্য রঘুমণির হস্তে ঐ তালিকা অর্পিত হইল রঘুমণি তালিকা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—

"দাদা, এ কি করিলে? তোমায় আমায় পৃথক্ হইলে, বিভাগ এইরূপ হইত বটে; কিন্তু এ বিভাগ ত তোমার আমার জন্য নহে,—ইহা পুত্রগণের জন্য।" তখন শ্রীরাম কহিলেন,—

"তবে তুমিই বিভাগ কর।"

রঘুমণি, শ্রীরাম-কৃত বিভাগ অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত সম্পত্তির চারি অংশ করিলেন, তাহার তিন অংশ জ্যেষ্ঠের তিন পুত্রকে অর্পণপূর্ব্বক এক অংশ মাত্র নিজ পুত্রের জন্য রাখিলেন।

নবদ্বীপের রঘুমণি বিদ্যারত্ন এককালে এইরূপে শাস্ত্রীয় নিদেশ অগ্রাহ্য করিয়া,—স্বার্থের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, সৌভ্রাত্রের জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন!

---

(২)

রাঢ় দেশে, অর্থাৎ বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে মনোহর মুখোপাধ্যায় ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। মনোহর জ্যেষ্ঠ,

মন্মথ কনিষ্ঠ। মনোহর কর্ম্মক্ষম ও উপার্জ্জনশীল। কনিষ্ঠ মন্মথ তাদৃশ কার্য্য-পটু নহেন এবং অর্থোপার্জ্জনেও অসমর্থ। বিশেষ জ্যেষ্ঠের সাতিশয় স্নেহানুগ্রহে বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষালাভ ও অর্থো-পার্জ্জনের ক্লেশ স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন। যথাসময়েই উভয় ভ্রাতার বিবাহ হইয়া-ছিল। জ্যেষ্ঠের ঘরণী বন্ধ্যা হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠের পুত্রকন্যায় ৭৮টী। জ্যেষ্ঠ উপার্জ্জন সূত্রে প্রায়ই বিদেশে অবস্থান করেন; মধ্যে মধ্যে পূজা পর্ব্বাহে গৃহে আগমনপূর্ব্বক কনিষ্ঠের সহিত এক সঙ্গে ভোজন করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রপুত্রীগণ সহ আমোদ করিয়া এবং সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীর প্রেম-সেবায় প্রবাস-দুঃখ দূর করিতেন। এইরূপে বহুবৎসর কাটিয়া গেল।

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" — মুনিগণেরও সময়ে সময়ে মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। এমন স্থলে অশিক্ষিতা নারীগণের মতিভ্রংশ উপস্থিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা বলিয়া বা অন্য যে কারণে হউক রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ একটু সঙ্কীর্ণ এবং মলিন, - পরের শুভ বড় সহজে সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন না। শিক্ষা ও চক্ষুলজ্জার অনুরোধে ফুটিতে না পারিলেও, পরকুশল দর্শনে মন পুড়িয়া যায়। এই অন্তর্দ্দাহজনক ব্যাপার অধিক দিন স্থায়ী হইলে, তাহার মন্দ ফল বাহিরে প্রকাশ পায়। শরীর কৃশ ও বদন বিরূপ হইতে থাকে। ইহা আমাদের কল্পিত সিদ্ধান্ত নহে,—ইহার সত্যতা বিষয়ে রমণীগণের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে। যথা,

"হিংসুটেরে ভাই,
পরের ভাল দেখতে নারি,
সল্‌তে হয়ে যাই।"

মনোহরের মনোমোহিনীর এই রোগ ধরিয়াছিল। তিনি দেখিতে পান দেবর কোন কাজই করেন না,—তাঁহাদের একটু নিজাবাদ ও মহাজনী ছিল,—উত্তমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা হইতেও দশ টাকা আয় হইতে পারে,—দেবর তাহাও করেন না। কেবল কতকগুলা বহ্‌ইয়ার লইয়া অষ্টপ্রহর দাবার বোড়ে টিপেন,—আর গুড়ুক ও গাঁজার শ্রাদ্ধ করেন। ছোট বউ ভুলিয়াও একদিন রন্ধনশালায় গমন করেন না। রান্নাঘরে যাইবার অবকাশও বড় পান না। সূতিকাগারে যাইতে এবং সূতিকা-শৌচ দূর করিতেই তাঁহার প্রায় বারটা মাস কাটিয়া যায়। পুত্র কন্যাগুলি পরম-সুখে খায় পরে। মনোহর প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন,—খরচের মধ্যে নিজের অন্ন বস্ত্র এবং তাঁহার (মনোহর-মোহি-নীর) অন্ন বস্ত্র। গহনা ছোট বউর অপেক্ষা এক খানিও বেশি নহে। ভাল কাপড়ও ছোট বউর সঙ্গে সমান সমান। একা স্বামীর রোজগারের টাকা বারভূতে খাইয়া ফেলিতেছে। এই সকল কথা বড় বউ প্রকাশ করিতে পারেন না,—কেবল মনে মনে পুড়িতে লাগিলেন। শরীর কৃশ ও বদন মলিন হইতে লাগিল।

একবার পূজার সময় মনোহর বাড়ি আসিয়াছেন। প্রথম দিনই পত্নীর শরীরের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। বড় বধূর নাম সরোজিনী। মনোহর রাত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সরোজ, আজ দিবাভাগে তোমাকে বড়ই কৃশ ও তোমার মুখশ্রী মলিন দেখিয়াছি। কেন? তোমার কি কোনও পীড়া হইয়াছে?" সরোজিনী কহিলেন,—

"পীড়া ত হইয়াছে,—মরণ ত হয় না।" কথাটা শুনিয়া মনোহর মনে আঘাত পাইলেন। কহিলেন,—

"তোমার কি পীড়া হইয়াছে? কেনই বা মরণ কামনা করিতেছ?" সরোজিনী কহিলেন,—

"তুমি ভাই, ভাইয, ভাইপো, ভাইঝী লইয়া নিষ্কণ্টকে মনের সুখে সংসারধর্ম্ম করিবে বলিয়া মরণ কামনা করিতেছি।"

এখন মনোহর মুখোপাধ্যায় সকলই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, পীড়া মিথ্যা,—সরোজিনীকে দ্বেষ হিংসায় আগুনে পুড়াইতেছে। প্রকাশ্যে কহিলেন,

"সরোজ! অনেক অর্থ উপার্জ্জন করি, তোমার গর্ভে ২।৪টী সন্তান জন্মিলে বড়ই সুখ পাইতাম। বিধাতা সে সুখ আমার অদৃষ্টে লিখেন নাই। ভাগো, ভাইপো ভাইঝিগুলা খায় পরে, তাহাতেও কতক সুখ পাই। বিশেষ ভাইটা নিতান্ত অকর্ম্মা,—আমি উহার পরিবার প্রতিপালন না করিলে, ঐ গুলা অনাহারে মারা যাইত। কিন্তু তোমার ইচ্ছা যেন অন্য প্রকার বোধ হইতেছে। কেমন নয়?"

সরোজিনী সেয়ানা মেয়ে হইলে এই স্থলেই চাপিয়া যাইতেন। চাপা দূরে থাকুক, স্বামীর পরিষ্কার কৈফিয়ৎ শুনিয়া যেন অধিকতর প্রশ্রয় পাইলেন। বলিয়া বসিলেন,—

"তোমাকে কালই পৃথক্ হইতে হইবে। তুমি রক্ত জল করিয়া রোজগার করিবে, তোমার ভাই দাবা খেলিয়া ও গাঁজা খাইয়া দিন কাটাইবে। তুমি চিরকাল তাহার সাত পাল পুষিবে। ছোট বউ বার মাসই আঁতুড় ঘরে বাস করিবে। আমি একা,—খাটিয়া খাটিয়া এবং এই সব অন্যায় কাজ দেখিয়া দেখিয়া আমার দেহ মাটী হইয়া গেল। আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

মনোহরের ভ্রাতৃস্নেহ ও ঔদার্য্য একটু অল্প হইলে আমরা সুখী হইতাম। কেননা তিনি সেরূপ হইলে, সরোজিনীর মনের দুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া, যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই। প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"যদি পৃথক্ হইলেই তুমি সুখী হও, তোমার মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়, কল্যই পৃথক্ হইব। অদ্য নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাও।"

স্বামীর মিষ্ট কথা শুনিয়াই সরোজিনীর মনের দুঃখ অনেকটা কমিয়া গেল।

সহাস্যবদনে স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রত্যূষে সরোজিনীর আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহাকে লইয়া তাঁহার স্বামী পৃথক্ হইবেন। মনোহর মুখোপাধ্যায় সমস্ত সম্পত্তির ছুইটা তালিকা প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর বড় বউকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"আমি ত পৃথক্ হইবার জন্য সমস্ত বিষয়ের ছুইটী ফর্দ্দ করিয়াছি। তুমি কোন্ ফর্দ্দমত দ্রব্যাদি লইবে, বল।" বড় বউ কহিলেন,—

"কোন্ ফর্দ্দে কি কি লিখিয়াছ আমাকে পড়িয়া শুনাও,—তবে ত আমি কি লইব, ঠিক্ করিতে পারিব?" বড় বধূর স্বামী মনোহর মুখোপাধ্যায় ফর্দ্দ ছুইটী পড়িয়া বড় বধূকে শুনাইলেন। বড় বধূ শুনিলেন, যে, এক ফর্দ্দে সমস্ত সম্পত্তি লিখিত হইয়াছে এবং অন্য ফর্দ্দে কেবল "মনোহর মুখোপাধ্যায়" এই নামটী বড় বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে। ফর্দ্দটীর কথা শুনিয়াই বড় বউর মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরবে অধোবদনে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যদি বিষয় লই, স্বামী পাইব না। যদি স্বামী লইয়া পৃথক্ হই,—বিষয় পাইব না। কি সর্ব্বনাশ, কি দুষ্ট! কি নিষ্ঠুর! বুঝিলাম,—স্ত্রী বলিয়া আমার প্রতি এক রত্তি মায়া নাই। আমি যে ভাবিয়া ও খাটিয়া আধমরা হইয়াছি,—তাহা তাঁহার মনেও স্থান পাইল না ভাই,—ভাইপো উঁহার সর্ব্বস্ব,—আমি কেহই নহি। যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, এ জন্মে তেমনি ফলভোগ করিতেছি। এই নিষ্ঠুরের যেরূপ গতিক দেখিতেছি,—বেশি বাড়াবাড়ি করিলে হয়ত, ভাত কাপড়েও বঞ্চিত হইব।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে স্বামীকে কহিলেন,—"আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনাকে আপনার জন মনে করিয়াই মনের কথা বলিয়াছিলাম। এখন এ দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনারা যেমন ছিলেন, তেমনি থাকুন। আমিও আপনাদের সংসারে যেমন দাসীবৃত্তি করিতেছি,—যাবজ্জীবন তাহাই করিব। ফর্দ্দ ছুইটা ছিঁড়িয়া ফেলুন।"

মনোহর মুখোপাধ্যায় বড়ই নিষ্ঠুর। ধর্ম্মপত্নীর এত অনুনয় বিনয় শুনিয়াও তাঁহার হৃদয় একটুও আর্দ্র হইল না। স্পষ্টাক্ষরে ও উচ্চৈঃস্বরে বিবাহবাসরে গঙ্গাযাত্রার গান গাইয়া ফেলিলেন;—

"দেশে দেশে কলত্রাণি,
দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি,
যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

মনোহর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃস্নেহের এক-টানা স্রোতে দাম্পত্য প্রেম ভাসিয়া গেল

একজাতিত্ব।

স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতি ও কর্ত্তব্য যেমন্ বিভিন্ন, ঐ দুই জাতির শিক্ষা-প্রণালীও তদ্রূপ বিভিন্ন হওয়া উচিত। রমণীজাতির রমণীয় গুণগ্রাম যাহাতে বর্দ্ধিত হয়; ঐ জাতিকে তদনুরূপ শিক্ষা দানই কর্ত্তব্য। পুরুষজাতির কার্য্য-নিষ্ঠা যাহাতে বলবতী হয়, ঐ জাতিকে সেইরূপ শিক্ষার অধীন করাই উচিত। রমণী নিদাঘকালীন বটচ্ছায়ারূপিণী হইয়া গৃহ-কার্য্য করিবেন; পুরুষ বিষয়-বিষ-দগ্ধ-বাতভীষণ কর্ম্মক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করিয়া জ্বালাতন হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বটচ্ছায়ে আগমন করিয়া স্নিগ্ধ হইবেন, ইহাই যেন বিধাতৃ-বিহিত নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ব-কালে এই সিদ্ধির উপযোগিনী শিক্ষাই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বারম্ভের পর হইতে ঐ দ্বিবিধ শিক্ষার আর বড় ভিন্নতা নাই;—এখন উভয় শিক্ষাই প্রায় একরূপ হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালীতে স্ত্রীগণের স্ত্রীভাবের বিলোপ হইয়া পুংভাবের সৃষ্টি হইতেছে। স্ত্রী ও পুং প্রকৃতির মিলন-রূপ যে সংসারে একটী সুখের উৎস আছে, এখন তাহা রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। যাহাই হউক, এখন আমাদের এইরূপ বৃথা বাক্যব্যয়ের কোন ফলই নাই। তবে এ সকল কথাবতারণার তাৎপর্য্য এই, কেহ যেন এই প্রবন্ধটিকে বামাগণের অপাঠ্য না বলেন। কেননা বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা বামাগণ উচ্চশিক্ষার পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, এখন তাঁহারা যে কোন বিষয় বুঝিতে ও তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। এমন কি, এখন বামাগণের পাঠোপযোগী বলিয়া যে সকল বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে অনেক পুরুষেরও ললাট-প্রদেশ ঘর্ম্মাক্ত হয়। "একজাতিত্ব" বিষয়টি অতীব গুরুতর,—উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক পুরুষগণের তৃপ্তিজনক আলোচ্য বিষয়। কিন্তু "বামাবোধিনীর" পাঠিকাগণ উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল বুঝিতে সমর্থা হইলেও, তাঁহাদের স্বাভাবিক কোমল মস্তিষ্ক যাহাতে ব্যথিত হয়, আমরা সে ভাবে এ বিষয়টির বিচার করিব না।

অনেকের বিশ্বাস এই, ভারতবর্ষ যেরূপ বিভিন্ন-প্রকৃতিক প্রদেশনিচয়ে বিভক্ত, অধিবাসিগণ যেরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী,—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদধারী, বহুবিধ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী;—তাহাতে ভারতবাসিগণের মধ্যে একজাতিত্বের আশা করা, বাতুলতা মাত্র। কোন সময়ে একজন উচ্চশ্রেণীস্থ আইরিষ, এ দেশীয় একটি প্রধান বাঙ্গালিকে বলিয়াছিলেন,-

"প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরাজ রাজ্যের শাসনাধীনে তোমরা যে, একজাতিত্ব, বা জাতীয়ভাব রক্ষা করিবার অভিলাষ কর, সেটা তোমাদের নিতান্তই অনভিজ্ঞতার লক্ষণ।" তখন বাঙ্গালী বাবু কহিলেন,—"তবে কি, কেবল তোমাদের দাসত্ব করা এবং পূর্ণোদরে খাওয়াই আমাদের ললাটলিপি?"

"তা কেন হইবে? আমাদের জীবনবৃত্ত শ্রবণ করিয়া, কর্ত্তব্যাবধারণ কর। তোমাদের ন্যায় আমাদের দেশও ইংরাজের অধীন;—কিন্তু তোমাদের ভারতের ন্যায় আমাদের আয়র্লণ্ডে প্রতি বিষয়ে এতাদৃশ বৈষম্য নাই;—তথাপি আমি একজাতিত্ব রক্ষার অভিলাষ ও চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজের ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বাধিত হইয়াছি। এখন আর আমার কোন চিন্তা ও উদ্বেগ নাই। তোমাদেরও তাহাই।"

"যদি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারত ইংরাজের উপনিবেশ হইত, তাহা হইলেও বরং একদিন তোমার কথা গ্রাহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা এবং ইংরাজ জাতির দৈহিক প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে কস্মিন্ কালে ইংরাজগণের উপনিবেশ হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ ভারতবাসীজনগণের মধ্যে শত বিষয়ে শতবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও, এমন কি! মানব জীবনকে একীভূত করিবার প্রধানতম উপায় যে, ধর্ম্ম—ভারতীয় জাতিগণের মধ্যে সেই ধর্ম্মগত বহু বৈষম্য থাকিলেও ভারতে বহুকাল হইতে একজাতিত্ব আছে এবং চিরকাল থাকিবে।"

কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থাবলম্বী,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী,—ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও শিক্ষা সমন্বিত জাতি সকল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, ভারতের একজাতিত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে;—বর্ত্তমান ভারতে জাতীয় ভাবের প্রত্যাশা করা সুদূরপরাহত। এ যুক্তিও সমীচীন নহে। কেননা, মুসলমানই হউক, খৃষ্টানই হউক, অথবা অন্যধর্ম্মাবলম্বী অন্য জাতিই হউক, ভারতের জল মাটী প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতিতে এবং ভারতীয় হিন্দুজাতির অন্তঃপ্রকৃতিতে এমন একটী বিশিষ্ট গুণ আছে যদ্দ্বারা সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে এবং আপনার করিয়া লইতে পারে। বিশেষ পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ভারতীয় হিন্দু জাতির যে পরিমাণে আছে, পৃথিবীর আর কোন জাতির সে শক্তি সে পরিমাণে নাই। এই জন্য বহু পূর্ব্ব কাল হইতে ভারতবর্ষে বহুবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও এক সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া একজাতিত্ব, বা এক প্রাণতা ছিল। বর্ত্তমান কালেও, ভারতে বিবিধ বর্ণ, ভাষা, ধর্ম্মাদি ভেদ সত্ত্বেও এক ইংরাজী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন একজাতিত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, ভারতবাসিগণের

মধ্যে একজাতিত্ব থাকিবার বা বৃদ্ধি পাইবার অনেক ব্যাঘাত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সম্প্রীতি নাই। বিশেষ উহাদিগের মধ্যে যাহাতে সম্প্রীতি না থাকে, অন্য দিক্ হইতে প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কিছু কিছু চেষ্টাও হইতেছে। শেষ উক্তিটী অমূলক না হইলেও কোন মতেই ফলপ্রদ নহে। মুসলমান ও খৃষ্টানের সহিত হিন্দুর ঐক্যবাক্য নাই বলিয়াই বাহিরে বোধ হয় বটে এবং অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টানগণও সেরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ হিন্দুর সহিত অভ্যন্তরে ঐ এই বিধর্ম্মী জাতিরও একজাতিত্ব বা একপ্রাণতা আছে কেননা এ দেশবাসী মুসলমানগণের সহিত হিন্দুর বিশিষ্টরূপ শোণিত-সম্বন্ধ আছে। মুসলমান জাতির প্রকৃতি এই, তাহারা পৃথিবীর যে যে দেশ জয় করিয়াছে তাহাতে রাজসিংহাসন পাতিত করিয়াছে, সেই সেই দেশের স্ত্রীগণকে অধিক পরিমাণে বিবাহ করিয়া থাকেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, উচ্চবংশীয়া নারীগণকে অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে পারে নাই কিন্তু ভারতের এবং উপকণ্ঠস্থ নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। এজন্য ভারতীয় প্রায় সমস্ত মুসলমানই হিন্দুর যবনৌরসজাত। এই শোণিতসংস্রবের ফল কোথায় যাইবে? হিন্দুমুসলমানের প্রাণে প্রাণে, অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের ন্যায়, একপ্রাণতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই জন্যই কোন কোন মুসলমানবাসীন্দারের বাসিন্দারীতে গো-হত্যা বন্ধ হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে আপন অনুগত, বা আশ্রিত হিন্দুর গৃহে দুর্গোৎসব, রথযাত্রাদি হিন্দু-পর্ব্বাহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনেক মুসলমান হিন্দু গৃহস্থের ন্যায় লক্ষ্মী পূজা, ষষ্ঠী পূজা, সত্যপীর বা নারায়ণের সির্ণি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কংগ্রেস, তিলকের ও নাটুখরের কারাদণ্ড, দামোদর স্পেকারের প্রাণদণ্ড ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয় সকলে হিন্দু মুসলমানের কিরূপ এক-প্রাণতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

দেশীয় কৃত-খৃষ্টান এবং ইউরেশীয়-গণ হিন্দুকে পরিত্যাগ করিয়া সাহেব ঘেঁসা হইতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু সাহেবেরা তাঁহাদিগকে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দেন না। তাঁহাদের অন্ন সংস্থান পদোন্নতি, বৈবাহিক সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে সাহেবেরা বড় একটা মনোযোগী নহেন। আভ্যন্তরিক প্রকৃতির টানে এবং হিন্দুজাতির পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তিবশে হিন্দুর সহিতই তাঁহাদের এক-প্রাণতার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মভেদে মুসলমান খৃষ্টানের সহিত হিন্দুর এই একজাতিত্বের হানি হয় নাই এবং কোনও কালে হইবে না। তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। যাহারা স্বয়ং খৃষ্টান

হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বন পুরুষগণ ভ্রমেও হিন্দুর বিরুদ্ধবাদী হয়েন না, বরং ধর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুর সহিত এক-মতাবলম্বীই হইয়া আসিতেছেন।

আর্য্যাবর্ত্ত এবং মধ্যপ্রদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অনার্য্য-প্রদেশসকলেই অধিকসংখ্যক লোক খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। সেখানেও খ্রীষ্টানগণের সহিত হিন্দুর ধর্ম্মভেদ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভেদ নাই।

কোন সময়ে একটী প্রধান বাঙ্গালীর সহিত পণ্ডীচারি হইতে তাঞ্জোর গমনের রেলপথে তদ্দেশীয় খ্রীষ্টানের সাক্ষাৎ হয়। বাঙ্গালী বাবু তাঁহার সহিত কথোপ-কথনে অবগত হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টানটীর নাম "সুব্রহ্মণ্য" এবং তিনি চারি পুরুষে খৃষ্টান। তাঁহার নামের পূর্ব্বে বা পরে জন, পল, বা মাইকেল—এরূপ কোন খ্রীষ্টীয় উপাধি নাই। এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন অপর জাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন নাই। তাঁহার মস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় ক্ষৌরকর্ম্মযুক্ত এবং পরিচ্ছদ তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের ন্যায়। স্ত্রী পরিবার সমভিব্যাহারে তাঞ্জোরে কোন হিন্দুজাতীয় মেলা দর্শনে যাইতেছিলেন। বাঙ্গালী বাবু তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে খৃষ্টান সুব্রহ্মণ্য কহিলেন, "আমরা ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন করিয়াছি, জাতি পরিবর্ত্তন করি নাই।" হিন্দুর সহিত মুসলমান,—খ্রীষ্টানাদির একজাতিত্বের ইত্যাদি প্রকার বহুল নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাগম হওয়ায় ভারত-বাসীর একজাতিত্ব ঘুচাইয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবিধ বিষয়ে এত বৈষম্য সত্ত্বেও কিরূপে একজাতিত্ব বা একপ্রাণতা ছিল, বা হইতে পারে, এ তত্ত্বটী সকলের মস্তিষ্কে প্রবেশ করা কঠিন। সেই জন্য আমরা একটী প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা ঐ তত্ত্বটী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মানবদেহের নখ ও দন্তাবলী শুভ্রবর্ণ ও অস্থিময়, চর্ম্ম লোমযুক্ত, পাতলা ও বিস্তৃত, ওষ্ঠাধর এবং রসনা কোমল ও মাংসল, কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আকারে ও গঠনে এতাদৃশ বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহারা একপ্রাণ একটী দেহ-স্বরূপ। কেন না নখাগ্রে আঘাত লাগিলে তাহা কেশাগ্রে বাজিয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ক্ষত হইলে নেত্রদ্বয় পীড়িত হইয়া থাকে। ইহার নাম একপ্রাণতা বা একজাতিত্ব। এইরূপে কুমারিকা-বাসী কোন ব্যক্তির হৃদয়-ব্যথা, হিমালয়-বাসীর প্রাণ কাঁদাইবে এবং মণিপুরবাসীর সুখের সহিত সিন্ধুবাসীর সমবেদনা হইবে। ইহারই নাম একজাতিত্ব,—ইহারই নাম একপ্রাণতা, এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কথা আমরা পরপত্রে প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ)

কলালাপ।

(৩৯৭ সংখ্যা—৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

সূত্র-ক্রীড়া,—আমরা পূর্ব্বে একবার এই কলাটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি। ঐন্দ্রজালিকেরা উদর হইতে কিরূপে কত প্রকার সূত্র বাহির করে এবং সেই নানা বর্ণের রাশীকৃত সূত্র মুখমধ্যে প্রবেশিত করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করে, সে ব্যাখ্যায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাগবতের দশম টীকার তোষণাকরে ইহার আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্র দ্বারা পুত্তলাদি নাচান। এই পুত্তলক্রীড়া অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা অনেক দিন হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে। ক্রমে উহার উৎকর্ষই দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ পুত্তলিকার আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল। বোধ হয় উহা অর্দ্ধ ফুটের অধিক ছিল না। রজনীকালে পট্টাবাসে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহ-তারের দ্বারা ঐ পুতুল নাচান হইত। ঐ তার প্রত্যেক পুতুলের মস্তক এবং হস্ত ও পদদ্বয়ে বদ্ধ থাকে। ক্রীড়াকারী ঐ সকল তার ধরিয়া গুপ্ত স্থান হইতে পুতুলকে নৃত্য করায়। বস্ত্রাবরণ ও অল্পালোক নিবন্ধন দর্শকগণ নর্ত্তনকারক মনুষ্য ও পুত্তলিকা-বদ্ধ তার কিছুই দেখিতে পায় না,—পুত্তলিকা স্বয়ংই নাচিতেছে, তাহাদের চক্ষে এইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এই পুত্তলক্রীড়ার এখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পুত্তলিকাসকলের আকার দুই ফুট হইতে প্রায় পাঁচ ফুট দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক পুত্তলিকার নিম্নভাগে এক একটী নর্ত্তক অবস্থান করে এবং পুত্তলিকার পশ্চাদ্‌ভাগে সংযুক্ত লগুড় বা বংশদণ্ড ধারণপূর্ব্বক আপনারা নাচে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পুতুলসকলকেও নাচায়। মস্তক এবং হস্ত ও পদদ্বয়ে তার ও সূত্র উভয়ই সংবদ্ধ থাকে ঐ সূত্রাদি আকর্ষণপূর্ব্বক পুত্তলিকার হস্ত মস্তকাদি সঞ্চালন করাইয়া পুত্তলনর্ত্তন সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই নৃত্যদর্শন বিশেষ আনন্দপ্রদ; ক্রীড়কগণ বস্ত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। উচ্চ রঙ্গমঞ্চে কেবল পুত্তলিকার নর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাত্রা, অভিনয়াদিতে যাহা আছে, ইহাতেও প্রায় তাহাই আছে। যখন পৌত্তলিক ভীম ও দুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ হয়, লব-কুশ রাম-লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করেন, কৃষ্ণ-বলরাম গোষ্ঠে গোচারণ করেন, হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হয়েন, তৎপূর্ব্বে রাক্ষস মারীচ কনক-মৃগের বেশে রাম-সীতাকে ছলনা করে, দেবেন্দ্র বা নরেন্দ্রের সভায় ২।৩ যুগ্ম নর্ত্তকী যুগপৎ নৃত্য করে, পুত্তলক্রীড়ায় এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া আমরা সময়ে সময়ে বড়ই আনন্দ উপভোগ

করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে উৎসবাদিতে অন্যান্য নৃত্যগীতের ন্যায় "পুতুল-নাচ" প্রায় প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

একাংশে যাত্রাভিনয়াপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। মনুষ্য অভিনেতা যতই সুন্দর হউন না কেন, পৌরাণিক স্ত্রী-পুরুষগণের ন্যায় কখনই হইতে পারেন না। কিন্তু পৌত্তলিক অভিনেতৃগণকে কল্পনাবলে প্রায়ই পৌরাণিক স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বলা যাইতে পারে। এই জন্য যাত্রাভিনয়ের রামার্জ্জুন ও সীতা-দ্রৌপদী দর্শনাপেক্ষা পুতুলক্রীড়ার রামার্জ্জুন ও সীতা-দ্রৌপদী দেখিয়া অধিক আনন্দ হয়।

পুত্তলক্রীড়া, কোন অংশে, যেমন যাত্রাভিনয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি, কোন অংশে উহা অদ্যাপি অতিশয় হীনাবস্থায় আছে। পুত্তলিকাগণের পরস্পর কথোপকথন অতি জঘন্য ও শ্রুতিকটু। ক্রীড়কগণ তালপাতার বাঁশী দ্বারা অনৈসর্গিক স্বরে ঐ কথোপকথনের অভিনয় করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে দর্শকবৃন্দের বিরক্তি ভিন্ন কিছুমাত্র আনন্দ হয় না। এখন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে অদৃশ্য ভাবে ...বিধ প্রণালীতে কথোপকথনের সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যবসায়ীগণের হস্তে এই পুতুলক্রীড়া আসিলে, বোধ হয়, ঐ অভাব দূরীভূত হইবে। আমরা আশা করি, শ্রীপঞ্চমী-মেলার নায়কগণ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। বোধ হয় একমাত্র "ভেন্ট্রিলিকিউজ্‌ম্‌" দ্বারা ঐ অভাব পূরণ হইতে পারে।

দুর্ব্বচযোগ, — অশক্য বাক্যের কথনোপায়। ইহার আর অধিক ব্যাখ্যা আমরা করিতে পারিলাম না। বামাবোধিনীর কোন পাঠক, বা পাঠিকা এই কলা সম্বন্ধে আমাদের আশা পূর্ণ করিলে আমরা সুখী হইব

পুস্তকবাচন,—এই কলার একটী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি, এক্ষণে আর একটী পৃথক্ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম। হস্ত-লিখিত পুস্তক বহুদিনের প্রাচীন হইলে মধ্যে মধ্যে বর্ণ বা শব্দ লুপ্ত হইয়া যায়। এই কলার সাহায্যে সেই অবিদ্যমান বর্ণ বা শব্দ শীঘ্র শীঘ্র যোজনপূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করা যায়। হস্তলিখিত পুস্তকে বর্ণলোপ বা শব্দলোপের বিপত্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ সেই বিপত্তি নিরাকরণের একটী উপায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

নাটকাখ্যায়িকা দর্শন,—তত্তৎ শাস্ত্রের পরিজ্ঞান ও প্রণয়ন।

পট্টিকাবানবিকল্প,—সূত্রনির্ম্মিত ফাঁদ বা বাগুরায় যে সকল পক্ষী পতিত হয়, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য বাণ ও কলা নির্ম্মাণ।

মণিরাগজ্ঞান,—পাতরে রঙ্ করা। ইহা অতি রমণীয় ও প্রয়োজনীয় কলা। কিরূপ প্রস্তরে কোন রঙ্ স্থায়ী হয় ও শোভা পায়, তাহার জ্ঞান এই কলাসাপেক্ষ। এই কলাবিৎ ব্যক্তি ভিন্ন যে সে ব্যক্তি প্রস্তরের উপর রঙ্ করিতে পারে না।

অক্ষরমুষ্টিকাকথন,—কোনরূপ কৌতুক সম্পাদনী বিদ্যা। পূর্ব্বকালে একজনের মুষ্টিকা মধ্যস্থ অক্ষর বা বস্তুর স্বরূপ ও সংখ্যা আর এক জন বলিতে পারিতেন। পূর্ব্বকালে এই কৌতুকানন্দ উপভোগের জন্য একটী কলার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছিত বিকল্প,—যে কলার সাহায্যে দেশপ্রচলিত বিবিধ ভাষায় লিখিত নাটিকাদির ভাবাজ্ঞান জন্মে।

দেশভাষাজ্ঞান,—যে কলার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা বুঝিবার কৌশল জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

পুষ্পশকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান,—পুষ্পশকটিকা নাম্নী একটী বিদ্যা আছে। সে বিদ্যা কিরূপ এবং কোন কাজে লাগে, আমরা তাহা আপাততঃ জানিতে পারি নাই। যে কলার দ্বারা ঐ বিদ্যা লাভের উপায় জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম "পুষ্পশকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান।"

সংপাট্য,—ইহা একটী অতি প্রয়োজনীয় কলা। ইহা দ্বারা হীরকাদি সুকঠিন রত্ন এবং অন্যান্য কাচ, প্রস্তরাদি দ্বিধা বিভক্ত করা যায়। কঠিন বস্তু দ্বারা অপেক্ষাকৃত কোমল পদার্থকে অঙ্কিত করা যায়। সমস্ত ধাতু অপেক্ষা কাচ কঠিন; কিন্তু হীরকাপেক্ষা কাচ কোমল। এ জন্য হীরক দ্বারা কাচ অঙ্কিত হইয়া থাকে। কাচব্যবসায়ীদিগের নিকট লৌহ বা ইস্পাতময় শস্ত্রবিশেষের অগ্রভাগে সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র একটু হীরক সংবদ্ধ থাকে। কাচশিল্পী সেই শস্ত্র দ্বারা কাচের উপর প্রয়োজনমতে দাগ দেয় এবং সেই দাগে দাগে অতি সহজে কাচ ভিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে স্থূলতঃ কাচশিল্প সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাচকে কাটাকুটি, বা কাচের উপর সূক্ষ্ম শিল্প করিতে হইলে তাহা ঐরূপ শস্ত্রে হয় না। সে সকল কার্য্যের জন্য হীরকনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়।

হীরক এমন কঠিন যে তদ্দ্বারা সর্ব্ব ধাতু অপেক্ষা কঠিনতম যে কাচ তাহাও কাটা যায়; কিন্তু এমন কঠিন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা হীরক কর্ত্তিত হইতে পারে? যদিও আমরা তাহা অবগত নহি বটে, কিন্তু এমন পদার্থ অবশ্যই আছে। নতুবা "সংপাট্য" কলার উপযোগিতা থাকে না।

যন্ত্রমাতৃকা,—বঙ্গ ভাষায় স্বর ও হল এই দুই প্রকারে যত বর্ণ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির নাম মাতৃকাবর্ণ। সেই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা 'পূজার্থে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জ্ঞান যে কলা দ্বারা লাভ করা যায়, তাহাকে "যন্ত্রমাতৃকা" নাম্নী কলা কহে। এখনকার কালে এ সকল বিষয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু আর্য্য ভারতে এককালে ঐ সকল ব্যাপারের বিশেষ আদর ছিল। আর্য্য ঋষিগণ অবশ্যই তাহার সুফলও ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানসী কাব্যক্রিয়া,—ইহা একটী মনোহারিণী কলা। যাঁহারা এই কলা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অপরের মনস্থ ভাবানু-

রূপ কবিতা রচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং অন্যান্য শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত ও আনন্দিত করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিগণ এই কলাটী শিক্ষা করেন, ইহা আমাদের নিতান্তই বাসনা। শ্রীশিক্ষা-মেলার অধ্যক্ষগণ এ-বিষয়ে যত্ন করিলে আমরা সুখী হইব।

ক্রিয়াবিকল্প,—এই কলাটিও জন-সমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কলা-টিতে পণ্ডিতগণ কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বিবিধ উপায়ে সম্পাদন করিতে পারেন। কোন ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে সর্ব্বত্র একবিধ উপায় অবলম্বন সুবিধাজনক নহে। দেশ কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অব-লম্বন করাই সুবিধা। এই জন্যই "ক্রিয়া বিকল্পনাম্নী" প্রয়োজনীয় কলাটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দু পরিবার।

এখন অনেক মহিলারা স্বামীর কার্য্য ও পুত্র কন্যাদের প্রতিপালনের ভার দাস দাসীর হস্তে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন ও ছেলে মানুষ করাকে একটি হেয় কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। এ গৃহিণী সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি জানিতেন বেতনভোগী দাসদাসীরা কখনও সন্তানদিগকে আন্তরিক যত্ন করে না এবং সন্তানদের ভাবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের অনেক কর্ম্ম হইতে এখন অবসর লাভ করিলেন বলিয়া সন্তানদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও সু-শিক্ষার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন এবং স্বামীকে কর্ম্মস্থানে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবা করিতে ও তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। পুত্রকন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরিণামে যাহাতে সুখী ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় এজন্য ইঁহাদের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সতত সন্তানদের সুশিক্ষার উপর দৃষ্টি রাখিতেন। কর্ম্মস্থানে অধিক পরিশ্রম জন্য পুত্রদিগকে পূর্ব্বমত শিক্ষা দিতে পারিতেন না বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রদের শিক্ষার সহায়তার জন্য বাড়ীতে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পুত্রগণ উত্তমরূপ পাঠাভ্যাস করিতেছে জানিতে পারিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, নিজের অধিক পরিশ্রমসত্ত্বেও প্রত্যহ তাহাদের পাঠ দেখিতেন ও প্রত্যহ সন্তানগণকে সৎশিক্ষা এবং ধর্ম্মবিষয়ে নানারূপ উপদেশ দিতেন। ভবিষ্যতে যেন পুত্রগণ বিদ্যাবান্ ও কৃতী হয়, এজন্য ইঁহাদের বিশেষ চেষ্টা ছিল এবং সেই চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ক্রমে পুত্রগণ নানা গুণে বিভূষিত হইলেন। কন্যাগণও মাতার সৎশিক্ষা

এবং রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া মাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা সকলেই ইহাঁদের পুত্র কন্যাগণের সদ্বুদ্ধি ও শিষ্টাচার দেখিয়া প্রশংসা করিতেন।

একদা এই গ্রামের একটী পুষ্করিণীতে কোন একটী চাষার ছোট ছেলে জলমগ্ন হয়। ছেলেটীকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল গোলমাল ও চিৎকার করিতে ছিল ও কেহ কেহ ইহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া যাইতে ছিল। পথিমধ্যে এই ব্রাহ্মণের একটী ১২ বৎসরবয়স্ক পুত্রের সহিত উক্ত লোকদের সাক্ষাৎ হয়, সে এই কথা শুনিয়া বালস্বভাবসুলভ কৌতূহল-বশতঃ দৌড়িয়া সেই পুষ্করিণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এবং দেখিল যে পুষ্করিণীর পাড়ে অনেক জনতা হইয়াছে ও গোলমাল হইতেছে, কিন্তু কেহই এই বালকটীর উদ্ধারের উপায় করিতেছে না। তখন বালকটী, পুকুরের পাড়ে একটী বাঁশ ছিল, সেইটী জলে ফেলিয়া দিল ও কাহারও নিষেধ না শুনিয়া সাহসপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া সেই বাঁশ ধরিয়া উক্ত চাষার পুত্রের নিকট গেল, এবং তাহার কোমর আপন কাপড়ে বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া তীরে উঠিল। পরে সে দৌড়িয়া যাইয়া আপন মাতাকে এই সংবাদ দিল। গৃহিণী পুত্র সহিত আসিয়া দেখিলেন যে জলমগ্ন বালকটী মৃতপ্রায় হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া আগুন করিয়া তাহাকে উত্তমরূপ সেঁক দিয়া ও নূণের জল খাওয়াইয়া খুব বমন করাইয়া কিছু কাপড় গায়ে দিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন, কিছুক্ষণ পরে যখন, বালকটীকে কিছু সুস্থ দেখিলেন, তখন আপন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত চুম্বন করিলেন ও বলিলেন, বাছা! তোমার যে এরূপ বুদ্ধি ও সাহস হইয়াছে ইহাতে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি, কেননা তিনি আমার পুত্র দ্বারা একটী দরিদ্র পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন। ভগবান্ যেন তোমার শরীরে এই পরহিতবুদ্ধি ও সাহস ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেন। গ্রামবাসী সকলে ব্রাহ্মণ পুত্রের এই দুঃসাহসিকতার সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও তাহার পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিল যে তাঁহাদের শিক্ষায় ও ধর্ম্মোপদেশে এই অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ সদ্বুদ্ধি ও সাহস হইয়াছে। ৪।৫ ঘণ্টা পরে উক্ত জলমগ্ন বালকের মাতা পিতা আসিয়া কোটিকোটি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপন পুত্রকে ঘরে লইয়া গেল। আহা! ব্রাহ্মণপুত্রের কি আশ্চর্য্য দয়া! সে যদি তখন জলে না পড়িত, কৃষকপুত্র নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইত। পিতা মাতার সদুপদেশ না শুনিলে ও সৎকর্ম্ম সকল না দেখিলে অল্পবয়স্ক বালকের কখনও এরূপ দয়া ও সাহস হইত না। পিতা মাতার আচার, ব্যবহার, দেখিয়া সন্তানগণ যেরূপ শিক্ষা লাভ করে, মুখের শত শত

শিক্ষাতেও কখনই সেরূপ লাভ করে না। এই গৃহিণী ও কর্ত্তার সন্তানগণের উপর অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল, কেননা তাঁহারা জানিতেন পুত্র কন্যা ভাল না হইলে সংসার বড় অশান্তির হয় ও পিতা মাতাকে অত্যন্ত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। সন্তানদের পরিণাম যাহাতে শুভজনক হয় সেই জন্য ইঁহারা উভয়ে সতত ভগবান্‌কে ডাকিতেন ও সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। আপনারা নিজের আচরণ ও উপদেশ দ্বারা সন্তান-গুলিকে শিক্ষিত করিতেন।

ক্রমে ক্রমে পুত্রগুলি বেশ বিদ্বান্ হইলে ও এক একজন উচ্চ বেতনের পদ প্রাপ্ত হইল। কন্যা তিনটীকে সৎ-পাত্রে বিবাহ দিলেন।

ক্রমশঃ

প্লেগের ইতিহাস।

উদ্ধৃত।

অতি প্রাচীন কালেও যে এই মহামারির প্রাদুর্ভাব হইত, তাহার অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় সম্রাট জস্‌টিনিয়নের রাজত্বকালে (৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে) মিসর দেশে প্লেগ মড়ক আরম্ভ হইয়া ইউরোপের অধিকাংশ স্থলে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে মধ্য যুগে ১৩৪৭১ খৃঃ ইটালির দক্ষিণাংশে এই মড়ক আরম্ভ হইয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া ১৩৪৮ খৃঃ ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া পুনরায় ১৩৭১ খৃঃ ইউরোপের বহু দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৩৬৮ খৃঃ তৃতীয়বার এই মড়ক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইউরোপে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ইতিহাস লেখক হেকর বলেন, ইউরোপের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক—২৫ কোটিরও অধিক এই মহামারিতে আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে ইউরোপে প্রকোপ দৃষ্ট হয়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ব্লাক্‌ডেথ মহামারি ইহার চরম অবস্থা, তৎপরে অদ্যাবধি ইংলণ্ডে এ রোগ আর দৃষ্ট হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে তুরস্ক, মিসর এবং সিরিয়া দেশে এবং ইউরোপের দক্ষিণে নানা স্থানে এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৮৪৩৫ খ্রীঃ হইতে মিসর দেশ হইতে একবারে তিরো-হিত হইয়াছে। ১৮৫৩ খ্রীঃ আরবদেশে প্লেগ হয়। তদবধি মধ্যে মধ্যে ইহার সংক্রামকতার প্রাদুর্ভাব হইয়া অবশেষে ১৮৮৯ সালে এই মড়কের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পারস্য ও খুর্দ্দিস্থানে ১৮৬৩, ১৮৭১০-২, ১৮৭৬-৭ ও ১৮৮৫ সালে এই মড়ক হয়।

ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব্বে এই মড়কের

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায়, বাঙ্গালার প্রাচীন নগরগুলি এই মড়কের জন্য জনশূন্য হইয়াছিল। ১৬৯০ সালে বোম্বাই নগরে এই রোগের মড়ক হয়। গোয়ার নিকট সুলতান মোসামের সৈন্যদল এই মড়কে আক্রান্ত হইয়া এক দিবসে ৫০০ লোক মরিয়া যায়। সুরাট নগরে ১৬৮৬ হইতে ১৬৯০ সাল পর্য্যন্ত এই মহামারি ছয় বৎসর ধরিয়া প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। সেই মড়ক এত ভীষণ হইয়াছিল যে, সুরাট, দামাউন ও টানা প্রদেশের সমস্ত নগর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জনশূন্য হইয়া পড়ে। সিন্ধু প্রদেশে টাটা নগরে ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে প্লেগে ৮০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮১৬ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সময় কচ্ছ, গুজরাট, ও কাটিওয়ার প্রদেশে এই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দৃষ্ট হয়। ১৮৩৬ খ্রীঃ রাজপুতানার পাল প্রদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

১৮৫০ খ্রীঃ হইতে চীন দেশের নানা স্থানে প্লেগ আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৯৪-৫-৬ খ্রীঃ হংকং ও ক্যাণ্টন নগরে ভীষণ প্লেগ মড়ক চলিতে থাকে। নানা দেশের জাহাজ বাণিজ্যার্থ চীন দেশে যায়। সেই সকল জাহাজে করিয়া প্লেগ বীজ নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষীয়েরা নিজ নিজ বন্দরগুলিকে প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পরে এই মড়কের বীজ বোম্বাই নগরে সংক্রামিত হইয়া (ভারতে পুনরায়) ভীষণ মড়ক উৎপন্ন করিয়াছে।—সঞ্জীবনী।

মাতার চতুর্থীতে কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ।

মা শান্তশীলা! তোমার জননী আজি ৩ দিবস হইল আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আমাদিগের গৃহ শূন্য ও ঘোর অন্ধকারময়। তিনি আমাদিগের মধ্যে কাজ করিতে করিতে, আমাদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে, আমাদের সঙ্গে একত্রে দয়াময়ের নাম গাহিতে গাহিতে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন, আর আমরা তাঁহাকে কোনওরূপে খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি যেখানে গেলেন, সেখানে কি একাকী? যে জীবন ধারণ করিতেছেন তাহা কি আমাদের মত সত্য নয়? এরূপ মনে করিও না। তিনি যে দেশে গিয়াছেন সেখানে তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার কত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা প্রীতি ও আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভুবনমোহন ও তাঁহার জননী মনোমোহিনী, তাঁহার সহোদরা নিকুঞ্জমোহিনী, তাঁহার স্নেহময়ী পিতৃস্বসা পিতৃবংশীয়গণের সহিত সেখানে, তাঁহার শ্বশুর পূজনীয় হরমোহন ও শ্বশ্রূ পূজনীয়া

সর্ব্বমঙ্গলা এবং স্বর্গগত শ্বশুরবংশীয় সকলে কুলবধূকে আদর করিয়া গৃহে লইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সপত্নী কত ভক্ত সাধুগণের সহিত সেখানে তাঁহার আগমনে আনন্দ করিতেছেন। যাঁহাদিগের সহিত তিনি একত্র আশ্রমে বাস করিয়াছেন ও ব্রহ্মমন্দিরে একত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন, এমন সঙ্গী সঙ্গিনী কত তাঁহার পূর্ব্বে সেই অমৃত নিকেতন সুসজ্জিত করিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে পাইয়া কত না আনন্দ ও মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন! তিনি যেমন আমাদিগকে ছাড়িয়াও একাকী নহেন, সেইরূপ এ জীবন পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর, মহত্তর, পবিত্রতর জীবনে জীবিত। আমরা যে জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা মৃত্যুময়— রোগ, শোক, জরা, ভয় ভাবনা, মোহ মায়া, পাপ তাপ ইহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; দেহের জড়তা আত্মাকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে; বাসনার শৃঙ্খলে মন বদ্ধ হইয়া কারাবন্দীর ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তিনি ঐহিক সকল মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতলোকে অমরদিগের পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছেন, পবিত্রতার বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার ঐহিক সুকৃতির ফল স্বরূপ পুণ্যের মুকুট পরিধান করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়কে সুশোভিত করিতেছেন। তিনি পুণ্যবতী—পরম সৌভাগ্যবতী, তাঁহার জন্য দুঃখ করিবার কারণ নাই।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তি-মবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং॥

যিনি পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারশীলা ও সংযতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে অনুপম সুখের অধিকারিণী হয়েন। তাঁর পতিপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃসৌহৃদ্য, সর্ব্বজনের হিতৈষিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং ভগবদ্ভক্তি সকলই তোমরা জান। তিনি দিব্যধামে দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁর সদ্‌গুণ সকল স্মরণ ও সুযশ কীর্ত্তন করি, অমরলোকে তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া বিচ্ছেদের সমুদায় যাতনা অতিক্রম করিব এবং আমাদিগের এখানকার ভগ্ন গৃহ ও ছিন্ন পরিবার সেখানে পূর্ণ গৃহ ও চিরসুখ সম্মিলনের পরিবার হইবে দেখিতে পাইব। আমাদের এ ঘোর পরীক্ষার সময়ে এস বিশ্বাস, নির্ভর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া দয়াময়ের চরণে শরণাপন্ন হইয়া থাকি, তিনি আমাদিগের দুর্দ্দিনের পর আবার সুদিন আনিয়া দিবেন—আমাদের অন্তরের গভীরতম আশা পূর্ণ করিবেন।

"তোমার মাতার সুচরিত এই শ্রাদ্ধবাসরে তোমাদের বিশেষ স্মর্ত্তব্য। প্রাচীন ঋষিরা সুগৃহিণীর যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখ দেখি তোমার মাতা আদর্শ চরিত্রের রমণী ছিলেন কি না?

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন ও বাক্য এবং কর্ম্ম শুদ্ধ আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিয়া গৃহকার্য্যেতে সুদক্ষা হইবেন।

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী॥

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহুভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না, এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥

ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু; ভার্য্যা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গের মূল; ভার্য্যা পরিত্রাণেরও সহায়। আবার বলি—

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তি-মবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং॥

যে নারী পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারশীলা ও সংযতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরকালে অনুপম সুখের অধিকারিণী হয়েন।

মা শান্তশীলা! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি আজন্ম এরূপ মাতার চক্ষে চক্ষে রক্ষিত হইয়া তাঁহার হস্তে গঠিত হইয়াছ এবং তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্য্যের সহকারিতা করিয়া আসিয়াছ। মাতৃসেবায় তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে, মাতৃচরিত্র তোমার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আজি তোমার মাতৃহীন ভাই ভগিনীদিগের তুমিই মাতৃস্থানীয়া, তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহার মুখের পানে চাহিবে? তোমার সুকুমার মস্তকে অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার পতিত হইয়াছে, ঈশ্বর সহায় হইয়া তোমার দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন করাইয়া লউন। অদ্য তুমি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে মাতার সদ্গতি ও কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, এই শ্রাদ্ধকার্য্য এক দিনের জন্য নয়—প্রতিদিনের জীবনে তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। তোমার জননী তোমার হস্তে যাহাদিগকে গছাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তুমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আনন্দিতচিত্তে তাহাদিগের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়া তোমার জীবনকে চিরধন্য কর, ঈশ্বরের প্রসাদ এবং স্বর্গীয়া মাতার শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। তুমি সেই মাতার গুণে গুণবতী হইয়া তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও সুযশস্বিনী হও, আজি ঈশ্বর-চরণে আমাদের ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

হেঁয়ালী।

চৈত্রের হেঁয়ালির উত্তর।*

২। পবর্গ তৃতীয় বর্ণে যোজহ আকার।
আমি বিনা লোপ পায় অস্তিত্ব বাবার॥
বিবাহ বাসরে বাদে পাবে দরশন।
"বা" শব্দ আমার নাম শুভ সম্মিলন॥
৩। "বোদাম" তাহার নাম জামার বন্ধন।
প্রথম অক্ষর ছাড়ি মূল্য নিরূপণ॥
মধ্য বর্ণ ছাড়ি হয় বাজী চমৎকার।
আদি দুই বর্ণযোগে বড়ই বেতার॥
৪। চারি যুগ মধ্যে আমি কনিষ্ঠ সোদর।
আমার প্রভাবে সদা পাপে রত নর॥
"কলি" বলি মোর নাম বিদিত ভুবন।
অধর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম যত অঙ্গের ভূষণ॥
৫। এই যে ভ্রমিছে নিত্য সংসার কাননে,
পশু পক্ষী মানবাদি যত জীবগণে,
"মরণ" নামেতে কেন আতঙ্কে শিহরে,
জড়সড় কেন হয় মরণের ডরে?
জন্মিলে মরিতে হয় জান সর্ব্বজনে,
কেন নাহি সঁপ প্রাণ বিভুর চরণে?
"মরণ" সহায় যার কিবা ভয় তার?
অনায়াসে পার হয় দুস্তর সংসার॥

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দাসী।

বৈশাখের হেঁয়ালী।

প্রথম ও শেষ বর্ণে ইক্ষুদণ্ড হয়,
মধ্য শেষ বর্ণে ব্যক্তি বুঝ মহাশয়।
আদি দুই বর্ণে তিন বর্ণ সম হয়,
কি বস্তু বলিতে পার করিয়া নির্ণয়? ১
একটি বর্ণের যোগে আশ্চর্য্য ঘটন,
এক এক করি বল দেখি ভগ্নীগণ।
ধরিলাম ফল তাহা হইল কুলুপ,
ফেলিয়া কণিক পাটা মিস্ত্রী হ'ল ভূপ।
কাষ্ঠ পরিবর্ত্তে রূপ হইল কচ্ছপ,
চিহ্ন পরিবর্ত্ত হয়ে হইল হরূপ।
বৃক্ষ পরিবর্ত্ত হয়ে হৈল দীপাধার,
হস্তি-বিনিময়ে লাভ সুখাদ্য আহার। ২
পদতলে অস্থি রাখি দেখি চমৎকার,
পদার্থ গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড আকার। ৩
প্রিয়তম সঙ্গে এক মাতৃগর্ভে স্থান,
নদ নয় (তার) গভীর গর্জনে কাঁপে প্রাণ। ৫

নূতন সংবাদ।

১। ছোট লাট প্রচার করিয়াছেন কলিকাতায় (প্লেগ) মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। প্লেগের টীকা লওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিষের দ্বারা কাহাকেও আটক বা ধরাপাকড় করা

* প্রথমটীর উত্তর হাজা বা তাড়ু। ইহারা মিষ্টরসের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার আস্বাদ পায় না। লেখিকার প্রথমটী ছাড়া অন্য অন্য উত্তর ঠিক হইয়াছে। বা, বো, স।

হইবে না। পীড়াগ্রস্ত লোক আপনার বাটীর এক স্বতন্ত্র গৃহে একজন পরিচারক লইয়া থাকিতে পারিবে।

২। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ডাক্তার, আত্মারাম পাণ্ডুরাং ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

৩। বড় লাট সস্ত্রীক গত ২৭এ এপ্রেল সিমলায় পৌঁছিয়াছেন। ইঁহারা অনেক পথ পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

৪। পৃথিবীতে টেলিগ্রাফের তার সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ লক্ষ আট হাজার নয় শত একুশ মাইল বিস্তৃত হইয়াছে।

৫। সাহারা মরুভূমিতে প্রায় চারি কোটি বিঘা জমি উর্ব্বরা হইয়াছে।

৬। গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণের স্মরণার্থ ২৪৪২ বার্ষিক মহোৎসব কলিকাতার আলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহাত্মা ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বামারচনা।

নববর্ষ।

অনন্ত কালের সিন্ধু গরজিছে ভীমবেশে,
বরষ বুদ্বুদ এক, যায় তার স্রোতে ভেসে।
পুরাণ বৎসর ওই! বিদায় লইল হায়!
কত স্মৃতি বিজড়িত রহিল তাহার গায়।
অশিব, অশুভ কত-দেবতার আশীর্ব্বাদ,
হরস-উল্লাস কত বিষাদের অবসাদ;
আনন্দ-আসার কত মর্ম্মভেদী হাহাস্বর,
প্রেম, স্নেহ প্রীতি কত নিরমম অত্যাচার,
আত্মার প্রসাদ-শশী, অনুতাপ উল্কারাশি,
করুণা, মমতা কত ঘৃণা, উপেক্ষার হাসি,
স্বরগের দৃশ্যাবলী, নরকের বিভীষিকা,
নৈরাশ্যে আশ্বাস-আলো, কত আশা মরীচিকা,
আরো কত লয়ে ওই পুরাণ বরষ ধায়,
রোধিতে তাহারে কারো শকতি নাহিক হায়!
তরু, লতা, পুষ্পময় করি সমভূমি কত,
কুসুম-কাননে করি মরুভূমে পরিণত,
পঙ্কিল অধর্ম্ম-নীর ধার্ম্মিক আননে ঢালি,
মহাপাপী পাপহ্রদে ধরম অনল জ্বালি;
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি—অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় তাঁর
পুরাতন বর্ষ যায় লয়ে সুখ দুঃখ ভার।
চিরতরে চলিল সে গাহি বিষাদের গান,
নূতন বরষ আসি পূরিল সে শূন্য-স্থান।
হরষ-সঙ্গীত-মাখা নূতন বরষ পাখী,
পুলকিছে কতজনে, ভবিতব্য পক্ষে ঢাকি,
ভগন পরাণে কত আঁকিছে আশার ছবি,

আঁধার হৃদয় দেশে বিভাসিছে নব রবি।
উল্লাসে জাগিছে কত ঘুমন্ত শিথিল স্মৃতি,
শুনি তার কুহকিনী অনন্ত মধুর গীতি।
বণিক, বিপণি-পতি, ব্যবসায়ী জন যত,
নব নব আশা ফুটি উঠিছে হৃদয়ে শত।
খুলি যে যাহার খাতা গণিতেছে লাভ
ক্ষতি,
নিরাশ কাতর কেহ,কেহ উল্লসিত-মতি।
অধমর্ণ মহা ব্যস্ত করিতেছে আয়োজন,
দিতে মহাজনে ফিরে সুদ সহ মূলধন।
আমিও এ শুভ দিনে জীবনের খাতা
খুলি,
আত্মানুসন্ধান করি, হৃদি-যবনিকা তুলি।
ফুরাইলে জীবলীলা, জগত-নাথের পায়,
হিসাব যে দিতে হবে জীবনের সমুদায়,
যত দিন এ ধরায় খেলিব জীবন খেলা,
ওই ব'য়ে যায় তার একটি প্রভাত বেলা,
কিন্তু আমি সাধিয়াছি কতখানি কাজ
তার,
পাতি পাতি খাতা খুলি দেখি আজ
একবার।
ছি! ছি! একি! নিরখিলো! অনিত্য
সেবায় আমি,
ভুলিয়া সে নিত্য ধন, যাপিয়াছি দিন
যামী।
প্রভুর সংসার এই, আমি করমের দাসী,
পূজিব তাঁহারে নিতি দিয়ে ভক্তি ফুল
রাশি;
এসেছি দুদিন তরে, আমার কিছুই নয়,
কেবল তাঁহার প্রীতি সাধিয়ে পাইব লয়।
এ কথা স্মরণে রাখি করি নাই কোন কাজ
সাধিয়াছি আত্মসুখ, শত ধিক্ প্রাণে
আজ,
আজি আমি কিবা দিব? বিশ্ব-মহাজন
পায়,
সুদ ত দূরের কথা আসলই বাকি হায়!
ত্রিলোকের পতি—তাঁর কোটি প্রেম
ঋণ-জালে,
জড়িত হতেছি আমি শোধিব গো!
কোন্ কালে?
অপার্থিব রত্নরাজি দে'ছিলেন হৃদি পূরে,
হারানু সে ধন আমি হায়! কোথা? কত
দূরে?
হরষের বিনিময়ে, তুলিছে বিষাদ-সুর,
আজি এ হৃদয় মম, নিরাশায় ভরপুর!
পাপে বিমলিন চিত প্রভো! এ বিশেষ
দিনে,
হবে নাকো নিরমল তোমার করুণা-
বিনে—
(তাই) যুড়িয়া যুগল করে, প্রণমি ভকতি
ভরে,
মাগি এই ভিক্ষা নাথ! দাও বরদয়া
করে—
নূতন বরষে আমি লভিয়ে জীবন নব,
সুধাস্নিগ্ধ ও চরণে আজীবন পড়ে রব;
যাতনায়, রোগে, শোকে, জুড়াব মা!
তোরি বুকে,
তব প্রীতি-পরসাদ মাগি লব সুখ দুঃখে!
জননী! নূতন বর্ষে নূতন করিয়া মন,
বিশ্বাস, ভকতি দাও, দাও প্রীতি, প্রেম-
ধন;
নবোৎসাহ, নবোদ্যম হৃদয়ে ভরিয়ে আজ

দাও মা! এ নববর্ষে অক্ষয়, সুন্দর সাজ!
এ বরষে আর যেন নাহি হয় ঋণ ক্ষতি,
বর্ষ-অবসানে যেন হতে পারি ফুল্লমতি;
অনিত্য অসার হ'তে শত হাত দূরে থাকি,
সারাটি বছর রাখি, তোমাপরে দুটী আঁখি,
প্রক্ষালি মালিন্যরাশি তব প্রেম-সিন্ধু-নীরে,
ধরিয়ে নির্ম্মাল্য-জ্যোতি যেতেছি মা! ঘরে ফিরে,
নিবিড় নীরদরূপী সংসারের প্রলোভন,
যেন এই জ্যোতিটুকু নাহি করে আবরণ।
চরণ কমলে তব আবার বরষ-শেষে,
যেন মা! নমিতে পারি এতাধিক পূত-বেশে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

স্বর্গগতা ভগ্নী দেবী কৈলাস কামিনী।

মন্দার কুসুম কেন ফুটে পৃথিবীতে,
কেন পদ্ম পরকাশে উত্তপ্ত ভূমিতে?
দুদিনের প্রীতি দানে কেন এ ভীষণ স্থানে
কোমল কুসুম কলি কেন ফুটে হায়!
নিমেষে ফুটিয়া কেন নিমেষে শুকায়? ১
আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী,
আমাদের পূজনীয়া কৈলাস-কামিনী,
কেন এ আঁধার দেশে, সুচারু সুন্দর বেশে
কি কারণ কাঁদাইতে দীনা ভগ্নীদলে
আইলেন সংসারের ভীম মরুস্থলে! ২
নাহি স্থান রাখিবার আজ অশ্রুজল,
কাঁদিবার দিন আজ প্রিয় ভগ্নীদল,
হারাইয়া ভগ্নীধনে আজি বিষাদিত প্রাণে
বিরলে বিমনে কাঁদি ঘরে ঘরে ভাই,
এস অশ্রুজলে আজ ভুবন ভাসাই। ৩
নাই প্রিয় ভগ্নী আজ কৈলাসকামিনী,
শ্রদ্ধার সামগ্রী অতি প্রীতি-প্রদায়িনী।
পরিহরি পৃথ্বীতল, দেবতার প্রিয় স্থল
চলিলেন দেবধামে দেব-কন্যা হয়ে,
অধমা পাপিনী মোরা,মোদের ত্যজিয়ে। ৪
চিহ্নিত ভগিনী তুমি আমাদের দলে,
স্বর্গধাম যাত্রী তুমি জানিনা কি বলে!
প্রেম, ভক্তি পুষ্পহার, হৃদয়ের উপহার
ভগ্ন গৃহ হতে দিই ভগিনি তোমারে,
বিরলে বিজনে বসি সুদূর বিহারে। ৫
পাঠিকা ভগিনীগণ বামাবোধিনীর
বিসর্জিয়া সবে মিলে তীব্র অশ্রুনীর
বামাবোধিনীর পত্রে, এস আজি প্রতি ছত্রে
ভগিনীর তরে কাঁদ ভগিনী সমাজ,
বামাবোধিনীর অতি দুরদিন আজ! ৬

সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর।

দেবী কোথা গেলে?*

১

সেই যে সে দিন দেবী, দেখেছি স্বর্গের ছবি,
(যেন) মন্দার কুসুম শত জাহ্নবীর জলে।
দেবী! কোথায় গেলে?

*ভক্তিভাজন "বামাবোধিনী" সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রীর লোকান্তর গমন উপলক্ষে লিখিত।

২

সেই যে মু'খানি তব, হাস্যছটা মৃদু রব,
এখনো ভাসিছে যেন স্মৃতির সলিলে,
দেবী ! কোথায় গেলে ?

৩

শোকের লহর তুলি, স্নেহের পুতুলিগুলি
ডাকিছে অধীর ভাবে মা মা মা মা বলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

৪

দেবী ! কোথায় গেলে ?
যাঁর পদে হয়ে দাসী, সেবিয়াছ দিবানিশি,
যাঁহারে পূজিতে সদা দেবআত্মা বলে,
তাঁহারে ফেলিয়া আজি কোথা চলে গেলে ?

৫

সুখের সংসার তব, সুখ শান্তিময় সব,
সুবাসিত প্রতি হিয়া ফুল্ল প্রীতি ফুলে,
দেবী! কোথায় গেলে ?

৬

কি হবে এখন বল, অবিরল অশ্রুজল,
বহিছে দীরঘ শ্বাসে তরঙ্গ তুলে।
দেবী কোথায় গেলে ?

৭

দেবী কোথায় গেলে ?
(আজ) মর্ম্মভেদী হাহাকার, উঠিতেছে অনিবার,
তুমিগো আনন্দময়ী যেখানেতে ছিলে,
আহা কোথায় গেলে ?

৮

দেবী কোথায় গেলে ?
কোথা সে অমরাবতী, সেখানে কি সুখ সতী ?
কি লাগি গিয়েছ বিশ্বসংসারটী ভুলে,
আহা ! কোথায় গেলে ?

৯

স্বামী পুত্র কন্যা যথা, শ্রেষ্ঠ স্বর্গ আছে তথা,
সেথানেই মন্দাকিনী সুমেরুর মূলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

১০

এ অকালে হেন ভাবে, কে জানে তুমি যে যাবে,
ভাসাইয়ে প্রিয়জনে শোক অশ্রু-জলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

১১

আহা কোথায় গেলে ?
হয়ে মোরা তোমা-হারা, হয়েছি কাঙ্গাল পারা,
কাঁদিতেছি দিবানিশি পড়ি ভূমিতলে।
দেবী ! কোথায় গেলে ?

১২

গেলে যদি যাও সতী, লভগে অমরাবতী,
মিশিয়া নক্ষত্রলোকে দেবীদের দলে,
প্রীতি ভাবে পূর্ণজ্ঞানে, গিয়েছ আনন্দধামে
আদরে অনন্দময়ী লইবেন কোলে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

_ প্লেগ হাঙ্গামে প্রেস বন্ধ থাকায় এবং পারিবারিক দুর্ঘটনায় সম্পাদক মহাশয় দূর স্থানে যাইতে বাধ্য হওয়ায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশেও বিলম্বের সম্ভাবনা।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ—কার্য্যাধ্যক্ষ।

No. 401. June, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬ বর্ষ। ৪০১ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫—জুন, ১৮৯৮। ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৯ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৮০ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র উৎসব ও নূতন উপাধি বিতরণ হইয়াছে। মহারাণী চিরজীবিনী হউন।

জন্মদিনে উপাধি—মহারাণীর জন্মদিনে কাসিমবাজারের বাবু আশুতোষ নাথ রায় এবং শ্রীহট্টের শ্রীকৃষ্ণ রায় রাজা উপাধি, কলিকাতার বাবু অনাথ নাথ মল্লিক ও ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, খিদিরপুরের বাবু মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেহ কেহ "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। মেং আবদুর রহমন "খাঁ বাহাদুর" হইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাজা সীমান্তযুদ্ধে সাহায্যকারী আরও কয়েকটী মহারাজার সহিত "সি, বি" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

মৃত্যু—(১) গত ১৯এ মে মহাত্মা গ্লাডষ্টোন পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীর অদ্বিতীয় পুরুষ—রাজনীতি, সমাজনীতি, বাগ্মিতা, গ্রন্থরচনা ও ধর্ম্মানুরাগ সকল বিষয়েই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল। ২৮এ মে ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবীতে রাজব্যয়ে তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

(২) কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি যেমন সুচিকিৎসক, সেইরূপ সচ্চরিত্র ও পরোপকারী ছিলেন।

(৩) গাজীপুরের প্রসিদ্ধ পওহারী বাবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নির্জ্জন সাধনাতে

অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকিতেন এবং বায়ু আহার করিতেন।

(৪) পূর্ব্ববাঙ্গালার সমাজসংস্কারক বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদেও আমরা দুঃখিত হইলাম।

দান—ঢাকার নবাব আসান্নুল্লা টাঙ্গাইলের জলকষ্ট নিবারণার্থ ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবাহ সম্বন্ধ—(১) বড়লাট লর্ড এলগিনের প্রাইবেট সেক্রেটারী ব্যাবিংটন স্মিথের সহিত তাঁহার কন্যা এলিজাবেথ ব্রুসের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

(২) বারিষ্টার ডবলিউ সি বানর্জ্জির কন্যার সহিত ডাক্তার মল্লিকের শুভ বিবাহ হইবে। বর কন্যা উভয়েই ইংলণ্ডে এবং উভয়েই চিকিৎসা-বিদ্যায় নিপুণ। কন্যাটী কেম্ব্রিজের বি,এ, এবং সুখ্যাতির সহিত এম বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বর এম, বি, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতের এক হাঁসপাতালের ডাক্তার হইয়াছেন।

প্রিন্স রণজিৎ সিং—ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে ক্রিকেট খেলিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি যোধপুর মহারাজের খুল্লতাত ভ্রাতা। খেলায় বিলাতী ইংরাজদিগকে হারাইয়া অদ্বিতীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

সীমান্ত গোলযোগ—ওয়াজিরী নামক জাতির এক দল লোক ঝোর উপত্যকাতে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া এবং কতকগুলি উষ্ট্র হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিপক্ষেরা কিছুতেই শাসিত হইতেছে না।

রৌদ্রে গৃহ-দাহ—ডেলি নিউস বলেন, এবার মান্দ্রাজ বিভাগে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। নেল্লোর বিভাগে প্রচণ্ড রৌদ্রে অনেক গৃহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুরা নিবারণ—রেওয়ার মহারাজা আপনার রাজ্যে একটীও মদের দোকান খুলিতে দেন নাই। এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য রাজার অনুকরণীয়।

গ্রীষ্মকালে বরফপাত—গত ১৬ই মে সীমান্তের লোরাসাই গিরিমধ্যে এত বরফ পতিত হইয়াছে যে, তাহাতে ৩ জন ইংরাজ সৈনিক চাপা পড়ে, ২ জন মরিয়াছে।

ভাস্কো ডি গামা মহোৎসব—১৪৯৮ সালের মে মাসে পোর্ত্তুগিজ নাবিক গামা কালিকটে পদার্পণ করিয়া ইউরোপীয়দিগের নিকট সর্ব্বপ্রথম ভারত আবিষ্কার করেন। ইহাঁর স্মরণার্থ বোম্বাইনগরে পোর্ত্তুগিজেরা এক মহোৎসব করিয়াছেন।

কালদূত—আসামের কালাজ্বরের ন্যায় "কালদূত" নামক এক নূতন জ্বর পুর্ণিয়া জেলার স্থানে স্থানে প্রবল হইতেছে, তাহাতে শতকরা ২৫ জন লোক মরিতেছে।

হেয়ারস্মৃতি—ডেবিড হেয়ারের ৫৬ বার্ষিক মৃত্যুদিন স্মরণার্থ ১লা জুন প্রাতে কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার সমাধির নিকট এবং অপরাহ্নে বিজ্ঞানসভা-গৃহে উৎসব হইয়াছে।

জহুরা—পঞ্জাবের কুঞ্জাহি নামক এক গ্রামের এক বালিকা ভূতগ্রস্তা হইয়া পরে দেবী বলিয়া পূজিত হইতেছেন। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার স্মরণার্থ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এক দেবী-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

রমণীর দেশহিতৈষিতা—আমেরিকার এক প্রধান ধনীর কন্যা হেলেন গোল্ড মার্কিন-স্পেন যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপাততঃ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে আরও দিতে প্রস্তুত আছেন।

জাহাজ-ডুবী—মেকা ও লেণ্ডুলা নামক দুইখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে যাইতেছিল, বঙ্গোপসাগরে দুই-খানিই ভগ্ন হইয়া মেকা ডুবিয়াছে এবং কাপ্তেন সহিত কতকগুলি আরোহী মরিয়াছে। লেণ্ডুলা ভগ্নাবস্থায় ফিরিয়াছে।

ইংলণ্ডে স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসী—খ্যাতনামা বাবু আনন্দমোহন বসু ও রমেশচন্দ্র দত্ত ইংলণ্ডবাসীদের নিকট এ দেশের অনেক দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া ইংরাজদের শুভদৃষ্টি ভারতের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। রমেশ বাবু ইংলণ্ডীয় মহিলাদের জাতীয় উদারনৈতিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিলাতযাত্রা—কুচবিহারের মহারাজা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

বিবী বেজাণ্ট—ইনি এখন রোমনগরে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন।

বড় লোক কে?

বড় লোক কে? যিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক পরিবারবর্গ, কুটুম্বমণ্ডলী ও দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, না যিনি স্বীয় রণপাণ্ডিত্যে দেশ সকল জয় করিয়া বীর নামের গৌরব সাধন করেন, না সেই কূটার্থভেদী রাজ-নীতিজ্ঞ যিনি স্বীয় মন্ত্রণাবলে দেশমধ্যে নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গ উপস্থিত করিয়া যুগান্তরের সৃষ্টি করেন, না সেই বাণীপুত্র বাগ্মিবর যিনি আপনার বাক্‌পটুতা দ্বারা মানবমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সাংসারিক বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, না যিনি সাহিত্যমন্দিরে প্রধান অধিনেতা হইয়া সাহিত্যদেবীর পদ-সেবা করতঃ জগতে চিরযশস্বী হয়েন, না যিনি মানবদুঃখাপনোদনের জন্য স্বার্থত্যাগী হইয়া মানবের ঐহিক দুঃখ দূর করতঃ সুখী হয়েন, না যিনি জীবকুলের উদ্ধার হেতু জগৎ মাতাইয়া বাড়ী বাড়ী প্রেম বিলাইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দেন?

প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ধনমদে গর্ব্বিত,

স্বার্থই তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা, রিপুগণ প্রবল থাকিয়া প্রায়ই তাঁহাদিগকে অন্ধ রাখে ও অনেক সময় নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ কুকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। হরিচরণ বাবু একজন ধনী ব্যক্তি—তিনি আপনাকে সংসারমধ্যে এক জন বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং দশজনের সমক্ষেও তিনি একজন বড় লোক বলিয়া অভিহিত ও প্রশংসিত। ধন সংগ্রহ করিতে তাঁহার অনেক বিদ্যা বুদ্ধি খরচ হইয়াছে—অনেক মন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে; ঐ ধনের প্রথম সমাবেশ কালে তাঁহাকে নানাবিধ দুশ্চিন্তায় দোদুল্যমান হইতে হইয়াছে, এখনও উহার রক্ষা ও বৃদ্ধি হেতু তদ্রূপ হইতে হইতেছে। পৃথিবীর কি পূর্ব্বতন, কি অধুনাতন, সকল সময়ের ধন-কুবেরেরা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন? প্রাচীন কালে লিডিয়ার অধীশ্বর ক্রসস্ ধনিশ্রেণীর অগ্রগণ্য ছিলেন, এবং ধনেই সুখ মনে করিতেন, তাঁহার শোচনীয় পরিণাম ইতিহাস-পাঠকদিগের অবিদিত নাই। সকল ধনলিপ্সুদিগের দশা কি এইরূপ নহে?

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বীরমদে মত্ত—রুধির-লালসা ইহাঁদিগের প্রধান রণচণ্ডী; এই দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিবার জন্য ইহাঁরা সততই ব্যস্ত। ইহাঁরা অনেক সময়ে দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া নির্ম্মম অন্তরে দেশ সকল শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া থাকেন। পিতৃহীন বালক ও অনাথা বিধবাদিগের রোদনধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইলেও, ইহাঁদিগের অন্তঃকরণ বিন্দুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হয় না। ইহাঁরা অটল অচল-পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ইহাঁদিগের দুন্দুভিনাদে, রণকেতনে ও সমরাস্ত্রে দেশ ভীত, চমকিত ও প্রকম্পিত। জামদগ্ন্য, নেপোলিয়ান, ওয়েলিংটন ইত্যাদি খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁদিগের দিগন্তব্যাপী নাম ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে জ্বলিতেছে। ইহাঁরাও বড় লোক। জগৎ ইহাঁদিগের মস্তকোপরি অনেক প্রশংসার কুসুম স্তূপাকারে চাপাইয়া থাকেন—কণ্ঠদেশে প্রশংসাসূচক বীরমাল্য প্রদান করিয়া সুখী হয়েন।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সূক্ষ্মদর্শী ও বক্র-স্বভাব। ইহাঁরা পরের গুহ্যমন্ত্রণাভেদে সক্ষম, আপনাদিগের গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছু। ইহাঁদিগের অন্তরে ও মুখে বিশেষ প্রভেদ। ইহাঁরা এক একটী বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের কর্ণধার, নানাবিধ বিঘ্নবিপত্তিরূপ ঝটিকার দুর্দ্দিনে রাজ্য সকলকে সুচালিত করিয়া রক্ষা করিতে প্রয়াস পান। ইহাঁদিগের ভয়ে বিপক্ষগণ সদা শঙ্কিত। ইহাঁদিগের নামও ইতিহাসে বর্ণিত হইয়া থাকে। চাণক্য, বিসমার্ক, পিট ইত্যাদি মহাপুরুষ-গণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁরাও বড় লোক। ইহাঁরাও জগতে মান্য ও গণ্য।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ দেশহিতৈষী ও দয়াবান্। ইহাঁরা আপনাদিগের ভাষার ও ওজস্বিতা ও পারিপাট্যে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত করিয়া লোকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন। ইহাঁরা স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য পথে আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হয়েন। কর্ত্তব্য ইহাঁদিগের কার্য্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহাঁরা ভয় ও লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বীরদর্পে চলিয়া যান। এমন কি কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ইহাঁরা জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সিসিরো, ডিমসথেনিস, বার্ক ইত্যাদি এই শ্রেণীর লোক। ইহাঁরা সকলেই বড় লোক। ইতিহাসে ইহাঁদিগের বক্তৃতাবলে সংসাধিত কার্য্য সকল কীর্ত্তিত আছে।

পঞ্চম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যামোদী। সাহিত্য ইহাঁদিগের প্রধান ব্যবসায়। এই সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা ইহাঁরা জগতের বিবিধ উন্নতি ও উপকার সাধন এবং আপনাদের অমরত্ব ক্রয় করেন। ইহাঁরা স্বভাবতঃ ভাবুক ও চিন্তাশীল। ইহাঁরা চিন্তাসাগরে ডুব দিয়া যে রত্ন উত্তোলন করেন, তদ্দ্বারা মানব মণ্ডলী ভূষিত হয়েন। ইহাঁদিগের নিকট জ্ঞান শিক্ষা জন্য মানব চির-ঋণে আবদ্ধ। ভবভূতি, কালিদাস, সেক্সপীর, মিলটন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশকে গৌরবান্বিত ও জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। কপিল, পতঞ্জলি, মিল, কোম্‌ৎ ইত্যাদি বিজ্ঞানকেশরীদিগের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁরা সকলেই বড় লোক। মনোরাজ্য ইহাঁদিগের প্রধান রঙ্গভূমি। মনুষ্যের মনের উপর ইহাঁরা কার্য্য করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পরদুঃখে বিগলিত-হৃদয়। ইহাঁরা আপনাদিগের জীবন পরের জন্য হইয়াছে এই ভাবেন। পরের কিসে কায়িক ও মানসিক উন্নতি হইবে, ইহাই ইহাঁদের রাত্রি দিন ভাবনা। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে হউক, বা আর্থিক সাহায্যে হউক, যে কোন প্রকারে পারেন ইহাঁরা মনুষ্যের দুঃখ দূর করিতে সতত যত্নশীল। বিদ্যাসাগর, কেরী, মার্সমান, ডেভিড হেয়ার, বিশ্বহিতৈষী হাউয়ার্ড এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাঁরাও সকলে বড় লোক।

সপ্তম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ জগতে ঈশ্বরের অবতার বিশেষ। ইহাদিগের দেব-অংশে জন্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-কুলের উদ্ধার ও মুক্তি প্রচার ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। জগৎ ইহাঁদিগের কুটুম্ব ও জগৎকে ইহারা আত্মবৎ মনে করেন। রিপুসংযম ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ও শিক্ষা। জগতের জন্য ইহাঁদিগের প্রাণ কাঁদে এবং জগৎও ইহাঁদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করে। চৈতন্য, শাক্যসিংহ, খৃষ্ট, মহম্মদ ইত্যাদি

এই শ্রেণীর উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। ইহাঁদিগের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মশিক্ষা-দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত। ধর্ম্মপ্রচার ইহাঁদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাঁরাও বড় লোক।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই বড় লোক, সকলেই পৃথিবীর মধ্যে অল্পাধিক যশ ও গৌরব লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে ইহাঁদিগের মধ্যে প্রকৃত বড় লোক কে?

শ্রীভূ।

অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় সেনাপতি ওয়াসিংটন সসৈন্যে ভ্যালি-ফর্জ নামক স্থানে যখন অনাহারে বহু ক্লেশে কালহরণ করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিন হঠাৎ গম্ভীরমূর্ত্তি এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তক অবনত, চক্ষু ভূমি-সংলগ্ন এবং তিনি পদব্রজে অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন বোধ হইল। এই ব্যক্তির বয়স প্রায় ৭০ বৎসর এবং আমেরিকার মধ্যে ইনি একজন সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী। ইঁহার নিবাস ল্যাঙ্কাষ্টার প্রদেশের ইফ্রাটা নামক গ্রামে। সেনাপতি ওয়াসিংটনের নিকট একটী অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনার বিশেষ অধিকারও ছিল—তিনি কতকগুলি সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া ইফ্রাটার আশ্রমে শত শত আহত সৈনিকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং ওয়াসিংটনের পরম বন্ধু টমাস জেফারসনের অনুরোধে দেশের উপকারার্থ আপনার লেখনী যেরূপ চালনা করিয়াছেন, কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তিনি সাতটী বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং জগতের সমক্ষে আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের যুক্তিযুক্ততা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন। তিনি মাইকেল উইট্‌ম্যান নামক এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার উদ্দেশে সেনাপতি ওয়াসিংটনের সমীপস্থ হইয়াছেন।

এই আগন্তুকের নাম পিটার মিলার। তিনি যে দিন হইতে ইউফ্রাটার ভ্রাতৃসমিতির সহিত যুক্ত হন, সেই দিন হইতে উইট্‌ম্যান ইহাঁর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি সরল স্বভাব বশতঃ এক দিন মিল্ হইতে ছাপাখানায় একমোট কাগজ লইয়া যাইতেছিলেন, উইট্‌ম্যান্ তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুরা তোমার প্রতি বড় সদয়, কাগজের গাড়ীতে ঘোড়া করিয়া যুড়িয়া দিয়াছে!!" এই বলিয়া মিলারের মুখে নিষ্ঠীবন (থু থু) নিক্ষেপ করিল। উইট্‌ম্যান্ জানিত

ঐ সাধু বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক যে সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছেন, আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ।

পিটার মিলার অনেক দিন ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন—ভাবিতেছিলেন কি প্রকারে এই দুরাত্মার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ করা যায়। এখন সুসময় উপস্থিত, উইট্‌ম্যান্ (টোরি) নূতন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বলিয়া ধৃত হইয়াছেন। সামরিক নিয়মে বিচারিত হইয়া অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

ওয়াসিংটন প্রফুল্লবদনে পিটার মিলারের অভ্যর্থনা করিলেন এবং সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিটার মিলার বলিলেন, "সেনাপতি, আমি মাইকেল উইট্‌ম্যানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। টার্কস্‌হেড নামক স্থানে কল্য তাহার ফাঁসি হইবে।" মহাত্মা ওয়াসিংটন বলিলেন, "প্রিয়বন্ধু, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি না, উইট্‌ম্যান্ টোরি, সে আমাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সে এতদূর স্বদেশদ্রোহী যে, ফিলাডেল্‌ফিয়াতে গিয়া আমাদের শত্রু সেনাপতি হাউইর অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে এরূপ লোকদিগকে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে।" সেনাপতি শেষ কথা বলিলেন "এরূপ ঘটনা না হইলে তোমার বন্ধুকে আনন্দের সহিত অব্যাহতি দিতাম।" মিলার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "সেনাপতি ওয়াসিংটন! কি বলিতেছ? সে আমার বন্ধু? সে আমার নিদারুণ শত্রু।" ওয়াসিংটন বন্ধুর মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া অতি কোমল স্বরে বলিলেন "এ কিরূপ, তোমার শত্রুর জন্য ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছ?" মিলার উত্তর করিলেন, "যীশু আমার জন্যত এরূপ করিয়াছেন।"

তখন ওয়াসিংটন কিছু অপ্রতিভ হইয়া উইট্‌ম্যানের ক্ষমাপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং তাহা পিটার মিলারের হস্তে দিয়া বলিলেন "প্রিয় বন্ধু! এইরূপ খৃষ্টীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইলে, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

পিটার মিলার ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া ক্ষমাপত্র হস্তে টর্কস্‌হেড স্থানের অভিমুখে চলিলেন। সমস্ত রাত্রি পদ-ব্রজে চলিয়া যখন ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শান্তিময় প্রান্তর জনতা ও কোলাহল-পূর্ণ! দুই জন সৈনিক অগ্রপশ্চাতে থাকিয়া মাইকেল উইট্‌ম্যানকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট লইয়া যাইতেছে। এক জন রাজপুরুষ দোষী ব্যক্তির গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইল। লোকমণ্ডলী চমকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল, রাজপুরুষ থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দী ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিল, দেখা গেল জনতার মধ্য দিয়া এক ব্যক্তি

দ্রুতবেগে বধ্যভূমির দিকে ধাবমান, তাহার হস্তে একখণ্ড কাগজ, তাহা সে মাথার উপর ঘুরাইতেছে। দ্রুতগামী ব্যক্তি বলিলেন, "থাম, উইট্‌ম্যানের জন্য সেনাপতি ওয়াসিংটনের স্বাক্ষরিত ক্ষমা-পত্র আনিয়াছি।" রাজপুরুষ দেখিলেন সত্য সত্যই ক্ষমাপত্র। পিটার পরম শত্রুর প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণ পরিশ্রমে ঠিক্ সময়ে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তখন লোকমণ্ডলী জনতা ভাঙ্গিয়া চারি দিকে চলিয়া গেল, রাজপুরুষ আস্তে আস্তে কাগজখানি ভাঁজিতে ভাঁজিতে একাকী জেলে ফিরিয়া আসিলেন

এদিকে পিটার মিলার. উইট্‌ম্যানের হস্ত ধারণ করিয়া বৃক্ষবাটিকা হইতে খোলা মাঠে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রতি একটীও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া পাহাড় ও উপত্যকা সকল ভাঙ্গিয়া উইট্‌ম্যানের গৃহে তাঁহাকে উপস্থিত করিলেন। সেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন-পুরুষ রহিল।

পিটার মিলার কি আশ্চর্য্য লোক! তাঁহার ইউফ্রাটার ভ্রাতৃমণ্ডলী তাঁহাকে ভাই বলিয়া ডাকিত। তিনি ভারি পণ্ডিত, পবিত্র চরিত্র ব্যক্তি এবং বিখ্যাত মুদ্রাকার। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে জর্ম্মণ ভাষাতে এইরূপ লিখিত আছে—

"পিটার মিলার এই স্থানে শয়ান, প্যালাটিনেটের অন্তর্গত গারেণ প্রদেশে ইহাঁর জন্ম হয়, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কারক দলভুক্ত প্রচারকরূপে আমেরিকায় আগমন করেন এবং তাঁহার নাম জাই-বেস বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদবধি আমৃত্যু তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ৮৬ বৎসর ৯ মাস বয়সে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর মহানিদ্রাগত হইয়াছেন।"

আত্ম-সংযম।*

এ জগতে, প্রকৃত সাধু বা সাধ্বী হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা মানব-শরীরের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সাধুতার প্রতি অনুরক্তিও সেইরূপ মনের স্বাভাবিক সংস্কার। তবে যেমন রোগ বিশেষ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষুধা অনুভূত হয় না, সেইরূপ মহাপাপে আচ্ছন্ন হইলে মানবের সাধুতার কামনা থাকে না। সাধুতার আকাঙ্ক্ষা না থাকাই মানব-জীবনের চরম অবনতি। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সে রকম লোক জগতে অতি কমই দেখা যায়; কেননা সাধারণতঃ এ সংসারে যে সকল ব্যক্তি পাপাচারে রত, তাহারা সকলেই প্রায় সদাচারের সুখ্যাতি

* এই প্রবন্ধ নীরস, রুক্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলেও আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা আদ্যোপান্ত পড়িবেন; পড়িয়া আমাদের শ্রম সফল করিবেন, ইহাই প্রার্থনা করি।

করে—সদাচারের মহত্ত্ব বুঝিতে পারে; তাহাদের অনেকেই পাপগ্রস্ত দুর্ভর জীবন অতিক্রম করিয়া পুণ্যময় পবিত্র জীবন গ্রহণ করিতে চায়। তথাপি, সাধুতার প্রতি প্রাণের টান সত্ত্বেও মানব অসাধু হয় কেন? লোকসমাজে শত সহস্র মিথ্যাবাদী, পরপীড়ক, ব্যভিচারী, চোর, নরহন্তা প্রভৃতি পাপী ও মহাপাপীরা বিচরণ করে কেন? আরও দেখা যায় যে, ক্রোধীর সংখ্যা যেরূপ বহুল, ক্ষমাশীলের সংখ্যা সেরূপ নহে; লোভীর সংখ্যা যেরূপ বহুল, নিঃস্পৃহের সংখ্যা সেরূপ নহে; সেই জন্য অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি সাধুতার প্রতি "অনেকেরই" স্বাভাবিক অনুরাগ, তবে "অনেকেই" সাধু বা সাধ্বী হইয়া জীবন সার্থক এবং মর জগৎকে স্বর্গ তুল্য করে না কেন? এ কথার উত্তর এই যে, ইচ্ছা থাকিলেও কেবল আত্মসংযম-শক্তি পরিচালনা ভিন্ন মর মানব সাধুতা আয়ত্ত করিতে পারে না। যিনি আত্মসংযমে অভ্যস্ত, তিনিই জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা হইয়া প্রকৃত সাধু বা সাধ্বী হইয়াছেন। মনুষ্যের ধন, মান, যশঃ বিদ্যা সকলই শেষে, আত্মসংযম-শিক্ষাই আগে। আত্মসংযমের লক্ষণ কি তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

মনুষ্যত্ব লাভের জন্য ভগবান্ মনুষ্য-হৃদয়ে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দিয়াছেন। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যে একবিধ প্রবৃত্তি বিস্তারে মানব-হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয়; সেইজন্য তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলে। ভক্তি, উপচিকীর্ষা*, জ্ঞানপিপাসা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। অপরবিধ প্রবৃত্তি অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইলে মানব-হৃদয় যারপরনাই অবনত হয়, সেইজন্য তাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলে। আত্মাদর, জিঘাংসা †, উপার্জ্জনেচ্ছা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ‡। এই সকল প্রবৃত্তি মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ভগবৎ-প্রদত্ত হইলেও অনুশীলন-সাপেক্ষ। সমুচিত যত্ন ও চেষ্টা করিলে ইহারা বিকাশ লাভ করে; নচেৎ অযত্ন-সম্ভূত গোলাপ ফুলের গাছের মত শুকাইয়া পড়ে। হৃদয়ের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংযম-শক্তির শাসনে থাকিলে ইহাদিগের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভের আংশিক সাহায্য পাওয়া যায়; সে সাহায্য অভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্বলাভ হয় না। কিন্তু একটুকু অসতর্ক হইলেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল কুপ্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। তখন কণ্টক গুল্মের মত সমস্ত হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করে। ইহাদের জন্য সুগন্ধি পুষ্পতরু-রূপ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল জীবনশূন্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-দিগকে সুসংযত করা মানবমাত্রেরই

* উপচিকীর্ষা—পরোপকারের ইচ্ছা।

† জিঘাংসা—বৈরনির্য্যাতনেচ্ছা।

‡ সংযতাবস্থায় এই সকল প্রবৃত্তির কার্য্য নিকৃষ্ট নহে, এ কথা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বার্থপরতা সহযোগে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে অনুশীলন করিলেই উহারা অসংযত হইয়া পড়ে। অতএব সাবধানে এই প্রবৃত্তিদিগকে সুসংযত করিবার চেষ্টাই আত্মসংযমের প্রথম কার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অসংযত হইলে, তাহাদিগকে কুপ্রবৃত্তি বলা যায়, সে কথা আমরা বলিয়াছি। জ্ঞানিগণ যাহাকে "ছয় রিপু" বলেন, তাহাই ঐ কুপ্রবৃত্তি—কতকগুলি নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির অসংযতাবস্থা*। ছয় রিপু যে আমাদের প্রকৃত শত্রু, আমাদের সাধুতা লাভের প্রধান বিঘ্ন, এ কথা অনেকেই শুনিয়াছেন—অনেকেই জানেন। কিন্তু কার্য্যে ঐ কথাটাই অনেকে ভুলিয়া যান বলিয়া এ সংসার এত দুঃখময়। রিপুগণ মানবের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জড়তুল্য করিয়া মানবকে আপনাদের দাসানুদাস করে। সে অবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য হইয়া পড়ে। আরও দেখা যায়, যদি কোনও একটী রিপু মানবের হৃদয় অধিকার করে, তবে তাহার আনুষঙ্গিক আরও দুই চারিটী রিপু জাগিয়া উঠিবে। যে ব্যক্তি সম্প্রতি অহঙ্কারী হইয়াছে, তাহার ক্রোধ ও ও হিংসার পরিচয় শীঘ্রই পাইবে। "অধোগতির লক্ষরেখা" পাড়তে আরম্ভ হইলে মহাপতনই সম্ভব†। ঐরূপ পতিত ব্যক্তি যদি কোনও সময়ে এক বিন্দু চৈতন্য লাভ করে, তবে অনুতাপের অসহ্য যন্ত্রণায় সে তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। কিন্তু তারপর?—হায়! তাহার যতই আত্মগ্লানি হউক, সে যতই সদুপদেশ লাভ করুক, যতই দণ্ড প্রাপ্ত হউক, কুকর্ম্ম ত্যাগ করিতে যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউক, যতক্ষণ সে ব্যক্তি আত্মসংযমের অভ্যাস না করিবে, ততক্ষণ সে পাপাচরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে এক হস্তে অনুতাপের অশ্রু মুছিলেও অন্য হস্তে পাপ কার্য্য করিবে। কারণ তাহার কুপ্রবৃত্তি সকল ক্ষিপ্ত পশুবৎ দুর্দ্দমনীয়, ক্ষিপ্ত পশুবৎ তেজস্বী; আত্মসংযম শাসন ভিন্ন তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা কাহারও সাধ্য নহে। তাই সে পুনঃপুনঃ প্রলুব্ধচিত্তে বহ্নি-প্রবেশোন্মুখ পতঙ্গবৎ, পাপাচরণে কুপ্রবৃত্তিদিগকে চরিতার্থ করে। হায়! ঐরূপ আত্মসংযম-শূন্য ব্যক্তি কোন্ দিন কোন্ রিপুর উত্তেজনায়,কোন্ স্রোতে আপনাকে ভাসাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তাহার নিজের "মন" তো নিজের অধীন নয় যে, ধর্ম্মানুমোদিত নিষেধ-বিধি মানিবে! অতএব সে রাগের মাথায়, লোভের মাথায় কখন কি সর্ব্বনাশ করিবে তাহা বলা কাহার সাধ্য? আজি "দশ জনের মধ্যে সেও এক জন" হইলেও কালি লোভের উচ্ছ্বাসে

* কোন নিকৃষ্টবৃত্তি কোন্ রিপুর মূল এবং তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করা যায়, আমরা ভবিষ্যে ক্রমশঃ লিখিব।

† ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬২ এবং ৬৩ শ্লোকদ্বয়ে মানবের মহাপতনের বিষয় বিবৃত আছে; প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তাহা অবশ্য পাঠ্য।

পরস্বাপহারী, পরশ্ব ক্রোধের উত্তেজনায় হত্যাকারী বলিয়া সে যে পরিগণিত হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? যে ব্যক্তি সে দিন ফাঁসি-কাষ্ঠে উঠিয়া প্রাণ হারাইয়াছে, সে দুর্ভাগাও তোমার আমার মত এক জন মনুষ্য-দেহধারী ছিল; কিন্তু আত্মসংযম অভাবে, রিপুর উত্তেজনায় তাহার এই ভয়ানক পরিণাম হইয়াছে; লোকে তাহাকে নরপিশাচ বলিয়া মনে করিতেছে! তবে আত্ম-সংযমে অভ্যস্ত হওয়া মানবের যে একান্ত প্রয়োজনীয়, সে কথা কি আর বলিতে হইবে? দ্রব্যবিশেষের গন্ধ পাইলে উন্নতশীর্ষ ভুজঙ্গম যেমন ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, আত্মসংযম-শক্তি পরিচালনে মানবের রিপুগণও সেইরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ঈদৃশ দৈব মহৌষধ যে মানব জীবনের অমৃত স্বরূপ, তাহা কি বলিতে হইবে? আবার বলি আত্মসংযম শিক্ষাই সকলের আগে, যাহার আত্ম-সংযম শিক্ষা হইয়াছে, সেইই সকল সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। যে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইয়াছে, তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি না—আধ্যাত্ম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, সে সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তাহার মানব-জীবন নিষ্ফল হইবে না।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন

গ্লাডষ্টোন বর্ত্তমান যুগের এক জন অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী, সুলেখক এবং বিশ্বজনহিতৈষী। বর্ত্তমান শতাব্দী ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবন অনুস্যূত। তিনি যে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কয়েক মাসাবধি নিজে যেমন প্রস্তুত হইতে-ছিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণও সেইরূপ। গত ১৯এ মে এই নিমজ্জমান জাহাজখানি কালসাগরে ডুবিয়াছে এবং তাহাতে জগৎময় শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। ইং-লণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার পরিজনবর্গ যেরূপ, বিদেশীয় রাজন্যগণ সেইরূপ এবং স্বদেশ বিদেশের গুণগ্রাহী লোকমাত্রেই তাঁহার প্রতি সম্মাননা প্রদর্শনে ব্যস্ত—তাঁহার ঘোর শত্রুগণও এ সময় তাঁহার সম্মাননার্থ মিত্রদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন! তাঁহার এক বিপক্ষ লর্ডের প্রস্তাবে পার্লেমেণ্ট মহাসভা স্থির করেন যে, ইংলণ্ডের গুণিপ্রধানদিগের সমাধিক্ষেত্র ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবীতে তাঁহার দেহ সমাহিত ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং ইংলণ্ডের রাজকোষ

হইতে এই অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ ডিসেম্বর ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নগর লিবরপুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই স্কচজাতীয়। তাঁহার পিতা সার জন গ্লাডষ্টোন একজন বুদ্ধিমান্ অধ্যবসায়শীল স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁহার জননী ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত। গ্লাডষ্টোন পিতামাতার সদ্‌গুণ সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রথমে ইটন স্কুলে, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। ১৮৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ইটালী এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

গ্লাডষ্টোনের প্রথমে ধর্ম্মযাজক বৃত্তি অবলম্বনের প্রয়াস ছিল এবং যদি সে পথ ধরিতেন, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ যাজকপদ ভূষিত করিতে পারিতেন। কিন্তু নিয়তির গতি তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিল এবং তাহাতেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। ১৮৩২ সালে বন্ধুগণের সহায়তায় নিউইয়র্কের প্রতিনিধি সভ্য হইয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রবিষ্ট হন এবং প্রথম হইতেই বাক্‌পটুতা ও তর্কশক্তির পরিচয় দেন। লর্ড মেকলে তাঁহার উদীয়মান প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন। তিনি প্রথমে রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন, ক্রমে কার্য্যগতিকে উদারনৈতিক দলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ হইয়া এই দলের সর্ব্বপ্রধান নেতা হন।

১৮৩৯ সালে যখন গ্লাডষ্টোনের বয়স ৩০ বৎসর, তখন ওয়েল্‌স প্রদেশীয় গ্লীন নাম্নী এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়, এই রমণী অতি পতিব্রতা এবং অনেক গুণে গুণবতী। এই দম্পতী প্রায় ৬০ বৎসর কাল পরম সুখে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। ইহঁাদের ৪টী পুত্র, তাহারা সকলেই কৃতী। গ্লাডষ্টোনের শ্বশুর একজন ধনাঢ্য লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন।

১৮৪১ সালে সার রবার্ট পীলের মন্ত্রিত্বকালে গ্লাডষ্টোন পুনরায় মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে রাজকোষের জুনিয়র মেম্বর এবং পরে উপনিবেশ সকলের অণ্ডার-সেক্রেটারী হন। এই সময় স্বাধীন ব্যবসায় লইয়া ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে ঘোরতর বিতণ্ডা চলিতেছিল। গ্লাডষ্টোন টোরীদলস্থ হইয়াও জন ব্রাইট ও কবডেন প্রভৃতি মহাত্মার সহিত একমত হইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং সেই পক্ষেরই জয় হইল।

১৮৪৭ সালে গ্লাডষ্টোন অক্সফোর্ড বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয়ান ভিন্ন আর কেহ মহাসভার সভ্য হইতে পারিতেন না। তিনি ইহুদীদিগকে সভ্য হইবার অধিকার দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন। উত্তরকালে ভারত হিতৈষী ব্রাডল সাহেব নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইয়াও তাঁহার সহায়তায় পার্লেমেণ্টের সভ্য পদ হইতে বিচ্যুত হন নাই। ইহাতে বুঝা যায় রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার মত ক্রমে কত উদার হইয়াছিল।

১৮৫২ সালে তিনি এক বক্তৃতায় মহাযশা ডিসরেলীকে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তৎপরে প্রায় ২৪ বৎসর কাল রক্ষণশীল দলের নেতা ডিসরেলীর সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে।

১৮৫৩ সালে লর্ড আবার্ডিনের মন্ত্রিত্বে গ্লাডষ্টোন রাজস্বসচিব (Lord Chancellor of the Exchequer) পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করেন যে, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক উভয় দলের লোক তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হন। ইনি রাজস্বের অনেক উন্নতি সাধন করেন, জাতীয় ঋণভার কমাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাণিজ্যেরও উন্নতির সহায়তা করেন।

গ্লাডষ্টোন ৪ বার (১৮৬৮, ১৮৮০,১৮৮৫ এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে) ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদে বৃত হন এবং তাহাতে উদারনৈতিক দলের অগ্রণী হইয়া স্বদেশ ও বিদেশের উন্নতির পথ অনেক প্রসারিত করেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক বিষয়ে ভোট দিবার অধিকার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সৈনিক বিভাগ সংস্কার ইত্যাদি তাঁহার কীর্ত্তি। ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যবন্ধন, তুরস্কের অধীনতা হইতে বুলগেরিয়ার মুক্তিসাধন, আর্ম্মেণীয় খ্রীষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সপক্ষতা করিয়া বিদেশীয়দিগের প্রতিও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারত তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহারই মন্ত্রিত্বকালে লর্ড রিপণের ন্যায় রাজ-প্রতিনিধি লাভ ইহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার, স্বায়ত্ত-শাসন, ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিপদে ভারতবাসীর নিয়োগ ইত্যাদি অনেক সৌভাগ্য গ্লাডষ্টোনেরই প্রসাদাৎ।

বিপন্ন জাতিদিগের প্রতি গ্লাডষ্টোনের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং তাহাদিগের দুঃখ নিবারণে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। আইরিসদিগের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংরাজজাতির বহুকালব্যাপী উৎপীড়ন ও অন্যায়াচরণের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই দেশের

রোমান কাথলিক প্রজাদিগের অর্থে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজক সকল প্রতিপালিত হইতেন, তিনি এ ব্যবস্থা রহিত করেন। ইংরাজ জমীদারগণ আইরিস প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেন, তিনি একেকটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রতীকার করেন। আইরিস জাতির শিক্ষোন্নতির জন্য একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া যখন দেখিলেন আইরিসদিগের জাতীয় উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে না, তখন তাহাদিগের জন্য "হোম রুল" অর্থাৎ স্বতন্ত্র পার্লেমেণ্ট দ্বারা শাসন ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" মঙ্গল কার্য্যে অনেক বিঘ্ন। এই শুভ চেষ্টায় তিনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ইংরাজদের চক্ষুশূল হন এবং অনেক বন্ধুও তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার প্রণীত ব্যবস্থা কমন্স সভায় গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড সভায় অগ্রাহ্য হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই।

গ্লাডষ্টোন চিরদিন আপনাকে সাধারণ লোকের শ্রেণীস্থ বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং আমৃত্যু সেই গৌরব ভোগে অভিলাষী ছিলেন। মহারাণী কতবার তাঁহাকে "লর্ড" উপাধিতে ভূষিত করিতে চান, কিন্তু তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে পার্লেমেণ্টের উভয় সভায় যে বিধি গৃহীত হয়, রাজা বা রাজ্ঞী তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব কালে আয়র্লণ্ড সম্বন্ধীয় একটী আইন পার্লেমেণ্টের উভয় সভায় গৃহীত হইলে গ্লাডষ্টোন তাহা রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার স্বাক্ষরের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন, কিন্তু রাজ্ঞীর মনোমত না হওয়াতে তিনি সে বিধিতে স্বাক্ষর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে গ্লাডষ্টোন বলেন "আপনাকে অবশ্যই স্বাক্ষর করিতে হইবে।" রাজ্ঞী বিরক্ত হইয়া বলেন "আমি কে জান?" গ্লাডষ্টোন তখন উত্তর করিলেন "হাঁ আপনি ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, কিন্তু আমি কে জানেন? আমি ইংলণ্ডের জন-সাধারণের প্রতিনিধি।" রাজ্ঞীর অনিচ্ছা সত্বেও বিধিতে স্বাক্ষর করিতে হইল। গ্লাডষ্টোনের কি সাহস, কি আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান! তাঁহার রুক্ষ ব্যবহারের জন্য রাজ্ঞী সময় সময় অপ্রসন্ন হইলেও চিরকাল তাঁহার গুণের গৌরব করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে বলিয়াছেন "আমার রাজত্বসময়ের একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞকে হারাইলাম।"

গ্লাডষ্টোনের কার্য্যক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া ইংলণ্ডময় ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সহস্র সহস্র লোকের জনতার মধ্যে বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। অনেকগুলি গভীর গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; তদ্ভিন্ন প্রতিদিন তাঁহাকে অসংখ্য চিঠি পত্রের উত্তর দিতে

হইত। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার কার্য্য স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি কত কার্য্য করিয়াছেন কে তাহা মনে ধারণা করিবে? তাঁহার শারীরিক্ বল যথেষ্ট ছিল, বৃদ্ধবয়সেও স্বহস্তে কুঠার লইয়া বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করিতেন। চিরকাল অধ্যয়নশীল ও গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। আবার তাঁহার হৃদয় অটল ধর্ম্মবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। মানবের আদর্শচরিত্র এরূপ ব্যক্তি জগতে চিরকাল পূজিত হইয়া থাকিবেন।

মৃত্যুকালীন উক্তি

১। রাবিলে শান্তভাবে বলিলেন "পটক্ষেপ কর, নাট্যাভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে"।

২। প্রথম চার্লস্ যখন ঘাতক-হস্তে নিহত হন, তখন বলিলেন "মনে রেখো"।

৩। চতুর্দ্দশ লুই ম্যাডাম মেইন্টিনোকে বলিলেন "আমরা শীঘ্র পুনর্ম্মিলিত হইব।"

৪। কবি ওলকটের মৃত্যুকালে তাঁহার বন্ধু টেলার জিজ্ঞাসা করেন, পৃথিবীতে তাঁহার জন্য কি করিবেন? তিনি উত্তর করিলেন, "আমার যৌবন ফিরাইয়া দাও।"

৫। কুইবেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সেনাপতি উল্ফ যখন মৃত্যুশয্যাশায়ী, তখন তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, সকল দিকেই ফরাসীরা পরাজয় মানিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি সুখে মরিতেছি"।

৬। বিখ্যাত ইংরাজ জজ লর্ড টেণ্টার্ডেনের শেষ কথা "এখন জুরী মহাশয়েরা কি রায় দিবেন, বিবেচনা করুন"।

৭। অষ্টম হেনরীর মহিষী আনবোলিনের যখন শিরশ্ছেদ হয়, তখন তিনি আপনার গলায় হাত দিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন "আমি শুনিয়াছি ঘাতুক খুব দক্ষ, আমার গলা খুব ছোট।"

৮। সুবিখ্যাত সার টমাস মুরকে যখন ফাঁসীকাষ্ঠে চড়ান হয়, ফাঁসীগাছ 'অপোক্ত' দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "আমাকে নিরাপদে উপরে উঠাও, নীচে নামিবার ভার আমার উপর।"

৯। কবি বয়লো এক বন্ধুকে দেখিয়া যে নিঃশ্বাসে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শুভ দিন বিদায়, অনেক দিনের জন্য বিদায়," সেই নিঃশ্বাসেই তখনই প্রাণত্যাগ করিলেন।

১০। ফরাসী সেনাপতি মণ্টকাম সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও যখন সৈন্য সকল পুনরায় একত্র করিবার চেষ্টা

করিতেছেন, তখন একজন সৈনিক বলিল "আপনার মৃত্যু আসন্ন"। তিনি বলিলেন "সে ভাল, কুইবেক শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবে, ইহা আমাকে দেখিতে হইবে না।"

১১। ইংলণ্ডের জারোর প্রাচীন ধর্ম্মাধ্যক্ষ আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে বাইবেলের এক অধ্যায় মুখে মুখে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন, শিষ্য লিখিতেছেন। শেষ হয় কি না সন্দেহ। শিষ্য শেষবাক্য লিখিয়া বলিলেন "শেষ হইয়াছে"। গুরু "শেষ হইয়াছে" বলিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

১২। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন মৃত্যুকালে "দয়া, দয়া, চারিদিকে দয়া" এই কথা বলিতে বলিতে পরলোক গমন করিলেন।

দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী।

জন্ম ও শৈশবাবস্থা।

বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ২রা পৌষ বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার নিকটবর্ত্তী একচাকা নামক গ্রামে কৈলাসকামিনীর জন্ম হয়। শুনা যায়, এই গ্রামটী মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। এই গ্রামের জমীদার আদিত্য বাবুরা বহুগোষ্ঠীসমন্বিত হইয়া বাস করিতেন এবং ধনাঢ্য হিন্দুগৃহস্থোচিত ক্রিয়াকাণ্ড সকল মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। কৈলাসকামিনীর পিতার নাম ৺ ভুবনমোহন দেব সরকার এবং মাতার নাম মনোমোহিনী। মনোমোহিনী উক্ত আদিত্য-গৃহের দৌহিত্রী। তৎকালীন প্রথানুসারে মনোমোহিনীর পিতা হরমোহন বসু আদিত্যগৃহে ঘরজামাই হইয়াছিলেন। মনোমোহিনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা ও বড় স্নেহের পাত্রী ছিলেন, এ জন্য বিবাহিত হইয়াও মাতামহাশ্রয়ে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বামীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কৈলাসকামিনীর পিতা ও মাতা উভয়েই অতি সরল ও সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের দাম্পত্য প্রণয় ও ধর্ম্মপরায়ণতা সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। তাঁহাদের দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা হয়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যা অতি অল্প বয়সেই মরিয়া যায়। কৈলাসকামিনী ইহাঁদিগের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি দেখিতে সুন্দরী ও সুলক্ষণাক্রান্তা থাকাতে পিতামাতার বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। যখন ইহাঁর বয়স ৫ বৎসর, তখন দেশী টীকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বসন্ত উঠিয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয়। মাতা মনোমোহিনী নিজের প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা

দ্বারা ইহাঁকে বাঁচাইয়া তোলেন। এই রোগের তিনটী ফল ইহাঁর শরীরে লক্ষিত হয়—(১) ইহা দ্বারা ইহাঁর বর্ণ কিছু মলিন হইয়া যায়; (২) মুখমণ্ডল বসন্ত-চিহ্নে অঙ্কিত হয়; এবং (৩) ধাতু গরম হইয়া যায়, সেই জন্য হাত, পা, গা চির দিন জ্বলিত এবং তাঁহাকে অধিক পরিমাণে জল সেবন করিতে হইত।

কৈলাসকামিনী অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই। কিন্তু বনিদী হিন্দুগৃহের একটী বুদ্ধিমতী শ্রমশীলা বালিকার পক্ষে যে শিক্ষা সম্ভব, তাহার কিছুরই অভাব হয় নাই। গুরুজনে ভক্তি, আত্মীয়দিগের সেবা শুশ্রূষা, বিনয়, লজ্জাশীলতা, শিষ্টাচারিতা, ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ এবং গৃহকর্ম্মে মাতার সহকারিতা—এ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। উত্তর কালে তিনি জন্মভূমির আনন্দোৎসব ও শোকাবহ ঘটনা সকল এবং আদিতা-গৃহের প্রত্যেক কর্ত্তা ও বধূর চরিত্রের চিত্র যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে সেই অল্প বয়সে তাঁহার আশ্চর্য্য সহৃদয়তা ও পর্য্যবেক্ষণশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বস্তুতঃ ভবিষ্যতে তিনি যে গৃহিণীপনার আদর্শ হন, শৈশবে হিন্দু গৃহে তাহার ভিত্তি সংগঠিত হয়।

পিতৃমাতৃ-বিয়োগ

পিতা ভুবনমোহন কলিকাতায় কর্ম্ম-কার্য্য করিতে করিতে ১২৭৩ সালে (৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে) পরলোক গমন করেন। তিনি ঝামাপুকুরে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া বিধবা ভাগিনেয়ীর বাটীতে থাকিতেন। এই ভগিনী অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসলা ছিলেন। সহোদরের মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারেরা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইল দেখিয়া তাহাদিগকে কিছু দিন আপনার নিকটে রাখিবার মানসে কলিকাতাতেই আনাইলেন। কৈলাসকামিনীর বয়স তখন ৮ বৎসর মাত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৩ বৎসরের বালক, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ১১ বৎসরের নব-বিবাহিতা বালিকা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৩।৪ বৎসরের শিশু। বিধবা রমণী সন্তানগুলিকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ—স্বামীর মৃত্যুর পর এক মাস গত হইতে না হইতেই হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং "স্বামী ডাকিতেছেন" বলিয়া শিশু পুত্র ও কন্যাদিগকে ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয় পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। পিতৃমাতৃহীন প্রবাসস্থ ও পরগৃহে আশ্রিত সন্তানদিগের এ সময় যে কি ক্লেশের অবস্থা, তাহা বর্ণনীয় নহে। দয়াময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানে ভাগিনেয়ীটি আশ্চর্য্য সাহস ও সহৃদয়তা সহকারে এই পরিবারটীর রক্ষণ ও পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, আর তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না।

বিবাহ—কলিকাতায় বাস স্থির হইলে কৈলাসকামিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি

করা হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহের চেষ্টাও হইতে লাগিল। কুমারী পিগট তৎকালে বেথুন স্কুলের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং এই ঝামা-পুকুরের বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তিনিই জিদ করিয়া কৈলাসকামিনীকে স্কুলে লইয়া যান। পিসতুত ভগিনীর গৃহ উদার হিন্দুগৃহ ছিল; তথায় বাবু রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির ন্যায় লোক সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। তাঁহার পুত্রের ব্রাহ্মদিগের সহিত সহানুভূতি ছিল। তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটে আদিসমাজ-সংসৃষ্ট এক পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি কৈলাসকামিনীকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ইহাঁকে এক ব্রাহ্মের সহিত বিবাহ দিবার পরামর্শ দিলেন এবং স্বয়ং বর জুটাইবার ভার লইলেন। বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক ও বর্ত্তমান সম্পাদক এই পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রামস্থ লোক; তিনি এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং কখনও বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে করিবেন প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্ম-বিবাহ ২।১টী মাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে এই কন্যার পাণি-গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল। তিনি আপনার মাতা, মাতুল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমোদন ক্রমে ১২৭৪ সালের ২৪শে বৈশাখ ৯ বৎসরবয়স্কা কৈলাসকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহে বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শিশুপালন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কৈলাসকামিনীর বয়স যখন ৮ বৎসর তখন তাঁহার মাতা ৩.৪ বৎসরের একটী শিশুপুত্র রাখিয়া যান। এই শিশু পালনের ভার কৈলাসকামিনীর হস্তে পড়িল, কারণ তাঁহার বিবাহিতা ভগিনী অবিলম্বে শ্বশুরবাড়ীতে গমন করিলেন। কৈলাসকামিনী ভ্রাতাকে খাওয়ান, পরান, শোয়ান, তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করেন, তাহাকে খেলা দিয়া হাসান, আবার সে কাঁদিলে তাহার সহিত নীরবে কাঁদেন। মাতাকে যখন গঙ্গাযাত্রী করিয়া লইয়া যায়, শিশু তখন একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা কোথায় যায়?" সকলে বলিল "ডাক্তারখানায়"। তৎপরে অনেক দিন সে চক্ষু খুলে নাই, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিত "মা আজও ডাক্তারখানা হইতে আসিতেছে না কেন?" এই শিশুকে তাহার বালিকা ভগিনী হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিবাহ হইয়া প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে গেলে, ইহার নাম করিয়া ডোকরাইয়া কাঁদিতেন। সুখের বিষয় এই সহোদর বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ও এম এ, বি এল, পাঠ্য শেষ করিয়া এক গবর্ণমেণ্টের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। ভগ্নী কলিকাতায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার

মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার কাছ-ছাড়া হন নাই।

কৈলাসকামিনীর বাল্যজীবনে আর একটী শিশুপালনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়, এটী তাঁহার ঝামাপুকুরের ভাগিনেয়-পুত্র। ভাগিনেয়-বধূ সদ্যঃ-প্রসূত শিশুটীকে রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাহার বাঁচিবার কোন আশা ভরসা ছিল না, তাহাকে স্তন্য পান করাইবার জন্য একটী ধাত্রী কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও পালনের ভার কয়েক বৎসর ধরিয়া কৈলাসকেই বহন করিতে হইয়া-ছিল। কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় এই বালকটীকেও তিনি মানুষ করিয়াছিলেন এবং আনন্দের বিষয় এই যে সে ইংলণ্ডে গিয়া সুখ্যাতির সহিত বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন ব্যারিষ্টারী কার্য্য করিতেছে। এইরূপে শৈশবকালেই শিশুপালনে অভ্যস্ত হইয়া কৈলাসকামিনী সঙ্গিনী অনেক মাতার শিশুগণের রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়াছেন এবং আপনার পুত্র কন্যাগণের পালনে কিছু মাত্র ভার বোধ করেন নাই।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

কৈলাসকামিনীর প্রথম শিক্ষা বেথুন স্কুলে হয়। তৎপরে স্বামীর নিকট সাহিত্য ও গণিতে অনেক উন্নতি লাভ করেন। অবশেষে যখন ভারতাশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতে যোগ দান করিয়া তত্রত্য উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, এবং সময়ে সময়ে পারিতোষিকও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জ্জনে চিরকাল উৎসাহবতী ছিলেন। বঙ্গ মহিলা ও আর্য্য মহিলা সমাজ, বেথুন কলেজ ও বিক্টোরিয়া কলেজে সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ যে সকল বক্তৃতা করিতেন, তিনি কন্যাগণ সমভিব্যাহারে তৎশ্রবণে উপস্থিত হইতেন। স্বর্গীয় অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতক-গুলি সুন্দর উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ়মুদ্রিত হয় যে, গৃহে বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করিতেন এবং আপনার বাটী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণে যত্ন করিয়াছিলেন।

তিনি যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক ছাত্রীকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে হইবে। তদনুসারে স্বামী যখন হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন, তখন তিনি তত্রত্য বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া প্রায় দুই বৎসরকাল বালিকাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দান করেন। ছাত্রীগণ তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্তা ছিল যে, অনেকে বিবাহিতা হইয়াও তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিত ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় গুরুভক্তি প্রদর্শন করিত। আপনার বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষা অনেকটা নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করিতেন।

বাটীর ও বিষয়াদির হিসাবপত্র রাখিতেন, আবশ্যক চিঠিপত্র লিখিতেন ও লিখাইতেন এবং স্বয়ং সমুদয় হিসাবের নিকাশ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রবন্ধ রচনারও শক্তি ছিল, মেয়েদের কোন কোন সভা সমিতিতে তাহা লিখিয়া পাঠ করিতেন। বাটীতে অনেক পুস্তক পত্রিকা আসিত, অবসরমত সে সকল পাঠ করিতেন। ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীর সকল পুস্তকই পড়িয়াছিলেন এবং তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সারভাগ অন্যের নিকট বেশ বিশদরূপে বিবৃত করিতে পারিতেন। পুরাণ ও কাব্য পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, সে সকলের সারাংশ মধ্যে মধ্যে গল্পচ্ছলে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী মানকুমারীর কবিতার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং বলিতেন "এখন যে যত লিখুক, ইহার মত লেখা কাহারও নয়।"

শারীরিক ব্যাধি।

তাঁহার শরীরে রোগ প্রায় ছিল না বলিলে হয়, সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাল্যকালে যে বসন্ত রোগ হয়, তাহাতে ধাতু গরম হওয়াতে হাত পা ও গা জ্বলিত, কিন্তু অধিক পরিমাণে জল সেবন এবং পান্তা পনি-ভাত ও অন্যান্য ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিয়া প্রায় নিবারণ করিতেন। তাঁহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ, শালতিযোগে পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করিয়া এবং তাঁহার ভাসুর উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া বাতুলাশ্রমে থাকাতে বড় যাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছেন। তখন মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ১২।১৩ নম্বর বাটীতে ভারতাশ্রম ইহার তৃতীয়তল গৃহে বাসস্থান এবং একটি নিম্নতলস্থ গৃহে সকলের আহার-স্থান। যাতার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য ইনি তাঁহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাত্রে সাজাইয়া লইয়া যেমন আহার-গৃহের মধ্য দিয়া যাইবেন, অমনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া এমনি আঘাত পাইলেন যে, তাঁহার বাম উরুর অস্থি স্থানচ্যুত হইল। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পাট্রিজ সাহেব প্রভৃতির সু-চিকিৎসায় এবং ২।৩ মাস ক্লেশ ভোগের পর হাড় ঠিক্ হইয়া বসিল, কিন্তু ভগ্ন স্থানে একটু খুঁত রহিয়া গেল। এজন্য বরাবর তাঁহাকে একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হইত এবং উত্তরকালে বাত আশ্রয় করাতে রজনীকালে অল্পাধিক যাতনা ভোগ করিতে হইত। তদ্ভিন্ন অন্য রোগে তাঁহাকে প্রায় কখনও শয্যা গ্রহণ করিতে হয় নাই।

প্রবাসে বাস ও গৃহ নির্ম্মাণ।

কৈলাসকামিনীর ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হওয়াতে, এবং স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকাতে শ্বশুরালয়ে বাস অল্প দিনই ঘটিয়াছিল, এজন্য ৪।৫ বৎসর কাল সহোদরদ্বয়ের সহিত ঝামাপুকুরের ভগিনীর বাটীতেই ছিলেন। স্বামী যখন কোন্নগরে হেড মাষ্টারী করেন, তখন কলিকাতায় একটি

বাসা করিয়া তথায় স্ত্রীকে আনিলেন। এই সময়ে ভারতাশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইনি তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। আশ্রমটী বেলঘরিয়ার এক সুন্দর উদ্যানে স্থানান্তরিত হইলে এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবারের তথায় থাকিবার ব্যবস্থা হইলে তিনি আগ্রহপূর্ব্বক স্বামীর মত লইয়া তথায় গিয়া বাস করেন এবং বাবু কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে সমর্থ হন। ২।৩ বৎসর নানাস্থানে আশ্রমের অন্তর্ভূত হইয়া ছিলেন। পরে স্বামীর সহিত হরিনাভিতে গিয়া প্রায় তিন বৎসরকাল তথায় বাস করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার সহিত ১৮৭৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় নানা স্থানে বাসা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র হইল। আপনারা শৈশবকালে নিরাশ্রয় অবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন এবং কলিকাতায় নানা স্থানে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া কষ্ট পাইতে হয় এ জন্য একটী স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন। সামান্য কিছু টাকা সংগৃহীত হইলেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একযোগে আণ্টনিবাগানে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে মনোমত সুন্দর একটী বাটী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া এই বাটীর সকল কার্য্য করাইয়াছিলেন এবং দুই এক খানি গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া অন্য টাকায় তাহা আবার খোলসা করিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে ব্যয় সম্পন্ন করিয়াছেন। রাঁধুনী ও চাকর পারতপক্ষে রাখিতেন না। নিজের পরিশ্রমে অর্থ বাচাইয়া দেনা পরিশোধ করিতেন। তাঁহার স্বামী সাধারণ নানা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে সাংসারিক কোনও ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। কৈলাসকামিনীও তাঁহার নিকট কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার সাহায্য লইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নূতন বাটীতে প্রায় ১৫ বৎসর বাস করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাটীটী মনোমত করিয়া সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামীকে বলিয়াছিলেন "আমার জন্য কিছুই করিতেছি না, এ সকল তোমার ও তোমার সন্তানদিগের জন্য।"

সন্তানের জননী।

যখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, তখন ভারতাশ্রমে তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার প্রায় ৩ বৎসর পরে হরিনাভিতে দ্বিতীয়া কন্যা জন্মে। কলিকাতার বাসায় আর একটি কন্যা হয়। উপরি উপরি ৩টি কন্যা হওয়া অলক্ষণ বলিয়া অনেকে ভয় দেখাইলেও

তিনি ভীত বা ক্ষুব্ধ হন নাই। কন্যা পুত্রে বিশেষ নাই বলিয়া কন্যাদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন করিতেন। আণ্টনিবাগানে ভূমি ক্রয়ের পূর্ব্বে তাঁহার ১ম পুত্র জন্মে। তৎপরে আর একটি কন্যা হয় এবং এই কন্যার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কনিষ্ঠ পুত্র অষ্টম গর্ভের বলিয়া বিশেষ শুভ লক্ষণাক্রান্ত মনে করেন এবং স্বামীর সহিত একমত হইয়া যখন তাহার বয়স এক বর্ষ হইল, তখন তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য উৎসর্গ করিলেন। ইহার পর সসত্ত্বাবস্থায় তাঁহার ভয়ানক কম্পজ্বর হয় এবং একটি পুত্র সন্তান মৃত জাত বা জাতমৃত হয়। তিনি "জেঁওজ পোয়াতী" এই জন্য সকলেই তাঁহাকে মহা সৌভাগ্যবতী বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। তাঁহার সন্তান মৃত হইল এজন্য মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যে চক্ষে কখনও জল পড়িতে দেখা যায় নাই, তাহা দিয়া অশ্রুপ্রবাহ বহিতে দেখা যাইত। সন্তানটির নাম 'অমরকুমার' দিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিতে এই কবিতা তাহার স্মৃতিচিহ্নে সংলগ্ন করা হয়—

"শুক্ল প্রতিপদ চাঁদ হইয়া উদয়,
কোথায় লুকালে কেহ বলে না সন্ধান;
ছিলে যথা পুনঃ তথা করিয়া প্রয়ান
বিকশিছ—উজলিছ অমর-আলয়।"

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পুনরায় সসত্ত্বা হইলেন। ছয় মাস গত হইতে না হইতেই তাঁহার উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার এবারকার অবস্থা ভাল নহে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী, ও আলোপ্যাথী ডাক্তারদিগের পরামর্শ লইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত, কিন্তু পূর্ব্ববারের দুর্ঘটনাহেতু কোনও ঔষধসেবনেই প্রস্তুত ছিলেন না এবং "ডাক্তারকে কি আর দেখাইব" বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এইবার গর্ভধারণ তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইল।

তাঁহার কন্যাদিগের মধ্যে একটীকে মাত্র বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় যেমন সুপাত্র জুটিয়াছিল, তেমনি মনের মত ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কন্যার প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক একটী পুত্রকেও তিনি দেখিয়া গিয়াছেন, সে তাঁহাকে "দিদি মা" বলিয়া ডাকিত। প্রথম ও দ্বিতীয়া কন্যা বিক্টোরিয়া কলেজে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছে। তৃতীয়া কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বেথুন কলেজে ফাষ্টআর্ট পড়িতেছে। ১ম পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তিনি বহুব্যয় স্বীকারেও কুণ্ঠিত হন নাই, ঈশ্বরেচ্ছায় সে এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর দুটী পুত্র সিটি স্কুলে পড়িতেছে। কনিষ্ঠা কন্যা গৃহে অধ্যয়ন করে। কনিষ্ঠ পুত্রটি ৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫ম

বর্ষে পড়িয়াছে। সন্তান পালনে কৈলাস-কামিনীর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তাহারা অল্পবয়সে নিজে খাইতে, পরিতে ও নিজের কাজ করিতে পারে এমন করিয়া প্রস্তুত করিতেন। তাহাদের উপর তাঁহার নিয়ম ও শাসন অতি কঠিন ছিল, তাহারা তাঁহার অমতে বা আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে পারিত না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৫।১৬ বৎসরের হইলেও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া নিকটস্থ প্রতিবেশীর বাটীতেও গমন করিতে পারিত না। তাঁহার রাশি খুব ভারি ছিল, তাঁহার ইঙ্গিতে ছেলে মেয়েরা চলিত। তাঁহার দৃষ্টি এবং দুই একটী কথা দ্বারা পুত্র কন্যাদিগকে এরূপ শাসন করিতেন যে অনেকে গুরুদণ্ড দিয়াও সেরূপ করিতে পারে না। তথাপি এই শাসনের মধ্যে এরূপ প্রেম ও কোমলতা ছিল যে, সন্তানেরা তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইত। সন্তানের চরিত্র গঠনে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাহারা সত্য, ন্যায়, ঈশ্বরভক্তি ও পবিত্রতায় সুদৃঢ় হয়, এজন্য সকল উপায় অবলম্বন করিতেন। সন্তানদের উপর তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, বাক্স, সিন্দুক, আলমারী প্রভৃতির চাবি সকলকেই ব্যবহার করিতে দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে না বলিয়া কেহ একটী পয়সাও লইত না বা ব্যয় করিত না এবং তাঁহার সন্তানেরা যে মিথ্যা, চুরি বা প্রবঞ্চনা করিতে পারে ইহা তিনি কল্পনাতেও আদৌ স্থান দিতেন না। স্কুল বা সমাজ অপেক্ষা গৃহেতে সন্তানদের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ভাল হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেন। (ক্রমশঃ)

কিউবা দ্বীপ।*

(উদ্ধৃত)

আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যস্থিত 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া' দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কিউবা দ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও সমৃদ্ধ। খাস কিউবা দ্বীপের পরিমাণফল ৪৩ হাজার ৩১৯ বর্গমাইল। নিকটস্থ পিনস নামক দ্বীপের পরিমাণ ১ হাজার ৩৫০ বর্গ মাইল। এই সমস্ত দ্বীপ কিউবা রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ইহাদিগকে লইয়া হিসাব করিলে সমগ্র কিউবা রাজ্যের পরিমাণফল ৪৫ হাজার ৮৮৩ বর্গমাইল হয়।

কিউবা নিম্নভূমি, সুতরাং বর্ষণসময়ে

এখানে বন্যা আসিয়া থাকে। অল্পমাত্রায় ভূমিকম্পও মধ্যে মধ্যে অনুভূত হয়। গ্রীষ্মের সময় এখানে তাপের পরিমাণ ৭৬ হইতে ৮০ ডিগ্রীর মধ্যে (ফারেনহিটের তাপমান অনুসারে)। শীতের সময়ে তাপ ৫৮ হইতে ৭৮ ডিগ্রীর মধ্যে। স্থানের বিশেষত্বসূচক কোন ব্যাধি এখানে নাই। কখন কখন একপ্রকার জ্বর কতকটা সংক্রামক আকার ধারণ করে। উহা পীত-জ্বর (yellow-fever) নামে পরিচিত।

কিউবা রাজ্যের মধ্যে অকর্ষিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির পরিমাণ বিস্তর। কেহ কেহ বলেন, কিউবায় এক্ষণে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালী যদি তথায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এক্ষনকার অপেক্ষা কৃষ্যুৎপন্ন পাচগুণ আধিক জন্মিতে পারে এবং খনিজ দ্রব্যাদি হইতে আয়ও অনেক বৃদ্ধি পায়।

১৪৯২ খ্রী অব্দের ২৮শে অক্টোবর কলম্বস এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপের নাম তখন হইতে কিউবা ছিল। পরে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামানুসারে ইহা জুয়ানা, ফরনাণ্ডিনা, সান্টিয়াগো, আভামারিয়া নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে উহা পুনরায় সেই পূর্ব্ব নামেই অভিহিত হইতেছে।

১৫১১ খৃঃ অব্দে স্পেনীয়েরা এই দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে। বর্ত্তমান রাজধানী হাভানাই উহার রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। (১৫১৯)। ১৫৩৮ খ্রী অব্দে ফরাসীরা এই নগর পুড়াইয়া দিলে কিউবার গবর্ণর ভবিষ্যতে এই অত্যাহিতের পুনরাবৃত্তি নিবারণ জন্য কিউবায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৪৪ খ্রী অব্দে ফরাসীরা আবার উক্ত নগর আক্রমণ করিয়া উৎসাদিত করে। ১৬০০ সালের পূর্ব্বে কিউবায় আরও দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অতঃপর ফরাসী ইংরাজ, ওলন্দাজ অথবা বোম্বেটিয়াগণ কর্তৃক আক্রমণ আশঙ্কায় হাভানাকে দেড় শত বৎসরকাল সদাই সশঙ্কভাবে অবস্থিত করিতে হয়।

১৭৬২ খৃঃ অব্দে হাভানা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এতদুপলক্ষে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জেতৃপক্ষের সেনাগণ আপনাদিগের মধ্যে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৮৫ পাউণ্ড মূল্যের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিভক্ত করিয়া লইয়াছিল।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে পারিসে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, সেই সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে হাভানা স্পেনীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। এই সময় হইতে কিউবার উন্নতি আরম্ভ হয়। লাকাসাস নামক স্পেনীয় গবর্ণর ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এখানে নীলের চাষ প্রবর্ত্তিত করেন এবং ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে তামাক ও ইক্ষুর চাষ আরম্ভ হইবার উপলক্ষে এখানে যে দাসত্ব প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, উহা রহিত করিয়া দিবার সম্বন্ধে সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৮৭০ খৃঃ অব্দেও কিউবায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার দাস ছিল, ১৮৭৩ সালের দাস-সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৭ হাজার, ১৮৭৬ সালের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৯ হাজার।

১৮৫৩ সালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টকে দাসপ্রথা উঠাইয়া দিতে প্রবৃত্ত করেন এবং তদনুসারে কিউবায় আফ্রিক দাস চালান দেওয়া কয়েক বৎসরের জন্য বন্ধ থাকে। ১৮৮৬ সালে আইন করিয়া দাসত্ব-প্রথা এককালে উঠাইয়া দিবার কথা হয়।

কিউবার অধিবাসিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) স্পেনীয়গণ, রাজ্যের প্রায় সমস্ত পদগুলি যাহাদের অধিকৃত। (২) ক্রিয়োল (Creole), ইহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী। ইহাদিগের প্রতি স্পেনীয়-দিগের বড়ই বিরাগ। (৩) স্বাধীন মলাটো (Mulatto) অর্থাৎ কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ জাত এবং স্বাধীন নিগ্রো সমভাগে মিলিত হইয়া তৃতীয় শ্রেণী সংগঠিত হইয়াছে। ইহারা রাজ্যের অসৈনিক বিভাগীয় সমস্ত পদ হইতেই বঞ্চিত। (৪) দাসজাতীয় লোক লইয়াই ৪র্থ শ্রেণী সংগঠিত।

কিউবার শাসনের জন্য স্পেন হইতে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। ইঁহাদের অভিধান গবর্ণর-কাপ্তেন-জেনারেল। প্রত্যেকের শাসনকাল ৩ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত। সৈনিক, অসৈনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিভাগের উপর ইঁহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। শাসনপ্রণালী রাজতন্ত্র। রোমান ক্যাথলিক ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্ম রাজার অনুমোদিত নয়।

কিউবার আয় প্রায় ৩ কোটী ২০ লক্ষ ডলার, তন্মধ্যে প্রায় ২ কোটী ৬ লক্ষ ডলার স্পেনে পাঠাইতে হয়, অবশিষ্ট কিউবায় সেনা, রণপোত, সিভিল সার্ভিস প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয়।

এখানকার শিক্ষাপ্রণালী তত উন্নত নয়। হাভানায় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় রেক্টর একজন, এবং অধ্যাপক সংখ্যা ত্রিশ। চিকিৎসা ও আইন শিক্ষার স্কুল আছে।

কিউবার অধিবাসিগণ সরকারী সমস্ত পদ হইতেই বঞ্চিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের স্বাধীনতা নাই, অধিকন্তু রাজ্যের সৈনিক ব্যয় সঙ্কুলান জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট ট্যাক্স দিতে হয়। এই হইতেই স্পেনের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপর কিউবা-বাসিগণ দারুণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে এবং এই সূত্রেই উভয় পক্ষে বিদ্রোহ সংঘটন হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ বিদ্রোহ এযাবৎ অনেক বারই সংঘটিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে একটী সংস্কারক দল সংগঠিত হয়। ঐ দলের লোকের চেষ্টায় কিউবাবাসীদিগের অভাব অভিযোগ তদন্তের জন্য মাদ্রিদ নগরে একটি সভা হয়। তদন্তের ফল এই হইল যে, কিউবাবাসী-দিগের উপর এক নূতন ধরণের ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইল এবং তাহাতে তাহাদিগের কষ্ট আরও বাড়িল বই কমিল না।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য অনেক দিন হইতেই কিউবাবাসীদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রী: অব্দে প্রেসিডেণ্ট পলক উক্ত রাজ্যটী খরিদ করিয়া লইবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পায় নাই।

১৮৬৮ খৃ: অব্দে স্পেনীয় বিদ্রোহের সময় কিউবার সমুন্নতদল স্পেনীয় শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতদুপলক্ষে আট বৎসরকাল যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার চূড়ান্ত ফল তেমন কিছুই হয় নাই। এই যুদ্ধে কিউবার ব্যবসায় বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজ্যের ট্যাক্স ত্রিগুণ পরিমিত বর্দ্ধিত হয়।

গত বৎসর হইতে অধিবাসিগণ আবার বিদ্রোহী হইয়াছে। মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি বিদ্রোহীদিগের প্রতি এতাবৎ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। বিগত ২৮শে মার্চ্চ ওয়াসিংটন নগর হইতে এই সংবাদ আইসে যে, কিউবার হাভানা বন্দরে মার্কিণ রণতরি "মেইন" বিনষ্ট হইয়াছে। কি কারণে এরূপ হইল, তাহার তদন্তের ভার একটী কমিটীর উপর দেওয়া হয়। কমিটী স্পেন গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জলমগ্ন কোনরূপ যন্ত্রদ্বারা স-নাবিক ঐ উৎকৃষ্ট জাহাজখানি উড়াইয়া দেওয়া হয়। স্পেনের বিজ্ঞ লোকেরা বলিতেছেন যে, উক্ত জাহাজের নিজের মেগাজিনে আগুন উৎপন্ন হইয়াই এরূপ হইয়াছে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, স্পেন একেবারে কিউবা ছাড়িয়া চলিয়া যায়; কিউবার অধিবাসিগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্ত হউক। কয়েক বৎসরের যুদ্ধের হাঙ্গামায় প্রায় এক লক্ষ বিদ্রোহী এবং প্রায় তত সংখ্যক স্পেনীয় সেনা রোগে ও শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মে মাস হইতে ছয় মাস কাল কিউবা একান্তই অস্বাস্থ্যকর। স্পেনীয়েরা বিদ্রোহীদিগের আহারাদির সংগ্রহ বন্ধ করিয়া উহাদিগকে একপ্রকার দুর্ভিক্ষে নিপাতিত করিয়াছে এবং বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেরই এইরূপ একান্ত কষ্ট হওয়াতেই মার্কিণেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইয়াছেন। গত ১৭ই এপ্রিল আমেরিকার প্রতিনিধি ও সেনেট সভা এই অনিষ্ট নিবারণার্থ এক প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিয়া বিবেচনার্থ স্পেনকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। স্পেন প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় রাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে।—এডুকেশন গেজেট।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনদিগের উক্তি।

রমণী ঈশ্বরের প্রধান সৃষ্টি *—কংফুছে।

স্ত্রীলোকেরা আমাদিগকে শান্তি সৌজন্য এবং মহত্ত্ব শিক্ষা দেন—বলটেয়ার।

সেক্ষপিয়ারের নাটকে বীরপুরুষ নাই, কেবল বীরাঙ্গনা আছেন—রস্‌কিন।

আমি যাহা কিছু হইয়াছি তাহা মার হাতে গঠিত হইয়া—জন কুইন্সি আডাম্‌স।

স্ত্রীলোক যদি স্বর্গভ্রংশের কারণ হয়, তিনিই স্বর্গে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন —হুইটার।

স্ত্রীলোক যত স্ত্রীপ্রকৃতিসম্পন্ন হন, ততই পূর্ণাদর্শ—গ্লাডষ্টোন।

সুন্দরী স্ত্রীলোক রত্ন, সাধ্বী স্ত্রীলোক মহারত্ন—সানিডী।

সমুদায় মহৎ ঘটনার মূলে রমণী—ডামারটাইন।

রমণী-হৃদয় যখন দয়ার আধার হয়, তদপেক্ষা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোমলতর বস্তু আর কিছুই নাই—লুথার।

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় যে সৌন্দর্য্য শিক্ষা দেয়, তাহা কোন্ গ্রন্থকার দিতে পারে? —সেক্‌সপিয়ার।

রমণী প্রেমের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রেমান্বেষণে কে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন? —মার্গারেট ফুলার অসলী।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু
ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।—মনু।

স্ত্রীগণ গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোনও বিশেষ নাই।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

যেখানে নারীগণ পূজিত হন, সেখানে দেবতারা আনন্দিত হন, যেখানে নারীগণের পূজা নাই, সেখানে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল।

চাঁদের হাঁসি।

১

কে শিখালে বল চাঁদ
তোরে ও মধুর হাঁসি,
কেবা দিলে তোরে বল্
মাতাইতে সবাকারে
হেঁসে হেঁসে সারানিশি ?

* এই ভাবে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা

নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে, শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধি বিচিন্ত্য রমণীমুখং, ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

দিবাবসানে পদ্ম ম্লান হইয়া যায়, রাত্রি গত হইলে চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়। বিধাতা এই চিন্তা করিয়া রমণী মুখ রচনা করিলেন। লোকে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া থাকে।

ও অতুল রূপরাশি,
জগত করিতে আলো
আকাশের কোলে ভাসি?

২

রাজ-রাজেশ্বর দ্বারে,
দরিদ্রের ঘরে ঘরে,
হাসি ছড়াইছ, ওগো,
করে করে অকাতরে।
সবাকার চাঁদ তুমি,
বেশী কম কারো নও,
সমভাবে প্রাণ ঢেলে,
সবাকারে সুখ দাও।

৩

গোলাপের আধ ফোটা
কচি কচি কঁড়িগুলি,
তোমার হাঁসিতে, ওই,
গায় গায় পড়ে ঢলি।
ফোটে সৌরভের ভরে
কোমল মু'খানি তার,
আদরে অধর ধারে
হাঁসি ধরে নাক আর।

৪

লতা পাতা জল স্থল
সব চিকি মিকি করে,
সোণার কিরণে তব,
সোণার বরণ ধরে।
এত সোণা পেলে কোথা?
তুমি কি পরশমণি?
পরশে সুবর্ণময়
কর তাই এ ধরণী?

৫

শিশুপ্রাণ! কিবা জানে,
তবুও তোমার হাঁসি,
পড়িলে অধরে তার,
ফোটে হাঁসি রাশি রাশি,
ছোট ছোট হাত দুটি
তুলিয়ে তোমার পানে,
'আয় চাঁদ আয়' বলি,
ডাকে গো সরল প্রাণে।

৬

মলিন দর্পণ' পরে,
পড়িলে তোমার হাঁসি,
মলিনতা যায় মুছি
বাড়ে তার রূপরাশি।
বালিকারো প্রাণমাঝে
অপরূপ ভাব জাগে,
চেয়ে চেয়ে তোমা পানে
থাকে ভরা অনুরাগে।

৭

সুখের শয্যায় বসি
জানালাটি কেহ খুলি,
দেখিয়া তোমার হাঁসি
আবেশে পড়িছে ঢলি।
কত কি লুকান কথা
জাগিছে তাহার মনে,
নীরবে নয়ন-ধারা
বহিতেছে দু-নয়নে।

৮

সারা দিন দুঃখে কেহ
খেটে খেটে প্রাণপণে,
কুঁড়ের বাহিরে আসি

চাহিছে তোমার পানে;
ভুলিছে যাতনা সব,
তোমার ও হাঁসি দেখে,
সুখ-ছায়া পড়িছে গো
তাহার মলিন মুখে।

৯

সাগরের জল ওই
ছুটিছে তোমার দিকে,
ধোয়ায়ে চরণ তব
চুমিতেছে হাঁসি মুখে,
ছড়াইছে ওই হাঁসি
অপার জলধি'পরে,
কুলু কুলু রবে গেয়ে
মাতোয়ারা মধুস্বরে।

১০

নীরব আকাশ কোণে
একমনে একা বসি,
গাঁথিছ তারকামালা
নীরবেতে সারা নিশি,
আধ ফোটা তারাগুলি
ফোটাইয়া মধুকরে,
রাখিছ যতন করি
যামিনী কামিনী তরে।

১১

তাই তব যশোগীত
করিছে সবাই গান,
তাই, ভাসিতেছে সুখে
মানবের মরা প্রাণ,
তাই, প্রেমে মাতোয়ারা
চরাচর বিশ্ববাসী,
তাই শশী ওই হাঁসি
আমি বড় ভালবাসি।

১২

নশ্বর অধরে তোর
মাখায়েছে যে সুহাঁসি,
যাঁর শোভা-কণা লয়ে,
প্রকাশ ও রূপরাশি,
জগৎ-জীবন সেই,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি,
তাঁহার চরণে যেন
থাকে সদা মম মতি।

শ, চ, চ।

গার্হস্থ্যবিষয়ে নরনারীর কর্ত্তব্য।

যাঁহারা গৃহাশ্রমে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থ বলে। সংসারাশ্রমই সকল আশ্রমের সার। সংসারে থাকিয়া, প্রকৃতরূপে সুখ-শান্তি লাভ করিতে হইলে, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করিলে অপরাধী হইতে হয়, এবং এ সংসারে প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা অসম্ভব। অনেকে সংসারে আবদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম

পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ উপদেশ আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমাদের সমুদায় মানসিক প্রকৃতিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী, সুতরাং লোকের তাহা পরিত্যাগ করা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছি। যখন পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এই সমস্ত শুভকর বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উদ্বাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া, সংসারাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক, তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উদ্বাহবন্ধন যে কেবল মনুষ্য জাতিরই স্বভাব-সিদ্ধ, এমত নহে। আমরা পশু এবং পক্ষিশ্রেণীর মধ্যেও দেখিতে পাই যে, অনেক জন্তু চিরজীবন যুগবদ্ধ হইয়া বাস করে। সন্তানাদি উৎপাদনের এবং প্রতিপালনের সময় অতিক্রান্ত হইলেও, তাহারা পরস্পর একত্র কালযাপন করে। এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইলে, বিবাহ যে ঈশ্বরানুমোদিত পবিত্র রীতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেই যে হইল, তাহা নয়; স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর একমতাবলম্বী না হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সৎ ও ধার্ম্মিক স্বামী লাভ করা স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ এবং পুরুষের পক্ষেও চরিত্রবতী এবং সদ্‌গুণসম্পন্না স্ত্রী লাভ করা ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত মিলন না হইলে, পারিবারিক জীবন তিক্ত হইয়া উঠে। বিবাহের আদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহৎ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আত্মার মিলনই প্রকৃত বিবাহ। দেহের মিলন ইহলোকের, তাহার উদ্দেশ্য সমাজ সংরক্ষণ। স্ত্রী পুরুষ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এবং উভয়ে তুল্য সৎস্বভাবান্বিত হইলে, আমাদিগের গার্হস্থ্যজীবনে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইতে পারে। গার্হস্থ্য-শাসনে সামর্থ্য লাভই নরনারীর সমীচীন সাধনের উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি যথা-কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সম্মিলিত জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করিলে, নিশ্চয়ই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারেন। যখন স্ত্রী পুরুষ যথানিয়মে বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তখনই তাঁহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য পবিত্রব্রতে ব্রতী হওয়া হইল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের ভাগী হইলেন। তাঁহারা একে অপরের দুঃখ বিমোচন ও সুখসংবর্দ্ধন-রূপ কর্ত্তব্যসাধনে নিয়োজিত হইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পবিত্র প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, গৃহধর্ম্ম পালন করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইল।

যাহাতে আমরা সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, সুখশান্তি লাভ

করিতে পারি, পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযোগী শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন। পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গৃহধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও জনসমাজের শ্রী বৃদ্ধি-সাধন, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মীয়মণ্ডলীর সন্তোষসাধন, এই সমস্ত বিষয় যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

গৃহধর্ম্মের মধ্যে সন্তান পালন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। সন্তানগণ দোষযুক্ত ও শারীরিক মানসিক বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে,পিতা মাতাকে তজ্জন্য দায়ী হইতে হইবে। পিতা মাতার উপযুক্ত শাসনের অভাবে সন্তান কুপথগামী হইলে তজ্জন্য তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত, পিতা মাতাকে অতি সাবধানে নিজের শরীর ও মনের অবস্থা উত্তম রাখিতে হইবে।'

অন্তঃসত্ত্বাকালে জননীর মন ও শরীর উত্তম না রাখিলে, সন্তানের স্বভাবগত ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা কর্ত্তব্যানুরাগী ও আপন সন্তানগণের শুভ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে নিজের স্বাস্থ্য উত্তম রাখিতে হইবে এবং নির্ম্মল চরিত্র যুক্ত হইতে হইবে।

জনক অপেক্ষা জননীর চরিত্রের দোষ-গুণ সন্তানগণ অধিক প্রাপ্ত হয়; কারণ, শৈশবাবধি সন্তান অধিক সময় জননীর নিকটে থাকে। সন্তানের খাদ্য, পরিচ্ছদ ও খেলা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের সহিত জননীর সংস্রব রহিয়াছে। এই জন্য, জননীর স্বভাবগত দোষগুণই সন্তানে অধিক বর্ত্তে।

পুত্র কন্যাকে উত্তমরূপ প্রতিপালন, সুশিক্ষা প্রদান ও তাহাদের সুখসাধনের উপায় করা, জনক জননীর অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ-স্বরূপ।

পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানগণের শিক্ষাসাধনের উপায় অবধারণ করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অপারগ হইলে, চতুর্দ্দিকেই মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হয়।

পিতা মাতার 'অসমর্থতা হেতু যদি সন্তানকে কষ্ট পাইতে হয়, অথবা সন্তানের সুশিক্ষা লাভের ব্যাঘাত ঘটে, তবে সে জন্য পিতা মাতাকে দায়ী হইতে হইবে। গৃহকার্য্য, আত্মীয়বর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সন্তান পালন বিষয়ে স্ত্রীদিগের নিপুণতা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ নিজ নিজ ব্যবসায়ে সুনিপুণ হওয়া যেমন পুরুষদিগের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ গৃহকর্ম্মে এবং সন্তানপালনে সুশিক্ষিতা হওয়াও স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য। যে সকল নিয়মানুসারে চলিলে, নিজের ও সন্তানের শরীর সুস্থ থাকে, তাহার উপায় বিধান করা জননীর প্রধান কর্ত্তব্য, সুতরাং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান উপার্জ্জন করা জননীর একটী প্রধান কার্য্য

শিশু সন্তানদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা জননীর অপর একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যে ভাবে শিক্ষা দান করিলে, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদয় পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুরিত হয় এবং নিকৃষ্ট-বৃত্তি সমূহ তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, সন্তানগণকে সেইরূপ শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। শিশুগণ যে সকল বিষয় দর্শন করে, সর্ব্বদা জননীর নিকট সেই সকল বিষয় লইয়া, "এটা কি?" "ওটা কি?" "এরূপ হয় কেন?" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। জননীর ঐ সকল প্রশ্নের যথার্থ সদুত্তর দান করা কর্ত্তব্য। জননীগণ যদি প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অবগত না হন এবং তত্তদ্বিষয়ে যে সকল প্রগাঢ় কুসংস্কার তাঁহাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলিই তাহাদিগকে শিক্ষা দেন, তবে তাহাদিগের ভবিষ্যতে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; কারণ জননী প্রদত্ত শৈশবের শিক্ষাই সন্তানের জীবনে আজীবন কার্য্য করে। শিশুকাল হইতে যে সকল বিষয় অভ্যস্ত হয়, বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে, সেই অভ্যাসগুলি দূর করা অতীব কঠিন হইয়া উঠে। শৈশব হইতে মিথ্যা বলিতে অথবা হিংসা করিতে শিখিলে পরিণত বয়সে ঐ সকল প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেহ কোন দ্রব্য চাহিলে, উহা গৃহে থাকা সত্বেও যদি জননী অস্বীকার করেন, অথবা সন্তানকে অস্বীকার করিতে শিখান, তবে সন্তানের ঐরূপ করা অভ্যাস হয়। সুতরাং জননীর প্রদত্ত শিক্ষার উপরেই সন্তানের সদসৎ চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

স্ত্রীগণ সুচারু শিক্ষা লাভ করিলে, গৃহে সুখের পরিসীমা থাকে না। সন্তান-গণ শৈশবাবধি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, উত্তরকালে পুণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 'মানব' নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিতে পারে। আশৈশব যাহাতে সন্তান কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। শিশুদিগকে কার্য্যকরী বৃত্তির বশবর্ত্তী করিলে, অতি সহজেই শিক্ষা দান করা যায়; কারণ কোন বিষয়ে শতবর্ষ উপদেশ প্রদান করিলেও যাহা না হয়, অনুষ্ঠান দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বদা সৎ বিষয় উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা অনুষ্ঠান দ্বারা উহার উত্তমতা প্রতিপন্ন করা অধিক সহজ এবং ফলদায়ক। অতএব দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক শিশুদিগের জীবন সৎপথে পরিচালিত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্ত্তমান সময়ে কুসঙ্গ হইতে সন্তানদিগকে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সন্তানগণ গৃহে থাকিতে ভালবাসে না। গৃহ এমন আমোদজনক করিয়া তুলিতে হইবে যে, সন্তানগণ গৃহে থাকিয়া সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে। তাহারা গৃহে যেন সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদে যোগ দান করিতে পারে।

পিতা মাতা ভাই ভগিনীর মধ্যে রাখিয়া, সন্তানদিগকে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে দিলে আর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানগণকে বাহিরের নানা-প্রকার লোকের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা করিতে দেওয়া ভাল নয়। এতদ্দ্বারা অদৃশ্যভাবে চরিত্র নানা দোষে দূষিত হইতে পারে। যখন দেখা যাইবে বালক বালিকা পিতা মাতা ভাই ভগিনীর সহিত গৃহে থাকিতে ভালবাসে না, তখনই জানিতে হইবে, বালকের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে।

শিশুরা স্বভাবতঃ অনুচিকীর্ষু। তাহারা সর্ব্বদা গৃহে যেরূপ আচরণ ও ব্যবহার দেখিতে পায়, সেইরূপ শিক্ষা করে। বিশেষতঃ গুরুজনদিগের ব্যবহার অনুসারে তাহারা উত্তম অথবা মন্দ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বালক বালিকাদিগকে সুশীল করিতে হইলে, জনক জননী এবং পরিবারস্থ সকলকে সচ্চরিত্র হইতে হইবে। শিশুদিগকে সতত তিরস্কার করা, প্রচণ্ডরূপ তাড়না করা ও শারীরিক দণ্ড বিধান করা, অতীব অনিষ্টকর। তদ্দ্বারা তাহাদের ক্রোধাদি রিপু প্রবল হইয়া থাকে। সন্তানগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার অভিলাষ থাকিলে, তাহাদের সমক্ষে সতত সদাচরণ করিতে হইবে। জনক জননীকে সর্ব্বদা রাগ, দ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ ও অপরাপর কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগের চরিত্রেও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবির্ভূত হইতে থাকে। যে গৃহের জনক জননী প্রকৃত দম্পতী নামের উপযুক্ত হইয়াছেন ও যে গৃহে প্রতিনিয়ত সুখ ও সন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সেই গৃহই শিশুগণের উপযুক্ত স্থান।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

বিষম জ্বরের ঔষধ।

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটকী মিলিত দুই তোলা, অর্থাৎ প্রত্যেকে ॥৵১০। (কটকী ॥৵১০ দিলে যদি তরল ভেদ হয়, তবে মাত্রা কম করিয়া দিতে হইবে)। অর্দ্ধ সের জলে জাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে অবিচ্ছেদ বিষম জ্বর উপশমিত হয়।

দ্বৈকালিক জ্বর।

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি ও কটকী মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধ সের জলে জাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দ্বৈকালিক জ্বর আরোগ্য হয়।

প্রাত্যহিক একবার করিয়া জ্বর।

নিমছাল, পটোলপত্র, কিসমিস, ত্রিফলা

(হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) মুথা ও ইন্দ্রযব মিলিত দুই তোলা। জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রতিদিন একবার যে জ্বর হয়, তাহা প্রশমিত হয়।

বিবিধ প্রকার জ্বর।

চিরতা, গুলঞ্চ, ও শুট মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা পানে একদিন অন্তর যে জ্বর তাহা নিবৃত্ত হয়।

গুলঞ্চ, আমলা ও মুথা এই তিন দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাথ প্রস্তত করিয়া ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দুই দিন অন্তর যে জ্বর তাহা বিনষ্ট হয়।

পটোলাদি কাথ।

পটোলপত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বাসকছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে ইক্ষু চিনি ২।৩ আনা এবং মধু ২।৩ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঐকাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদি কাথ।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, রক্ত চন্দন, বেণার মূল, ও ধনে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু ও চিনি। এই কাথে তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসকাদি কাথ।

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী, ও শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা: পূর্ব্ববৎ কাথ প্রস্তত করিবে। কাথ শীতল হইলে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থিক জ্বর আরাম হয়।

মহাবলাদি কাথ।

গোরক্ষ চাকুলের মূল ১ তোলা ও শুঁঠ ১ তোলা দ্বারা কাথ প্রস্তত করিয়া পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সকল প্রকার বিষমজ্বর ২।৩ দিনে বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, আমলা, কণ্টকারী, শুঁঠ, বিল্বমূলের ছাল, সোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, কটকী, ইন্দ্রযব, ও দুরালভা মিলিত ২ তোলা পূর্ব্ববৎ কাথ। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও দ্বন্দজ প্রভৃতি রাত্রি জ্বর বিনষ্ট হয়।

পালা জ্বর।

আপাঙ্গের শিকড়ের রসের ঘ্রাণ একদিন কিম্বা দুই দিন লইলে পালা জ্বর উপশমিত হয়।

অপরাজিতার পাতার রসের নস্য গ্রহণ করিলে পুরাতন পালাজ্বর সারে।

বৈশাখের হেঁয়ালির উত্তর।

'আমার' নাহিক 'মার,' 'লোহার' নাহিক 'হার,'
'কণ্টক' নাহিক 'এক' অবশিষ্ট যাহা রয়,
পাছু পাছু পাছু করি বসাইলে, হরি, হরি!
আদি দুয়ে তিন(ই) সম* মধ্য শেষে ব্যক্তি হয়।
আদি শেষ যদি লই, ইক্ষুদণ্ড তবে কই?
তবে, বুঝি, এই তিনে সেই বস্তু মহাশয়। ১
স্বরবর্ণশ্রেণীমধ্যে দ্বিতীয় সে রয়†
হইবে কুলুপ তায় 'তাল'ফল্ ধর,
'রাজ' তায় হবে ভূপ ; বল মহাশয়
সত্য কিনা সেই বর্ণ প্রশ্নের উত্তর ?
সবিশেষ প্রমাণের কিবা প্রয়োজন ?
'গজ,' 'দাগ' আদি সহ মিলাইয়া লন। ২
'পা' আর 'হাড়' দুয়ে "পাহাড়" হইল,
বিরাট আকার তার গগন স্পর্শিল।
পদ অপভ্রংশে লোকে 'পা' এই কয়,
অস্থি অপভ্রংশে 'হাড়' জানি মহাশয়। ৩
‡ মেঘের শরীর বাষ্প প্রিয়তম তার,—
নহে কহ কার কার প্রিয়তম তার ?
মেঘ, বাষ্প, দৌহাকারি সিন্ধুগর্ভে স্থান,
'মেঘ'(ও) 'না'য় 'মেঘনা' নদের নিরমাণ।
মেঘের গভীর নাদে শিহরে পরাণী,
'মেঘ' তবে প্রশ্নের উত্তর এই জানি। ৪

নূতন সংবাদ।

১। ঢাকা মেডিকাল স্কুল হইতে এবার একটী স্ত্রীলোক ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২। ইটালীর ক্লজিয়া নগরের এক শিল্পীর স্ত্রী এককালে ৪টী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে, এবং ৪টীই জীবিত আছে। নগরাধ্যক্ষ তাহাদের জলসংস্কারের দিনে এক প্রকাণ্ড উৎসব করিয়া ৪টী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে তাহাদিগের নামকরণ করিয়াছেন--ডান্টি, পেট্রার্ক, টাসো ও অরিয়াষ্টো।

৩। পেসোয়ারে আগুন লাগিয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল নগর দাহ করে। প্রভূত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৪। বামাবোধিনীর পাঠিকারা জানেন সম্প্রতি কাউনটেস কানাভার নাম্নী এক ধনাঢ্যা বিদ্যাবতী মহিলা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ কয়েক মাস হইল সিংহলে আসিয়াছেন। গত ৩০শে এপ্রেল তত্রত্য মহিলাদিগকে লইয়া সঙ্ঘমিত্রা আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৫। আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর ন্যায় কাশীতে একটী অন্তর্জাতিক ধর্ম্ম-মণ্ডলীর অধিবেশন হইবার কথা।

---

*'আলো'তে সকলি, সত্য, সমান দেখায়।
কাজ কি কেবল তিন বর্ণের কথায় ?

† । আকার।

‡ ইহার উত্তর 'নবদ'। বা, বো, স।

৬। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ স্বর্গীয়া কৈলাস-কামিনীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা সহকারে তাঁহার পচম্বার বাটীতে সম্পন্ন হয়। এত-উপলক্ষে ৭।৮ শত গরিবকে খাদ্য ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছে, এবং তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গারোহণের ১৫ দিন পরে হরিনাভি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে, তথায়ও একটী স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস—শ্রীহেমলতা দেবী কর্ত্তৃক রচিত, মূল্য ॥০ আট আনা। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অনেক কারণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। প্রথমতঃ একজন শিক্ষিতা বঙ্গরমণী ইহার রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ পুস্তকখানির ভাষা এমন সরল ও সুমিষ্ট যে, ইহার যে কোন পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। বালক বালিকাদের জন্য ইতিহাস পুস্তক সচরাচর যেরূপ রচিত হইয়া থাকে, তাহা কটমটে ও পাঠে অরুচিকর। কিন্তু বর্ত্তমান লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন, হৃদয়ের ভাবের সহিত লিখিয়া গ্রন্থখানিকে অতি সরস ও উপাদেয় করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ গ্রন্থখানি সচিত্র না হইলেও ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ইহাতে ছবির ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহা সুকুমারমতি বালক বালিকাদের বেশ হৃদ্গত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ ইতিহাস পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য যে স্বদেশপ্রেম, মহৎ চরিত্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, দুশ্চরিত্রের প্রতি ঘৃণা এবং সকল সদ্‌গুণের সমাদর—এই সকল ভাবের উদ্দীপন, এই ইতিহাস দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে উৎসাহ দান করা কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বামাবোধিনীর পাঠিকারাও গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠে ইতিহাস পাঠের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

২। লক্ষ্মীমেয়ে—শ্রীবিধুভূষণ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ।৵০ আনা। এক মাতৃহীনা বালিকা গরিব পিতা ও শিশু ভ্রাতা একটীকে লইয়া নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেমন সুন্দর গৃহিণীপনা করিয়াছে এবং অবশেষে এক ধনাঢ্য যুবকের গৃহলক্ষ্মী হইয়া আপনার গুণের পুরস্কার লাভ করিয়াছে, তাহাই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটী বেশ সুপাঠ্য ও উপদেশপ্রদ।

বামারচনা।

মরণ।

ফুলটি ঝরে পড়ে,
পাতাটি শুখায়ে যায়,
প্রগাঢ় শীতের পর
ছুটিলে হিমানী বায়।
তারাটি ডুবে যায়,
যামিনী পোহায় যবে,
সবারি আছে কাল
নিখিল এই ভবে।
দিবস কাটে শুধু
খেলিতে নানা খেলা,
গাহিতে গাহিতে যায়
সুখের সান্ধ্যবেলা।
শান্তির নিদ্রার তরে
রজনী কোল পাতে,
মরণ! তোর গতি
অবিরাম দিবারাতে।
সুমোহন ঊষাকাল,
মধ্যাহ্ন প্রখর বেলা,
দিবসের অবশেষ,
রাঙ্গারবি করে খেলা।
সুন্দর শিশুকাল
মধুর যৌবন-লীলা,
শীতল স্থবির দশা,
জীবনে শান্তির ভেলা।
মরণ! তোর বাসা
প্রত্যেক কক্ষে কক্ষে,
কুটাস তুই কাঁটা
অবাধে প্রতি বক্ষে।

চাঁদিমা ডুবে কবে
আঁখিটি বলে দেয়,
কোকিলের কুহু গীতি
শ্রবণে আসি গায়।
শরতের নীলাকাশ,
নিদাঘের খর রবি,
বরষার জলধারা
হেমন্তে শিশির ছবি,
শীতল শীত নিশি
বসন্ত মলয়বাতে,
প্রকৃতি রাখে লিখি
সুকোমল শুভ্রপাতে।
মরণ! তোরে শুধু
চিনেনা হেথা কেহ,
এসেছ কোথা হতে
কোথা বা তোর গেহ?
শিখাতে জানে কেবা
তোরও মনোরথ,
জীবনের কোন্ দণ্ডে
গণিব তোর পথ?
ধনীর অট্টালিকায়
দুঃখীর কুটীর তলে,
সঙ্গীত-লহরী সম
লুটাও তরঙ্গে ছলে।
মাননা কালাকাল,
জাননা লঘু গুরু,
শুনিলে নাম তোর
হিয়া করে দুরুদুরু।

ভীষণ রীতি তব
কাঁপায়ে জীবের প্রাণ
কেনরে এ ধরায়
হ'লি দেবতার দান ?
ফুলটি ঝরে পড়ে
পাতাটি শুখায়ে যায়,
গভীর শীতের পর
ছুটিলে হিমানী বায় ;
তারকার উজলতা
উষা এসে নিভে যায়,
মরণের দিন শুধু
কেহ কি খুঁজিয়া পায় ?

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

শ্মশান।

(স্নেহের ভগিনী লাবণ্যময়ীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত)

হায় ! শ্মশানের কোলে
সোণার প্রতিমা গুণে অনুপমা
দিয়েছি দিয়েছি ঢেলে।
চিতার অনল জ্বলিছে প্রবল
ঐ গগনের তলে।
ধূম উদ্গারিয়া 'ফেলিল' গিলিয়া
পীড়িত লাবণ্য-দেহ।
হল ভস্মশেষ নাহি তার লেশ,
আর না হেরিবে কেহ।
যতনের ধন মানব জীবন
চিতা তার গম্যস্থান।
চিহ্নমাত্র তার শ্মশান অঙ্গার,
একি জীব-পরিণাম !
শিয়াল শকুনী করিবেক ধ্বনি
এবে সে শ্মশান-কোলে।
অনিল আসিয়া ভস্ম উড়াইয়া
যাইবে গরবে চলে।
তারকা ও শশী জোছনার হাসি
শ্মশানে ঢালিয়া দিবে।
কোকিল বায়স শালিক সারস
রসালে বসিয়া গাবে।
বৃক্ষ লতা যত দিবেগো গলিত
পত্র পুষ্প উপহারে।
প্রভাত তপন বিমল কিরণ
ঢালিবে শ্মশান পারে।
নীরদের দল ঢালিবেক জল
ঝম্ ঝম্ শব্দ করি।
চপলা সুন্দরী আলোক বিতরি
হাঁসিবে আঁধার হরি।
মলয় বাতাস ফুলের সুবাস
দিবেগো ঢালিয়া গায়,
কুল কুল ধ্বনি শুনাবে তটিনী
জুড়াবে শ্মশান-কায়।
কুসুম-কলিকা কোমলা বালিকা
এ হেন শ্মশানে মরি !
এসেছে সবায় জনম বিদায়
দিবে হায় হরি ! হরি !
মনে লাগে ব্যথা যে দিনের কথা—
লাবুর সূতিকালয়,
পনর বছর হয়েছে অন্তর

মাত্র যে কদিন হয়।
জনমে মরণে একই বাঁধনে
বাঁধিয়ে দিয়েছ হরি!
জনম-আহ্লাদ হইল বিষাদ
সূতিকা শ্মশান মরি!
শ্মশানের মত এ জগতে পূত
সাম্য-স্থাপয়িতা নাই,
সবে এক দিন হইবে অচিন্
সকলে সমান ছাই।
রাজা প্রজা দীন বালক প্রবীণ
সকলে সমান দয়,
সন্ন্যাসী সংসারী সম্রাট ভিখারী
একই শ্মশানোপর।
শত্রু মিত্র ভাই সব এক ঠাঁই
একত্রে মিশিয়ে যাবে,
স্নেহ ভক্তি প্রেম দয়া ধর্ম্ম ক্ষেম
নিন্দা তুচ্ছ গ্লানি ভবে।
সুখ্যাতি অখ্যাতি নিঠুর পিরীতি
সবি হবে একাকার,
জনম মরণ স্রষ্টার সৃজন,
কিবা লীলা বিধাতার!
সূতিকা-আলয় করে শোভাময়
শিশু জননীর কোলে,
এই দেখ তার চিতার উপরে
ঢাকিয়া রেখেছে কালে?
হরি! হরি! হরি! তব লীলা স্মরি
অন্তর উন্মাদ হয়,
পবিত্র শ্মশান, তোমার বয়ান
সতত সেথায় রয়।
তোমার বিকাশ অতি সুপ্রকাশ
আঁতুড়ে শিশুর মুখে,
আরো স্পষ্ট হরি! শ্মশান উপরি
ধরিয়ে অনল বুকে।

শ্রী—

শোকোচ্ছ্বাস।*

আজিগো মলয় হেন,
কালিমা মাখান কেন,
গাহিছে বিজয়া গীতি আজি সে কাহার?
"কৈলাসকামিনী নাই"
হেন অমঙ্গল ছাই,—
কে ঢালে ধরায় ভাঙি হিয়া সবাকার?
হৃদয়ে শোণিত ছুটে,
ধমনী কাঁপিয়া উঠে,
বালাই এ হেন গাথা গাহিও না আর!
ওকি কেন গণ্ডগোল,
কিসের এ "হরিবোল"
কেন ওই শত কণ্ঠে এত হাহাকার?
ওই যে মানবদল,
কেন ঢালে আঁখিজল,—
কি রতন হারাইয়া গিয়াছে সবার?
"কি আর শুনিবে ছাই,
কৈলাসকামিনী নাই,
উজল রতন আজ খসিল ধরায়!"

* গুরুপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।—লেখিকা।

সত্যই কি দেবী আজ,
গেছেন স্বরগ মাঝ,
ফেলিয়া তাঁহার যত দীনা ভগ্নীগণ,—
এত মৃত্যু নহে তাঁর,
এ মরণ অবলার,
কে আর তাদের হিতে করিবে যতন।
তাদের মরমে আজ,
পড়িল দারুণ বাজ,—
নাহি বুঝি বিধাতার এ বিধি কেমন!
দেবিগো! কিসের আশে,
ধাইলে অমর বাসে,
কাঁদাইয়া সুত সুতা পতিদেবতায়?
(আমিত বুঝি না হেন কি আছে তথায়!)
বলগো শুনিতে চাই,
গেলে কি বিভুর ঠাঁই,
সুধিবারে রমণীর উন্নতি-উপায়?
তুমি ত গিয়েচ চলে,
মোরা ভাসি অশ্রুজলে,—
কে জানে আবার কবে নমিব ও পায়।

কে হেন নিঠুর এসে,
নিল তোমা কোন্ দেশে,—
ছিলেগো ধরার দেবী অতুলন গুণ,—
দয়া ধর্ম্ম সরলতা,
অমিয়া-মাখান কথা,
একাধারে রেখেছিল বিধাতা নিপুণ।
তোমার স্নেহের ছায়,
এ বঙ্গ জুড়াত হায়,—
আজ বঙ্গ-মা'র ভালে জ্বলিল আগুন।

তুমি স্বরগের ফুল,
জগতে মিলে না তুল,
বুঝেছি সংসার তব উপযুক্ত নয়।
পাপ কুটিলতা ছল,
পূর্ণ এই ধরাতল,—
স্বর্গীয় রতন তুমি পবিত্রতাময়,—
তাই বুঝি দ্রুতগতি,
স্বরগে গিয়াছ সতি,—
স্বরগের জীব কবে মর ভবে রয়!

যার বাস স্বর্গপর,
সে কি রহে ধরাপর,—
ভ্রমিতে—ভ্রমিতে বুঝি নন্দন উদ্যানে,—
পথ ভুলে একবার,
এসেছিলে এ সংসার—
যে কদিন ইচ্ছা ছিল ছিলেগো এখানে!
করুণা সুরভি সুখে,
ঢালি দীনা বঙ্গ-বুকে,
আবার চলিলে সুখ-আবাস যেখানে!

লইয়া মঙ্গল ডালা,
এস যত দেব-বালা,
ধরার দেবীরে লও করিয়া বরণ—
রও দেবী সুখে তবে,
আমরা পূজিব সবে,—
প্রীতির কুসুম তুলে নিতি ওচরণ।
থাকে যদি পুণ্যফল,
(পুনঃ) হেরিব ও পদ-তল,—
আবার শুনিব তব অমিয় বচন!!

নগেন্দ্রবালা।

No. 402. July, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬ বর্ষ। ৪০২ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩০৫—জুলাই, ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মোক্ষমুলারের ভারত দর্শনেচ্ছা—ভারতহিতৈষী মোক্ষমুলার এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন, তখন সংগতি অভাবে ভারতে আসিতে পারেন নাই, এখন তিনি বৃদ্ধ এবং নানা কার্য্যে আবদ্ধ সে জন্য ভারতদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বিলাতে থাকিয়াই ভারতের যেমন মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সেইরূপ করিতে থাকুন।

ভারতের নূতন রাজপ্রতিনিধি—লর্ড এল্‌গিন্ আগামী অক্টোবরে যাইতেছেন। তাঁহার স্থানে বার্লের লর্ড ব্যালফোর অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা।

মহারাণীর দৃষ্টিশক্তির উন্নতি—ভারতেশ্বরী চসমা ব্যবহার করিয়া সুন্দররূপ দেখিতে পাইতেছেন।

সাবানের ব্যবহার—এক গ্রেট ব্রিটেনেই বৎসরে পাঁচ কোটী মণের অধিক সাবান খরচ হইয়া থাকে! ভারতে ইহার কাট্‌তি ক্রমেই বাড়িতেছে

ইউরোপের লোকসংখ্যা—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পঁচিশ কোটি ছিল, এক্ষণে ছত্রিশ কোটির অধিক হইয়াছে।

মার্কিন সংবাদপত্র—১৭০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় একখানি মাত্র সংবাদপত্র ছিল, এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জর্ম্মণি এই তিন দেশে যত পত্র প্রচারিত হয়, এক আমেরিকায় তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

মার্জ্জার-ভক্তি—পূর্ব্বকালে মিসরে মার্জ্জারের যেরূপ আদর ছিল, এক্ষণে পারস্যে সেইরূপ। পারস্যের শা পঞ্চাশটী বিড়াল পুষিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ, আহার এবং ভৃত্যের

ব্যবস্থা আছে। শা যখন ভ্রমণে বহির্গত হন, তাঁহার প্রিয় বিড়াল সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে নীত হইয়া থাকে।

স্ত্রী ম্যাজিষ্ট্রেট—লোনীর জায়গিরদার ভেঙ্কট রেওর বিধবা রাণি লক্ষীবাই তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজেষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন; দেওয়ানী বিষয়ে ১০০৲ টাকা পর্যান্তের মকর্দ্দমা করিতে পারিবেন। স্ত্রী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

দান নিউ ইয়র্কের ডাক্তার এলিজাবেথ বেটস্ মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের এক সম্পত্তি দান করিয়াছেন। স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের জন্য এক চিকিৎসাধ্যাপক নিযুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

মৃত্যু—আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই আষাঢ় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ভারতসভার সহকারী সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পিত্তশূল রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ২০ বৎসর গত হইল, ইনি 'অবলাবান্ধব' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার করিয়া স্ত্রীজাতির হিতোন্নতি সাধনে প্রাণগত যত্নের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি সময় সময় লেখাদ্বারা বামাবোধিনীকেও বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

ভারতীয় বীরদিগের ফণ্ড—বিলাতে এই ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস ইহার সভাপতি। মহারাণী এই ফণ্ডে ২৫০ গিনি দান করিয়াছেন। ফণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার টাকা জমিয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষীয় বীর মাত্রকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—এ বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩১৯৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে—১ম বিভাগে ৫৩১, ২য় বিভাগে ১৩১৯ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৩৪৩ জন। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ ১৪১৭ জন—১ম বিভাগে ৫১, ২য় বিভাগে ২৭১ এবং ৩য় বিভাগে ১০৯৫ জন।

পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাদিগের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা।

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
বি, ই, ইষ্টিল	২য়	প্রাইবেট
গ্রিফিন মেরী	"	"
পুসিলা বসু	৩য়	বেথুন কলেজ
জ্ঞানদা দাসগুপ্ত	ঐ	ঐ
সরযূ মজুমদার	ঐ	ঐ
শান্তা সরকার	ঐ	ঐ
লিলিয়ান পালিত	ঐ	প্রাইভেট
ওয়ালটাস এগ্নিস	ঐ	ঐ

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
উষ: প্রভা ঘোষ	১ম	লোরেটো হাউস
চারুলতা গুপ্ত	"	"
কনকলতা রায়	"	"
নগেন্দ্রবালা সেন	"	ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল
মনোরমা বন্দ্যো	২য়	ব্রাহ্মবালিকা ,,

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়	নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
সুষমা ভট্টাচার্য্য	২য়	ব্রাহ্মবালিকা বিঃ	জুলিয়েট ওয়াইট	২য়	এম. ই, স্কুল, রেঙ্গুণ
মৃণালিনী বসু	„	ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল	হেডিঙ্ এনি	„	সেণ্ট জোজেফ কঃ
অরবিন্দ রায় চৌধুরী	„	„	সাইমন লিডিয়া	৩য়	কনভেণ্ট রেঙ্গুণ
শরৎকুমারী মিত্র	„	বেথুন স্কুল	সরোজিনী বন্দ্যো	„	ফ্রিচার্চ নর্ম্মাল
সরোজিনী দাস	„	„	চারুবালা ঘোষ	„	বেথুন স্কুল
স্বর্ণলতা রায়	„	লোরেটো হাউস	লেনা রজাস	„	মান্দালে কনভেণ্ট
হিন্দু ওয়েলেষ্টেড	„	„	সি মুর্শিরা মানিয়ম	„	প্রাইবেট
মারিয়া রিচমণ্ড	„	পিটার্সন বালিকা বিঃ			

আধুনিক পারস্য রাজ্য।

প্রাচীন পারস্য রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের নিকট সম্বন্ধ ছিল। পারস্য জাতি আর্য্যবংশসম্ভূত এবং পারস্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতেই হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন। পারস্যজাতি আপনাদিগকে "ইরাণী" বলিয়া থাকে। "ইরাণী" শব্দ "আর্য্য" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

পূর্ব্বে আফগানিস্থান এবং পশ্চিমে তুরস্ক, এই দুই রাজ্যের মধ্যস্থ ভূভাগই পারস্য রাজ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা আকারে ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষের অধিক নহে। পারস্য রাজ্যের মধ্যভাগে পর্ব্বত এবং স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত মরুভূমি দেখা যায়। উর্ব্বর ভূমির ভাগ অধিক নহে। লবণ-জলময় হ্রদের সংখ্যা অনেক। পারস্য রাজ্যে উষ্ট্র, অশ্ব ও মেষ বহুসংখ্যক দেখা যায়। পারস্যদেশজাত মেষের লেজ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে খুব বড়; এক একটী মেষের লেজ ওজনে বার সের পর্য্যন্ত হয়।

পুরাকালে পারস্য একটী বিশাল ও মহাপরাক্রান্ত সাম্রাজ্য ছিল, এবং ভারতবর্ষের কিয়দংশ কিয়ৎকাল পারস্যের সম্রাটের অধীনে ছিল। পারস্যের বর্ত্তমান রাজাকে "শা" বলিয়া থাকে। তিনি আপনাকে "শা-এন-শা" অর্থাৎ "রাজার রাজা" বলেন।

পারস্যে প্রধানতঃ পারস্যজাতি, তুর্কোমান্, বেলুচী, আর্ম্মেনিয়ান্, ও জাটনামক জাতীয় লোকেরা বাস করে। বোম্বাই নগরে অগ্ন্যুপাসক পারসি নামে যে জাতি বাস করে, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পারস্য দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বসতি করেন। এই পারসি জাতীয় লোককে পারস্য দেশেও এখন দেখা যায়।

পারস্যজাতীয় পুরুষ দীর্ঘাকৃতি, নাতি গৌরবর্ণ, ও অঙ্গসৌষ্ঠবশালী। মস্তক কৃষ্ণ-কেশাবৃত, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও দীর্ঘ, এবং নাসিকা ঈষৎ বক্র। দীর্ঘ শ্মশ্রু রক্ষা করা পারস্যবাসীদিগের মধ্যে একটী বহুকাল-প্রচলিত সর্ব্বজনাদৃত প্রথা। পারস্য রমণীগণ সাধারণতঃ রূপবতী; কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ মহিলাগণ নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য সাধন করিতে গিয়া আপনাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হানি করেন। গণ্ডদেশে রং লাগান, মুখমণ্ডলের নানা স্থানে তারা বা সূর্য্যের চিত্র চিত্রিত করা, কেশদাম রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা, উল্‌কি পরা, এইগুলি পারস্য রমণীদিগের অতি প্রিয় ও তরপনেয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পারস্য পুরুষগণ ঢিলে পাজামার উপর প্রথমে একটী পিরাণ, তাহার উপর একটী হ্রস্ব চাপকান, এবং তদুপরি একটী কোট পরিধান করেন। যাহার যেমন অবস্থা তিনি কোটটী তদনুযায়ী মূল্যবান্ ও শোভাবিশিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ঢিলে পাজামা পরিধান করিবার প্রথা থাকাতে পারস্য পুরুষগণ উচ্চ কাষ্ঠাসন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আসনে উপবেশন করিতে অসুবিধা বোধ করেন না। উৎসবাদি শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার প্রথা আছে। পারস্য পুরোহিতগণ পাগড়ী পরিধান করেন; অপর সকলে মেষচর্ম্ম অথবা বস্ত্রনির্ম্মিত টুপি ব্যবহার করেন। মোজা ও জুতা পরিধান করার প্রথা উভয় পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সম্ভ্রান্তবংশীয় পারস্য মহিলাগণ বাটীর বাহিরে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে পারেন; কিন্তু রাজপথে বা প্রকাশ্য স্থানে বহির্গত হইলেই অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করেন, এবং এক প্রকার নীল বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করেন। এ অবস্থায় পারস্য মহিলাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহাকে একটী প্রকাণ্ড থলির মধ্যে পুরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহমধ্যে অবস্থিতিকালে ভদ্র পারস্য মহিলাগণ একটী মাত্র বস্ত্র পরিধান করেন। নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অবগুণ্ঠন ধারণের প্রথা প্রচলিত নাই।

রুটী পারস্যবাসীদিগের প্রধান আহার্য্য দ্রব্য। এদেশে মুসলমান ও হিন্দুস্থানীগণ যেরূপ রুটী প্রস্তুত করেন, পারস্যবাসীও ঐ প্রকার রুটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ডিম, দধি ও পনীর পারস্যবাসীদিগের অত্যন্ত প্রিয় আহারীয় সামগ্রী। ধনী ব্যক্তিগণ পোলাও এবং নানা প্রকার মসলা মিশ্রিত ব্যঞ্জন আহার করিতে বড় ভাল বাসেন। আহার করিবার পূর্ব্বে পারস্যবাসিগণ "বিসমিল্লা" অর্থাৎ "ঈশ্বরের নামে" এই কথাটী উচ্চারণ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়েন।

পারস্য দেশের অধিকাংশ গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। ধনী ব্যক্তিগণ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন,

কিন্তু তাঁহাদিগেরও গৃহ সাজ সজ্জাশূন্য। দরিদ্র লোকেরা মাদুর এবং সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গালিচার উপর শয্যা প্রস্তুত করেন। দরিদ্র লোকেরা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে, কিন্তু তাহারা প্রত্যহ দুই তিন বার গাত্র ধৌত বা স্নান করিয়া থাকে।

অতি শৈশবাবস্থাতেই প্রত্যেক কন্যার পাত্র স্থির হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ হইবার পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে কেহই কাহাকেও দেখিতে পায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় পারস্যদেশে বিবাহানুষ্ঠানে সামর্থ্যাতীত ব্যয় করার প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায়। তথায় বিবাহোপলক্ষে তিন দিন হইতে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ভোজ দেওয়ার রীতি আছে। তিন দিনের কম ভোজ দিলে রীতিবহির্ভূত কার্য্য করার দোষ স্পর্শে। বিবাহোৎসবের প্রথম দিবসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সদালাপ করেন; দ্বিতীয় দিবসে কন্যার হস্তদ্বয় গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করা হয়; তৃতীয় দিবসে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে যাঁহার যত দিন ইচ্ছা, তিনি তত দিন ভোজ দিয়া থাকেন। বিবাহ দিবসে পাত্রের সম্মুখে কন্যা আনীতা হইলে পাত্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রথমতঃ একখানি আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করেন; পরে এক ইক্ষুদণ্ড লইয়া দন্ত দ্বারা তাহা দ্বিখণ্ড করেন, এবং নিজে একখণ্ড ভক্ষণ করিয়া অপর খণ্ড পাত্রীর হস্তে প্রদান করেন।

পারস্যবাসী পুরুষগণ বহু বিবাহ দূষণীয় মনে করেন না কিন্তু চারিটীর অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে প্রায় তাহাদিগের কাহাকেও দেখা যায় না। পারস্য মহিলারা স্বাধীনতাশূন্যা নহেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে পারেন। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার যৌতুক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। স্ত্রী অসতী হইলে স্বামী তাহার প্রাণ বধ করিতে পারেন, পারস্য ব্যবস্থাশাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে। অসতী স্ত্রীর হত্যাকারী স্বামী রাজদ্বারে অপরাধী হন না।

পারস্যাধিপতি যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে পারেন। পারস্যের শাদিগের কাহারও বা এক শত, কাহারও বা দেড় শত, কাহারও বা ততোধিক বেগম ছিল। বেগমদিগের মধ্যে যাহাদিগের সন্তানাদি হয়, তাহাদিগকে আর অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যাহারা সন্তানবতী নয়, তাহাদিগের মধ্যে অনেককে শা ইচ্ছানুসারে তাঁহার অমাত্যবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন।

পারস্যবাসিগণ অতি ভদ্র, অতিথিসৎকারশীল, পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্ এবং সন্তানবৎসল। কোন কোন য়ুরোপীয় পরিব্রাজক বলেন যে, মিথ্যা কথা বলা তাহাদের অভ্যাসসিদ্ধ। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায়ই উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পারস্যবাসিগণ শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসল-

মান। শিয়া অর্থ অনুবর্ত্তী। শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ মহম্মদের জামাতা আলীর অনুবর্ত্তী, অর্থাৎ তাহাদের মতে আলিই মহম্মদের প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গী ও উত্তরাধিকারী। পারস্যবাসিগণ হাসান ও হোসেনের স্মরণার্থ মহরম নামক উৎসব করিয়া থাকে।

এক বৎসরের অনধিক কাল হইল পারস্যের শা নসীর উদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মজফর উদ্দীন পারস্যের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজধানী তিহারান্ নগর কাস্পিয়ান্ হ্রদের ৭০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার উত্তরে এল্‌বর্জ নামক পর্ব্বতমালা বিস্তৃত রহিয়াছে। তিহারাণ নগর সুন্দর রাজপথ, সুশোভন অট্টালিকা ও মনোহর উদ্যান সমূহে পরিশোভিত। পারস্যাধিপতির রাজপ্রাসাদ দুর্গের বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক সুন্দর কৃত্রিম ফোয়ারা আছে। তিহারান্ সহরের বহিঃপ্রদেশে পাঁচটী প্রাসাদ আছে, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে শা ঐ সকল প্রাসাদে ইচ্ছানুসারে বাস করেন। রাজধানী তিহারান্ নগরীর লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক নহে।

সদুপদেশ ও সার বাক্য।

১। অন্যের গুণ অনুসন্ধান কর, কিন্তু নিজের দোষ অনুসন্ধান করিও।

২। যাহার সহিষ্ণুতা আছে, সকলই তাহার সাধ্যায়ত্ত।

৩। "এ জীবনে আমি কি ভাল কাজ করিতে পারি?" মানুষের মুখ হইতে ইহা অপেক্ষা সুমহান্ প্রশ্ন বাহির হইতে পারে না।

৪। ভাগ্য দোষ বা ভাগ্য গুণ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরিশ্রমের নাম ভাগ্যগুণ ও আলস্যের নাম ভাগ্য-দোষ।

৫। যে ধনের সদ্ব্যয় করে, সেই প্রকৃত ধনী। যাহার ধন আছে, অথচ সদ্ব্যয় করিতে জানে না, সে দরিদ্র নামের উপযুক্ত।

৬। এ জীবনে তুমি নিজে আপনাকে যতবার প্রবঞ্চনা করিয়াছ, ভাবিয়া দেখ, দেখিবে অপরে তোমাকে কখনই ততবার প্রবঞ্চনা করে নাই।

৭। সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে যে সক্ষম নহে, সে যে কেবল অসৎ স্বভাবের পরিচয় দেয় তাহা নহে, সে বুদ্ধিহীনতারও পরিচয় দেয়।

৮। মানুষের বুদ্ধি অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, ইহা জানাই মানুষের বুদ্ধির সার্থকতা।

৯। মানব জীবন একখানি সাদা কাগজের ন্যায়;—প্রত্যেকেই ইহাতে আপনার আপনার চরিত লিখিয়া যান।

১০। যাহার সার কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, সেই অধিক বক্ বক্ করে।

১১। গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করা দূষণীয়।

১২। মত দ্বারা চিন্তা ও কার্য্য গঠিত এবং নিয়মিত হয়, সুতরাং মত গঠনে তোমার সমস্ত বুদ্ধি ও বিচারশক্তি নিয়োগ করিবে।

১৩। নীচাশয়তা প্রযুক্ত কেহ তোমার ক্ষতি করিলে তাহা যদি তুমি গ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে তুমি মহানুভব নামের যোগ্য।

১৪। যে শিক্ষক ছাত্রকে বা যে পিতা পুত্রকে মুখে সদুপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু কার্য্যে কুদৃষ্টান্ত দেখান, তিনি বালকের এক হাতে অমৃত ও অপর হাতে গরল ঢালিয়া দেন।

১৫। পিতা চক্ষুষ্মান ছিলেন ইহা চিন্তা করিয়া অন্ধ পুত্রের সন্তোষ অবলম্বন করা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, পিতৃ পিতামহের গুণ ছিল ভাবিয়া নির্গুণ ব্যক্তির আপনাকে ধন্য মনে করা তদ্রূপ যুক্তিসিদ্ধ।

১৬। পরিশ্রম তিনটী দোষের অপহারক—দরিদ্রতা, অবসাদ ও ইন্দ্রিয়াসক্তি।

১৭। জ্ঞান হইতে কঠোরতা লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠা বিনা সহিষ্ণুতা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।

১৮। ভগবান্ অতি হীন ব্যক্তিকেও সৌভাগ্যের উচ্চতম মঞ্চে উঠান এবং অতি সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকেও দারিদ্র্যের কূপে নিমগ্ন করেন; অতএব সৌভাগ্যবান্ হইয়াও মদমত্ত হইবে না এবং অতি হেয় অবস্থাপন্ন হইলেও নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়া হাহাকার করিবে না।

১৯। অবিকৃত-চিত্ত লোকেরাই নির্জ্জন-বাসের আনন্দ ও সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন।

২০। দরিদ্রতার ক্লেশ দুর্বিষহ বটে, কিন্তু সম্পদ্‌জনিত ঘোর সাংসারিকতার যন্ত্রণা তদপেক্ষাও তীব্রতর। (ক্রমশঃ)

দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী।

(৪০১ সংখ্যা—৬১ পৃষ্ঠার পর)

গৃহে সাম্রাজ্ঞী।

ইনি অতি সুনিপুণা গৃহিণী ছিলেন এবং গৃহের সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তে বা নিজ তত্ত্বাবধানে না করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। গৃহমার্জ্জন, রন্ধন, ভাণ্ডার রক্ষা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা এবং বড়ি

আচার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হইতে পশম-বোনা সেলাই প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তৎপর ছিলেন। হরিনাভিতে থাকিতে তিনি গো-সেবাও করিতেন, কিন্তু কলিকাতায় কয়েকটী গোরু আনিয়া স্বচক্ষে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণান্তে গোরু পুষিতে সম্মত হন নাই। রাঁধুনির হাতে রন্ধন মনঃপূত হইত না। অনেক সময় রাঁধুনি রাখিতেন না। রাঁধুনি থাকিলেও রন্ধন-শালায় নিজে বসিয়া অধিকাংশ কার্য্য করিতেন। পুত্র কন্যাদিগের নামকরণ, জন্মদিন, শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে লোককে ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। সে সময় কর্ত্তৃত্বভার কাহারও হস্তে দিতেন না, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিজে অসীম পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তখন তাঁহার ভগ্ন পদের কোনও লক্ষণ দেখা যাইত না এবং বোধ হইত একা যেন দশ হস্ত বাহির করিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং বাটীতে অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হয়, তাহাতেও সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ও পরিণামদর্শী ছিলেন। মাসের খরচের আবশ্যক দ্রব্যাদি মাস না পড়িতে পড়িতে ক্রয় করিয়া রাখিতেন, যে সময়ে যে বস্তু সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা কিনিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং অভাবের সময় কষ্ট পাইতে না হয় এরূপ অর্থও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। এইরূপ উপায়ে আপনার অভাব যেরূপ মোচন করিতেন, সেইরূপে প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুগণের অভাব মোচনেও সহায়তা করিয়া আনন্দিত হইতেন।

বিষয়কার্য্য-দক্ষতা।

বিষয়কার্য্যে অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা ছিল। নিজে মতলব খাটাইয়া গৃহ কার্য্যের সমুদয় ব্যবস্থা করিতেন এবং কন্যাদিগের ও ভৃত্যদিগের যাহা দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে তাহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন করাইতেন। স্বামী অপরের উপর নির্ভর পূর্ব্বক কোনও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভূত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তিনি নিজের বুদ্ধিকৌশলে ও পরিশ্রমে সে ঋণ সকল পরিশোধ করেন। দূর স্থানে পৈতৃক জমী জমা কিছু আছে, নিজে তাহার খাজনা আদায় আঞ্জামের ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বামাবোধিনীর আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধান ও হিসাব নিকাশ করিতেন। স্বামী কেবল বেতনের টাকা তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, বৈষয়িক কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কি গৃহ নির্ম্মাণ, কি সংসার নির্ব্বাহ, কি বিষয় রক্ষা সকল বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল এবং তিনি বুদ্ধি বিবেচনা ও মিতাচারিতা সহকারে সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন।

সৌভ্রাত্র।

ভাই ভগিনীদিগের প্রতি ইঁহার হৃদয় ভরা প্রেম ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার স্নেহছায়াতে রাখিয়া যেমন সে প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, অন্য সহোদর সহোদরার প্রতি ব্যবহারেও তেমনি দিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া স্বপ্নযোগে এক দিন মৃত স্বামীর দর্শন পাইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠেন। কৈলাসকামিনী যখন হরিনাভিতে থাকেন, তখন দুঃখিনী ভগিনীকে আপনার নিকট রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা অনেকটা সুস্থ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর তাঁহার বিশ্বাস নির্ভর চিরদিন অটল ছিল এবং ভ্রাতার সহিত একত্রে বাস করিবার ঐকান্তিক অভিলাষ ছিল। এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নিকট ব্রাহ্মগণ বসবাসের জন্য যখন ভূমি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনিও আপনার ও ভ্রাতার জন্য কতক জমী লইলেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা হিন্দু বলিয়া কয়েকটী ব্রাহ্ম আপত্তি করাতে, তিনি ব্রাহ্মপল্লীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত একযোগে আণ্টনীবাগানে পুনরায় জমী ক্রয় করিলেন। এই ভ্রাতা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, পরে একটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনেন। ভগ্নী তাহার শ্বশ্রূস্থানীয়া হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষা বিধানে বিশেষ যত্ন করেন, পরে তাহাকে গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়া দিয়া সদ্ভাবে ভ্রাতার সহিত পৃথগন্ন হন। ইঁহার সৌভ্রাত্র কেবল সহোদর সহোদরাতে বদ্ধ ছিল না। ঝামাপুকুরের ভাগিনেয়-পুত্রেরা চিরকাল তাঁহার ভ্রাতৃস্থানীয় ছিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় যেমন সহোদরদ্বয়কে, তেমনি তাহাদিগকেও বস্ত্র ও খাদ্যাদি দিয়া তত্ত্ব করিতেন। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহিলাকেও সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় দেখিতেন এবং সময় সময় দেখা হইলে তাহাদের সহিত হৃদয় বিনিময় করিয়া পরম সুখ লাভ করিতেন। তাঁহারা ভিন্নমতস্থ বা ভিন্নসমাজস্থ বলিয়া তাঁহাদের সহিত হৃদয়ের যোগের অন্যথা দেখা যাইত না। এইরূপ এক মহিলা দুরবস্থায় পতিত হইলে তিনি তাঁহাকে, সন্তানগণসহ আপনার কলিকাতার বাটীতে আশ্রয় দেন, পরে পচম্বার বাটীতে আপনার পুত্রকন্যাদিগের সহিত তাহাদিগকেও আনিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিধান করিয়া সুখী হন

তেজস্বিতা ও সাহস।

ইঁহার তেজস্বিতা ও সাহস অত্যন্ত অধিক ছিল। বাল্যকালে নিরাশ্রয় অবস্থায় অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, এজন্য নিজে বা সন্তানগণ পরের গলগ্রহ বা মুখাপেক্ষী হইবে, কখনও ইচ্ছা করিতেন না। এজন্য তাহাদের ভবিষ্যতের সম্বল করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। এ দিকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকা মহা পাপ মনে করিতেন এবং কিছু ঋণ হইলে না

খাইয়া না পরিয়া আগে তাহা শোধ করিতেন। অন্যকে খাওয়াইব, অন্যের খাইব না; অন্যকে অর্থ সাহায্য করিব, অন্যের অর্থ সাহায্য লইব না; লোকের সেবা করিব, সেবার প্রত্যাশী হইব না; আমৃত্যু তাঁহার এই ভাব ছিল। মরিতে যান, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা খুখুটুকু হাতে ধরিতে গেলে তাহার হাত সরাইয়া নিজে তাহা ভূমিতে ফেলিলেন। তাঁহার সাহস যথেষ্ট ছিল, হরিনাভিতে এক শ্মশানভূমির নিকট স্কুলবাড়ীতে বাসা ছিল, সেখানে লোকে ভূত আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইত। তাঁহার বয়স তখন ১৬.১৭ বৎসর মাত্র, তথাপি নির্ভয়ে তথায় বাস করিতেন। স্বামী সময় সময় কলিকাতায় গেলেও একাকিনী শিশুসন্তান দুইটীকে লইয়া থাকিতে ভয় করিতেন না।

সামাজিকতা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণ কর্ত্তৃক যখন স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গমহিলা সমাজ নামে একটী সমাজ স্থাপিত হয়, তখন কিছু কালের জন্য তিনি তাহার অন্যতর সম্পাদিকা ছিলেন। এই সময় ভারত জাতীয় সভায় (Indian National Association) সম্পাদিকা বিবি জে,বি, নাইট, বিবি উইল্স প্রভৃতি কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা দেশীয় মহিলাগণের সহিত সামাজিক সম্মিলনে মিশিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন। সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারদিগের গৃহ দর্শনার্থ কৈলাসকামিনী অন্যান্য মহিলার সঙ্গে উৎসাহের সহিত গমন করিতেন এবং তাহাদের গৃহের সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার বড়ই প্রশংসা করিতেন। এক সময়ে নিজের বাটীতে কয়েকটী ইংরাজ রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া দেশীয় আসন ও কলাপাত পাতিয়া দেশীয় অন্নব্যঞ্জনে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান, তাহাতে তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া যান। বিবি নাইট বিলাতে গিয়াও বারংবার তাঁহার তত্ত্ব লইয়াছেন, মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। কৈলাস-কামিনী আণ্টনীবাগানের যে পাড়ায় বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান পাড়া। তাঁহার বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ কি গরীব, কি ধনী মুসলমান রমণীগণ তাঁহার সৌজন্য ও সদালাপে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে "দিদী" "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহার সহিত সাংসারিক নানা প্রকার আলাপ করিতেন। বাটীতে কর্ম্মকাজ হইলে তিনি তাহাদিগকে খাদ্যাদি উপহার দিতেন। তিনি গরিব প্রতিবেশীদিগকে চাউল, বস্ত্র ও পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে বড় ভাল বাসিতেন। বাটীতে হোমিওপ্যাথী ঔষধের বাক্স থাকিত এবং নিজে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা জানিতেন। রুগ্ন প্রতিবেশীদিগের জন্য ঔষধাদি সর্ব্বদাই প্রদান করিতেন। অনেককে সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দিয়াও সাহায্য করিতেন। পচযার তাঁহার

একটী গৃহ আছে। বৎসর বৎসর পূজার সময় প্রায় এখানে আসিতেন। তাঁহার আগমনে চারি দিক হইতে গরিব স্ত্রী-লোকেরা আসিয়া জুটিত। সামান্য জিনিস সকল বিক্রয় করিতে আসিয়া অনেকে তাঁহার নিকট আশাতীত মূল্য পাইত। গরিবদিগকে অন্ন, চাউল, বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াও তাহাদিগকে বশীভূত করিতেন। তাঁহার কেমন একটী স্বাভাবিক সদ্ভাব ছিল, যেখানে যাইতেন, সেইখানের লোকেই তাঁহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইত। দেশস্থ ব্রাহ্মবিদ্বেষী অনেক গোঁড়া হিন্দু রমণীও তাঁহার কলিকাতার বাটী দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার সেবা সৌজন্যের শতমুখে প্রশংসা করিতেন। আণ্টনী-বাগানে তাঁহার বাটী হইলে অনেকগুলি বন্ধু লোক তথায় তাঁহার প্রতিবেশী হইয়া বাটী বা বাসা করিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁদের সহিত সুখে দুঃখে তিনি একীভূত ছিলেন এবং ইহাঁরা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা মাতার ন্যায় দেখিতেন। বামাবোধিনীর লেখিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সৌজন্যে পরম প্রীত হইয়া গিয়াছেন। যাঁহার সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে, তাঁহাকে বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শুদ্ধাচার।

এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। স্নান, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্রধৌত করণ, বাসনাদি পরিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ বাড়াবাড়ি ছিল যে, প্রাচীন তন্ত্রের অনেক হিন্দু-গৃহেও সেরূপ দেখা যায় না। আহারীয় দ্রব্যাদি উচ্ছিষ্ট হইতে দিতেন না, জিনিষ নোঙরা হইয়াছে সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেন। এ সকল বিষয়ে তাঁহার ছেলে মেয়েরা তাঁহার চৌকীদার ছিল, একজন কোনও অবৈধাচরণ করিলে সকলে তাঁহার নিকট অভিযোগ করিত। বাহ্য শুদ্ধাচারের প্রতি যেমন মনোযোগিনী ছিলেন, কি পরিবারে, কি সমাজে কোথাও দুর্নীতি ও অশিষ্টাচার দেখিলেও উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। কুটুম্বাদির মধ্যে কাহাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিলে পারতপক্ষে তাহাকে বাটীতে আসিতে দিতেন না এবং তাহার সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মপ্রাণ সাধু সাধ্বীদিগের স্থান বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল এবং ইহাকে পবিত্র দেব-সমাজরূপে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ছিল। সমাজের মধ্যে কোনও লোকের উচ্ছৃঙ্খল বা অন্যায় ব্যবহারের কথা শুনিলে তিনি পরিতাপিত হইয়া স্বামীকে বলিতেন, "তোমরা সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে না, সমাজের এইরূপ এক একটী ছিদ্রকে সামান্য মনে করিও না, ইহাতেই সমাজ ডুবিবে।"

পরোপকার।

তিনি গোপনে পরোপকার করিতে ভাল বসিতেন এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থ, বস্ত্র ও অন্য প্রকার সাহায্য করিতেন।

হাতে টাকা জমিলে কখন কখন ঋণ দিতেন, কিন্তু তাহার সুদের টাকা প্রায়ই সংসারের জন্য ব্যয় করিতেন না, কোনও সৎকার্য্যে দান করিতেন। একসময় একটী নিরাশ্রয় বিধবাকে আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দেওয়ান। আরও ২।৩টী বালিকার বিবাহে সাহায্য করেন। সামান্য আয় হইতে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দিয়াও কোন কোন নিরুপায় পরিবারকে সাহায্য করিয়াছেন। হরিনাভি অঞ্চলের অনেক বিধবা দুঃখিনী রমণী তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া আসিতেন, কেহই রিক্তহস্তে ফিরিতেন না। কোন কোন দুঃখিনী বিধবাকে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াও সাহায্য করিতেন এবং গরিব ছাত্রদিগকে নিজে বেতন দিয়া স্কুলে ও কলেজে পড়াইতেন।

পতিভক্তি।

প্রাচীনা হিন্দুনারীর অনেক ভাব তাঁহার ছিল। স্বামী আহার না করিলে কখনও আহার করিতেন না। স্বামী কোনও দূর স্থানে গেলে বলিয়া যাইতেন, বেলা হইলে আমার অমুক স্থানে আহারের সম্ভাবনা আছে, তুমি অনাহারে থাকিও না। কিন্তু কোন কোন দিন অপরাহ্ণে আসিয়া দেখিতেন তিনি উপবাসী আছেন। অনুযোগ করিলে বলিতেন "তোমার আহার হইল কিনা কেমন করিয়া জানিব?" পতির সাংসারিক সমুদায় ভার নিজ মস্তকে প্রফুল্লচিত্তে বহন করিয়াছেন এবং প্রাণপণ করিয়া সকল দায় হইতে পতিকে মুক্ত রাখিবেন—ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। স্বামীর সহিত একত্র হইয়া অনেক সময় উপাসনা ও ঈশ্বর সাধনা করিতেন এবং তাঁহার অভীষ্ট দানধর্ম্ম ও অন্যান্য সৎ-কার্য্যে সাধ্যমত সহায়তা করিতেন। বামা-বোধিনী পত্রিকার পুনরুদ্ধার পতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের একটী প্রধান নিদর্শন। ১২৮৫ সালে বামাবোধিনীর সম্পাদক একটী ছাপাখানা করিয়া ঋণগ্রস্ত এবং দীর্ঘ-কাল ম্যালেরিয়া পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে বামাবোধিনী প্রচার বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার যে পুনরভ্যুদয় হইবে সে আশা ছিল না। কিন্তু কৈলাসকামিনী স্বামীর প্রবর্ত্তিত ও স্ত্রীজাতির হিতার্থে প্রকাশিত এত দিনের কাগজখানি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ভাবিয়া ব্যথিত হইলেন এবং স্বামীকে বলিলেন "ইহার প্রচারের এক বৎসরের ব্যয় দিলে চালাইতে পার কি না?" স্বামী স্বীকার করিলে আপনার গহনা বন্ধক দিয়া আবশ্যক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বামাবোধিনীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ, সাহস ও অর্থসাহায্য না পাইলে পত্রিকাখানির আর পুনর্দর্শন লাভ হইত না।

ধর্ম্মানুরাগ।

কৈলাসকামিনীর মাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বারব্রত অভ্যাস করাইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়া

কন্যাকে সে সকল শিখান নাই, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "উহার এ সকলে দরকার নাই, উহার ধর্ম্মে মতি থাকুক।" কৈলাসকামিনী স্বয়ং এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিতেন তাঁহার মাতার অনেক বিষয়ে ভবিষ্য জ্ঞান ছিল। ইহাঁর অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা এবং ব্রাহ্মপরিবারের অনুষ্ঠানাদিতে মধ্যে মধ্যে যোগদান করিয়া বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও উপদেশ সকল গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহাঁর বয়স যখন ১৩।১৪ বৎসর, তখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবার লইয়া বেলঘরিয়ার একটী উদ্যানে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্মসাধনার সুবন্দোবস্তের কথা শুনিয়া কৈলাসকামিনী তথায় যাইতে আগ্রহান্বিত হন এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া আশ্রমবাসিনীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাস করেন। পরে তিনি কেশব বাবু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি সাধন-পরায়ণা ছিলেন। ধর্ম্মের আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। প্রতি দিন নিজে নির্জ্জনোপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ১১ই মাঘের দিন উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন উৎসবে যোগদান করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক দিন রাত্রিকালে একা একা ধর্ম্মসাধন করিতেন। কখন কখন স্বামীর সঙ্গে বসিয়া ধ্যানে এরূপ মগ্ন হইতেন যে, সহজে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত না। তিনি লোকের—এমন কি স্বামীর সম্মুখেও সঙ্গীত করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু নির্জ্জনে একাকী অনেকক্ষণ ধরিয়া এমন সুমিষ্ট গান করিতেন যে শুনিলে মোহিত হইতে হইত। এক একদিন পুত্রকন্যাদিগকে চারিদিকে বসাইয়া তাহাদিগকে গান ধরাইয়া দিয়া আপনি নীরবে মধ্যস্থলে বসিয়া শুনিতেন, তাহারা মধুর কণ্ঠে গান গাহিত, তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন। এ দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইত। গৃহে ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল যাহাতে নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ভণ্ড কপট বলিয়া যাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হইত, তাহাদিগের উপর বড়ই চটিতেন, কিন্তু সাধু ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহার ৩টী কন্যাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত করান এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে উক্ত মহর্ষি দ্বারা তাহার উপনয়ন বা ধর্ম্মশিক্ষারম্ভ কার্য্য সম্পন্ন করান। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অষ্টম গর্ভের সন্তান বলিয়া সে বড় সুলক্ষণ হইবে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল, এবং তাহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলে স্বামীর সহিত একমত হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার্থ ঈশ্বর-চরণে উৎসর্গ করেন। এই পুত্রের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতে হইতেই ইহাকে সুন্দর সুন্দর ভজন শিখাইতেন। সংসারের সমস্ত কার্য্যভার আপনার মস্তকে লইয়াও ইনি যে সংসারে অনাসক্ত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ

পাওয়া যাইত। ভাল বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে ইচ্ছা করিতেন না, সামান্য বেশ-ভূষা ও সামান্য আহারে সন্তুষ্ট থাকিতেন। মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন এবং বলিতেন 'স্বামীর অগ্রে তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে যাইবেন। এখানে যে এত পরিশ্রম করিয়া ঘরবাড়ী করিতেছেন, তাহা তাঁহার জন্য নহে, সন্তানেরা ভবিষ্যতে ক্লেশ না পায় সেই জন্য। পরলোকে গিয়া তিনি বিশ্বজননীর নিকট বেশ সুখে থাকিবেন।'

চরমাবস্থা।

এবার সঙ্কটাবস্থায় অনেক সময় বলিতেন "আমার এবারকার গতিক ভাল নহে।" মেয়েদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রায় বলিতেন "আমি মরিতে ভয় করি না, তোরাও ভয় করিস না, দেখ আমাদের বাপ মা আমাদিগকে তোদের অপেক্ষা ছোট ফেলিয়া গিয়াছিলেন, আমরা কি মানুষ হই নাই?" মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া প্রাণ যায় যায় হইলে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই দেখ আমি এখনি মরিব, তোরা কেউ ভয় করিস না, ঈশ্বরের নাম কর।" ভগবানের নাম ও ঔষধ সেবন করিতে করিতে ঈশ্বরেচ্ছায় সে দিন প্রাণ রক্ষা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিল "দেখ মা, তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ। আমি সে দিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, ভারী বুড়ী গাড়ী করিয়া (এমন গাড়ী কখনও দেখি নাই) দেবমূর্ত্তি কতকগুলি লোক সুন্দর সাজ গোজ পরা সোণার পাগড়ী মাথায় আমাদের বাড়ীতে আসিল। আর তুমি রাঁধিতেছিলে, হঠাৎ ডাকিয়া বলিলে 'ওরে সব রইল, আমি চলিলাম।' আমরা কাঁদিয়া উঠিলাম। এক বৃদ্ধ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল, 'এ থাক, আজি ইহাকে লইয়া যাইয়া কাজ নাই।' গাড়ী চলিয়া গেল। মা! তবে তোমার ফাঁড়া কাটিয়াছে।" ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে কৈলাসকামিনী নিজে এক স্বপ্ন দেখিয়া আপনার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি যখন আশ্রমে বাস করিতেন, আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং প্রায় আপনার কাছ-ছাড়া করিতেন না। অল্প দিন হইল ইঁহার লোকান্তর হইলে কৈলাসকামিনী স্বপ্নে দেখিলেন তিনি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন এবং তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। কৈলাসকামিনী মেয়েদিগকে বলিলেন "বোধ হয় সুকোর মা (কেশবপত্নী) আমাকে সঙ্গী করিবেন, নয়ত এমন করিয়া কেন ডাকিলেন।" ইহার পরেই এক দিন তিনি সংসারের দেনা পরিষ্কারের জন্য পাওনাদারদিগকে ডাকাইয়া হিসাব করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং যতদূর পারিলেন, তাহাদের সহিত হিসাব চুকাইলেন। তিনি মৃত্যুবিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়াও অদিনে কুদিনে পেটে-পোড় মরিতে বড় নারাজ ছিলেন। এক আত্মীয়া স্ত্রী ডাক্তার তাঁহার কষ্ট দেখিয়া

তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র প্রসব করাইতে চাহিলে বলিলেন "দেখ চৈত্র মাস যাউক, বৈশাখ পড়িলে যাহা হয় করিও"। ১লা বৈশাখ বুধবার পুণ্যদিনে ডাক্তারেরা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রসব করাইলেন। তিনি একটু সুস্থ হইয়া পুনরায় রোগ-যাতনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার [illegible] হঠাৎ মৃত্যু-যাতনাতে পরিণত হইল। তিনি অবিশ্রান্ত দয়াময় নাম করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে পরলোকগত আত্মীয়েরা কেন ছুটাছুটি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নাড়ী অবসন্ন হইল, দর্শন ও শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল, চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে দয়াময় নামের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, তিনিও শেষ নিঃশ্বাসের সহিত সেই নাম করিতে করিতে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

শোক সঙ্গীত।

কেন গেলে কোথা গেলে? নিমেষে সকলি শেষ,
ছাড়িতে এত বন্ধন হলোনা কি মায়ালেশ?
কিছুই ত বলিলে না, ছিল না কি বলিবার,
কিছুই ত শুনিলে না, সব কথা কি অসার?
বলিলে দয়াল নাম, শুনিলে দয়াল নাম,
চক্ষু মেলে চাহিলে না কি মহাধ্যানে প্রবেশ।
বিদেশে যখন যেতে কত যত্ন আয়োজন,
কত কি গুছায়ে নিতে যাহা কিছু প্রয়োজন,
হিসাব করিতে কত, পাথেয় খরচ যত,
লইতে তৈজসপত্র সুন্দর সুন্দর বেশ।
যেখানে যা ছিল র'ল, কিছুইত গুছালে না,
কড়া কড়ি তৃণকণা সঙ্গে তাও লইলে না,
সে দেশ বিদেশ নয় বুঝি আপনার দেশ?
যাহা কিছু প্রয়োজন আছে সব সমাবেশ।
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে হয়েছি বাক্ বুদ্ধি হারা,
ভাবিব কি ভাবনার না দেখি কূল কিনারা,
কেবল প্রার্থনা—তোমায় রক্ষা করুন্ পরমেশ।

কলালাপ।

(৪০০ সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠার পর)

ছলিতক যোগ,—ছলনা অর্থাৎ অন্যকে প্রবঞ্চনা করিবার উপায়। ভাগবতের টীকায় এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু এই কলা সম্বন্ধে আমাদের কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

বস্ত্রগোপন,—এক বস্ত্রকে অন্যপ্রকার

বস্ত্ররূপে প্রদর্শন। এই কলার ব্যাখ্যা শ্রবণ মাত্র বোধ হয়, ইহা একপ্রকার ইন্দ্রজালবৎ ক্ষণিক আমোদ ও কৌতুককর কৌশল, ইহাতে আর কিছুই নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা মানুষের আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়। ইহা প্রকৃতির অনুকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই জ্ঞাত আছেন, "বহুরূপী" নামে গিরগিটি জাতীয় এক প্রকার প্রাণী আছে। ঐ প্রাণী ইচ্ছামত আপনার অঙ্গের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার আত্মরক্ষার সম্বন্ধ আছে। যখন যে স্থানে, বা যে বর্ণের উদ্‌ভিদের নিকট থাকে, সেই সেই স্থানের বা সেই সেই উদ্‌ভিদের যে রঙ্গ, উক্ত প্রাণী তাহার সহিত আপন গাত্রের বর্ণ মিলাইয়া রাখে। তদ্দ্বারা শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পায়। যদিও উদ্‌ভিদ সাধারণতঃ হরিদ্‌বর্ণ, কিন্তু উদ্‌ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ। কাণ্ডের ও শাখার সচরাচর বর্ণ একরূপ, পত্রের বর্ণ একরূপ, এবং ফল-ফুলের বর্ণ একরূপ। ফলের বর্ণ অপকাবস্থায় একরূপ, পক্কাবস্থায় একরূপ। ফুলের কলিকাবস্থায় একরূপ এবং পরিস্ফুট-নাবস্থার বর্ণ অন্যরূপ। মৃত্তিকা, গৃহ, প্রাচীরাদির বহুবিধ বর্ণ আছে। যাহারা কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক বালুকা ও মোটেল মৃত্তিকার ১০।১২ প্রকার বিভিন্ন বর্ণ আছে। তদ্ব্যতিরেকে নানা বর্ণের ঘুটিঙ ও প্রস্তরে ভূপৃষ্ঠস্থল বিশেষ আবৃত আছে। বহুরূপী যখন যে বর্ণের নিকট থাকে, তখন সেই বর্ণ প্রকাশ করিতে পারে, শত্রুগণ তাহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতে পারে না। এই-রূপ যে সকল ব্যক্তি "বস্ত্রগোপন" কলা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা দিবায় এক-রূপ, রাত্রে একরূপ, কৃষ্ণপক্ষে একরূপ, শুক্লপক্ষে একরূপ, আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একরূপ, সূর্য্যকিরণে অন্যরূপ গাত্রবস্ত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া সময়ে সময়ে আগন্তুক আপদ বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। চতুঃষষ্টি কলা যে সুখ-সৌকর্য্য-সাধিনী, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। "ভক্তমাল" গ্রন্থ এবং শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী পদের "গোবিন্দলীলা-মৃত" গ্রন্থ পাঠে অবগতি হয়, রাধা-গোবিন্দের অষ্ট সখীর প্রত্যেকে অষ্ট কলায় শিক্ষিতা ছিলেন এবং একা রাধিকা চতুঃষষ্টি কলার অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, কেননা চিদানন্দময় পুরুষের পূর্ণানন্দ সম্পাদনে চতুঃষষ্টি কলারই প্রয়োজন ছিল।

আকর্ষণক্রীড়া,—বিবিধ ক্রীড়াসাধন সামগ্রীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই কলা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৈতালিকী বিদ্যা—বেতাল শব্দ প্রেত, প্রেতাবিষ্ট শবাদি নানার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশে "প্রেততত্ত্ব" "প্লানচেট" প্রভৃতির বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কতকগুলি সম-ধর্ম্মী ও সমপ্রকৃতিক ব্যক্তি সংযত হইয়া অন্যোন্য হস্তধারণপূর্ব্বক বৃত্তাকারে

উপবেশন করিতেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তন্মধ্যস্থ একজন "মিডিয়ম" অর্থাৎ প্রেতাবিষ্ট হইতেন। তখন তাঁহাকে যে যাহা প্রশ্ন করিত, তিনি তাহার উত্তর দিতেন। সেই উত্তরে অনেক অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পাইত।

কোন কোন গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ফরাসীদিগের মধ্যে "ক্লেয়ারভয়েন্স" নামক একটী বিদ্যা প্রচলিত আছে। ঐ বিদ্যার প্রভাবে অদ্ভুত কার্য্য হইয়া থাকে। কোন সময়ে মৃত সম্রাটের উইল লইয়া বিবাদ হয়। দুই পক্ষে উইলের দুই প্রকার অর্থ করেন। বহু দিন ব্যাপিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ চলে। ঐ বিবাদে দেশের অনিষ্ট ঘটিবার উপক্রম দেখিয়া ঐ বিদ্যার দ্বারা সমাধি হইতে সম্রাটের শব উত্তোলন করা স্থির হইল। ঐ বিদ্যাবিৎ কোন ব্যক্তিকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করা হইল। সমস্ত আয়োজন ঠিক্ হইলে, এক দিন দুই পক্ষ রজনীর নিশীথকালে একটি ঘরের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বসিয়া আছেন। মধ্যস্থ টেবিলের উপর উইল পাতিত। ক্লেয়ারভয়েন্স বিদ্‌ও সেই প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান। তিনি তাঁহার শিক্ষামত কার্য্যসাধনোপযোগী অনুষ্ঠানে রত আছেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে অবস্থানের পর হঠাৎ খটিকাশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দ্বার দিয়া সমাধিস্থ সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে উইলের বিতণ্ডা প্রশ্ন করা হইল। তিনি তাহার সদুত্তর প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

"প্লানচেট্" একটি কাষ্ঠময় ত্রিপদ মাত্র। উহা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। উহার ত্রিপদের একটি পদ একটি উড-পেনসিল। ঐ যন্ত্রটী একখানি সাদা কাগজের উপর স্থাপন করিয়া প্রেততত্ত্ববাদিগণ প্রেত আহ্বান করেন। প্রেত ঐ যন্ত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে থাকে।

যে তিনটি বিষয় উপরে লিখিত হইল, এই তিনটি যদিও এ দেশে ইংরাজী প্রণালীতে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা আনীত হইয়াছিল, কিন্তু উহা ঐ বৈতালিকী কলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ দেশে ঐ কলার অনুষ্ঠান অনেক প্রকার ছিল, এবং অদ্যাপি স্থানে স্থানে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া প্রচলিত আছে। ঐ সকল কাণ্ড দ্বারা শুভাশুভ কথন, রোগের ঔষধ দান, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান, অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি অনেক কার্য্য হইয়া থাকে।

বৈনায়িকী ও বৈজয়িকী কলা,—যে কলার সাহায্যে বিমান বিচরণ করা যায়। ব্যোমযান, পক্ষরচনা পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডয়ন এই কলার দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর শীতকালে যে ব্যোমযান ক্রীড়া দর্শন করিয়া আমরা পরম আমোদ সম্ভোগ করি ও যে জন্য দরিদ্রেরও ধনক্ষয় হইয়া যায়, তাহা বিলাতী বিদ্যা নহে,—ভারতবর্ষীয় আর্য্যবিদ্যা।

বৈয়াসিকী কলা,—বৈনায়িকী ও বৈজয়িকীর নামান্তর মাত্র। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন বক্তব্য নাই।

দ্যূত বিশেষ,—অর্থ সংসৃষ্ট ক্রীড়া মাত্রকেই দ্যূতক্রীড়া কহে। কিন্তু সচরাচর পাশ-ক্রীড়াকেই দ্যূত-ক্রীড়া কহে। এই কলায় বোধ হয়, পাশক্রীড়ারই নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা আর কিছু পাওয়া গেল না।

মাল্যগ্রন্থন বিকল্প;—স্রক্ নির্ম্মাণ। বিবিধ সুগন্ধি কুসুমদাম পরম রমণীয় দেবভোগ্য সামগ্রী। রাজধানীমাত্রই বিলাসিজনবহুল এবং তথায় পুষ্পমালা প্রধান বিলাসদ্রব্য। এজন্য সকল রাজধানীতেই ফুলের মালার ব্যবসায় বিলক্ষণ প্রচলিত কোন কোন মাল্য গ্রথনে বিশেষ শিল্পকৌশল আবশ্যক। সেই কৌশল শিক্ষণীয় বিষয়। এই জন্য মাল্যগ্রন্থন একটি কলার মধ্যে পরিগণিত। দেব বিগ্রহের কোন কোন পূজারী এই কার্য্যে এমন পটুতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়।

গন্ধযুক্তি,—বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের প্রস্তুতীকরণ। যেমন আতর, গোলাপজল, ফুলেল তৈল, ল্যাবেণ্ডার, পোমেটম, ম্যাকাসর অইল, কুন্তলীন, ফুলেলা ইত্যাদি। ভারতে যত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পদার্থ ছিল এবং এখনও আছে, বোধ হয়, পৃথিবীর কোন রাজ্যে তত নাই। এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি বিদেশ হইতে অনেক প্রকার সুগন্ধি পদার্থের আমদানী হইতেছে। এদেশীয় সাহেব বিবিরা তাহাই ব্যবহার করেন। তাঁহাদের অনুকরণে দেশীয় বিলাসিগণও তাহাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের অন্যতর কারণ, ঐ সকল পদার্থের সৌলভ্য। দরিদ্র বিলাসিগণ ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহার হেতু বুঝা যায়। কিন্তু যাঁহাদের দেশীয় উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। গোলাপী আতরের ন্যায় সুগন্ধি বস্তু বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। তাহাও ত এখন মহার্ঘ নহে। মোগল-সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান এই আতরের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্রী। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে উহার এক ভরি ৮০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। এখন সেই আতরের মূল্য ১ টাকা হইতে ৫৲ টাকার অধিক নহে। দেশীয় নরনারীগণ যদি দেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের পক্ষপাতী হয়েন, তাহা হইলে এই সুকুমারী কলার স্বতঃই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে আজ কাল বহুবিধ সুগন্ধি ও সুরঞ্জিত তৈলের বিজ্ঞাপন পাঠ করা যায়, ইহা আহ্লাদের বিষয় বটে।

ভূষণ যোজন,—গহনা গাঁথা। এখন যাহারা ঐ কার্য্য করে, তাহাদিগকে পাটোয়ার কহে। রঙ্গিল কার্পাসসূত্র ও রেশম এবং স্বর্ণ রৌপ্যের জরি, কিম্বা ঝুঁটা জরি দ্বারা আভরণ গ্রন্থন করা হয়। কোন্ প্রকার অলঙ্কারে কোন প্রকার

উপাদান আবশ্যক, কোন্ রঙ্গের সহিত কোন্ রঙ্গের মিলন শোভনীয়, ইত্যাদির জ্ঞান শিক্ষণীয়। ঐ শিক্ষা প্রদানার্থই ভূষণ-যোজন কলার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন পারম্পর্য্য উপদেশেই ঐ ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদির নাম গন্ধও নাই।

প্রতিমালা,—স্মৃতিপরিচায়িনী কবিতা। পূর্ব্বকালে এক প্রকার কবিতা রচিত হইত, ইহা সকলেরই কণ্ঠস্থ করিবার সামগ্রী ছিল। ঐ সকল কবিতা দ্বারা ছাত্রাধ্যাপকের মেধার পরীক্ষা হইত। ঐ সকল কবিতা দ্বারা মেধাশক্তির স্ফূর্ত্তিও হইত।

মেষ-কুক্কুট-লাবক-বিধি,—মেষ ও কুক্কুট অর্থাৎ ভেড়া ও মোরগ। লাবক বুলবুল পক্ষী। সামাজিক আমোদ প্রমোদ সমাজের জীবনশক্তি, এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ তদ্বিষয়ে কতই না যত্ন করিয়াছেন। মেড়ার তাল, মোরগ ও বুলবুলের লড়াই, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন। এই তিনটি বিষয়ই বড় আমোদ ও কৌতুকজনক। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উহার বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। এরূপ আমোদ প্রমোদ অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণের জন্য নহে। কিন্তু কালধর্ম্মে এখন ঐ আমোদ নিম্ন শ্রেণী হইতেও প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

মেষজাতীয় ষণ্ডকে মেড়া কহে। মেড়া সকল বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। উহাদের মস্তকে অতি সুন্দর, সূচলাগ্র, বক্র ও বন্ধুর শৃঙ্গদ্বয় বহির্গত হয়। ঐ শৃঙ্গ প্রস্তরবৎ কঠিন। প্রত্যেক জাতীয় পশু পক্ষীর ষণ্ডগণ স্বভাবতঃ রণপ্রবণ। দুইটি ষণ্ডের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারণ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে মেষ, কুক্কুট ও বুলবুল এই ত্রিবিধ জন্তুর যুদ্ধপ্রণালী ও রণকৌশল সাতিশয় কৌতুকাবহ। এই জন্য ঐ ত্রিবিধ প্রাণীকে পুষিয়া লোকে উহাদিগের নৈসর্গিক রণপ্রবৃত্তিকে আরও উত্তেজিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মেলা মহোৎসবে ঐ ত্রিবিধ জন্তুর রণক্রীড়া প্রদর্শন করা হইত। যে ব্যক্তির মেষ, কুক্কুট ও বুলবুল যুদ্ধে জয়লাভ করিত, সেই ব্যক্তি পারিতোষিক পাইত। মেলা মহোৎসবে যত প্রকার উৎকৃষ্ট আমোদ আহ্লাদের আয়োজন করা হয়, তন্মধ্যে ঐ ব্যাপারটি অন্যতম।

শুক-শারিকা-প্রলপন,—পাখী পড়ান। শুক, শারিকা (শালিক), ময়না, কাকাতুয়া, মদনা, চন্দনা প্রভৃতি অনেক পক্ষী শিক্ষা পাইলে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে ও গান করিতে পারে। কেবল ময়না শারিকা জাতীয়, তদ্ভিন্ন আর সকল শুকজাতীয়। পক্ষীর মুখে মনুষ্যবৎ বাক্য ও দেবদেবীর নাম শ্রবণ বড়ই সুখজনক। এই জন্য পাখী পড়ান একটি কলার মধ্যে পরিগণিত। যাত্রা ও কীর্ত্তনের মধ্যে যে "শুকশারীর গান" শুনা যায়, তাহা অমূলক ও অসম্ভব নহে।

উৎসাদন,—উদ্বর্ত্তন। গাত্রে নানাবিধ

সুগন্ধি দ্রব্য মর্দ্দন করার রীতি আছে। ঐ সকল পদার্থ কিরূপে প্রস্তুত ও মর্দ্দন করিতে হয়, উৎসাদন নাম্নী কলায় তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

মিলন-গীতি।

১

দেবতা গো! ভাবিতেছি তাই,
যবে আমি শুভক্ষণে,
তোমাতে—তোমারি সনে,
"জলে জলবিম্ব" সম
মিলে মিশে যাই;
মনে ভাবি কত বার
"ফটোগ্রাফ" রাখি তার,
কিন্তু সে যে রামধনু
ধরিতে না পাই!
(এই আছে এই যায়—
এই নাই! নাই!)

২

সে যে কি পরম লাভ
অশ্রুত অবাচ্য ভাব!
ফোটে না ভাষার মুখে
কণিকাটী তার;
মরমে অমৃত-যোগ,
আত্মারাম উপভোগ,
অনবস্থ অতীন্দ্রিয়
সর্ব্ব-অর্থ-সার!

৩

সে যে কি উদার তৃপ্তি,
কি যে তমঃ কি যে দীপ্তি,
কে বোঝে সে মরমের
মহান্ সঙ্গীত,
কতই নৈরাশ্য-আশা,
বিরক্তি ও ভালবাসা,
মিশে আছে এক সনে
কে জানে নিশ্চিত?

৪

সে যে কি গরল, সুধা—
নহে তৃষা নহে ক্ষুধা,
জীবনের, মরণের
নহে অভিলাষ,
বিলীনতা মহাযোগ,
দিশাহারা উপভোগ
শিথিল বিভল প্রাণ
উদাস-উদাস!

৫

বৈরাগ্য, বাসনা ছুটে,
শকতি, বন্ধন টুটে,
আনন্দে মুছিয়া যায়
বিষাদের কণা,
অথচ কি দুঃখভরে,
হিয়া লুটাইয়া পড়ে,
আসক্তি, বিরক্তি, দোঁহে
হারায় চেতনা!

৬

কে জানে সে সুখ-স্মৃতি,
অথবা শোকের গীতি,
অসীম অনন্ত-মূল
তত্ত্ব কেবা জানে?
লুকায়ে বুকের মাঝে,
কিসের বাঁশিটী বাজে,
জলধি উথলি উঠে
কোথাকার তানে?

৭

সে যে প্রেম কিম্বা ধর্ম্ম,
তপস্যা অথবা কর্ম্ম,
স্বর্গ কিবা অপবর্গ,
সুধিব তা কারে?
কোন লক্ষ্য উপলক্ষ্য
কিসে পরিপূর্ণ বক্ষ,
নীরস হিসাব অত
কেবা দিতে পারে?

৮

তবে কি সে শুধু শূন্য,
নহে পাপ নহে পুণ্য,
সে নিবৃত্তি, নিরমল
আকাশের মত?
স্বপ্নহীন নিদ্রা সম,
জীবন, জীবনী মম
পড়ে থাকে সুখে দুখে,
হইয়া বিরত?

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

পরমাণু-তত্ত্ব।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণা সমূহকে পরমাণু বলা যায়। আমরা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের গুণ প্রত্যক্ষ করি, তাহাদিগকে জড় পদার্থ কহে। এই বিশ্ব সংসারে যত জড় পদার্থ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, সে সমস্তই কয়েকটি রূঢ় বা ভূত পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। যেমন বর্ণমালার কয়েকটি মাত্র অক্ষর দ্বারা ভাষার সমস্ত শব্দই উদ্ভূত হইয়াছে,তেমনি কয়েকটি মাত্র রূঢ় বা ভূত পদার্থ যোগে এই বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটিকে মূল পদার্থ বলিতেন; কারণ তাঁহারা দেখিতেন যে কোন প্রাণী মরিলে পর, তাহা পরিণামে মৃত্তিকা হয়; পচিবার সময় তাহা হইতে জলবৎ দ্রব্য নির্গত হয়; স্পর্শ করিলে উষ্ণতা অনুভূত হয়, আর তাহা হইতে বাষ্প বহির্গত হয়,এবং শূন্য সকল স্থান অধিকার করিয়া আছে, এজন্য তাঁহারা উক্ত পাঁচটিকে মূল পদার্থ কহিতেন।

যাহাকে বিশ্লিষ্ট করিলে, দুই কিম্বা ততোধিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাকে মূল পদার্থ কহে। আর যাহাকে

বিশ্লিষ্ট করিলে একাধিক বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে যৌগিক পদার্থ কহে।

নব্য রাসায়নিক পণ্ডিতেরা পঞ্চভূতের একটীকেও মূল পদার্থ বলেন না; কারণ, তাঁহাদের মতে শূন্য কিছুই নহে; তেজঃ প্রাকৃতিক গুণ বা জড় বস্তুর অবস্থা বিশেষ মাত্র; মৃত্তিকা নানাবিধ লবণ ও ধাতব বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন; জল হাইড্রজেন ও অক্সিজেন নামক পদার্থদ্বয়ের যোগে এবং বায়ু নাইট্রোজন, অক্সিজন ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় ৬৬টী মূল পদার্থের যোগে উৎপন্ন। কিন্তু এই ৬৬টীই যে চিরকাল মূল পদার্থ থাকিবে এমন নহে। এক্ষণে যাহারা মূল পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কালক্রমে তাহারা যৌগিক পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ এবং আরও নূতনবিধ মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। মূল পদার্থ সকল দুই ভাগে বিভক্ত; যথা, ধাতু ও উপধাতু।

যাহারা চাকচিক্যশালী, প্রবল তাপ ও তাড়িত পরিচালক ও যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক তাহাদিগকে ধাতু, আর অবশিষ্ট গুলিকে উপধাতু কহে। উপধাতু সর্ব্বসমেত ১৫টী, কাহার কাহার মতে ১৪টী; যাঁহারা আর্সেনিককে উপধাতু মধ্যে গণনা করেন, তাঁহাদের মতে ১৪টী। আর্সেনিকের কতকগুলি গুণ ধাতুর ন্যায় এবং কতকগুলি উপধাতুর মত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে ধাতু ও কেহ কেহ উপধাতু কহিয়া থাকেন। ধাতু বাদ অবশিষ্টগুলি উপধাতু।

উপধাতু।

সংখ্যা	লাটিন বা ইং নাম	বাঃ নাম	সাঃ চিহ্ন	পরমাণুর ভার
১	অক্সিজেন	অম্লজন	O	১৬
২	হাইড্রজেন	উদজন	H	১
৩	নাইট্রজেন	যবক্ষারজন	N	১৪
৪	কার্ব্বন	অঙ্গার	C	১২
৫	ক্লোরিন	হরীতীন	Cl	৩৫·৫
৬	ব্রোমিন	পূতীক	Br	৮০
৭	আয়োডিন	অরুণক	I	১২৭
৮	ফ্লুরিন	কাচাস্তক	F	১৯
৯	সলফর্	গন্ধক	S	৩২
১০	সেলিনিয়ম	উপগন্ধক	Se	৭৯·৫
১১	টেল্লুরিয়ম	অনুপগন্ধক	Te	১২৯
১২	বোরন	টঙ্গনক	B	১১
১৩	সাইলিকন	সিকতক	Si	২৮
১৪	ফস্ফরস্	প্রস্ফুরক	P	৩১
১৫	আর্সেনিক	শিমুলক্ষার	As	৭৫

ধাতু।

সংখ্যা	লাটিন বা ইং নাম	বাঃ নাম	সাঃ চিহ্ন	পরমাণুর ভার
১	কোলিয়ম্ বা পটাসিয়ম্	ক্ষারক	K	৩৯.১
২	ন্যাটরিয়ম বা সোডিয়ম	লবণক	Na	২৩
৩	ক্যালসিয়ম্	চূর্ণপ্রদ	Ca	৪০
৪	এলিউমিনম	ফটকিরিপ্রদ	Al	২৭·৫
৫	জিঙ্ক	দস্তা	Zn	৬৫·২
৬	ফেরম বা আয়রণ	লৌহ	Fe	৫৬
৭	কোবাল্ট		Co	৫৮·৭
৮	নিকেল		Ni	৫৮·৭
৯	অরম বা গোল্ড	স্বর্ণ	Au	১৯৭
১০	ষ্টানম বা টীন	রঙ্গ বা রাং	Sn	১১৮
১১	ষ্টিবিয়ম বা আন্টিমণি	রসাঞ্জনপ্রদ	St	১২২
১২	বিস্মথ		Bi	২১০

ইং নাম	বাং নাম	সাং চিহ্ন	পরমাণুর ভার
১৩ প্লমবম বা লেড	সিসা	Pb	২০৭
১৪ কিউপ্রম বা কপার	তাম্র	Cu	৬৩.৫
১৫ হাইড্রজিয়স বা মার্করি	পারদ	Hg	২০০
১৬ প্লাটিনম	সিতকাঞ্চন	Pt	১৯৭·৫
১৭ ম্যাগনিসিয়ম	সুবঙ্গ	My	২৪
১৮ ম্যাঙ্গনীজ		Mn	৫৫
১৯ আর্জেণ্টম বা সিলভার	রৌপ্য	Ag	১০৮
২০ বেরিয়ম		Ba	১৩৭
২১ বেরিলিয়ম		Be	৯·৩
২২ ক্যাডমিয়ম্		Cd	১১২
২৩ সিসীয়ম্		Cs	১৩৩
২৪ সেরিয়ম		Ce	৯২
২৫ ক্রোমিয়ম্		Cr	৫২·২
২৬ ডিডীমিয়ম		D	৯৫
২৭ অরেব্রিয়ম্		E	১১২·৬
২৮ ইণ্ডিয়ম		In	১১৩
২৯ ইরিডিয়ম		Ir	১৯৮
৩০ ল্যান্থেনম		La	৯২
৩১ লিথিয়ম		Li	৭
৩২ মলিবডিনম		Mo	৯৬
৩৩ নিওবম্		Nb	৯৪
৩৪ অস্‌মিয়ম		Os	১৯৯·২
৩৫ প্যালেডিয়ম		Pd	১০৬·৬
৩৬ রোডিয়ম		Rh	১০৪·৪
৩৭ রুবিডিয়ম		Rb	৮৫·৪
৩৮ রুথিনিয়ম		Ru	১০৪·৪
৩৯ ষ্টনসিয়ম		Sn	৮৭·৫
৪০ ট্যানটেলম্		Ta	১৮২
৪১ থ্যালিয়ম		Tl	২০৪
৪২ থোরিয়ম		Th	২৩১·৫
৪৩ টিট্যানিয়ম		Ti	৫০
৪৪ টঙ্গষ্টেন		W	১৮৪
৪৫ ইউরেনিয়ম		U	১২০

ইং নাম	সাং চিহ্ন	পরমাণুর ভার
৪৬ ভ্যানেডিয়ম	V	৫১·১
৪৭ ইট্রিয়ম	Y	৬১·৬
৪৮ জিরকোনিয়ম	Zr	৮৯·৬
৪৯ প্র্যুসিনিয়ম		

ধাতুদিগের মধ্যে লিথিয়ম, পটাসিয়ম ও সোডিয়ম জল অপেক্ষা লঘু অর্থাৎ জলের উপরে ভাসে। আর যাবতীয় তরল পদার্থের মধ্যে লিথিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। প্লাটিনম্ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু।

উপধাতুর মধ্যে টেলুরিয়ম্ সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, হাইড্রজেন্ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এবং ইহা হইতে জানা যায় যে, বায়বীয় মূল পদার্থদিগের যাবতীয় ভার পরমাণুর আয়তন সমান।

উপধাতুর মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন বায়বীয়; ব্রোমিন তরল ও অবশিষ্টগুলি কঠিন।

ধাতুর মধ্যে পারদ ও লিথিয়ম্ তরল এবং অবশিষ্টগুলি কঠিন।

মূল পদার্থগুলির সংক্ষেপে নামোল্লেখ করিবার জন্য উহাদের ইংরাজী বা লাটিন নামের আদ্যক্ষর ব্যবহৃত হয়; যথা অক্সিজেন O, হাইড্রজেন H ইত্যাদি। এই সকল চিহ্ন দ্বারা কয়টী পরমাণু তাহাও বুঝায়। যথা O_3 বলিলে, অক্সিজেনের তিনটী; H_2 বলিলে, হাইড্রজেনের দুটী বুঝায়। ইহা দ্বারা উহাদের প্রত্যেকের গুরুত্বও বুঝায়। যথা O বলিলে, উহার গুরুত্ব ১৬ এবং নাম অক্‌সিজেন বুঝায়।

পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যাবতীয় পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণাসমূহের সমষ্টি। ঐ অবিভাজ্য কণাকে পরমাণু কহে। পরমাণু যে কত ক্ষুদ্র তাহা কেহ দর্শন করে নাই, ও তাহা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় না। তবে বাষ্পীয় ও বায়বীয় পদার্থমাত্রের ধর্ম্ম এই যে, সমান সমান আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থগুলি, সমান তাপে, সমান চাপে, সমান সমান স্থান অধিকার করে অর্থাৎ উহাদের আয়তনের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

বস্তুদিগের আয়তনের ইতর বিশেষ হইবার কারণ উহাদের পরমাণুর অবকাশের হ্রাস বৃদ্ধি মাত্র। অর্থাৎ উত্তাপ নিবন্ধন উহাদের অবকাশের বৃদ্ধি ও চাপ এবং শৈত্যনিবন্ধন অবকাশের হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং সমান সমান আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থগুলিতে সমানসংখ্যক পরমাণু না থাকিলে, সমান তাপে ও সমান চাপে, সমান সমান স্থান অধিকার করিতে পারে না; কিন্তু উহাদের ভার ভিন্ন। অর্থাৎ O, H, ও N এই তিনটী বায়বীয় পদার্থের ভার O°শ উষ্ণতায় ৭৬০, মিলিমিটর চাপে ১১·১৯, লিটারের ভার যথাক্রমে ১৬.১১৪ গ্রাম। আর যেখানে সমান আয়তন বায়বীয় পদার্থগুলিতে সমানসংখ্যক পরমাণু আছে, সেখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হাইড্রজেন একটী পরমাণুর ভার ১ হইলে অক্সিজেন ১৬, এবং নাইট্রজেন ১৪ হইবে; ইত্যাদি...

হাইড্রজেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ। এজন্য সমায়তন হাইড্রজেনের গুরুত্বকে ১ ধরিয়া যাবতীয় মূল ও যৌগিক বায়বীয় পদার্থের পারমাণবিক ও আণবিক গুরুত্ব ঘনত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন, ক্লোরিন ইহাদের গুরুত্ব যথাক্রমে ১৬, ১, ১৪, ৩৫.৫। ইহা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, O, N, Cl প্রত্যেকেই সমায়তন হাইড্রজেন অপেক্ষা ১৬, ১৪, ও ৩৫.৫ গুণ ভারী। অপর উক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা কেবল মূল পদার্থদিগের নাম ও গুরুত্ব বুঝায় এরূপ নহে। কোন্ যৌগিক পদার্থের কি নাম ও কোন্ কোন্ মূল পদার্থের কয়টী পরমাণুর সংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে ও উহার গুরুত্ব কত, তাহাও জানা যাইতে পারে। যথা $H_২O$; HCl বলিলে, উহাদের নাম জল ও হাইড্রক্লোরিক এসিড এবং হাইড্রজেন ২টী ও অক্সিজেনের ১টী পরমাণুর সংযোগে জলের অণু এবং হাইড্রজেন একটী ও ক্লোরিনের একটী পরমাণুর যোগে হাইড্রক্লোরিক এসিডের এই অণু উৎপন্ন হয়। এবং উহাদের মৌলিক গুরুত্ব যথাক্রমে ১৮ ও ৩৬·৫ বুঝায়।

কোন মূল বা যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে, কোন্ কোন্ পদার্থ, কি কি পরিমাণে মিশাইতে হয় এবং কোন্ পদার্থে কত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাও জানা যাইতে পারে।

যথা—

$২Kclo_{৩} = ২Kcl + ৩O_{২}$

$KHNO_{৩} + H_{২}\ So_{৪} = KHSo_{৪} + HNo_{৩}$

রসায়ন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন)।

$Kclo_{৩}$ ইহার মধ্যে—$K = ৩৯.১$

$Cl = ৩২.৫$

$O_{৩} = ৪৮$

$Hclo_{৩} = ১২২.৬$
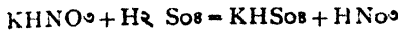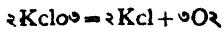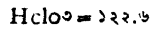
ইহা হইতে সমস্ত অক্সিজেন অর্থাৎ $O_{৩} = ৪৮$ বহির্গত হয় এবং $Kcl = ৭৪.৬$ পটাশিয়ম ক্লোরেট থাকিয়া যায়। এইরূপ সমস্ত রাসায়নিক সমীকরণ দ্বারা কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে লইলে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি কি পরিমাণে প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতে পারা যায়।

অধাতু ভূত পদার্থ।

ইং নাম,	বাং নাম,	সাং চিহ্ন,	পরমাণু ভার
অক্সিজেন	অম্লজন	O	১৬
হাইড্রজেন	জলজান	H	১
নাইট্রজেন	যবক্ষারজান	N	১৪
কার্ব্বন	অঙ্গার	C	১২
ক্লোরাইন	হরিতীন বা হরিতক	Cl	৩৫.৫
ব্রোমাইন	পূতীন বা পূতীক	Br	৮০
আইয়োডাইন	অরুণক	I	১২৭
ফ্লুয়োরাইন	কাচাস্তক	F	১৯
সল্ফর	গন্ধক	S	৩২
সিলিনিয়ম	উপগন্ধক	Se	৭৯.৫
টেলুরিয়ম	অনুপগন্ধক	Te	১২৯
সিলিকন	সিকতাপ্রদ বা বালুকীন	Si	১২৮
বোরন	টঙ্কক বা উপাঙ্গার	B	১১
ফস্ফরস্	প্রস্ফুরক বা দীপক	P	৩১
আর্সেনিক	শিমূলক্ষার	As	৭৫

রসায়ন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন)।

ধাতু ভূত পদার্থ।

ইংরাজী নাম	বাং, নাম	সাং চিহ্ন	পরমাণু ভার।
পটাসিয়ম	কাষ্ঠভস্মসার বা ক্ষারক	K	৩৯.১
সোডিয়ম	লবণক	Na	২৩
ক্যালসিয়ম	চূর্ণপ্রদ	Ca	৫০
এলিউমিনম্	ফটকিরিপ্রদ	Al	২৭.৫
ম্যাগনিসিয়ম্	সুবঙ্গ	Mg	২৪
জিঙ্ক	দস্তা	Zn	৬৫.২
ম্যাঙ্গেনিজ		Mn	৫৫
ফেরম্ বা আয়রন্	লৌহ	Fe	৫৬
কোবাল্ট		Co	৫৮.৭
নিকেল		Ni	৫৮.৭
টিন	রঙ্গ বা রাং	Sn	১১৮
এণ্টিমনি বা ষ্টিবিয়ম্	রসাঞ্জনপ্রদ	Sb	১২
বিসমথ		Bi	২১০
লেড বা প্লমবম্	সীস	Pb	২০৭
কপার বা কিউপ্রম	তাম্র	Co	৬৩.৫
মার্করি বা হাইড্রার্জিরম	পারদ	Hg	২০০
সিলভার বা আর্জেণ্টম		Ag	১০৮
গোল্ড বা অরম	স্বর্ণ	Au	১৯৭
প্লাটিনম	সিতকাঞ্চন বা সিতক	Pt	১৯৭.৫

নিম্নে কতিপয় প্রধান প্রধান যৌগিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শিত হইল :—

হাইড্রজেন মনক্সাইড্ বা জল—$H_{২}O$

" ডায়ক্সাইড্ বা অম্লজল—$H_{২}O_{২}$ বা No

নাইট্রজেন মনক্সাইড বা নাইট্রস অক্সাইড —$N_{২}O$

" ডাইক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড—$N_{২}O_{২}$ বা No

„ ট্রায়ক্সাইড বা নাইট্রিক এন হাইড্রাইড— H_2O_3

„ „ বা নাইট্রিক পারক্সাইড— N_2O_4 NO_2

„ পেণ্টকসাইড বা নাইট্রিক এন হাইড্রাইড— N_2O_5

নাইট্রস এসিড— HNO_2

(ক্রমশঃ)

একজাতিত্ব।

(৪০০ সংখ্যা -- ২৮ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্ব পত্রে শরীর ও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ দ্বারা ভারতীয় এক জাতিত্বের ভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। আজ দেখাইব, ভারতীয় একজাতিত্ব, বা একপ্রাণতার আশ্রয় কি? এবং কিরূপে তাহা স্থায়ী ও বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র একজাতিত্বের অন্যতম আশ্রয়। হিন্দু পুরাণ, এই নাম শ্রবণ মাত্র অনেকে কতকগুলি কল্পিত ইতিহাসপূর্ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ মনে করেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহ হিন্দু পুরাণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, হিন্দু পুরাণ দুইটী সূত্রে গ্রথিত। তাহার একটীর নাম "প্রাক্তন" এবং অন্যটীর নাম "পুরুষকার।" কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত ঐ দুইটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাক্তন,—পূর্ব্বকালবর্ত্তী দৃষ্টাদৃষ্ট কারণকূট এবং "পুরুষকার,—ধর্ম্মসহকৃত বর্ত্তমানকালবর্ত্তী বুদ্ধিবলাদি করণের প্রয়োগ। ঐ দুইটীর অপর নাম 'পূর্ব্বতপস্যা' এবং 'বর্ত্তমান উদ্যোগ'।" এই পূর্ব্বতপস্যা এবং বর্ত্তমান উদ্যোগের সমবায়ই, হিন্দুপুরাণ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের মূল। মুসলমান, য়িহুদী প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় জাতি কর্ম্মসূত্রে ভারতে আগমন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ঐ সূত্র মানিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দু জাতি হিন্দু পুরাণের অনেক অংশ মানিয়া থাকেন। মিথিলার রাজকন্যা—কোশলের রাজমহিষী সীতার সতীত্বে হিন্দু ভারত চিরবিমুগ্ধ। পাঞ্চালী পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগ্রামে ভারতের হিন্দু জাতিমাত্রে বশীভূত। সপ্তরথিকর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অন্যায়রূপে বালক অভিমন্যুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণে আজও হিন্দু ভারত অশ্রুপাত করে ও কৌরবের অত্যাচারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়। এইরূপ সাবিত্রী, সত্যভামা, অরুন্ধতী, দময়ন্তী, দেবকী, দেবহুতি, নন্দরাণী, নগেন্দ্রনন্দিনী প্রভৃতি রমণীকুলাদর্শ রমণীগণ কোন প্রদেশবিশেষের নহেন, তাঁহারা সমস্ত ভারতের অসমুদ্রসম্ভূতা রত্নস্বরূপা। যে সকল

পৌরাণিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা গেল সে সকল স্থানবিশেষের সম্পত্তি হইলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত ভারতের সমান সহানুভূতি হইত না।

তীর্থসেবা, দেবদ্বিজ ও দরিদ্রে দান, অতিথিসংকার, অনার্ত্তবা কন্যাকে সৎপাত্রের হস্তে অর্পণ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদি কার্য্যগুলি ভারতীয় হিন্দুমাত্রেরই করণীয় ও অবশ্যপালনীয়। মনুপ্রণীত মানব ধর্ম্মের উপদেশ না মানেন, ভারতে এমন হিন্দু প্রায় নাই। মিথিলার পক্ষধর মিশ্র এবং নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির নিকট এককালে তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, যক্ষপুর, কাশী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান হইতে নানাজাতীয় ছাত্রবৃন্দ আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এখন যেমন বিষয়কার্য্যসূত্রে পৃথিবীর নানাজাতি কলিকাতায় আসিয়া এক স্বার্থে মিলিত হইয়াছেন, এক সময়ে তেমনি মিথিলা, নবদ্বীপ, কাশী ও পুনায় ভারতের নানা স্থান হইতে নানাজাতীয় লোক শাস্ত্রাধ্যয়ন উদ্দেশে আসিয়া মিলিত হইতেন, এবং পরস্পর সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। এখনও নবদ্বীপের টোলে নানাজাতীয় হিন্দু ছাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এককালে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকথা, কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা ভারতের সর্ব্বজাতীয় লোকে একতানমনে শ্রবণ করিয়াছে। এখনও বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ইংরাজী বক্তৃতা ভারতের কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি য়িহুদি সকল ভারতীয় লোকে শ্রবণ করিয়া একবিধ স্বার্থেরই পোষণ করিতেছেন। ভারতের একজাতিত্ব, বা একপ্রাণতা এইরূপেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং চিরকাল হইবে।

উপরি-উক্ত প্রণালীতে ভারতীয় একজাতিত্ব চিরকাল রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে, এ কথা দম্ভসহকারে বলা যাইতে পারে। কেননা, ঐ একজাতিত্বের মূলে প্রকৃতির অনুকূলতা আছে। ভারতীয় ইতিবৃত্ত সমালোচনায় জানা যায় যে, প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটী যেন একটী স্থির লক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছে। ইহা মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বাঁকিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু নদীও সাগরসঙ্গমে যাইতে বাঁকিয়া চুরিয়া যায়,—গাছও আকাশমুখে উঠিতে যোড় খাইয়া উঠে,—ছেলেরাও বাড়িবার সময় একবার মোটায় ও একবার রোগায়,—সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই এইরূপ।

ভারতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনায় ইহাও জানা যায় যে, ভারতে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক জাতি ও বহুসংখ্যক ভাষা বিদ্যমান ছিল। আর্য্যগণ এ দেশে আসিয়া ঐ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অনুলোম বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় ক্রমশ জাতিসংখ্যা অল্পীকৃত ও পরস্পর সুসদৃশ হইয়াছে। আর্য্যগণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সংস্কৃত ভাষার শুভাগমন হয়। ঐ সংস্কৃত ভাষার দ্বারা

পূর্ব্বপ্রচলিত বহুসংখ্যক ভাষা কেবল ১০।১২টী ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

জাতি ও অধিকারি-ভেদ স্বীকার এবং অনুষ্ঠানবাহুল্য প্রযুক্ত হিন্দু সমাজের ভিত্তি বহুব্যায়ত। এজন্য আর্য্যগণই ভারতীয় অসংখ্য আদিম জাতিকে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য ও জাতীয় ভাবসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। এখনও ৯২ লক্ষ আদিমনিবাসী ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিদ্যমান আছে। তাহাদের ভাষা-সংখ্যা একশত পঞ্চাশেরও অধিক। ইহারা এখনও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হয় নাই। মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, উপরি-উক্ত আদিম জাতিগণ কোন না কোন কালে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হইয়া জাতীয় ভাব অধিকার করিবে। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি-বশেই এরূপ ঘটনা হইবে।

যেমন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু থাকিলেও জন্মসংখ্যাই বেশি হইতেছে, তেমনি ভারতে সম্মিলন ও বিচ্ছেদ এই উভয় শক্তির কার্য্য হইলেও মোটের উপর সম্মিলনী শক্তিই বর্দ্ধিত হইতেছে। হিন্দু জাতির বিচ্ছেদপ্রবণতার কারণ স্বজাতি-বিদ্বেষ। এই স্বজাতি-বিদ্বেষের দ্বারাই এ জাতির পরাধীনতা সংঘটিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতির শাসনাধীন হইয়া অবধি বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটনা হয় নাই বটে, কিন্তু স্বজাতি-বিদ্বেষের ভূরি ভূরি নিদর্শন আজও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন মনুষ্য-দেহে রক্তের অভাব ঘটিলে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যায়,—আপাদমস্তক-ব্যাপিনী অনুভূতি লোপ পায়,—পায় কাঁটা ফুটিলে, বা পৃষ্ঠে মশকাদি দংশন করিলে বুঝিতে পারা যায় না;—সেইরূপ কোন জাতির মধ্যে স্বজাতি-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইলে ঐ জাতির একপ্রাণতা নষ্ট হইয়া যায়। স্বজাতিবিদ্বেষই শোণিতাভাব। জাতীয়ানুরাগই সামাজিক শোণিত। হিন্দু সমাজ এখন ঐ শোণিতের অভাবে অসাড়, তজ্জন্যই বাহে জাতীয় ভাবশূন্য বলিয়া বোধ হয়। এখন ভারতীয় সমাজ-শরীরে ঐ শোণিতসমাবেশ আবশ্যক।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইংরাজের সুদৃঢ় মুষ্টি মধ্যে আগমন করিয়া ভারতীয় সমাজের বিচ্ছেদ-প্রবণতা অল্পীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন কোন কূট-রাজনৈতিক রাজপুরুষের চেষ্টায় কখন কখন বিচ্ছেদ-প্রবণতার নিদানগুলি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভারতীয় বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্মভেদ বশতঃ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া হীনবল হইয়া যায়, রাজপুরুষগণ যেন তাহা দেখিয়াও দেখেন না। হিন্দু সমাজের অন্তর্ব্বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা, স্বার্থ, ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজপুরুষদিগের লক্ষ্যও হয় না। যাহা হউক, পুরাতন ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান রাজশাসন, এই উভয়ই

আমাদিগের একজাতি-নিষ্ঠ কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছে।

আমরা যদি একজাতিত্ব, বা এক-প্রাণতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ করি, আমাদিগকে হিন্দু জাতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া চলিতে হইবে। সৌভাগ্যবশে সুসভ্য ও রাজনীতিবিৎ ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়াছেন। আমাদিগের জাতীয়ভাব যদি সম্পূর্ণ হয়, ইংরাজের সুশাসনে ও সাহায্যেই হইবে। আমরা যদি এখন ইংরাজকে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়রাজ মনে করি, এবং ভারতীয় সমাজকে ক্ষত্রিয়োপদেষ্টা ব্রাহ্মণস্বরূপ মনে করি, তাহা হইলে আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও সম্পূর্ণ একপ্রাণ হইতে পারি। অতএব ইংরাজকে আমাদের ভক্তিভাজন রাজা ও হিতৈষী মিত্র মনে করিতে হইবে। ইংরাজের নিকট আমাদিগকে স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু যতদূর সম্ভব, তাঁহাদের মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরাজ সমাজের অন্তর্গত মনে করিয়াও তাঁহা-দিগের বাহ্য দলাদলির ভাব পরিহার করিতে হইবে। স্বজাতিবিদ্বেষ মহাপাপ। হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে এই পাপ পরিহার করিতে হইবে। স্বজাতীয় সহানুভূতিই আমাদের সকলের সর্ব্বস্ব। (১)

বর্ণিয়া।

গভীর অলকানন্দা গঙ্গার এক প্রশস্ত তটপ্রান্তে কুসুম নগরী নামে এক নগর আছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘোর অরণ্যানী ও ধবলাকার পর্ব্বত।

এই নগরে রবি ও ছবি নামে দুই জন বণিক্ বাস করেন। উভয়ে দুই বিভিন্ন বংশে উদ্ভূত হইলেও দুই জনের মধ্যে কোনরূপ হৃদয়ের ভিন্নতা ছিল না; উভয়ের নিকটে উভয়ে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইত।

ছবির সংযুক্তা নামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এক কন্যা। রবিরও তদধিক সুন্দরী একটী কন্যা, তাহার নামই বর্ণিয়া।

পূর্ণিমার বিশদ জ্যোৎস্নালোকে বিদ্যুৎ-প্রপাতবৎ সংযুক্তার রূপের সহিত গুণের সংমিশ্রণ বড় প্রীতিকর। সংযুক্তা সর্ব্বদা সর্ব্বজনের নিকট প্রশংসিতা, সংযুক্তা ক্রীড়াস্থলে সুকৌশলা, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহশীলা। বর্ণিয়ার কিন্তু এ সব গুণ কিছুই ছিল না। বর্ণিয়া বড় সরলা—সে কুটিল সংসারের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না, সংসারের কূট তর্ক তাহার বোধগম্য হইত না। সে কৃষ্ণ কুন্তল

(১) ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থের "জাতীয় ভাব" প্রবন্ধের মর্ম্মাবলম্বনে উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইল। প্রঃ লেঃ।

এলাইয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়—বেশ-বিন্যাসে দৃষ্টি নাই। গৃহকর্ম্মে তাহার মনোনিবেশ হয় না। বর্ণিয়া কখন নিন্দা-বাদে ভীত হয় না, আত্মোন্নতির চেষ্টা তাহার মনে আসে না। ফুলের বাগানে বা নিবিড় কাননে বা গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া সে অধিক সময় যাপন করে। এই সকল কারণে সকলেই সমস্বরে সংযুক্তার প্রশংসা করিয়া বর্ণিয়ার নিন্দা করিত।

বর্ণিয়ার সঙ্গে সংযুক্তার কোন দিন বাদ বিসম্বাদ হয় না। সংযুক্তা যাহা বলে, বর্ণিয়া সরলান্তঃকরণে তাহাই পালন করিতে প্রস্তুত হয়। উভয়েরই এখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, কিন্তু কাহারও বিবাহ হয় নাই।

পিতা ব্যতীত এ সংসারে বর্ণিয়ার আর কেহ নাই। মাতার পবিত্র মুখকমল তাহার স্মরণপথে ভালরূপে উদিত হয় না। বর্ণিয়া জনমদুঃখিনী, এইজন্য সংযুক্তা মাঝে মাঝে তাহাকে বড় আদর করে। এই ভাবে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

বর্ণিয়া চির-দুঃখিনী। সে সংযুক্তার নিকট কোন দিন আদর চায় নাই। সংযুক্তা আপনা হইতেই তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু বর্ণিয়া দেখিল আজ কাল সংযুক্তা তাহারে আর ভাল বাসে না। তাহারে দেখিলেই আড়ালে ভর্ৎসনা করিতে থাকে। ইহার গূঢ় অর্থ সে সরলা বালিকার বুঝিবার শক্তি হইল না।

সংযুক্তা এখন আর পূর্ব্বভাবে বর্ণিয়ার কাছে বসিয়া আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া বা খোপায় ফুল গুঁজিয়া দিতে চাহে না। নিজেও চুল বান্ধে না, হাসে না, সর্ব্বদা অন্যমনস্কা। বর্ণিয়া একদিন নিবিড় বন-পথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, সংযুক্তা একজন যুবা পুরুষের কোলে অর্দ্ধশায়িতা হইয়া অশ্রু মোচন করিতেছে। বর্ণিয়া সে দিন বুঝিল সংযুক্তার এই নবজীবন তাহার ঔদাস্যের কারণ, সংযুক্তা কাহাকে ভাল বাসিয়াছে। এই ভাবে আর কিছু দিন গেল।

ইতিমধ্যে বর্ণিয়ার পিতা রবি বর্ণিয়াকে ঘোর দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ইহ সংসার হইতে চিরবিদায় লইলেন।

বর্ণিয়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন পিতাকে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই সময় সেই নগরের অনেকগুলি ভদ্রলোক তীর্থপর্য্যটনে গমন করিতে-ছিলেন। সংযুক্তা সেই সময় বর্ণিয়াকে পিতার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য তীর্থধামে গমন করিতে পরামর্শ দিল। বর্ণিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহের সমুদয় মূল্যবান্ বস্তু বিক্রয় করিয়া প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে তীর্থধামে বাহির হইল। ইহাতে যে সংযুক্তার কি স্বার্থসাধন হইল, তাহা কেহই বুঝিল না, সে সরলা কিরূপে বুঝিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনীর অন্ধকার এখন ভাল করিয়া বিদূরিত হয় নাই, কেবল উষা সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া বিহঙ্গনিচয় মধুর কাকলী-ধ্বনি করিতেছে। বাত্যান্দোলিত মেঘ-

খণ্ডের তলে দু চারিটী নক্ষত্র এখনও পরিলক্ষিত হয়। এই সময় একজন যুবতী বৃক্ষশ্রেণীর তলভূমি অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে চলিতেছে, তাহার নিবিড় মেঘমালাসদৃশ কুন্তলরাজি পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর নিপতিত হইয়া অতুল শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, অবিন্যস্ত মলিনাঞ্চল ধূলায় অবলুণ্ঠিত। এ রমণী কে? এ কি বর্ণিয়া?

বর্ণিয়া পিতার পিণ্ডদানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া বহুদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল, হঠাৎ পথিমধ্যে সঙ্গীদিগকে হারাইয়া চঞ্চলহৃদয়ে শূন্যনয়নে দ্রুতবেগে বনপথে চলিয়াছে। এমন সময় সে দেখিল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভদ্রলোকও দ্রুতপদে আসিতেছেন। তখন তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, সে লোকটী তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। তখন বর্ণিয়ার সরল হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিল। বর্ণিয়া দ্বিগুণবেগে ছুটিল, পশ্চাদ্গামী ব্যক্তিও সেইরূপ বেগে ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনও আকাশ ভালরূপ পরিষ্কার হয় নাই। ভয়ে বর্ণিয়া আর পশ্চাৎদিকে চাহিতে পারিল না—কেবল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর্ণিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে একবার পশ্চাৎদিকে চাহিল। দেখিল সেই লোকটি বর্ণিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কেশাগ্রে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ণিয়া এই ব্যাপার দর্শন করিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে বর্ণিয়ার চৈতন্য হইল। সংজ্ঞা পাইয়া বর্ণিয়া দেখিল সে একটী মধুর লতামণ্ডপে সুরভিত পুষ্পশয্যায় শায়িতা, তাহার শয্যার অনতিদূরে একটী কুসুমাসনে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি। বর্ণিয়ার চৈতন্য হইল দেখিয়া সে যুবকটী সাতিশয় আহ্লাদভরে কহিল "বর্ণিয়া! তুমি কি সুস্থ হইয়াছ?" সে আদরে সহসা বর্ণিয়ার হৃদয় কম্পিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে কম্পিত হইতেছিল, এখন তাহাকে দেখিয়া প্রাণাধিক প্রিয় দেবতা বলিয়া প্রতীতি হইল। লতামণ্ডপে কুসুম-স্তবকে যাহাকে দেখা যায়, তাঁহাকেই কি প্রাণাধিক দেবতা বলিতে সাধ হয়? এ মহা প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বর্ণিয়ার অবোধ হৃদয় কিছুই দিতে পারিল না। যুবা কহিল "বর্ণিয়া!"

বর্ণিয়া তখন উঠিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। যুবা কহিল "বর্ণিয়া! তুমি আমার দিকে তাকাও, তোমার কোন ভয় নাই।"

বর্ণিয়া তখন অশ্রুপূর্ণমুখে কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, যুবা দেখিল সে চাহনিতে কেবল কাতর প্রার্থনা। সে কহিল, বর্ণিয়া, আমি জানি তুমি জনম-দুঃখিনী, এ সংসারে তোমার কেহই নাই; কিন্তু জানিও বর্ণিয়া! আমি তোমারই আজি এবং চিরকাল রহিব।" অনাথিনীর হৃদয়ে ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, এবং সেই ক্ষুদ্র লতামণ্ডপটী ক্রমে

ক্রমে সপ্তম স্বর্গে পরিণত হইতে লাগিল। বর্ণিয়া আজ বুঝিল যে, দুঃখ যত অধিক হউক, তাহার একটা সীমা আছে।

যুবা কহিল আমি তোমাকে চিনি, তোমার পিতাকে বিশেষরূপে জানি, আমি পূর্ব্বে তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তুমি আমাকে চেন না, এবং আমার নামও জান না। আমার নাম অমর দেব। আমি তোমাদের স্বজাতি, এবং বড় লোকের ঘরের সন্তান। দেশের সকলেই তোমাকে নিন্দা করে, কিন্তু আমি তোমাকে হৃদয়ের সহিত প্রশংসা করি। এমন মধুর রমণী আমি আর কখন দেখি নাই। বর্ণিয়া, তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার নেত্রপথে পড় নাই, সেই জন্যই আমা হইতে অন্য এক জনের মনে কষ্ট হইয়াছে।

তখন বর্ণিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। যোড় হাত করিয়া অমরকে "আমি জনম-দুখিনী বর্ণিয়া, তুমি আমাকে রক্ষা করিলে, আজ তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অমর মধুর স্বরে কহিল বর্ণিয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?

অমরের কথা শুনিয়া বর্ণিয়া হঠাৎ লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুটাইয়া গেল। লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, সমস্ত শরীর কম্পমান হইল, সমস্ত হৃদয় চঞ্চল হইল। সে তখন কোন উত্তর করিতে পারিল না।

অমর আবার কহিল—বল বর্ণিয়া, বল তুমি আমায় বিবাহ করিবে?

অনেকক্ষণ পরে বর্ণিয়া কহিল আমার ভাল মন্দ এখন সমস্তই আপনার হাতে দিয়াছি। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহাই আপনি করুন।

অমর—হাঁ বুঝিলাম। প্রস্তুত হও, আজ তোমার বিবাহ হইবে।

বর্ণিয়া তরঙ্গান্দোলিত পদ্মের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কহিল "এই মুহূর্ত্তে?"

অমর—হাঁ এই মুহূর্ত্তে।

বর্ণিয়া—এত তাড়াতাড়ি কেন?

অমর—তাহা পরে জানিবে।

তখন সেই লতামণ্ডপে বর্ণিয়াকে রাখিয়া অমর বিবাহের আয়োজনে প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বর্ণিয়ার সঙ্গে মিলিত হইল। সেই দিনই মহাসমারোহে বর্ণিয়ার সহিত অমরের বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। এত শীঘ্র এত আয়োজন, এত দাস দাসী অমর কোথায় পাইলেন বর্ণিয়া তাহার কিছুই বুঝিল না।

বর্ণিয়ার আজ বড় শুভদিন, সে আজ জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে। বর্ণিয়া সমস্ত দিন স্বামীর সহিত মধুর বাক্যালাপ করিয়া সমস্ত রজনী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া গাঢ় নিদ্রানুভব করিতে লাগিল। অমরেরও তদ্রূপ অবস্থা, কারণ আজ তিনি বহুদিন পরে প্রার্থিত রত্ন পাইয়াছেন। সে রজনী প্রভাত হইল। জাগ্রত হইয়া অমর দেখিলেন তাঁহার কোল শূন্য—বর্ণিয়া সে লতা-মণ্ডপে নাই। শশব্যস্তে অমর উঠিল, 'বর্ণিয়া' 'বর্ণিয়া' বলিয়া কত ডাকে, হায়!

অভাগিনী বর্ণিয়া আর সেখানে নাই! অমর তখন ক্রোধকম্পিতহৃদয়ে সেখান হইতে বাহির হইয়া লতামণ্ডপের বাহিরে যে সকল পাহারা নিযুক্ত ছিল, সিংহ-গর্জ্জনে চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল "আমি সব বুঝিয়াছি। যদি তোমরা আপন মঙ্গল চাও, তবে শীঘ্র সমস্ত বিষয় আমার নিকট বিবৃত কর।" কম্পিতহৃদয়ে পাহারাওয়ালাগণ প্রভুর নিকট বিবরণ ভাঙ্গিয়া কহিল। অমর সে সব পাহারাওয়ালাকে বাঁধিতে হুকুম দিয়া বর্ণিয়ার উদ্দেশে বাহির হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একটি ক্ষুদ্র দোকানের একখানি ভগ্ন গৃহে বর্ণিয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে। চারি পাঁচ জন দাসী তাহাকে এক গ্রাস সরবৎ খাওয়াইবার জন্য অনুরোধ—অবশেষে মহা পীড়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু বর্ণিয়ার আজ আহারে রুচি নাই, অতএব সে কিছুতেই সে সরবৎ খাইতে স্বীকৃত হইল না। দাসীরা মহা কুপিত হইয়া এইবার সরবৎ খাওয়াইবার জন্য বর্ণিয়াকে জোর করিয়া ধরিল। এই বার কিন্তু বর্ণিয়ার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে সরবৎ খাইতেই হইত।

এমনি সময় দ্রুতগামী অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক এক জন মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল। সেই মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়াই দাসীর হস্ত হইতে সরবতের গ্রাস দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দাসীদিগকে পরুষ বাক্যে কহিলেন "তোমরা জান না যে কোথাও আমার অগম্য স্থান নাই—আমার অবিদিত এ দেশে কিছুই নাই।" তখন তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি তাঁহার ইঙ্গিতে দাসীদিগকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিল।

সেই মহাপুরুষ বর্ণিয়ার মুখচুম্বন করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন "বর্ণিয়া! তুমি অবশ্য ও সরবৎ খাও নাই, কারণ তোমার এখনও জ্ঞান রহিয়াছে।"

বর্ণিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল এবং স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল "প্রাণাধিক, এমন অঁাধার জগতে যে এখনও এমন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা আছেন, তাহা আমি কি পূর্ব্বে জানিতাম?"

বর্ণিয়া আপন করপল্লবে প্রেমাশ্রু মুছিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া আবার কহিল "প্রিয়তম! কে আমাকে বাঁধিয়াছিল?"

অমর বর্ণিয়ার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "বর্ণিয়া, এখন তাহা তোমার জানিয়া কাজ নাই। তুমি সব পরে জানিতে পারিবে।"

বর্ণিয়া—তুমি কি সব জান?

অমর—হাঁ সব জানি। এখন আর সে কথায় কাজ নাই, এই শিবিকারোহণ কর। এই কথা বলিয়া অমর বর্ণিয়াকে লইয়া উপস্থিত শিবিকারোহণ করিলেন। শিবিকা গন্তব্য স্থানে চলিল।

(ক্রমশঃ)

চুটকি গল্প।

(৩)

রাণাঘাট হইতে চাক্‌দা চারি ক্রোশ; বগপুর সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ। "সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ" কথাটা এ গল্পে বসাইতে হইবে, কেননা গল্পটা ব্রাহ্মণপণ্ডিত সংক্রান্ত। প্রায় দেড় শত বর্ষের কথা—রাণাঘাটে জয়রাম তর্কপঞ্চানন নামক একটী নৈয়ায়িক অধ্যাপক ছিলেন। জয়রামের সতীর্থ মধুসূদন ন্যায়রত্ন, তারাচাঁদ তর্কভূষণ প্রভৃতি আরও ২।৪টি অধ্যাপক ঐ সময়ে রাণাঘাটে বাস করিতেন। মধুসূদনকে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার বয়ঃক্রম ১১০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ভীমরতি (ভ্রমরতি) হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ তাঁহার সেবা করিতেন। পূর্ব্বাহ্ণে স্নানাহ্নিক পূজা ও ভোজন করাইয়া শয়ন করাইয়া দিতেন। ন্যায়রত্ন অপরাহ্ণে শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় ত্রিমূর্দ্ধা হইয়া উপবেশন করিতেন। এক এক দিন কাতরস্বরে বধূমাতাকে আহ্বান করিতেন। বধূমাতা নিকটবর্ত্তিনী হইলে কহিতেন—

"হাগো বউমা, তোমার কি একরত্তি দয়া নাই?" বউমা ভয়ে জড়সড় হইয়া দয়া না থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন,—

"সমস্ত দিনটা বয়ে গেল,—আমাকে এপর্য্যন্ত একটু জলখাবারও দিলে না? ক্ষুধানলে আমার নাড়ী যে দগ্ধ হইয়া গেল।" পুত্রবধূ অতিশয় দুঃখিতা হইয়া জানাইতেন,—

"সে-কি ঠাকুর,—তুমি আমার প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঠাকুর; তোমার পূজাহ্নিক ভোজনাদি না হইলে আমি অন্য কাজে হাত দেই না। তোমাকে দুপরের মধ্যে আহার করাইয়া শয়ন করাইয়াছি।" ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন লজ্জিত হইয়া কহিতেন,—"বটে? আমাকে খাওইয়াছ? ভাল! ভাল! আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

কিন্তু সেকালে এ দেশের সংস্কৃত টোলের কি অদ্ভুত শিক্ষাপ্রণালী ছিল। সে শিক্ষা এখনকার ন্যায় গ্রন্থ-নিবদ্ধ নহে। ডাক্তার বাবু এক গাড়ী পুস্তক না দেখিয়া একটা ব্যবস্থা দিতে বা একটা রোগ নির্ণয় করিতে পারেন না। উকিল বা ব্যারিষ্টার মহারথিগণও তদ্বৎ। কিন্তু সংস্কৃত টোলে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের শিক্ষানৈপুণ্য ও বিচারপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, কাব্যালঙ্কার, ব্যাকরণ।ভিধান প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিচার পরস্পরে করিয়া থাকেন, অথচ একখানি পুস্তক স্পর্শ করেন না। শিক্ষা এমন সসার ও পরিপক্ক যে ভ্রমরত্ত

বর্ষীয়ান্ অধ্যাপকেও তাহা দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে অধ্যাপকের ভ্রমরতির বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত হইল, তাঁহার তাদৃশী অবস্থাতেও বাল্যশিক্ষা বলবতী ছিল। আমরা বাল্যকালে যখন ব্যাকরণ পড়িতাম, সন্ধি বা ধাতুর কোন পদ সাধনে সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রথমে যুবক অধ্যাপকগণকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তাঁহারা প্রায়ই আমাদের প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেন না। কিন্তু উপরি-উক্ত বর্ষীয়ান্ অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহার সদুত্তর পাওয়া যাইত। কি অদ্ভুত শিক্ষা! এরূপ শিক্ষা অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে; পূর্ব্বোক্ত যুবক অধ্যাপকগণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

তাঁহাদের বিদ্যানুরাগ ও আলোচনা-ভিনিবেশও অধুনাতন ছাত্রাধ্যাপকের স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। এই একটি গল্প দ্বারা এই কথার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাইখানার নামও ছিল না। এখন যেমন মিউনিসিপাল টাউন মাত্রেই কূপ বা তোলা পাইখানা না করিলে চলে না;—তোমার একাশন বা অর্দ্ধাশন হউক, অন্নাভাবে দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যু আসন্ন হউক,—তাহা কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না;—দেখিয়াও দেখিবে না; তোমার বাড়ীতে যদি পাইখানা না থাকে, কিম্বা কূপ পাইখানা নষ্ট করিয়া তোলা পাইখানা না করিয়া থাক,—তোমাকে নিশ্চয়ই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। পূর্ব্বকালে এ প্রকার সঙ্কট ছিল না। সকলেই ঝোপ, জঙ্গল, বাগান, বা ময়দানে মলত্যাগ করিত। বিশেষতঃ অতি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রাতঃ-শৌচের যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এখন গ্রাম, নগর ও জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তনে সে প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। সে ব্যবস্থা অনেকেই জানেন, তথাপি গল্পকে সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ করিবার জন্য এখানে তাহারও উল্লেখ করিলাম। উল্লেখ করিবার আরও একটি কারণ আছে। সে কারণ এই, যখন লোকের বেশি কাজ থাকে না, তখন তাহার মস্তক হইতে কত প্রকার ফন্দী বাহির হয়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু আর্য্য জাতির ছেলে-খেলাতেও উদ্দেশ্য আছে,—জনসমাজের কুশল কামনা আছে।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আদেশে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া এবং হস্তে জলপাত্র ও স্কন্ধে ধনুঃশর ধারণপূর্ব্বক গ্রামপ্রান্তে গমন করিতেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া আকর্ণ সন্ধানে একটি শরক্ষেপ করিতেন। ঐ শর যত দূর গিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত, সেই স্থানে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তাহাতে মলত্যাগ করিতেন এবং খনিত মৃত্তিকা দ্বারা মল

ঢাকিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ ভারতীয় সকল জাতির আদর্শ; সুতরাং তাঁহাদের অনুকরণে প্রায় সকল জাতিই গ্রাম হইতে দূর প্রদেশে ঐ প্রণালীতে মলত্যাগ করিতেন। এখন তোলা পাইখানা দ্বারা সুসভ্য ইংরাজ-রাজ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করান, প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ঐরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাইতেন—সঙ্গে সঙ্গে কেদার খণ্ডে সারাধান হইয়া যাইত।

আমাদের যে কেমন রোগ, খোষগল্প করিতে গিয়া কত বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। জয়রাম তর্কপঞ্চাননের সময়ে ধনুঃশর স্কন্ধে ধারণ রুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু জনসমাজ হইতে দূরে মলত্যাগের প্রথা রুহিত হয় নাই। ঐ সময়ে একদা প্রাতঃকালে তিনটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জল-পাত্র [illegible] [illegible]ঘাট হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলে[illegible] আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এককজনেই এক[illegible], —উপস্থিত ক্ষেত্রে তিন জনে উপস্থিত হইয়াছেন। শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। তিন জনই প্রাতঃকালীন শৌচোদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন। তিন জনের এক জন পূর্ব্ব পক্ষ, এক জন উত্তর পক্ষ এবং এক জন মধ্যস্থ। ঘোর বিচারের অবতারণা। সকলেই স্ব স্ব গৃহ হইতে অরুণোদয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শুক-পিক-কাকলী শুনিতে শুনিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বিচার চলিতেছে,—আর মৃদুপদসঞ্চালনে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। যখন মাথার উপর চড়্‌চড়ে রৌদ্র লাগিল, তখন ঠাকুর মহাশয়দিগের বাহ্যজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপে অবগত হইলেন,রাণাঘাট হইতে প্রাতঃশৌচোদ্দেশে যাত্রা করিয়া, যগপুর ছাড়াইয়া, তাঁহাদের চাকদায় শুভাগমন হইয়াছে। তখন চাকদার জাহ্নবী স্রোতস্বতী,—সকলে তাড়াতাড়ি গঙ্গাবগাহন করিলেন এবং এক এক গাড়ু গঙ্গাজল লইয়া দিবা দ্বি প্রহরে সোণার চাঁদেরা আপনাপন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। রাণাঘাট হইতে যগপুর আড়াই ক্রোশ এবং চাকদা চারি ক্রোশ, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।

(ক্রমশঃ)

প্লেগ।

একি হ'ল ভয়,
কেহ নাহি রয়,
সোণার সহরে দিদি!
মোরাও পলাই,

কোথায় বা যাই,
কি হ'ল কি হ'ল বিধি!
বোম্বাই হইতে
আইল কেমতে

পোড়া পেলেগ বালাই ?
পড়িল তদন্ত,
হইল সিদ্ধান্ত,
ইঁদুর বাহনে ভাই !
শুনেছ কি কভু,
'দুর ছাড়ি প্রভু,
কোলা বেঙ গলা ফুলা
লইয়া আসিল,
প্রমাদ ঘটিল,
মুখে ছাই একি জ্বালা।
হচ্চে কত হ'বে,
দেখিছ দেখিবে,
পুড়িছ পুড়িবে বোন !
এযে কাল কলি,
সম্ভবে সকলি,
অসম্ভব আছে কোন্ ?
মরি—ক্ষতি নাই,
ধর্ম্ম রক্ষা চাই,
রাখিতে জীবন দিব।
অনেকেত ভাই,
পলাতেছে তাই,
শশব্যস্ত কি বলিব ?
শুনলো বিষম
বলি এই ভ্রম,
বিভু ভুলে নাহি ত্রাণ ;
যাহা কিছু হয়,
জানিহ নিশ্চয়,
আছয় তাহে কল্যাণ॥
দৃঢ় করি চিত্ত,
হইয়া সম্প্রীত,
তিষ্ঠহ আপন গেহে।
যা কিছু মঙ্গল,
হইবে সকল,
ভকতি রাখহ তাঁহে॥

শ্রীন।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতহিতৈষী মহাত্মা ডবলিউ এস কেইন কিলমার্ণক প্রদেশের উদারনৈতিক সভ্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন।

২। উক্ত মহাত্মা কেইনের কন্যা ডরোথি কেইন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি, উপাধি পাইয়াছেন।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ বৎসর নিম্নলিখিত মহিলাগণ বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

এস, পি, মার্সেল	প্রাইবেট
(ফরাসী ও ইংরাজীতে অনর সহিত)	
শিশিরকুমারী বাগচী	বেথুন কলেজ
ডি সৌজা ফ্রান্সেস্কা	ঐ
মার্গারেট গুপ্ত	ডবটন কলেজ
রাইপার এমি	ঐ

৪। দিল্লীবাসী ক্ষত্রিয়েরা সভা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় যে ব্যক্তি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ

করিবে, তাহাকে "একঘরে" করা হইবে। পঞ্জাবীরাও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

৫। স্পেন-মার্কিন যুদ্ধে স্পেনের বার বার পরাজয় হইতেছে। আমেরিকানেরা সেণ্টিয়াগো দুর্গ অধিকার করিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। কিউবা আর স্পেন রক্ষা করিতে পারেন, বোধ হয় না। সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে।

৬। মহীশূরের রাজমাতা এখন রাজ্যের অভিভাবিকা। ইনি স্ত্রীজাতির উন্নতির পক্ষপাতিনী। তাঁহার ব্যবস্থায় সম্প্রতি তত্রত্য মেয়ে হাঁসপাতালে সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণীগণ কম্পাউণ্ডারী কার্য্য শিখিতেছেন।

৭। কেপ কলোনীর আপলো বন্দরে এক উল্কাপিণ্ড পড়িয়াছে; তাহা ১২০ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট চৌড়া। এই উল্কাপাতে ৫০ ফুট গভীর এক গর্ত্ত হইয়াছে।

৮। তুরস্কের সুলতান মক্কাতে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে ৬০ তীর্থযাত্রী বাস করিতে পারিবে। পৃথিবীতে এরূপ বৃহৎ বাটী নাকি আর নাই।

৯। নরওয়ে রাজ্যে নব-বিবাহিত দম্পতী অর্দ্ধ ভাড়ায় রেলপথে ভ্রমণ করিতে পারেন।

১০। গত ৩০এ এপ্রেল বারাকপুরের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকারকে যে ৩ জন গোরা নির্দ্দয়রূপে হত্যা করে, হাইকোর্টের বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের ৭ বৎসর কঠিনশ্রমসহ কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। অপরাধীদের নাম বেঞ্জামিন উইন, আলবার্ট উইক্‌স ও জেম্‌স রিড।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ভূমিকম্প (কাব্য)—শ্রীবিপিন বিহারী ঘটক বিরচিত, ঢাকা বাবুর বাজার বেদব্যাস যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীসারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।৴০ আনা মাত্র। বিগত ভূমিকম্পে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তদবলম্বনে কাব্য-রচিত। বর্ণনা গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব এবং সদুপদেশ আছে

বামারচনা।

রূপ।

রূপ রূপ ক'রে সবে মোহিত ভূতলে।
রে রূপ! তোমার মোহে মোহিত সকলে।
কিবা বাল-যুবা জন, সুকেশ হয়েছে শণ,
তথাপি তোমার মোহে সেও যায় ভুলে,

আরসিতে মুখ দেখে মহা কুতূহলে।
স্বরূপে বলগো রূপ কি রূপ তোমার—
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা কি প্রকার ?
মুগ্ধ হয় নারী নরে, বারেক বিলোকি তোরে,
বাঁধা রহে পরস্পরে শৃঙ্খলে তোমার,
বিরলে মাধুরি হেরি হয় চমৎকার।
রূপসী হলে রমণী, গরবে চলে অমনি,
ধরা সরা জ্ঞান করি হয়গো বিহ্বল,
তবু রূপ ! হও তুমি ধোয়ারের জল।
আমি নাহি ভালবাসি, কাল তারা মৃদু হাসি,
গোলাপের রঙ রূপ ভুবনভুলান,
নিবিড় নব নীরদ সুকেশ এলান।
আমি ভালবাসি রূপ, নাহি যাঁর অনুরূপ,
অনন্ত অক্ষয় রূপ, জগতে অনুপ,'
পার্থিব রূপেতে আমি হই যে বিরূপ॥
হেরিবারে সেই রূপ, হইয়া সদা লোলুপ,
যথার্থ রূপস যেই এ বিশ্বের ভূপ,
জগতে নাহিক কেহ যাঁহার স্বরূপ।
বাল-রবি প্রভাতের, রাঙ্গা শশী শারদের,
জলদে দামিনী রূপ ভালবাসি হায় !
তারকাশালিনী আর অমার নিশায়॥
সুরক্তিম তামরসে, কৃষ্ণ অলি উড়ে বসে,
রূপেতে উন্মত্ত হয়ে কিবা গান গায়,
আঁখি ডুবু ডুবু ওই রূপের আভায়।
তাই বলি রূপ ! তোরে সেই রূপ দেখা মোরে,
নয়ন সফল করে, দেও চিরতরে।
মকর হইয়া থাকি সে রূপ-সাগরে॥

শ্রীনগেন্দ্রবালা দাসী, ছাপরা।

অমৃতময়ি !

অভাগী অমৃতময়ি, বহুদিন আগে
ভাবিতাম মনে তুমি হবে রাজরাণী ;
আজ দেখি ছাইভস্ম মাখা সে সোহাগে,
পিতা মাতা সাজাইয়া দিল ভিখারিণী !
এতোগো ! বিবাহ নহে, কন্যা বলিদান,—
সতিনী,—বিমাতা, তুমি হ'লে আজ হতে,
আহাহা ! পিতার প্রাণ এতই পাষাণ !
একটু করুণা নাহি হ'ল কোন মতে ?
এমন সোণার তরী কর্ম্মনাশা জলে
কে কবে ভাসায়ে দেয়—আপন সন্তানে ?
এ যে কন্যা বলিদান,—বিবাহ কে বলে ?
জীবন্ত মানুষ দিল ঠেলিয়া চিতায় !
বালিকা অমৃত আজ হ'ল হলাহল,
সতিনী বিমাতা বেশে মহা অমঙ্গল !

শ্রীমতী শশিপ্রভা চন্দ।

দুঃখ আবাহন।

হেথায় গাহে না পাখী নড়ে না পল্লব,
নিশীথের অন্ধকার অকূল মাঝারে,
ঘুমায়ে পড়েছে এবে শ্রান্ত এ জগত,
জীবনের কোলাহল মিলায়েছে দূরে।

আয় দুঃখ আয় হেথা এমনি সময়ে,
শ্রান্ত এ মস্তক রাখি তোর বাহুপরে,
একবার এ পরাণ কাঁদিবারে চায়
ঢালিয়া হৃদয় হায়! দীপ্ত অশ্রুধারে।
আয় তুই পদতলে দলিয়া হৃদয়
বসে থাক পাশে মোর চাহি মুখ পানে;
ভাঙ্গা বীণা ক'রে কাঁধে বিষাদ যেথায়,
তোর দীপ্ত দীর্ঘশ্বাস পশুক সেখানে।
শুনে তোর পদধ্বনি ওই দেখ ধীরে
সুখ সে চলিয়া গেল স্বপনের প্রায়,
চির-বিস্মৃতির দূর সমাধি-মাঝারে;
আয় তবে ডাক্ মোরে তোর ও ছায়ায়।
দুখী সে যেমনে চুম্বে মরণের মুখ,
তেমনি আগ্রহভরে হৃদয় আমার
চুম্বন করিতে চাহে তোরে হায় দুখ!
নীরবে শোণিতধারা দিয়া উপহার।
আয় তুই বস পাশে হইয়ে নীরব,
কণ্ঠেতে জড়ায়ে তোর আলিঙ্গন-পাশ।
সারা নিশি শিরোপরে কাঁদিবে পেচক,
আঁধার মোদেরে ঘেরি ফেলিবে নিঃশ্বাস।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

নিদাঘ।

কে তুমিগো বল একবার,—
বসন করিয়া দূর,
লাজ ভয় করি চুর,—
"তাথৈ তাথৈ" রবে নাচ অনিবার।
ও পদ পরশে ধরা,
অনল অনল ভরা,
নাহি যেন সুখ সাধ মরমে কাহার।

কে তুমিগো হাস "খল খল"
তুমি কি শিবের নারী,
দৈত্যকুল-ধ্বংসকারী,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী এমন চপল?
পুনঃ রক্তবীজ সনে,
সমর কি রণাঙ্গনে,
তাহারি শোণিতে হেন উষ্ণ ধরাতল?

কিম্বা কোন বিরহিণী হায়,—
আপন প্রাণের কথা,
গোপন মরম-ব্যথা,
নীরবে লিখিয়া দেছে তোর ও হিয়ায়
তপত নিঃশ্বাস দিয়া,
দেছে পত্র আবরিয়া,—
তাহারি বিষম তাপ ধরণী পোড়ায়?

পাছে তার মরম কথন
জানে জগতের কেহ
তাই কি করিয়া স্নেহ,—
ঢেকেছে বক্ষের ছায়ে করিয়া যতন?
সেই পত্রখানি তার,
দিতে ভবে উপহার,—
কে তুমি অনল মাখি এসেছ এমন?

নগেন্দ্রবালা।

No. 403. August, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬ বর্ষ। ৪০৩ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৫—আগষ্ট, ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মদেশের মৌলমিন নগরে মহারাণীর এক প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় এক ভাস্কর ফটোগ্রাফ অবলম্বনে এই মূর্ত্তি এমন সুন্দররূপে খুদিয়াছে, যে সাহেবেরাও দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কলিকাতায় কবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে?

সৎকার্য্যে দান— জাহাঙ্গিরাবাদের রাজা তাসডক রসুল খাঁ গত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে স্থানীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার এণ্টনি মাকডোনালের কীর্ত্তি স্মরণার্থ স্ত্রী ডাক্তার প্রস্তুত করিবার জন্য মাকডোনাল ফণ্ডে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আমেরিকা আবিষ্কারোৎসব— কলম্বস যদিও আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জ সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন, কিন্তু আমেরিগো ভেস্পুসী নামে এক জন ফ্লোরেন্সবাসী সর্ব্বপ্রথম নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করেন, এই জন্য তাঁহার নামে উহা আমেরিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। গত মে মাসে ফ্লোরেন্স নগরে এই ঘটনা স্মরণার্থ ৫ম শতাব্দীর উৎসব হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ড—আমেরিকার এক স্থানে একটী কুমড়া গাছ ২৩৬ ফিট ভূমি ব্যাপিয়া ছিল, তাহাতে ১৯টী কুমড়া হয়, এক একটী ওজনে ২৬ সের হইতে দেড় মণের উপর।

মৃত্যু—(১) গত ১লা শ্রাবণ হায়দ্রাবাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার আসমান জার মৃত্যু হইয়াছে, ইনি এক জন বড় গুণান্বিত সম্ভ্রান্ত কৃতীপুরুষ ছিলেন। (২) ৩রা শ্রাবণ বোম্বাই পারসী সমাজের নেতা সার জেমসেটজি জি জি ভাই ফুসফুস

রোগে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। (৩) বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইনি একজন উদারহৃদয় দয়াবীর ছিলেন; (৩) কৃতবিদ্য মাজিষ্ট্রেট বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল পরলোকগত হইয়াছেন। (৪) সাংহাইয়ের সিবিল সর্জ্জন ব্রিগেড় সর্জ্জন লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা ইঁহাদের আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং ভারতবাসীদের চরিত্রে ইঁহাদের সদ্‌গুণ সকল সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

যুবরাজের বিপদ—যুবরাজ ব্যারণ রথচাইল্‌ডের প্রাসাদের সোপান হইতে হঠাৎ স্খলিতপদ হন, তাহাতে হাঁটুর মালা ভাঙ্গিয়াছে। ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে শীঘ্র নিরাময় করুন্।

চান্দ্রধনু—গত ৩রা জুলাই বেগমসরাই নামক স্থানে রাত্রিকালে সুন্দর রামধনু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহা চন্দ্রের আভা পড়িয়া হয়।

স্পেন-মার্কিণ যুদ্ধ—সেণ্টিয়াগো ও তাহার নিকটবর্ত্তী ২টী নগর মার্কিণদিগের হস্তগত হইয়াছে। ২২৭৮০ জন স্পেনীয় সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

মূক-বধির বিদ্যালয়—ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি ছোট লাট ষ্টিবেন্স সাহেব ইহার কমিটির সভাপতি ছিলেন, তাঁহার স্থানে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী বোল্‌টন সাহেব মনোনীত হইয়াছেন।

চিনে রাষ্ট্রবিপ্লব—চিনবাসীদিগের মধ্যে এক দল লোক বর্ত্তমান রাজবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনে উৎসুক। তাহাদের উত্তেজনায় চিনবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া রাজকীয় সৈন্যদলকে হারাইয়া দিয়া উচৌ নগরে উপস্থিত হইয়াছে।

নূতন রেলওয়ে—কটক হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা মেদিনীপুর হইয়া আসিবে।

ধনাঢ্যা রমণী—"লেডী রেলম্‌স" নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত ৬টী রমণী পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনাঢ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন :—(১) মাডাম কুসিমো, (২) বিবী গ্রীন, (৩) বর্দে কুট্‌স্, (৪) মাডাম বারিয়াস, (৫) কুমারী গ্যারেট, (৬) মাডাম উলেস্কা। কুসিমের দৈনিক আয় প্রায় ৫ হাজার পাউণ্ড বা ৬০।৭০ হাজার টাকা।

নূতন ভূত—অধ্যাপক রামসে এবং ট্রাভার্স নূতন দুইটী ভূত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের নাম ইউকন ও মেটাঅর্গন।

ঘটার বিবাহ—পঞ্জাবের ফরিদকোটের রাজা একমাত্র কন্যার বিবাহে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১ লক্ষ টাকায় কন্যার জন্য ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করা হইবে।

ভূমিকম্প—গত ২৫এ জুলাই রঙ্গপুরে বার বার ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে। মণিপুর ও আসামের অন্য কোন কোন স্থানেও ঐরূপ হইয়াছে।

দেশী বারিষ্টার—এবার ২৪ জন

ভারতবাসী বারিষ্টার হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৬ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলমান ও ৩ জন পারসী। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের পুত্র মহীমোহন ইহাঁদের মধ্যে একজন।

স্বাধীন মুসলমান রমণী—আফ্রিকার নাইগার নদীর তীরে তুয়ারেগ নামে এক জাতীয় মুসলমান আছে, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা অনাবৃত মুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করে এবং স্বয়ম্বরী হইয়া স্বামী নির্ব্বাচন করে। ইহা সাধারণ মুসলমান প্রথার বিরুদ্ধ। কথিত আছে এক সময় তুয়ারেগ সৈন্যদল শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে, স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। তদবধি পুরুষেরা লজ্জায় মুখাবরণ ধারণ করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়াছে!

দুর্ঘটনা--মেদিনীপুর বন্যায় ১০০ বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে। পেসোয়ারে অগ্নিকাণ্ডে ২১টী হিন্দু দেবমন্দির ভস্মসাৎ হইয়াছে।

রাজকীয় ভ্রমণ—জর্ম্মণ সম্রাট সাড়ম্বরে খৃষ্টীয় তীর্থস্থান জরুজিলম দর্শন করিতে আসিতেছেন, তথায় একটী গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিবেন।

কাফিরিস্তান।

কাবুলের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ অবস্থিত, উহা কাফিরিস্তান নামে বিদিত। তথাকার অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, তজ্জন্য মুসলমানগণ তাহাদিগকে কাফির বলিয়া থাকে। এই কারণেই এই স্থানের নাম কাফিরিস্তান হইয়াছে এবং এই দেশবাসিগণকে সকলেই কাফির বলিয়া থাকে। ইহাদিগের আর একটী নাম "সিয়াপোশ্"। "সিয়াপোশ্" শব্দের অর্থ, কৃষ্ণবস্ত্র। কাল ছাগলের চামড়ার গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহারা "সিয়াপোশ্" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন ইয়োরোপবাসী কাফিরিস্তানে কুত্রাপি প্রবেশ করেন নাই। মুসলমানগণও এই প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। আফগানিস্থাননিবাসী মুসলমানগণ অন্ততঃ এক জন কাফিরকেও হত্যা করা জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম কার্য্য মনে করেন। কাফিরদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে অন্ততঃ এক জন মুসলমানকে বধ করিতে না পারিলে জীবন গৌরবান্বিত হয় না। কাফিরদিগের মধ্যে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে এক দরিদ্র কাফির এক জন ধনী মুসলমানের নিকট তাহার পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিল। তনয় মুসলমানের অধীন হইল, কিন্তু মুসলমান-বিদ্বেষ হৃদয় হইতে

দূর করিতে সক্ষম হইল না। সে এক-দিন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া অল্পকাল মধ্যে চৌদ্দ জন মুসলমানের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া কাফিরি-স্তানস্থ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

জনপ্রবাদ আছে যে কাফিরগণ ইউরোপীয়গণের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং নীল চক্ষু বিশিষ্ট। কিন্তু এ প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতিগণের যেরূপ বর্ণ ও আকৃতি হইয়া থাকে, কাফিরগণও সেইরূপ বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদিগের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা বলবান্, সাহসী, আমোদ-প্রমোদ-নিরত। ইহাদিগের মধ্যে মদ্য-পান বহুলরূপে প্রচলিত। পূর্ব্বকালে এক সময়ে ইহারা জল পান না করিয়া কেবল মদ্যই পান করিত। প্রত্যেক কাফিরের গলদেশে একটী চামড়ার থলি লম্বমান আছে; উহা সর্ব্বদাই মদ্যে পূর্ণ থাকে। কাফিরদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে অদ্যাবধি এই প্রথা প্রচলিত আছে যে যে পর্য্যন্ত না এক জন কাফির পুরুষ একজন মুসলমানকে হত্যা করিবে, তদ-বধি তাহার বিবাহ করিবার অধিকার জন্মিবে না।

কাফিরদিগের সাহস অতুল। তিন চারি জন কাফির একত্রিত হইয়া মুসলমানের রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা-দিগের দুর্গ হইতে বন্দুক বা বারুদ অপহরণ করিয়া আনে, এবং প্রায়ই শত্রুপক্ষীয় দুই চারি জন লোককে হত্যা করিয়া স্বদেশে নিরাপদে প্রত্যাগমন করে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

কাফির মহিলাগণ সুন্দরী বলিয়া খ্যাত, এই জন্য আফগানিস্তানের ধনী মুসলমান-গণ কাফির মহিলা বিবাহ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন।

কাফিরগণ পৌত্তলিক। তাহারা কতকগুলি দেব দেবীর পূজা করে। দেবতার সম্মুখে সঙ্গীত, নৃত্য, ও বলিদান করা হয়। ভোজও তাহাদিগের ধর্ম্মোৎ-সবের একটী প্রধান অঙ্গ। দেবতার সম্মুখে যে নৃত্যাদি হয়, তাহাতে স্ত্রী-লোকেরা যোগ দিতে অধিকারী নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বা দেবীর সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নৃত্য হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর হইল আফগানিস্তানের আমীর কাফিরস্তান আক্রমণ করেন। কিম্বদন্তী আছে যে তিনি ১৬ হাজার কাফির পুরুষ ও স্ত্রীকে বন্দী করিয়া কাবুলে লইয়া যান। আমীরের এই বিজয় ঘটনা লইয়া একখানি পুস্তক রচিত হইয়াছে। কাফিরদিগের বল বিক্রম কত, সীমান্ত যুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও সময় সময় তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন।

সদুপদেশ ও সার বাক্য।

(গত প্রকাশিতের পর)

২১। দুইটী ব্যক্তি আছেন, তন্মধ্যে একের সম্পত্তি অল্প, কিন্তু তদপেক্ষা আরও অল্প হইলেও তিনি সন্তোষ অনুভব করেন; অপরটির বিপুল সম্পত্তি আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্তোষ নাই, আরও কিসে তাহা বাড়িবে সর্ব্বদাই এই চেষ্টা। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ধনী।

২২। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও অমূলক সংস্কারের ভিত্তি ধীরে ধীরে শিথিল হইতে থাকে।

২৩। লোকে ধর্ম্ম বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করিবে, ধর্ম্মমত সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ প্রকাশ করিবে ও বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মোহিত করিবে, ধর্ম্ম প্রচার জন্য ঘোরতর আন্দোলন করিয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করিবে, এবং আরও নানা কাণ্ড করিবে, কিন্তু সার বিষয় যাহা—অর্থাৎ ধর্ম্মজীবন যাপন করা, তাহার প্রতি মনোযোগী হইবে না। কি ভ্রম! কি পরিতাপ!

২৪। বিলাসিতা যতটুকু সুখ প্রদান করে, তদপেক্ষা অধিক সুখ হরণ করে।

২৫। সতর্কতার সহিত সহজে ভয় মিশ্রিত হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি সতর্ক হয়েন, কিন্তু ভীত হয়েন না।

২৬। প্রত্যেক মানুষ আপনার বিপদকেই অন্য লোকদের বিপদ অপেক্ষা গুরুতর মনে করে।

২৭। বৃদ্ধের মন অতীতের এবং যুবার মন ভবিষ্যতের উপর সদাই নিপতিত।

২৮। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—দুশ্চিন্তার বিরাম ও উদ্বেলিত হৃদয়ের আরাম।

২৯। প্রখর বুদ্ধি অথবা তেজস্বী মানসিক বৃত্তির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি, কিন্তু হৃদয়ের বিকশিত সদ্ভাবগুলির সহিত কি মানসিক বৃত্তির তুলনা হইতে পারে?

৩০। যাহারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কখনও মানব সমাজে নিম্নস্থান অধিকার করিতে হয় না।

৩১। শত্রুর প্রতি সদয় হও, তাহা হইলে আর সে তোমার শত্রু থাকিবে না।

৩২। যে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, সে তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনিও শাস্তি ভোগ করে। ঘৃণার সহিত মানসিক বিকট যন্ত্রণা কি সূক্ষ্ম ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে!

৩৩। যে সকল লোক মস্তিষ্ক চালনা করে, তাহাদের প্রত্যেকেরই যে মস্তিষ্ক আছে ইহা মনে করা ভ্রম।

৩৪। আত্মশাসন অর্থাৎ মনের উপর ন্যায় ও ধর্ম্মের শাসন যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনিই মানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩৫। অধ্যবসায় সহিষ্ণুতার ভগিনী,

একনিষ্ঠার কন্যা, শান্তির বন্ধু এবং বন্ধুতার বন্ধন।

৩৬। যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, তাহাকে অন্যের অনুগ্রহের ভিখারী হইতে হয় না।

৩৭। যিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে তিনি এক মহাশত্রুকে জয় করিয়াছেন।

৩৮। অবিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে গিয়া দেখিও যেন নাস্তিকতা ও ধর্ম্মহীনতা দোষে দূষিত হইও না।

৩৯। ঝটিকার সম্মুখে ফুৎকার দেওয়ার ন্যায় ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সদ্‌যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা বিফল।

৪০। গ্রন্থাধ্যয়নের একটী কার্য্য-কারিতা এই যে উহা বিপদের ভার লাঘব করে এবং সম্পদের সুখ দ্বিগুণিত করে।

চীনদেশের কতকগুলি অদ্ভুত রীতি।

কোনও পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চীন ভদ্র লোক আপনার হাত দুখানি নাড়িতে থাকেন, তৎপরে হস্ত দ্বারা মস্তক আবৃত করেন। বন্ধুর সহিত বন্ধুর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর স্কন্ধ-ঘর্ষণ দ্বারা প্রণয়সূচক অভিবাদন করা হয়।

গৃহে সমাগত বন্ধুকে যদি আহার করাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে আহার করিবার জন্য কোন অনুরোধ করেন না, কিন্তু যদি তাঁহাকে আহার করাইবার অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে বলেন,—"আজ অনুগ্রহ করিয়া আমার আলয়ে আহার করিবেন না কি ?" সমাগত বন্ধু এই প্রশ্ন শুনিলেই বন্ধুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

যাঁহার অন্ততঃ একটীমাত্রও পুত্র আছে চীন দেশে তাঁহাকে লোকে বিনা আপত্তিতে ঋণ দান করেন, কিন্তু যাঁহার কেবলই কন্যা আছে তাঁহাকে কেহই ঋণ দেয় না। চীন দেশের আইনানুসারে পিতা ঋণগ্রস্ত হইলে কেবল পুত্রই যে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য তাহা নহে, প্রপৌত্র ও তস্য পুত্র পর্য্যন্ত ঐ বাধ্যতায় আবদ্ধ।

শত্রুর মৃত্যু কামনা করিলে চীন দেশীয় লোক শত্রুর দ্বারদেশে গমন করিয়া তথায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে যে কেবল শত্রু মরিবে তাহা নহে, তাহার পরিবারস্থ সকলেই কাল-সদনে নীত হইবে।

চীনদেশে ধনী ব্যক্তির ভৃত্যগণ বেতন প্রাপ্ত হয় না—বক্‌সিস্ প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যের জন্যই প্রভু স্বেচ্ছাক্রমে বক্‌সিস্ দিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে যুবতী মহিলাগণের মধ্যে যিনি রূপে গুণে ও পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, তিনিই সমাজের অধিনেত্রী পদে বরণীয়া—কিন্তু চীনদেশে রূপ গুণ ও পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী-কেই ঐ পদে বরণ করা হয়।

বয়স্ক ব্যক্তিগণই চীনদেশে ঘুঁড়ি উড়ান ও গোলা খেলায় প্রবৃত্ত হয়েন, বালক ও যুবকগণ কেবল তাহা দর্শন করেন।

চীনবাসীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা এই যে যে সিন্দুকে তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা যেন অতি সুন্দর হয় এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়।

যদি কোন চীনবাসী কোন বন্ধু বা পরিচিত লোকের নিকট হইতে উপহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে একটী অল্প মূল্যের উপহার পাঠাইয়া দেন। চীনদেশের প্রথা এই যে যে মূল্যের উপহার পাওয়া যাইবে, তৎপ্রদাতাকে তদপেক্ষা অধিক মূল্যের উপহার পাঠাইতে হইবে।

ইয়োরোপীয় প্রদেশ সমূহে মহিলাগণ হাতপাখা ব্যবহার করেন, পুরুষগণ করেন না। চীনদেশে বিপরীত নিয়ম।

ইয়োরোপীয় ভদ্র পুরুষগণ ছড়ি হাতে করিয়া পথভ্রমণে বাহির হয়েন, কিন্তু চীনদেশে মহিলাগণের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত।

যে সকল অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পরিচয় থাকে, তাহাদিগের মধ্যে চীনদেশে বিবাহ হয় না। পাত্র ও পাত্রী সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের নিকট অপরিচিত না হইলে বিবাহ সিদ্ধ নহে। এই জন্য চীনদেশে বরকন্যা প্রায় কখনই এক নগর বা গ্রামের হয় না।

বিবাহের পূর্ব্বে তিন দিন মাত্র বর ও কন্যা পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিতে পারেন।

বর্ণিয়া।

(গত প্রকাশিতের পর)

বর্ণিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া নগর দর্শন করিতে করিতে যাইতেছিল—এমন সময় সম্মুখে এক প্রকাণ্ড জলছত্র দেখিতে পাইল। সেই জলছত্রের পশ্চাৎ-ভাগে বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ। রৌপ্যজড়িত তরু গাত্রে লেখা রহিয়াছে "সংযুক্তার জলছত্র।" বর্ণিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল স্বামিন্, এ সংযুক্তা কে?

অমর মৃদুস্বরে কহিলেন "পরে জানিবে।"

শিবিকা একটী বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল, বর্ণিয়া দেখিল বিদ্যালয়ের উপর লেখা রহিয়াছে "সংযুক্তা স্কুল"।

তাহার পর শিবিকা যথাস্থানে গিয়া পঁহুছিল। দাসীরা আসিয়া বহু সমাদর-সহকারে বর্ণিয়াকে দ্বিতল গৃহে লইয়া গেল।

অমর বর্ণিয়ার বাটীতে সাবধানে কুলুপ লাগাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বর্ণিয়া যে বাড়ীতে রহিল, তাহার সম্মুখেই ত্রিতল দালান সমলঙ্কৃত আর একটী বাড়ী। অমর তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে দ্বিতল গৃহে মলিনাঞ্চল বিছাইয়া এক রমণী শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। অমর তথায় গিয়া আদরের সহিত তাহাকে তুলিলেন এবং অশ্রুজল মুছাইয়া কহিলেন "সংযুক্তা ! এখন কেমন আছ ? আমি আসিয়াছি।" অমরের প্রতি চাহিয়া সংযুক্তা আর্ত্তস্বরে কহিল "তুমি বর্ণিয়াকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছ। বর্ণিয়াই আমার শত্রু।"

অমর—হাঁ বিবাহ করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু বর্ণিয়া কখনও তোমার শত্রু নহে। সংযুক্তা, তুমিই আমার প্রথমা স্ত্রী, আমি এখনও তোমাকে ভাল বাসি, তুমি দুঃখ ভুলিয়া যাও। আমার ত সবই তোমার —বর্ণিয়াকেও তোমাকে দিলাম।

সংযুক্তা—আমি ধন রত্ন চাই না। তুমি আমার হও। তোমাকে না পাইয়া তোমার ধনে আমি কখন সুখী হই নাই।

অমর তখন আর সংযুক্তার সহিত অধিক বাক্যালাপ না করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি বহু দিন বিষয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আজ স্থির হইয়া বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর এই অপ্রীতিকর ব্যবহারে সংযুক্তার হৃদয়ে বিষ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। নিজের সুখের, পথ নিজেই পরিষ্কার করিবে বলিয়া সংযুক্তা একজন দাসী সমভিব্যাহারে শিবিকা যোগে বর্ণিয়ার বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলে, দাসী তালা ভাঙ্গিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিল।

তখন সন্ধ্যার অন্তিম সময়, ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার আসিয়া সমস্ত দিক্ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। সেই সময় সংযুক্তা মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর্ণিয়ার নিকট উপস্থিত।

বর্ণিয়া তখন স্বামীর জন্য বেল ফুলের মালা গাঁথিতেছিল।

বিষাক্ত স্বরে সংযুক্তা ডাকিল "বর্ণিয়া"। বর্ণিয়া ব্যাকুল চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বহু দিন পরে সংযুক্তাকে দেখিয়া আহ্লাদ গদগদ চিত্তে সংযুক্তাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিল। বর্ণিয়াকে তদবস্থায় দেখিয়া সংযুক্তা তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া গেল। বর্ণিয়া অবাক্ হইয়া কহিল "সংযুক্তা, সখি ভগিনি! তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে ?"

সংযুক্তা ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া

কহিল "বর্ণিয়া তুই আমার শত্রু, তুই আমার স্বামি-হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছিস। তোর জন্যই আমি আমার দেবতুল্য স্বামীর স্বর্গীয় ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়াছি। তুই দূর হ তোকে দূর করিব বলিয়া আমি এখানে আসিয়াছি।"

বিষম বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে বর্ণিয়া কহিল "সংযুক্তা, কে তোমার স্বামী?"

সংযুক্তা—যিনি শ্যাম লতামণ্ডপে তোকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই আমার স্বামী —অমরতুল্য অমর। পাপিষ্ঠা তোকে দেখিয়াই তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন। বর্ণিয়া তুই চিরকালই আমার শত্রুতা সাধন করিলি। প্রথমে সেই শৈশবের কুসুম নগরীতে বনমাঝে কুসুম ক্রীড়া করিতে করিতে আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হই প্রথমে তিনি আমাকেই ভালবাসিয়াছিলেন। সেই সব ফুলবনে কুসুমস্তবকে উপবেশন করিয়া তাঁহার সঙ্গে কত মধুর আলাপ করিতাম, তাহার পরেই তুই রাক্ষসী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলি। তিনি পরম দয়ালু, তোর দুঃখে দুঃখিত হইলেন। জানি না তুই কোনও মন্ত্রে বশ করিয়াছিলি কি না, কারণ তিনি তোর রূপেও মুগ্ধ হইলেন। আমাকেও তিনি যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু সে প্রকৃত প্রেম আমি হারাইলাম। তাহার পর ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তোকে দেশত্যাগী করিয়া দিলাম। তুই দেশ হইতে চলিয়া গেলে আমাকেই তিনি বিবাহ করিলেন; আপনার দেশে লইয়া আসিলেন, অনেক রত্ন অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন; বহু দাস ও দাসীর কর্ত্রী করিয়া দিলেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে তিনি এত বড় ধনী লোক। কিন্তু রাক্ষসী তুই আমার সব সুখ নষ্ট করিলি, আমি আর কখনও তাঁহার প্রকৃত প্রণয়াদর লাভ করিতে পারিলাম না। তোর অনুসন্ধানেই তিনি অধিক সময় দিতেন। আমার গুপ্ত চরও তোর অনুসন্ধানে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষে পড়িবার পূর্ব্বেই তুই তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিলি, তাই তোর প্রাণ সে বার রক্ষা পাইয়াছে।

আমি যে লতামণ্ডপে শত পরিচারিকা ও সহচরীদের সঙ্গে খেলা করিয়াছি, সেই লতামণ্ডপেই তোর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তুই জানিস্ কার অনুমতি-ক্রমে দাসীরা তোকে চুরি করিয়া বিষ-মিশ্রিত সরবৎ খাইতে দিয়াছিল? পাহারা-ওয়ালারা কার অর্থে বশীভূত হইয়া দাসী-দিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল? স্বামীর অসীম বল, অদম্য সাহস, অপ্রতিহত বেগ এবং অসাধারণ প্রতিভার জন্যই তখন তোর প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। আমি আজ রাক্ষসী তোর জন্য আমার মনের সমুদয় মহত্ব হারাইয়াছি। এই দেখ আমি আপনি খাইব বলিয়া যে বিষ রাখিয়াছিলাম, তাই তোর জন্য আনিয়াছি। এই নে, এই বিষ খাইয়া মর। আমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য সম্পদ্ ভোগ করি।

মন্ত্রৌষধিমুগ্ধার ন্যায় বর্ণিয়া বিষের কৌটা হাতে করিয়া কহিল "সংযুক্তা,

আমি যদি জানিতাম যে তিনি তোমার স্বামী, তবে তাঁহাকে কখনও বিবাহ করিতাম না।" সংযুক্তা আরক্তলোচনে বর্ণিয়ার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

তখন রাত্রি ৮টা মাত্র। বর্ণিয়া পরিচারিকাদিগকে বিদায় দিয়া আপন ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল:—

তিনি সংযুক্তাকে নিরাশ করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, এটা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যথার্থই আমি সংযুক্তার শত্রু। এমন দেবতুল্য স্বামীর ভালবাসা এবং বিমল সংসার সুখ ভোগ করিতে যাহার জন্য বাধা পড়ে, সে শত্রু বই কি! তবে কি আমি মরিলেই সংযুক্তা সুখী হয়। হাঁ তা বই কি? আমি মরিলেই সে সুখী, আমি না থাকিলেই সে এ স্বর্গসুখের অধিকারিণী হয়। তবে এই বিষ খাইয়া মরি, পরের জন্য মরাই ত সুখকর। আগে স্বামীকে একবার দেখি, না না! তাহা হইলে সংযুক্তার অসুখ বৃদ্ধি হইবে, এখনি মরি। বর্ণিয়া তখন জলের সহিত বিষ গুলিয়া পান করিল। তারপর বর্ণিয়া চুলের বেণী বাঁধিয়া ফুলের মালা পরিয়া জানালার কাছে জ্যোৎস্নালোকে শয়ন করিয়া মহানিদ্রার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে অমর বিষয়কর্ম্ম শেষ করিয়া রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় পাগলের ন্যায় বর্ণিয়ার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুক্ত জানালায় জ্যোৎস্নালোকে বর্ণিয়ার নবীন রূপ জ্বলিতেছে। তাহার শিয়রেই উন্মুক্ত বিষের কৌটা রহিয়াছে। অমর বর্ণিয়াকে কোলে করিয়া অধীর ও সন্তপ্ত হৃদয়ে "বর্ণিয়া বর্ণিয়া" বলিয়া কত ডাকিলেন। হায়! বর্ণিয়া কি আর এ সংসারে আছে! বর্ণিয়া তখন মহানিদ্রায় নিদ্রিত। অমর বুঝিলেন সব ফুরাইল ফোটো ফোটো কুসুম-কলিকা বসন্তপ্রারম্ভেই বিশুষ্ক হইল।

যে মুহূর্ত্তে অমর শুনিয়াছিলেন সংযুক্তা তালা ভাঙ্গিয়া বর্ণিয়ার গৃহে গিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে যে বিষম বিপদাশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অধীর হইলেন। বর্ণিয়া আর এ সংসারে নাই, তাঁহার জন্যই তাহার পবিত্র প্রাণ বিনষ্ট হইল, চিরদুঃখিনী কখনও সুখের মুখ দেখিতে পাইল না, অমর অশ্রুজলে বর্ণিয়াকে সিক্ত করিয়া কহিলেন "আহা! বর্ণিয়া, তুমি একবার ওঠ, উঠিয়া দেখ তোমার স্বামী তোমার জন্য কত অধীর।"

আজ অমরের নিকট সমুদায় সংসার বিষবৎ হইল। তিনি প্রিয়তমার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বিষের অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং পান করিলেন। এইরূপে তাঁহার বিষম কর্ম্মের পরিণাম ফল ফলিল।

পর দিন বেলা ৯টার সময় এক অজানা আশঙ্কায় সংযুক্তার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সংযুক্তা বিনা দাসী বিনা শিবিকায় বর্ণিয়ার গৃহাভিমুখে ছুটিল। বর্ণিয়ার গৃহ আজ বিষাদ-কালিমাময়। সংযুক্তা বর্ণিয়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল নিজের সর্ব্বনাশ

নিজেই করিয়াছে। কুসুমাকীর্ণ শয্যোপরি স্খলিত চন্দ্রের ন্যায় অমর দেব পড়িয়া আছেন, তাহার কোলের ভিতর ছিন্ন স্বর্ণলতিকার ন্যায় বর্ণিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উভয়েই চির নিদ্রায় নিদ্রিত। সেই মুহূর্ত্তেই সংযুক্তার পূর্ব্ব জ্ঞানের উদয় হইল। তাহা হইতে যে এ বিষম শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহা তাহার বিলক্ষণ বোধগম্য হইল। তখন সে আক্ষেপ করিতে লাগিল যে সে কেন বর্ণিয়াকে লইয়া স্বামিসহ সুখে সংসার করিতে পারিল না। বর্ণিয়া তাহার একান্ত অনুগতা ছিল, মরণেও মহা আনুগত্য প্রকাশ করিয়া গেল। হায়! তখন অনুতাপে বিদগ্ধ হৃদয় লইয়া সংযুক্তা স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিল। তাহার পর দুঃখিনী বর্ণিয়াকে কোলে করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে কহিল "বর্ণিয়া, ভগিনি সরলে! যাহাকে প্রাণ সঁপিয়াছিলে তাহাকে লইয়াই স্বর্গে চলিলে। যাও ভগিনি! আর আমি তোমার সুখে বাধা দিব না। বর্ণিয়া তুমি সোণার প্রতিমা, সোণার রথে স্বর্গে গেলে! যাও ভগিনি! আর আমি তোমার সুখে বাধা দিব না।"

সংযুক্তা বর্ণিয়াকে পুনরায় স্বামীর কোলে রাখিয়া কহিল "এস কুসুম নগরীর প্রতিবেশিগণ! তোমরা এস, দেখিয়া যাও কে ভাল—সংযুক্তা না বর্ণিয়া? কে দেবী, কে রাক্ষসী? সংযুক্তা আঁচলে বর্ণিয়ার মুখ মুছাইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিল :—

বর্ণিয়া, তুমিই ভাল, তুমিই ভাল।
ওহো বর্ণিয়া! বর্ণিয়া!

এইরূপে সংযুক্তার অদৃষ্টের বিষম ফল ফলিল। দুর্ভাগ্য ভারতে এইরূপ স্বামীর দোষে কত দেবী রাক্ষসী হয়, কত কুসুম কোমল প্রাণ বিনষ্ট হয়, কত মহাসুখী প্রাণ অসুখী হয়, তাহার সীমাপরিসীমা নাই।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয়।

ডাক্তার মেক্লাউড স্কট্লণ্ডের এক জন খ্যাতনামা ধর্ম্মযাজক ও গ্রন্থকার। মহাত্মা অধ্যাপক ব্লাকির সহিত তাঁহার গভীর প্রণয় ছিল। ব্লাকির ন্যায় উচ্চ-হৃদয় ব্যক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিলাতবাসী কোন কোন শিক্ষিত হিন্দু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার জীবনের সকল তথ্য জানিয়া তাঁহাকে ঋষি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক ব্লাকি মধ্যে মধ্যে ডাক্তার মাক্লাউডের গ্লাসগো নগরস্থ ভবনে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন। ডাক্তার মাক্লাউড লিখিয়াছেন, এক দিন রাত্রে ব্লাকি ও আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে ব্লাকি বলিলেন "দেখ,

আমার আর 'যে দোষ থাকুক না কেন, আড়ম্বর-প্রিয়তা দোষে আমি দোষী নহি।" আমি মুখে এমনি ভাব প্রকাশ করিলাম যেন ব্লাকির কথাটী আমার কাছে অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্লাকি তাহাই ঠিক্ বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে না? আচ্ছা, আমার আড়ম্বর-প্রিয়তার একটাও প্রমাণ দেও দেখি'। আমি বলিলাম "দিবারাত্রি তুমি ঐ সুন্দর রঙচঙে গাত্রাবরণটী গায়ে ফেলে বেড়াও কেন?" এই কথা শুনিয়া ব্লাকির মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি বলিতে লাগিলেন;—দেখ, সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন বড় গরিব ছিলাম, ভাল খেতে, ভাল পর্‌তেত পেতামই না, অনেক দিন ছিন্ন বস্ত্রে রাজপথে বাহির হইতে হইত। আমার উপরের কোটটী বড় ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমি তাতে বড় ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। এক দিন আমার স্ত্রী কোটের ছিন্ন স্থান সমস্ত আমাকে দেখাইয়া একটা নূতন কোট শীঘ্র কিনিতে বলিলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখাইলাম দুই চারি মাসের মধ্যে নূতন কোট কিনিবার উপযুক্ত টাকা পাওয়া যাইবে না। ইহা শুনিয়া আমার স্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং সুন্দর শালখানি আনিয়া আমার স্কন্ধদেশে লম্বমান করাইয়া দিলেন। সে সময় প্রেমে ও কৃতজ্ঞতারসে আমার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। জীবনের সেই সুধাময় শুভ ঘটনাটীর স্মৃতি রক্ষার জন্য সেই অবধি আমি আমার স্ত্রীর প্রদত্ত শালখানির অনুরূপ শাল অনুক্ষণ আমার স্কন্ধোপরি ফেলিয়া রাখি।"

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ডাক্তার ম্যাক্‌লাউডের চক্ষু অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল। অধ্যাপক ব্লাকির পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের এই পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। ইয়োরোপ খণ্ডে চারি সহস্র দুইশত প্রকারের পুষ্প উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কেবল চারিশত কুড়ি প্রকারের ফুল সুগন্ধযুক্ত। এক হাজার এক শত চুয়ানব্বই জাতীয় ফুলের বর্ণ শ্বেত; নয় শত প্রকার জাতীয় ফুল পীতবর্ণ; লালবর্ণ ফুলের সংখ্যা আট শত তেইশ; পাঁচ শত চুয়ানব্বই নীলবর্ণ এবং তিন শত আট প্রকার ফুল ধূমল বর্ণ বিশিষ্ট।

২। আমেজন নদীর উপকূলে তাল-জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। উহার পত্র দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ১২ ফিট পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহা

অপেক্ষা বৃহত্তর পত্র অন্য কোন প্রদেশের অন্য কোন বৃক্ষে দেখা যায় না।

৩। বহুসংখ্যক শরীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের সিদ্ধান্ত এই যে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত একটী বিশ্বাস আছে যে মানবের পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণার ন্যায় শারীরিক ক্লেশ আর দ্বিতীয় নাই; তাহার মূলে সত্য নাই। যে কারণেই মৃত্যু হউক না কেন, প্রকৃত মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ সংজ্ঞাশূন্য হয়, সুতরাং তাহার কষ্টানুভব শক্তি বিলুপ্ত হয়।

৪। পক্ষী ও পতঙ্গ কত বেগে উড়িতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য কিছু কাল হইল একটী যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে মক্ষিকারা সকল জাতীয় পক্ষী অপেক্ষা দ্রুততর বেগে উড়িতে পারে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে একটী মক্ষিকা ২৫ ফিট উড়িয়া যাইতে পারে। ভীত হইলে মক্ষিকা এক সেকেণ্ডের মধ্যে ১৬০ ফিট পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। সকল পক্ষীর মধ্যে ইংলণ্ডের সোয়ালো নামক পক্ষী অতীব দ্রুতগামী। কিন্তু দেখা গিয়াছে সোয়ালো পক্ষী মক্ষিকার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াও তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

৫। মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সমান ভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় না। জন্মসময় হইতে প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যে মস্তক ও গ্রীবা দ্বিগুণ, শরীরের মধ্যভাগ ত্রিগুণ, হস্তদ্বয় চতুর্গুণ এবং পদদ্বয় পঞ্চগুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহাদিগের সকলের পরিবর্দ্ধনের গতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা, হস্তদ্বয় পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই দ্বিগুণ হয় এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় ত্রিগুণ হয়; তিন বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বেই পদদ্বয় দ্বিগুণ হয় এবং দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বেই চতুর্গুণ হয়।

৬। পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলস্থ স্থল সমূহ পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম প্রদেশ। তথায় জুলাই ও আগষ্ট মাসে চল্লিশ দিবস কাল ভয়ানক গ্রীষ্ম হয়। এই সময়ে তাপমান যন্ত্রে পারদ ১৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং রাত্রির শীতলতম সময়েও ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামে না। উক্ত প্রদেশে ঐ প্রকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ে কূপ মাত্রেরই জল শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু অনুপম প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঐ সময়ে ঐ প্রদেশে পারস্য উপসাগরের মধ্য হইতে অসংখ্য ফোয়ারার আকারে লবণশূন্য নির্ম্মল শীতল জলরাশি নির্গত হইতে থাকে। অসংখ্য ডুবুরী উপসাগরের তলদেশে নামিয়া ফোয়ারার উৎপত্তি স্থান হইতে এমনি কৌশলে উহা হইতে জল সংগ্রহ করে যে ঐ জল সাগরের লবণাক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইতে পারে না।

৭। পৃথিবীর প্রায় অৰ্দ্ধেক অধিবাসী অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

৮। ৭৫০ প্রকারের গোলাপ জাতীয় পুষ্প দেখা গিয়া থাকে।

৯। ইয়োরোপ খণ্ডের সমস্ত প্রদেশের

মধ্যে স্কটলণ্ডে সূর্য্যালোক সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দিন, এবং স্পেনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন পাওয়া যায়।

১০। বধির ও মূকদিগকে ভাষা শিক্ষা দিবার যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সহায়তায় ইয়োরোপ খণ্ডের অনেক মূক ও বধির আপনাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতে সক্ষম হইতেছে। তথাকার নানা স্থানের মূকগণ সভা সমিতি করিয়া আপনাদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সমুন্নত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মুক্তি-ফৌজ নামক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় একটী বধির ও মূকের দল করিয়াছেন। উহারা সপ্তাহে চারিবার একত্রিত হইয়া বাদানুবাদ দ্বারা আপনাদিগের উন্নতিসাধনের কার্য্যপ্রণালী স্থির করে।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু সতীর মনের বল।

ইছামতী নদী বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। পদ্মা হইতে নির্গত হইয়া নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা ও বাদা বনের অনেক ভূমি জলসিক্ত করিয়া বঙ্গীয় সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। উহার প্রসিদ্ধির আর একটী কারণ আছে। তাদৃশী নক্রভীষণা নদী ভারতে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ইছামতীর বক্রতা, নক্রশীলতার যেমন একটী কারণ,—উহাতে পূর্ব্বকালে নৌকার তাদৃশী গতাগতির অভাবও অন্য একটী কারণ। কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ নদীতে কুম্ভীরের যেরূপ উৎপাত ছিল, এখন সেরূপ নাই। আমি কোন সময়ে ইছামতীর তীরবাসী কোন কৃষককে উহাতে কুম্ভীরের উৎপাত কমিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিয়াছিল,—

"ইছামতীতে এখন আর সে কেলে তাওড় নেই, আর এখন লাহুনির কাজ বেড়েছে।" যে যে স্থলে নদনদী অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকিয়া যায়, সেই সকল স্থলে অধিক স্রোত থাকে না, এ জন্য তথায় কুম্ভীর সকল নিরাপদে বাস করিতে পারে। তাহাই ত্যাওড়। নৌকার গতাগতিকে 'লাহুনীর কাজ' বলে। উহাও কুম্ভীরের ভীতিজনক। স্রোতচালিত বালুকা দ্বারা পুরাতন বক্রতার বিলোপ ও নূতন বক্রতার সৃষ্টি অসম্ভব নহে। ঐ দুইটী কারণে এখন ইছামতী নদীতে তাদৃশ কুম্ভীরের উৎপাত নাই।

যখন ইছামতী নদী নিরতিশয় নক্র-ভীষণা ছিল,—তখন তত্তীরবর্ত্তী প্রতি গৃহস্থের এক একটী ঘেরা ঘাট থাকিত;—প্রায় প্রতি দিনই প্রতি ঘাটে দুই একটী মনুষ্য ও গো-বৎস কুম্ভীরের কবলে পতিত হইত। আমরা সেই সময়কার একটী হিন্দু সতীর গল্প করিব। ঐ সময়ে

কখনও কখনও এমন ঘটনাও হইত—ঘেরা ঘাটের মধ্যে কুম্ভীর আসিয়া লুকাইয়া থাকিত;—প্রথমে যে সকল স্ত্রী পুরুষ অবগাহনার্থ ঐ ঘাটে অবতরণ করিত, তন্মধ্য হইতে এক জনকে মুখে করিয়া ঘাটের বেড়া উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কুম্ভীর পলায়ন করিত। এ জন্য প্রথম অবগাহনার্থীদিগকে ঘেরা ঘাটের জলে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ, বা যষ্ট্যাদির আঘাত করিয়া তবে জলে নামিতে হইত। যখন ইছামতীর এতাদৃশী ভয়ঙ্করী অবস্থা, তখন তত্তীরবর্ত্তী বারাকপুর গ্রাম নিবাসিনী একটী প্রৌঢ়া রমণী আঘাটায় স্নান করিতেন এবং জলে বসিয়া প্রতিদিন পূজাহ্নিক করিতেন। তাঁহার "শুচিবাই" ছিল, পাছে অন্যের জলস্পর্শ হয়, এ জন্য প্রাণান্তেও ঘেরা ঘাটে যাইতেন না। শুচিতা ও সদাচারের আধিক্যকে লোকে "শুচিবাই" বলে। উহা এখনও অনেক স্ত্রাতে,—কোনও কোনও পুরুষেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়া জিলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে,—যাহা এক্ষণে উলা নামে খ্যাত, প্রেমচাঁদ বিদ্যারত্ন বাস করিতেন। তিনি স্মার্ত্ত ও খ্যাতিপ্রতিপত্তিশালী অতিশয় প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন। উপরি-উক্তা প্রাণভীতি-পরিশূন্যা রমণী তাঁহারই জননী ছিলেন। আমরা ঐ সত্যনিষ্ঠ অধ্যাপকের মুখে তাঁহার গল্প শুনিয়াছি।

তিনি আঘাটায় বসিয়া পূজাহ্নিক করিতেছেন,—কোমরের অর্দ্ধভাগ জলে মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে নদীর অপর দিকে কুমীর ভাসিল,—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কুম্ভীর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধ্যানমগ্না রমণীর অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু নদীর উচ্চ তীরস্থ কোন ব্যক্তির দৃষ্টি, এই ঘটনার উপর পতিত হইল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

"ঠাক্রুণ,—ঠাক্রুণ,—পলাও,—পলাও কুমীরে খেলে,—কুমীরে খেলে।"

ঠাকুরাণী কিয়ৎক্ষণের পর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন,

"দূর পাগল,—বামনের মেয়েরে কখন কুমীরে খায়?" এই কথা বলিয়া পুনরপি পূজাহ্নিকে মনোনিবেশ করিলেন। কুমীর অদৃশ্য হইয়া গেল।*

(২)

ঐ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী যখন ষট্পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্বামীদেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। প্রেমচাঁদ বিদ্যারত্ন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। তখন প্রেমচাঁদের আরও দুইটী জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান ছিলেন। ঠাকুরাণী পুত্রগণকে কহিলেন,—হিন্দু নারীর বিধবা জীবন ধারণ করা বড়ই বিড়ম্বনা। অতএব আমি কর্ত্তার সহগামিনী হইব, তোমরা সেইরূপ

* ইহাতে, যিনি যত পারেন, বিচার বিতর্ক করুন,—বা ইহার সপক্ষে বিপক্ষে হেতু বা অহেতু প্রদর্শন করুন,—ইহা কল্পিত গল্প নহে,—পরিস্ফুট সত্য ঘটনা। প্রঃ লেঃ।

আয়োজন কর। কর্ত্তার আর বিলম্ব নাই, বোধ হয়, দুই একদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন।"

পুত্রগণ জননীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ভীত হইলেন। কহিলেন,—"সে কি মা, তুমি বল কি? তা কখনই হইতে পারিবে না। এককালে আমরা পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া সংসারে তিষ্ঠিতে পারিব না;—আমাদের ঘর সংসার ছারে খারে যাইবে।"

জননী কহিলেন,—"তোমাদের ঘর সংসার ছারে খারে যাইবে বলিয়া আমি ছারে খারে যাইতে পারিব না। বিধবা হইয়া এক দণ্ড থাকিব না। স্বামীর চরণ ভিন্ন হিন্দুনারীর অন্য গতি নাই। তোমরা আমার কথার অন্যথা করিও না।" পুত্রগণ জননীর স্বভাব জানিতেন। উক্তরূপ কথা কহিতে আর সাহস হইল না। কথার অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—"মা, সহমরণের প্রথা প্রায় রহিত হইয়া আসিল। এখনকার নারী-গণের পুরাকালীন রমণীগণের ন্যায় মানসিক বল, সাহস ও সহিষ্ণুতা নাই। এখন কোন কোন নারী সতীত্বস্থাপনের জন্য স্বামীর সহগামিনী হন বটে, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তৎসঙ্গে অনেক গর্হিত ও নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সেটা বড়ই লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। তুমি কোন প্রকারেই জীবিতাবস্থায় জলচ্চিতায় দগ্ধ হইতে পারিবে না। অধিকন্তু আমাদিগকে ঘোরতর শোক ও অনুশোচনায় পাতিত করিবে।" জননী পুত্রগণ মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই কহিলেন,—

"বটে? তোমরা সেই আশঙ্কা করিতেছ? তবে দেখ। দেখ তোমাদের মা পতির অনুগমন করিতে পারিবে কি না।" এই কথা বলিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্বালন করিলেন,—আপন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তৈলসিক্ত চীর খণ্ডের তিনটী আবরণ প্রদান করিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ অগ্নিশিখায় ধারণ করিলেন। পূর্ব্ববৎ অবিকৃত চিত্তে পুত্র ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। অঙ্গুলি চট্‌পট্ শব্দে দগ্ধ হইল। গৃহ মধ্যে শব-দাহের গন্ধ অনুভূত হইল, তখন পুত্রগণ হাহাকার শব্দে জননীর হস্ত ধারণ করিয়া রোদনোন্মুখ গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—

"মা, তুমি এই মর্ত্তাভূমিতে প্রত্যক্ষ দেবীরূপিনী। তোমার ইচ্ছাও জীবন্তী অনুষ্ঠানময়ী। তোমার এই ইচ্ছায় বাধা দেয় কাহার সাধ্য? আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবে, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আমরা তাহাই করিব।

যে বঙ্গ এখন বিলাসতরঙ্গে ভাসমান, যে বঙ্গীয় কামিনীগণ ভীরু ও বিলাসিনীর অগ্রগণ্যা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই বঙ্গে এককালে এই প্রকৃতির অনেক নারী বিদ্যমান ছিলেন। এখনও যে এককালে নাই, এমন নহে। তবে অনেক অনুসন্ধানে বাহির করিতে হয়।

স্ত্রীভাগ্যে ধন।

"স্ত্রীভাগ্যে ধন, পতিভাগ্যে পুত্র।" এই বাক্যটি বঙ্গের চির-প্রচলিত প্রবাদ। যে বাক্য মিথ্যা, তাহা অনেক দিন টিঁকে না; যাহা সত্য, তাহাই সনাতন। প্রায় সমস্ত প্রবাদবাক্যের মধ্যেই সনাতন সত্য নিহিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে উপরি-উক্ত প্রবাদের প্রথমার্দ্ধের উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

রামদুলাল সরকার কত বড় লোক ছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না বটে, কিন্তু তাঁহার নামটা, বোধ হয়, সকলেই জানেন। এককালে তিনি বঙ্গীয় বণিক-সমাজের মস্তক ছিলেন,—তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে বাজার সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল হইত। ইউনাইটেড ষ্টেটস, ফিলিপাইনপুঞ্জ, চীন, জাপান, ইংলণ্ড, পারিস প্রভৃতি স্থানের বণিকমণ্ডলী তাঁহাকে আপনাদিগের কলিকাতাস্থ মুরব্বি মনে করিত। তিনি তাহাদিগের প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া দিয়া এদেশীয় দ্রব্যজাত দ্বারা তাহাদিগের জাহাজ পূর্ণ করিয়া দিতেন। তাঁহার নিজের তিন চারিখানা বাণিজ্য-জাহাজ ছিল। সেই সকল জাহাজ বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিত। তিনি এককালে কলিকাতায় বার তেরটা হাউসের (বণিক্-কার্য্যালয়) মুরুব্বি ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে নগদ সাড়ে তিন কোটি টাকা ও অনেক টাকার ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া যান।

এই রামদুলাল সরকার যখন হাটখোলার মদন দত্তের অধীনে দশ টাকা বেতনের সামান্য সিপ্-সরকার;—যখন কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত কখন কখন গমনপূর্ব্বক জাহাজী গোরাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া বিপন্ন হইতেন, সেই সময়েই মূলাযোড়ের কোন দুঃখীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কন্যাটী দুঃখীর বটে, কিন্তু পরমাসুন্দরী ও সুলক্ষণশীলা। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই রামদুলাল আপন প্রভুর নিকট হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। দশ টাকা বেতনের সিপ-সরকার কিরূপে এই অসম্ভব পুরস্কার প্রাপ্ত হন, যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "দ্বিতীয় চরিতাষ্টক" নামক পুস্তক পাঠ করিবেন।

রামদুলাল ঐ লক্ষ টাকাকে মূলধন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। রামদুলাল-পত্নীর মনে হইল, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াই তাঁহার স্বামী দিনমজুরের অবস্থা হইতে রাজা হইলেন। তাঁহার আনন্দ ও সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার ভাগ্যেই স্বামীর ধন

হইয়াছে, এই বিশ্বাস রামদুলাল-গৃহিণীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। গৃহিণী তজ্জন্য সাতিশয় স্বাধীনতা লইয়াছিলেন। সৌভাগ্য-গর্ব্বিণী গৃহিণীর এই স্বাধীনতা-মূলক অনেক আখ্যায়িকা আছে। অদ্য এই স্থলে তাহার দুইটী বিবৃত হইবে।

কোন সময়ে রামদুলাল সরকার সলাভে বিক্রয় করিবার জন্য ছয় শত বস্তা উৎকৃষ্ট চিনি ক্রয় করিয়া আপন বাটীর কোন নিরাপদ ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গৃহিণীর ইচ্ছামতে বাড়ীতে দীর্ঘকালের সংকল্পে পুরাণপাঠ হইতেছিল। তদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে প্রতি দিন বহুসংখ্যক রমণীর সমাগম হইত। তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়—গ্রীষ্মকাল। গৃহিণী দেখিলেন, শ্রোতৃরমণীগণ ক্লিষ্ট হইতেছেন। তিনি গামলায় ঐ চিনি ভিজাইয়া সেই বহুসংখ্যক স্ত্রীকে প্রতিদিন সরবৎ পান করাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অতিথিসেবা তিন চারি মাস যাবৎ চলিতে লাগিল। রামদুলাল ঐ সময় ঐ চিনির ক্রেতা পাইলেন। সওদাপত্র লেখা পড়া হইল। কিন্তু ক্রেতাকে ঐ চিনির ওজন দিবার সময় দেখিলেন,—ছয় শত বস্তা চিনির মধ্যে মোট চল্লিশ বস্তা চিনি ভাণ্ডারে মজুত আছে!! অনুসন্ধানে অবগত হইলেন, তাঁহার দানশীলা উদার-হৃদয়া গৃহিণী পাঁচ শত ষাইট বস্তা চিনি তাঁহার অজ্ঞাতে জলসাৎ করিয়াছেন!! এই ঘটনার একটু মধুময় উপসংহার আছে। তাহা পরে বলিব।

কোনও সময়ে রামদুলাল বনাতের একচেটে ব্যবসা করেন। ঐ বনাতের এক পৃষ্ঠ লালবর্ণ ও অন্য পৃষ্ঠ নীলবর্ণ। উহার প্রতি গজের মূল্য ৩০৲ টাকা। ঐরূপ বনাত কলিকাতায় আর কখনও আসে নাই। রামদুলাল বনাতের বস্তাগুলি নিজ বাড়ীর কোন উৎকৃষ্ট কোষে বিশেষ যত্নে রক্ষা করিয়া, ঐ বনাতের একচেটে ঠিক্ হইয়াছে কিনা, তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন। এক দিন মাঘ মাসের অতি প্রত্যুষে খোলা ছাদে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাতঃস্নান করিয়া ঐরূপ বনাত গাত্রে দিয়া যাইতেছেন। তৎক্ষণাৎ দালাল-দিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, কলিকাতার যেখানে ঐ বনাতের এক টুক্‌রা যে মূল্যে পাও, ক্রয় করিয়া আনিবে। দালালগণ সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া সন্ধ্যাকালে রামদুলালকে জানাইল, কলিকাতা সহরের মধ্যে কোথাও ঐ বনাতের এক ইঞ্চি নাই। রামদুলাল দালালদিগের উপর বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—

"ঐ বনাত যদি কলিকাতার বাজারে নাই, তবে কি আকাশ হইতে পড়িয়াছে? আমি আপনার চক্ষুতে অবিশ্বাস করিয়া তোমাদিগকে কিরূপে বিশ্বাস করিব? তোমরা পুনরায় কল্য সন্ধান করিবে।"

রামদুলাল যখন বনাতের একচেটে করিয়া তাহার লাভাঙ্ক গণনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দানশীলা গৃহিণী ভাবিতেছিলেন,—"এই মাঘমাসের শীতে প্রাতঃস্নানকারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ যদি এই বনাত গাত্রে দিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বড়ই আনন্দ হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া জনৈকা দাসীর সাহায্যে ঐ বনাতের তিন গজ পরিমাণের এক এক চাদর কাটিয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করেন। রামদুলাল বাজারে ঐ বনাত একটুকরাও না পাইয়া অবশেষে নিজ ভাণ্ডার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ঐ পর্য্যবেক্ষণে নিজ-গৃহিণীর কীর্ত্তি প্রকাশ পাইল। রামদুলাল কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ তাঁহারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—গৃহিণীই তাঁহার গৃহে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমানা লক্ষ্মীস্বরূপা,—তাঁহার ভাগ্যেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন। এজন্য বনাতের যে কয় বস্তা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া গৃহিণীর অনুষ্ঠিত মহান্ ব্রতের উদ্‌যাপন করাইয়া দিলেন।

রামদুলাল-গৃহিণী অনেক সময়ে এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সকল কার্য্যে ক্ষতি বা অসুবিধা যতই হউক না কেন, রামদুলাল কিছুই বলিতেন না। কিন্তু চিনি জলসাৎ করার সময় কিছু বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেননা, ঐ চিনি অপরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, অথচ তাহাকে দ্রব্য দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। এই জন্যই গৃহিণীকে বলেন,—

"তুমি আমার সৌভাগ্যের শনি!" বোধ হয়, অন্যবিধ গালি, বা কটূক্তি রামদুলাল গৃহিণী সহিতে পারিতেন, উপরি-উক্ত গালি সহিতে পারিলেন না। চক্ষু দুটি লাল হইল,—জলভরে টল টল করিতে লাগিল,—কহিলেন ;—

"আমি তোমার সৌভাগ্যের শনি?" এই কথা বলিয়াই বেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামদুলাল তখন আর কিছু বলিলেন না ;—আফিসে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন, গৃহিণী পূর্ব্বাবস্থায় গৃহমধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন, স্নানাহার কিছুই করেন নাই—তখন রামদুলালের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। কুঠির পোষাকেই গৃহিণীর দ্বারদেশে গমনপূর্ব্বক অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন ;—কটূক্তি প্রয়োগ নিবন্ধন ত্রুটি স্বীকার করিলেন ;—অবশেষে অপরাধের দণ্ড স্বরূপ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়া গৃহিণীর ক্রোধোপশম করিলেন। এরূপ ক্রোধ এবং এরূপ জরিমানা উভয়ই বড় মধুর!!

একটী কথা।

১

সে কি সদানন্দ-ধাম ?—
সেখানে স্নেহের ঘর,
ভেদ নাই পরাপর,
সকলেরি বুকে মাখা আনন্দ আরাম ?
সবারি "দেবত্ব" আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা,
উল্লাস অমৃত গীতি কণ্ঠে অবিরাম,
তুমি আছ যথা, সে কি সদানন্দ ধাম ?

২

সে কি নন্দন কানন ?—
সেখানে সোণার শাখে,
পারিজাত ফুটে থাকে,
স্বরগ-পাপিয়া ডাকে মধুর মোহন !
সোণার কমলদলে,
ভাসে মন্দাকিনী জলে,
অমৃত অমৃত গন্ধে ভরে প্রাণ মন !
তুমি যথা আছ, সে কি নন্দন কানন ?

৩

সে কি সত্য-ধর্ম্ম-পুর ?—
দেব-ঋষি পুলকিত,
গাহে হরিগুণ-গীত,
দেব বালা ধর্ম্ম-গীতি গাহে সুমধুর !
অজর অমর লোক,
নাহি পাপ, রোগ, শোক,
নিষ্কাম বৈরাগ্য ব্রতে হিয়া ভরপুর !—
তুমি যথা আছ সে কি সত্য-ধর্ম্ম-পুর ?

৪

সে কি অমর আলয় ?—
ছাড়িয়া মানব-দেহ,
ভুলি প্রীতি ভুলি স্নেহ,
নর কি অমর হয়ে সেইখানে রয় ?
যারা এ অবনীতলে
ভাসে নয়নের জলে,
তাদেরে একটী কথা স্বপনে না কয় ?
তুমি আছ যথা, সে কি অমর-আলয় ?

৫

সে কি কুহকের ঠাই ?
সেখানে গেলে কি ছাই !
কিছু মনে থাকে নাই,
সেথা কি হেথার স্মৃতি "আপদ বালাই ?"
ধরার মমতা স্নেহ,
সেথা কি বোঝে না কেহ,
একটী পুরাণো কথা ভাবিতে কি নাই ?
তুমি যথা আছ সে কি কুহকের ঠাই ?

৬

সে কি চির সুখময় ?—
তাই হোক তাই হোক,
আমারি পরাণে সো'ক,
হোক এ মাটীর দেহ তিলে তিলে ক্ষয় !—
তুমি দিয়েছিলে দেখা,
পাষাণে তা' আছে লেখা,
হৃদয় ভাঙিলে সে তো মুছিবার নয় !
—নীরব-আঁখির জলে,

আর কত দিন চলে,
কে জানে সুমুখে পড়ে কি দীর্ঘ সময়?
যে ক'দিন থাকে স্মৃতি,
গাহিব এ মহা গীতি,
এই মম অফুরন্ত অনন্ত অক্ষয়!
আর—
তুমি যদি থাক সুখে,
সেই মন্ত্র জপি বুকে,
আগুনে জ্বলিব সুখে, মরণে কি ভয়?
শুনিলে একটী কথা
ভুলে যাই সব ব্যথা,
হায়! সে একটী কথা কে আমারে কয়—
এখন কেমন আছ? আর কিছু নয়।

শ্রীকনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

আত্মসংযম।

(৪০১ সংখ্যা,—৫১ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অসংযত হইলে "ছয় রিপু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছয় রিপু বশীভূত করার প্রকৃত অর্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের সংযম। কোন্ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কোন্ রিপুর মূল এবং তাহাদিগের সংযমের উপায় বা কিরূপ, আমরা অদ্য তদ্বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের সংযমনই যে আত্মসংযমের প্রথম কার্য্য, ইহা আমাদের প্রধান স্মরণীয়।

১ম। দাম্পত্যানুরাগ—দাম্পত্যানুরাগ মানবের সহজ ও তীব্র প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির জন্য প্রাপ্তবয়সে নর নারীর হৃদয় পত্নী বা পতির প্রীতি আকাঙ্ক্ষা করে। সভ্য-সমাজে বিবাহ-ক্রিয়া হইতে এই বৃত্তির বিকাশ ও চরিতার্থতা হয়। বিবাহ-ক্রিয়ার সহিত সামাজিক মঙ্গল একই সূত্রে গ্রথিত। মানবের দাম্পত্যানুরাগ, সফলতার সহিত গৃহধর্ম্ম পালন, ও প্রজা-বৃদ্ধি বিবাহের সাধারণ ফল; আর স্বাস্থ্য, প্রফুল্লতা, স্বার্থশূন্য প্রীতি অনুশীলন, সুসন্তান এবং ধর্ম্মপথে উন্নতিলাভ বিবাহের অসাধারণ ফল। যে দম্পতী সুশিক্ষিত, সংযত এবং শুদ্ধচেতা, তাঁহারাই ঐ সকল অসাধারণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে দম্পতী পরস্পরকে বিধাতৃ-প্রদত্ত বিশ্বস্ত সঙ্গী বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহাদের প্রীতির মধ্যে সম্ভ্রম অর্থাৎ ভক্তিভাব আছে, যাঁহাদের ভালবাসা আত্মবিসর্জ্জনের প্রতিরূপ অর্থাৎ একের মঙ্গল অন্যে ত্যাগ-স্বীকার করিয়া অন্যে পরমানন্দ—পরম তৃপ্তি লাভ করেন, যাঁহারা পরস্পরের মুখে ঐশিক পবিত্রতা অনুভব করেন, যাঁহারা মহৎ বিষয় সকল লক্ষ্য করিয়া একযোগে তদভিমুখে ধাবিত হন, যাঁহারা পরস্পরের শরীর, মন ও আত্মার শক্তি ও সদ্ভাব সমূহ অনুশীলনের সহায় হইতে পারেন, তাঁহারাই সংযত ও শুদ্ধচেতা

দম্পতী। তাঁহাদের পবিত্র প্রেম সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, যৌবন বার্দ্ধক্য, জীবন মরণে বৃদ্ধি ভিন্ন কদাচ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। প্রথমতঃ সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ তাঁহারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। পার্থিব সকল বিষয়ে তাঁহারা যেমন সহযোগী, সহভোগী ও সহকর্ম্মী হইয়া থাকেন, ধর্ম্মজীবনেও তাঁহারা সেইরূপ একে অন্যের সহায় স্বরূপ হন। সেই অর্থেই ভারতীয় আর্য্যগণ পত্নীকে "সহধর্ম্মিণী" বলিয়াছেন। সেই জন্যই পতি ও পত্নী মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ। বিবাহ ভিন্ন এই উন্নতাবস্থা লাভ হইতে পারে না বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন" অর্থাৎ সকলেই পূর্ণতা লাভের জন্য বিবাহ করিবেন। দাম্পত্যানুরাগ প্রবৃত্তি "নিকৃষ্ট" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও সেই প্রবৃত্তি সংযতাবস্থায় যথোচিত অনুশীলন করিলে মানবের এতাদৃশী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই সুফলের জন্যই ভগবান্ মানবকে এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

এইতো গেল সংযতাত্মাদিগের কথা। কিন্তু এই দাম্পত্যানুরাগ প্রবৃত্তিকে অনুচিত বৃদ্ধি পাইতে দিলে ইহা মানবের একটা ভয়ানক রিপু হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় বিবাহের পবিত্র উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া দম্পতী কেবল স্বার্থপর হয়। উভয়ে উভয়ের শারীরিক সৌন্দর্য্য মাত্র প্রীতির বিষয় করে, পরস্পরকে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রহণীয় বস্তুমাত্র বলিয়া মনে করে। এইরূপে তাহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত পবিত্রতা ধ্বংস হয়, এবং তাহারা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পশুবৎ হীনতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত মানবের যে কি ভয়ানক পরিণাম হইতে পারে, কতদূর অধঃপতন ঘটিতে পারে, আমরা তদ্বিষয় চিত্র করিতে অশক্ত; বুদ্ধিমান্ পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ তাহা নিজেরাই অনুভব করুন। আর ঐরূপ অসংযত ব্যক্তিদিগের জন্য সমাজ যে কিরূপ কলঙ্কিত হইতেছে, তাহাও চাহিয়া দেখুন। দাম্পত্যানুরাগ প্রবৃত্তি সংযত ভাবে অনুশীলিত না হইলে মানবের সর্ব্বনাশই ঘটিয়া থাকে। মানব পশুবৎ, হীনচরিত্র হইয়া পড়ে।

এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দাম্পত্যানুরাগ মনুষ্যের এক তীব্র প্রবৃত্তি; ধর্ম্মার্থে ইহা সফল করা কর্ত্তব্য।* কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রবৃত্তি অযথা চরিতার্থ করিবার প্রয়াস যেন কেহ না করেন অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামী বা স্ত্রী যদি অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তবে পুনঃ পুনঃ বিবাহ দ্বারা কেহ দাম্পত্যানুরাগ চরিতার্থ যেন না করেন। প্রকৃত

* যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণা বা তাদৃশ কোনও মহৎ কার্য্যের জন্য স্বেচ্ছায় বিবাহে বিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করেন, সে মহাত্মা অথবা মহাপ্রাণগণ এ সকল কথার অতীত।

দাম্পত্যানুরাগ এক ব্যক্তি ভিন্ন বহু ব্যক্তিতে অনুশীলিত হইতে পারে না, আর বারংবার বিবাহ পুরুষের চরিত্রের পবিত্রতা এবং রমণীর সতীত্বের মর্য্যাদা খর্ব্ব করে *। সংসারের যাহা কিছু ভোগ্য, দম্পতী একত্র তাহা ভোগ করিবেন; এক জনের অভাবে অন্যে সে সকল ভোগ করিবে না, ভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। এইরূপ ত্যাগস্বীকারে হৃদয়ে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি জন্মিবে, ইহাই প্রকৃত ভালবাসার কার্য্য। তবে এ কথাও সত্য যে স্বভাবতঃ মানব-চিত্ত যেরূপ স্বার্থপর, তাহাতে এরূপ পবিত্র প্রীতি এক দিনেই সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না। সেই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে এই নিঃস্বার্থ প্রীতির সাধনা আছে; প্রত্যেক মানবের তাহা সাধনীয়। বিধবা হিন্দু মহিলাদিগের "ব্রহ্মচর্য্য ব্রত" এই মহতী সাধনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বর্গীয় প্রিয়জনের উদ্দেশে এই-রূপ সাধনায় দাম্পত্যানুরাগ অনুশীলিত ও পরিতৃপ্ত অথচ সংযত হয়। বিয়োগী-দিগের ইহাই কর্ত্তব্য।

বিশেষ দুঃখের বিষয় এবম্বিধ সাধনায়, বঙ্গদেশের অধিকাংশ পুরুষগণ বড়ই উদাসীন*। ইংরাজ-প্রদত্ত শিক্ষায় এদেশীয়দিগের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার সহিত এদেশে বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে। আর্য্য ঋষিদিগের গঠিত ভারতবর্ষে আত্মসংযম, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি পবিত্রতার উপাদান সকল এক্ষণে নীরস ও নিষ্ফল জিনিস বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, আর আপাতসুখকর ভোগ-বিলাস মানবজীবনের লক্ষ্য হইয়াছে! আর্য্য ঋষিদিগের সঞ্চিত অমূল্য রত্ন সকল শিশুর হস্তে মদ্‌গ্রহরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহারই ফলে এখন অনেক বিপত্নীক আর বিপত্নীক অবস্থায় থাকিতে পারেন না; তরুণবয়স্ক হইতে প্রৌঢ়, বৃদ্ধ যে কেহ পত্নীহীন হইতেছেন, তাঁহারই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি পক্ষেও "বিবাহ" করা আবশ্যক হইতেছে! মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে, হিন্দুদিগের হৃদয় যারপর নাই অবনত হইয়াছিল, পত্নীর জীবিতাবস্থায় বহু বিবাহ করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন। † কিন্তু এখন তো শিক্ষিত

* যাঁহাদের প্রথম বিবাহ কেবল নাম মাত্র, তাহাতে দাম্পত্যানুরাগ অনুশীলিত হয় নাই, তাহাদের প্রতি এ যুক্তি প্রযোজ্য নহে। প্রকৃত জীবন বা মনুষ্যত্ব লাভ জন্য একবার মাত্র দাম্পত্য প্রীতি অনুশীলন করিতে হইবে; অনুশীলনাবস্থায় একের বিয়োগ ঘটিলেও, আর সে চেষ্টা করিবে না; এই কথাই আমরা বলিতেছি।

* যে সকল সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত, সেখানে বিবাহার্থিনী বিধবাদিগের প্রতিও এই কথা প্রযোজ্য।

† বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ঐ কুৎসিত প্রথা সুসভ্য আর্য্য-জাতির সমাজ কলুষিত করিয়াছিল কেন, তদ্বিষয়

ব্যক্তিমাত্রেই একনিষ্ঠতার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, তথাপি কেন এরূপে আত্মার পবিত্রতা ধ্বংস করেন? ঐরূপ পুনঃ পুনঃ বিবাহের ফল দুই চারি জন ভিন্ন, সাধারণের পক্ষে যে প্রভূত অকল্যাণকর হয়, অনেক ভুক্তভোগী ব্যক্তিই এ কথা বলিয়া থাকেন। দুই চারি স্থলে ঐরূপ বিবাহ পরম লাভজনক হইলেও অধিকাংশ স্থলে উহা দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক বিষম অনর্থ ঘটিয়া থাকে! এ সব দেখিয়া শুনিয়াও অনেক বিপত্নীকের বিবাহের লালসা জন্মিয়া থাকে! লিখিতে লজ্জা করে, যাঁহাদের অনেকে বিপত্নীকের প্রথমাবস্থায় বীর পুরুষোচিত পত্নীপ্রীতি ও আত্মসংযম প্রদর্শন করেন, কিছু দিন যাইতে না যাইতে সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারাই আবার "নব বর" সাজিয়া সেই সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে বসেন! ঐরূপ বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে বিবাহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ উত্তর করেন "আমার সংসার চলে না, তাই বিবাহ করিলাম।" কেহ উত্তর করেন "পাত্রীপক্ষের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না, তাই বিবাহ করিলাম।" কেহবা অম্লানমুখে উত্তর করেন "আমি দুর্ব্বল, তাই বিবাহ করিলাম।" শেষোক্ত ব্যক্তিরাই যে অপেক্ষাকৃত সরল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক পুরুষজাতি সমাজের মস্তক স্বরূপ। তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইলে, কেহ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহের নামে এইরূপ কদাচরণ করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য? তাই বলিয়া নানা ছলনায়, আত্মাবনতি ও সমাজের পবিত্রতার মূল শিথিল করা কি তাঁহাদের মানবোচিত কার্য্য? কে কিরূপ বুঝেন জানি না—রোম, এথেন্স অথবা ইংলণ্ডের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেশের কথা যত দূর জানি, তাহাতে দেখিতে পাই সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার দিন পর্য্যন্ত এ দেশে নারীচরিত্র পুরুষের হাতেই গঠিত হইতেছে; স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রাণেই অনুপ্রাণিত হইতেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিবার সময় অদ্য নহে—তথাপি যাঁহারা মানবসমাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ বিষয়ও বুঝিতেছেন এমত ভরসা আছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে অনেক পুরুষ যে আত্ম-সংযম-বিমুখ হইয়া, বিলাসী ও তুচ্ছ ভোগ সুখাভিলাষী হইতেছেন, ইহা স্বদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই মহা আশঙ্কার বিষয়। এই সকল অসদাদর্শে, নারী-প্রকৃতি পবিত্রতার মাহাত্ম্যে সন্দিগ্ধা হইবে কি না, তাঁহাদের সাধনীয় পবিত্র ব্রত সকল হৃদয়ের জিনিস না হইয়া কেবল লোকলজ্জা রক্ষার্থে, যশোমানলাভার্থে এবং নিয়ম পালনার্থে বিরক্তির সহিত প্রতিপালিত

গত বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীর "একটী বিশেষ কথা" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

হইবে কি না, তাহা সর্ব্বদর্শী ভগবান্‌ই জানেন! আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি, তেমন দিন যেন এ দেশে না আইসে। কিন্তু যদি সে দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তবে তাহা ঐ সকল বিলাস-প্রিয় স্বার্থপরদিগের জন্যই হইবে! হায়! যে দেশে এইরূপ কুদৃষ্টান্ত অহরহ প্রদর্শিত হইতেছে, সে দেশে "আত্ম-সংযম" কথা কেবল কথার কথা, কেবল "পাগলামী" বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু আমরা নিরাশ নহি; বিধাতা মঙ্গলময়, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ জগৎ যতই অমঙ্গল-পথে যাউক না কেন, সেই অদৃশ্য মহান্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সুমঙ্গলের পথে তাহাকে আসিতেই হইবে—ইহা জাগতিক যুগধর্ম্ম *। তাই এই বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা-প্রবল সময়েও বঙ্গভূমি হইতে আত্মসংযমের আদর্শ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; আমাদেরই জীবৎকাল মধ্যে এ দেশে (অতি তরুণ বয়সে বিপত্নীক অবস্থা প্রাপ্ত) এমন ত্যাগস্বীকারপরায়ণ, সংযমী পুরুষরত্ন কয়েকটী দেখিয়াছি যে তাঁহাদের নামোচ্চারণেও প্রাণ পবিত্র হয়! আমাদেরও ভরসা হয় আত্মসংযমের মূল্য বুঝিলে বহু লোকে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইতে চেষ্টা করিবে, সেই চেষ্টার ফলে উপরি-উক্ত মহাত্মাদিগের মত শত সহস্র জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই বঙ্গভূমি অলঙ্কৃত করিবেন। সমাজের প্রতি ও স্বদেশের প্রতি যাঁহাদের মমতা আছে, তাঁহারা সকলেই এই জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

দাম্পত্যানুরাগ-জনিত "রিপু" হইতে যাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, হিন্দু বিধবাদিগের মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিরূপে আচরণ করিতে হয়, তাহার জন্য হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ এবং হিন্দু বিধবার নিয়ম ও কর্ত্তব্য সকল পালন করা আবশ্যক। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটী কথা এখানে লিখিলাম।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বীর কতকগুলি শারীরিক নিয়ম এবং মানসিক কর্ত্তব্য আছে। নিষিদ্ধ পান ভোজন পরিত্যাগ; নিরামিষ ও একাহার গ্রহণ (অর্থাৎ রাত্রে উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করা); একাদশী ব্রতাচরণ; (পরিচ্ছন্নতা ত্যাগ না করিয়া) বিলাসিতা ও বেশ বিন্যাস পরিত্যাগ; নির্ম্মল জল পান; বিশুদ্ধ বায়ু সেবন; রাত্রে সুনিদ্রা; প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ইত্যাদি তাঁহাদিগের শারীরিক নিয়ম। আর কুপথগামী ব্যক্তিদিগের সঙ্গ, বন্ধুদিগের সহিত কুভাবপূর্ণ আলাপ, কু-গ্রন্থ পাঠ, কুভাবোত্তেজক নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ এবং সর্ব্ব প্রকার কুচিন্তা, এই সকল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সদ্ভাবের অনুশীলন আবশ্যক; ইহাই

*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

মানসিক কর্ত্তব্য *। ভগবদ্ভক্তি-অনুশীলন †, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, পবিত্রতাপূর্ণ সঙ্গীত ও কবিতা আলোচনা, লোকহিতকর কার্য্য, বিজ্ঞান, দর্শন অথবা সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ, চিত্তজয়ী মহাত্মাদিগের সঙ্গ গ্রহণ, শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া এই সকল মহৎ ও পবিত্র কার্য্য দ্বারা সদ্ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সদ্ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই মন সংযত হয়। এইরূপে চিত্ত গঠন করিতে হইবে যে কুস্মৃতি, কুচিন্তা এবং কুকল্পনা মনে প্রবেশ করিতে না পারে। শরীরে যতই সংযত ও ক্লেশসহিষ্ণু হও না কেন, তোমার মন যদি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে তোমার ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ফল—কেবল কপটতা মাত্র। ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে,

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।"

"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, মনে মনে সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে, সে মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়।"

অতএব প্রাণপণে, চিত্তসংযমের জন্য সকলের চেষ্টা করা আবশ্যক। অপবিত্রচেতা সাধকের যশোমান [illegible] হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয় না। যশোলাভ হইতে চরিত্রলাভ যে কত-দূর উচ্চে অবস্থিত, এ কথা ভাবিয়া দেখিলে অনেকেই বুঝিতে পারেন। সময়ে সময়ে সন্ন্যাসী বা বহু দিনের ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী ব্যক্তির সহসা দারুণ অধঃপতনের কথা শুনিয়া আমরা ভীত, স্তম্ভিত এবং ক্ষণকালের জন্য মানবচরিত্রে বিশ্বাসশূন্য হই, কিন্তু ঐরূপ দুর্ঘটনার মূলানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সেই সকল ব্যক্তি শরীর সম্বন্ধে সংযত হইলেও তাহাদের মন অসংযত—নরকতুল্য অপবিত্র ছিল; তাই খড়ের ঘরের মত আগুন লাগিবামাত্র পুড়িয়া গেল! প্রকৃত শুদ্ধচেতা মানব হইতে ইহারা যে বহু নিম্নতলে, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। যিনি ভগবদ্‌গীতোক্ত

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।"

অর্থাৎ 'চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে,* সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার বশীভূত করিবে।" যিনি কার্য্যতঃ এইরূপ

---

*যাহাতে পবিত্রতার এক বিন্দু ক্ষতি হয়, তাহাই আমরা "কু" বলিতেছি; পবিত্রতা ক্ষতিকর বিষয় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং মনন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

† বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মধুর রস দ্বারা ভগবৎসাধনা করিলে মানব জিতাত্মা হইতে পারেন, ইহাই শ্রেষ্ঠতম সাধকদিগের উপদেশ। বিধবা রমণী যদি পরলোকস্থ স্বামীর প্রতি সাধক ভাবে চিত্ত সমাধান করেন, তবে তাঁহার দাম্পত্য-প্রেম এবং চিত্তশুদ্ধি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ সাধনায় ভগবদ্ভক্তি সহজ ও সুখ-সাধ্য হয়।

*আপাতসুখকর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে।

করিতে পারেন, তাঁহারই মন সংযত হইয়াছে।

আর এক কথা, প্রত্যেক সংযমেচ্ছু ব্যক্তি শরীর ও মনকে অলসতা হইতে রক্ষা করিয়া পবিত্র চিন্তায় ও পবিত্র কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিন কাটাইলে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অলস ও বিলাসী ব্যক্তিরা যে অজিতেন্দ্রিয় ও কদাচারী হয়, এ কথা কে না জানে? অতএব পুরুষেরা জীবিকার জন্য এবং রমণীরা সংসার-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া, অবকাশ পাইলেই আমরা পূর্ব্বে যে সকল পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের কথা বলিয়াছি, তাহারই কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত রহিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও পাপ-কামনার সাধ্য হইবে না (১)।

হিন্দু আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মনকেই সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা বলে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারি, চিত্তসংযমই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়তা। যিনি অপবিত্র চিন্তা ও অপবিত্র কামনা মনে স্থান না দেন, তাঁহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনা হইতে সংযত হয়, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়-সংযম সুখ-সাধ্য হয়। এ বিষয়ের সত্যতা যে কোন ব্যক্তি নিজ জীবনে অনুভব করিতে পারেন। আত্মসংযম সাধনায় মানব যখন এরূপ উৎকর্ষ লাভ করেন যে তাঁহার মনে ভ্রমেও অন্যায়েচ্ছার উদ্রেক হয় না, তখনই তিনি সিদ্ধ হইলেন বুঝিতে হইবে।

অন্যান্য রিপুদিগের বিষয়ে আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

ম্যানিলা।

আমাদের দেশে ম্যানিলার নাম হইলে চুরটের কথা আগে মনে হয়। আবার ইহা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কথা মনে পড়ে, যাহার ইহা উৎপন্ন দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের অধিকারভুক্ত। ইহা প্রথম গ্রহণ কালে তাহাকে বড় শোণিতপাত করিতে বা অন্য প্রকারে কষ্ট পাইতে হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া তাহাকে ধনে প্রাণে মানে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কথঞ্চিৎ সুখের বিষয় এই যে, সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। শীঘ্র ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

(১) ছয় রিপু দমন বিষয়ে বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত কৃত "ভক্তি যোগ" বহু উপদেশপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রত্যেক সংযমার্থীর তাহা অবশ্য পাঠ্য।

১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুন তারিখে ম্যানিলা নগর সংস্থাপিত হয়। সুবিখ্যাত ভূবেষ্টক ম্যাগিলেন কর্তৃক এই সমস্ত দ্বীপ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি সমগ্র ইউরোপের বাণিজ্যপোত বাণিজ্যার্থে এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে। দ্বীপবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া, তাহাদিগের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ম্যাগিলেন সাধ্যমত তাহাদিগের ব্যবসা বাণিজ্যের উৎসাহ দান করিতেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রেল তারিখে মেটান্ দ্বীপে তিনি হত হন। এণ্ড্রুজ অর্ডেনেটা নামে একজন সন্ন্যাসী স্পেন-রাজপ্রতিনিধি হইয়া এই সমস্ত দ্বীপ অধিকার করেন। ইনি ১৫৬৫ সালে প্রথম শাসনকর্ত্তা হন। দ্বীপবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সুদূর-পরাহত বিবেচনায় যাহাতে তাহাদের শান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি চেষ্টিত থাকেন। এবম্বিধ সাধু চেষ্টার ফলে দ্বীপবাসী সকল একাগ্রচিত্তে ভূমিকর্ষণ ও আপনাদিগের মধ্যে সভ্যতার বৃদ্ধি সাধনে তৎপর রহিল। বাস্তব, জেতা ও বিজিতবর্গ, কি ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি স্বভাব চরিত্র, সকল বিষয়ে একাঙ্গীভূত হইতে লাগিল।

ম্যানিলা নগরী এক বিস্তৃত মাঠে স্থাপিত। মাঠের অদূরে গিরিমালা শোভা পাইতেছে। বোধ হয় বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে এই স্থানটি মনোনীত হয়। সাধারণতঃ ম্যানিলা উপসাগর নিরাপদ। বৃত্ত খণ্ডাকারে নগরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বৃত্তের যে ভাগে ধনু, সেই অংশে নদী প্রবাহিত হইতেছে। পরিখা ও প্রাচীরে আবার নগরটি সুদৃঢ়ীভূত হইয়াছে। চতুষ্কোণ সজল ও নির্জ্জন বিচরণভূমি ব্যতীত নগরে গবর্ণরের প্রাসাদ, পরমিট, ধনাগার, ভজনালয়, আশ্রম, বিশ্ববিদ্যালয়, সৈন্যাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি গৃহাদি আছে। গৃহগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও প্রায়ই দ্বিতল। নিম্নতলে ভাণ্ডার, দ্বিতলে বাসস্থান,—ভোজনাগার, শয়নাগার, রন্ধনাগার ও স্নানাগার।

কোনও কোনও দ্বীপে আগ্নেয় গিরি এবং কোনও কোনওটিতে মৃত্তিকাসংমিশ্রিত ধাতুর স্তর আছে। সমুদ্রতীর হইতে যে সকল শৈলশৃঙ্গ উত্থিত হইয়া আপনাপন অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে, তৎসমুদায়ে পাথরিয়া কয়লা, লৌহ ও তাম্র পাওয়া যায়। তার সাক্ষী লুজন্। জাপান প্রভৃতি দেশসমূহের ন্যায় এখানে ভূমিকম্পের বড় উৎপাত নাই। এই সমস্ত দ্বীপের কয়লা ইংলণ্ডের কয়লার ন্যায় অতি উত্তম। সীসাও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একজন সুবিখ্যাত লোক * বলেন যে, "আকরিক পদার্থের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধেই বল বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের মৃত্তিকার বিবিধ উর্ব্বরা শক্তি সম্বন্ধেই বল, এই দেশে কিছুরই অভাব নাই। এক অভাব কেবল উদার রাজনীতির।" বঙ্গদেশের মত তণ্ডুল এখানকারও প্রধান কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্নতা লোকদিগের

* Commander Walker.

প্রধান খাদ্য। অতি উৎকৃষ্ট তুলাও এখানে জন্মে। এতভিন্ন কোকো, শণ, কাফি, নীল, গন্ধক, মরিচ, আবলুস কাষ্ঠ, রেসম, স্যাফ্রান কাষ্ঠ, কচ্ছপের খোলা এবং আরও অন্যান্য দ্রব্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত।

দ্বীপগুলি ৩১শটি অঞ্চলে বিভক্ত, তন্মধ্যে ছয়টি লুজনে। প্যাম্পানহান, ইলোকস্, ক্যাগিয়ান, তাগালা, পাপন্‌পান্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্টীর লোক এ সমস্ত দ্বীপের প্রধান অধিবাসী। পার্ব্বত্য আই-রোগট্গণই কেবল স্পেন কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই। *

শ্রীন।

পদ্মা।

কুলায়ে বিশাল বপু—অনন্ত প্রসার
সংসার গ্রাসিবে যেন মনেতে লইছে হেন
আতঙ্কে উড়িছে প্রাণ—নিরখি আমার।
উত্তাল তরঙ্গ কত উঠিতেছে অবিরত
শত যোজনের পথ ধাইছে সবেগে;
নদীবক্ষে তরীচয় ডুবু ডুবু মনে হয়,
দুলিতেছে তৃণবৎ শত ঢেউ লেগে।
কাঁপিছে তরাসে তাই প্রাণ করে আইচাই,
আরোহীর অন্তরাত্মা ধড়ফড় করে;
ঘেরিছে নিরাশা ঘোর বাজী বুঝি হল ভোর
এই ভাবে অন্তিমেতে স্মরিছে ঈশ্বরে।
নৌকায় উঠিছে নীর, ধৈরয না মানে ধীর,
গম্ভীরপ্রকৃতি যেবা সুদৃঢ় অটল,
টলিছে তাহার মন হেরি মহা আস্ফালন
তর্জ্জন গর্জ্জন ঘোর তরঙ্গ প্রবল!
রাজনগরের শোভা ভাবুকের মনোলোভা
পঞ্চ রত্ন নব রত্ন—একুশ রতন,
অতলে ডুবালি সব নাহি আর সে গৌরব,
(তোরে) সাধে কি গো কীর্ত্তিনাশা বলে
সর্ব্বজন?
কত গুণী ধনী মানী মহারাজা মহারাণী
তোর গর্ভে করিলেন আত্ম-বিসর্জ্জন!
বিষম সঙ্কটে পড়ি যখনি সে কথা স্মরি
ভেদিয়ে মরমতল ঝরে দু নয়ন।
সুকোমল বক্ষঃপরে রাখিয়ে অসংখ্য নরে
ধরিয়ে রাক্ষসীরূপ দেও রসাতল,
রে তটিনি! কি নিঠুরা! করি মায় শোকাতুরা
ছিঁড়িয়া লইছ তার হৃদয়-কমল।
তরল হৃদয় যার পাষাণী সে কি প্রকার?
এ কি বিপরীত ভাব হেরি স্রোতস্বতি!
কে বলে তরল তোরে সে কি পারে এত
জোরে
আঘাতিতে দেহ-লতা হয়ে বেগবতী।
গেল যুগ যুগান্তর বহিতেছ নিরন্তর
গরবে গর্ব্বিতা হয়ে—ফুলি অহঙ্কারে
বিনাশি অসংখ্য নরে কি লাগি কিসের
তরে
করিতেছ আস্ফালন বল মা আমারে?
অকূলে যেদের কূল, কেবা আছে তার তুল?
দুর্ব্বলে অভয় দিলে বাড়য় গৌরব,

সে গুণ কি আছে তোর বাঁচাতে বিপাকে ঘোর
কাতর মুমূর্ষু জনে দিয়ে স্নেহরস?
তাই বলি ওগো পদ্মে! নমি তব পাদপদ্মে,
বধিও না দুরবলে বিপদেতে ফেলি,
তুলিও বিপন্ন জনে ডুবিলে এ ভব জীবনে,
দয়া করি তার পানে চেও আঁখি মেলি।
পতিত-পাবনী-শাখা দয়াতে হৃদয়-মাখা
হইবে তোমার,—দীনে করিবে উদ্ধার,
পালিবে মায়ের ধর্ম্ম দুহিতার এই কর্ম্ম,
দেখ যেন ভুলিও না,—মিনতি আমার।
বঙ্গের গৌরব হানি করিয়াছ ঘোল আনি
ডুবায়ে অতলে কত সুদৃশ্য নগর,
আবার ভাবনা মনে, কত নর নারীগণে
করিবে উদরসাৎ—বছর বছর!!

শ্রীচ।

গো-পরিচর্য্যা।

গোরুর এঁসে রোগ বা আওসা।

এঁসে রোগ গো, ছাগ, শূকর প্রভৃতি অনেক জন্তুরই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পশুদিগের এঁসে রোগ হইতে দেখা যায়। ইহা এক প্রকার ছোঁয়াচে রোগ। পালের মধ্যে দুই একটী পশুর এই পীড়া হইলে অন্যান্য পশুগণেরও এই রোগ হইতে দেখা যায়। এঁসে রোগ আক্রমণ করিলে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পায়ে, এবং পালানে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। সকল পশুর এক প্রকারের রোগ হয় না, অর্থাৎ কাহার কেবল মুখে, এবং কাহারও কেবল পায়ে হইয়া থাকে। এঁসে রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সময় মনুষ্যাদিরও উক্ত পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। গর্ভবতী গাভীর এই রোগ উপস্থিত হইলে গর্ভস্রাব হইবার খুব সম্ভাবনা। এ রোগে গরু প্রায় মরে না, তবে বাছুরের হইলে তাহা প্রায় বাঁচে না। যে দুগ্ধবতী গাভীর এঁসে বা আওসা রোগ হয়, তাহার কাঁচা দুগ্ধ খাওয়া কখনই উচিত নহে, তাহাতে অনেক ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু একবার ফুটাইয়া লইলে দুধের দোষ কাটিয়া যায়।

বর্ষাকালে এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। গোরুকে অপরিষ্কার স্থানে রাখাই এই রোগের সম্ভাবিত কারণ। বহুদর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এই রোগের বীজ গবাদি পশুর দেহে চব্বিশ ঘণ্টা হইতে তিন-চারি দিন পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু প্রায়ই ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—এই রোগ উপস্থিত হইলে, চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে ইহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। গরু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধি, আর খাইতে অনিচ্ছা, ও মাঝে মাঝে কম্প, কাশি ইত্যাদি লক্ষণ আগে প্রকাশ পায়; কিন্তু

এ সকল লক্ষণের প্রতি আমাদের তত চক্ষু পড়ে না। যখন গরু আর জাব চিবাইতে পারে না, ও তাহার মুখ দিয়া লাল ভাঙ্গিতে থাকে, তখন আমরা জানিতে পারি যে, গরুর কোনও পীড়া হইয়াছে। মুখে ও ক্ষুরের উপর ফোস্কা হইবার উপক্রম হইলে গরু পা ছুড়িতে ও ঘন ঘন চোয়াল নাড়িতে থাকে। ফোস্কা বাহির হইয়া পড়িলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তখন নিশ্চয় জানা যায় যে, গরুর আওসা উপস্থিত। গাভীর হইলে পালান ও বাঁটে ফুস্কুড়ি দেখা যায়। ফুস্কুড়িগুলি আবার প্রায়ই আঠার কিম্বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাটিয়া গিয়া ঘা হইয়া উঠে। এই ঘা শীঘ্র ভালও হইতে পারে, কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা না করিলে নালী ঘা হইবার সম্ভাবনা। মুখের মধ্যে সকল স্থান অপেক্ষা জিহ্বাতে ফুস্কুড়ির পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু টাকরায়, দন্তমূলে এবং মুখমধ্যে অন্যান্য স্থানেও হইতে দেখা যায়। পায়ে ফুস্কুড়ি হইলে প্রায় ক্ষুরের যোড়ের মধ্যে এবং ক্ষুরের সহিত যে স্থানে চর্ম্মের সংযোগ, সেই স্থানে হইয়া থাকে। এঁসে-রোগাক্রান্ত বলদকে খাটাইলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায়, এবং কখন কখন ক্ষুর খসিয়া পড়িতেও দেখা যায়। গাভীর পালান ও বাঁটে এই রোগ হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং দুগ্ধ দুহিলে বেদনা বোধ করে। রোগের সময় বাছুরে দুগ্ধ পান করিলে তাহার এই রোগ হইয়া থাকে। এঁসে গরুর দুগ্ধ দুহিয়া গোয়ালা হস্ত না ধুইয়া অন্য গরুর দুগ্ধ দোহন করিলে তাহারও এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধবতী গাভীর এই রোগ হইলে দোহনকালে তাহারা অস্থির হইয়া উঠে, এদিকে আবার না দুহিলে পালান ফুলিয়া কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই রোগ উপস্থিত হইলে বসন্ত রোগ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কয়েকটী লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সেই ভ্রম সংশোধন হইতে পারে। অর্থাৎ বসন্ত হইলে পায়ের রোগ হয় না। এঁসে রোগে পেটের পীড়া দেখা যায় না। কিন্তু বসন্তে প্রায়ই উদরভঙ্গ এবং রক্তামাশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। পীড়িত পশুদিগকে যদি ভাল যত্ন ও উপযুক্ত মত চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যে জ্বরাদি আরাম হইয়া থাকে, এবং এক পক্ষের মধ্যেই পশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু যদি উপযুক্ত মত যত্ন না করা যায়, আর তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে দশ বার দিনের মধ্যে পশু মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা—পীড়িত পশুকে গৃহমধ্যে পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত; আর গৃহমধ্যে যেন ভালরূপ বাতাস খেলিতে পারে। দিনের মধ্যে দুই তিন বার গরম জলে পশুর মুখের ক্ষতাদি ধুইয়া দেওয়া উচিত। আর নিম্নলিখিত ঔষধের জলে ধৌত করিলে বিশেষরূপ উপকার হইতে পারে।

ফটকিরি ... সওয়া তোলা।
জল ... আধ সের।

ফটকিরি জলে গুলিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিতে হইবে।

গরম জল দ্বারা দিনে দুই তিন বার পা ও ক্ষুর ধুইতে হইবে। আর ক্ষুরের মধ্যস্থ যোড় মুখের ময়লাদি অতি সাবধানে বাহির করিয়া দিতে হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে সেঁক দেওয়া আবশ্যক। সেঁক দিয়া নিম্নলিখিত মলম বাঁধিয়া দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া উঠিবে।

কর্পূর ... এক ভাগ।
তার্পিণ তৈল ... সিকি ভাগ।
মসিনা তৈল ... চারি ভাগ।

এই দ্রব্যগুলি ভাগ করিয়া মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে মাংস বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহাতে অল্প পরিমাণে তুঁতের গুঁড়া দেওয়া উচিত। পালান বাঁট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা থাকে, তাহা পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থানে উক্ত মলম লাগাইয়া দেওয়া উচিত। এই মলম দিলে বাঁটে ও মুখে মাছি বসিয়া মাইস্ত বা মাচিতা পড়িতে পারে না।

যদি পশুর অত্যন্ত জ্বর থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর মধ্যে যে কোন একটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কর্পূর ... ... বার আনা।
সোরা ... ... এক তোলা।
মদ ... ... আধ ছটাক।

মদে কর্পূর গলাইয়া পরে তাহাতে সোরা দিয়া এক সের ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া পশুকে দিনে দুইবার সেবন করাইতে হইবে।

সোরা ... ... সওয়া তোলা।
লবণ ... ... আড়াই তোলা।
চিরতার গুঁড়া ... আড়াই তোলা।
মাত গুড় ... দেড় ছটাক।

এই সমুদায় দ্রব্য এক সঙ্গে আধ সের জলে মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। কার্ব্বলিক অয়েল দ্বারা অনেক সময় ক্ষত আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

পথ্য—দুর্ব্বাঘাস কিম্বা মটরের কচি গাছ প্রভৃতি নরম অথচ টাট্‌কা দ্রব্য খাওয়ান উচিত। আর চাউল তিন পোয়া, পাঁচ সের জলে দেড় ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে আধ ছটাক লবণ কিম্বা দেড় ছটাক মাত গুড় মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়।

অনেকে পীড়িত গরুর পায়ের গোচ পর্য্যন্ত জলে কিম্বা কাদায় ডুবাইয়া থাকিবার জন্য বাঁধিয়া রাখে। উহা দ্বারা মাস্তে পড়া কথঞ্চিৎ নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু কখন কখন লোম ও ক্ষুরের মধ্যে বালি ও কাদা প্রবেশ করাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই রোগ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—খাজান, বাদলা, বাখের, চপচপ্যা, চপরা, খুরখুর, গোড়ফুটা, খাজ, খুরা, খুরপাকা, খুরই, খুরচুন, কমখুর, লাগ, মোখুর, পাবণ, কাটুরা, সেবাকায়, ঠেগা ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)।

আশ্চর্য্য বিবরণ।

(উদ্ধৃত)

জন ল্যাং কাষ্টার নামক এক জন মার্কিণ জীবতত্ত্ববিৎ ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে ৫ বৎসর পক্ষিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ফ্রিগেট নামে এক প্রকার পক্ষী এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত কোনও স্থানে না বসিয়া দিবা রাত্রি শূন্যে উড়িতে পারে এবং ঘণ্টায় এক শত মাইল অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহার পাখা বিস্তার করিলে ১০ কিম্বা ১২ ফিট লম্বা হয়। এই পক্ষী অধিকাংশ সময় আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—এমন কি ইহারা আকাশে উড়িবার সময় নিদ্রা যায়। এক বার একটী পক্ষী অনেক দিন পর্য্যন্ত কোনও স্থানে না বসিয়া একখানি জাহাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। ইহার আকার রাজহাঁস অপেক্ষা কিছু বড়। ইহার শরীরের ভার ১২ হইতে ২৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ইহার পাখা বিস্তার করিলে বার ফিট স্থান অধিকার করে। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এক পাখীকে গুলি করিয়া মারা হয়। উহার পাখার এক দিক্ হইতে অন্ত দিক্ পর্য্যন্ত বার হাত লম্বা ছিল।

চিত্রিত প্রাণী।

মানড্রিল নামক এক প্রকার জন্তু আছে, তাহার গায়ে নানা প্রকার রং দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্তুর শরীরের বর্ণ দেখিতে ঠিক্ রামধনুর মত। ইহার পিঠ বেগুণে রং দ্বারা চিত্রিত। নাকটী লালবর্ণ। নাকের দুটী ছিদ্র কাল। ইহার লোম বাদামি রঙের। গায়ের দুই পাশ ধূষর বর্ণে রঞ্জিত। ইহার দাড়ি হলদে রঙের, কাণ ছোট ও নীলবর্ণ।

মেক্সিকো দেশের নেকড়ে বাঘও নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহার মাথা ও শরীর ধূষর বর্ণের, তাহাতে কাল কাল দাগ আছে; ইহার লেজ ও পা পাঁশুটে রঙের।

এক প্রকার বানর আছে, তাহাদের মুখ কাল, দাড়ি হলদে রঙের। মাথার উপরিভাগ হলদে রঙের, তাহাতে কাল ডোরা আছে, পেছনদিক্ লাল কাল মিশ্রিত এবং লেজ ও পা কাল।

বৃক্ষের উত্তাপ।

এম্, ডব্লিউ প্রিন্স সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জীবজন্তুর শরীরে যেমন উত্তাপ আছে, সেইরূপ বৃক্ষেরও আভ্যন্তরিক উত্তাপ আছে। তিনি বলেন বৃক্ষের উত্তাপ এক বৎসরে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের সমান হয়। কিন্তু প্রত্যেক মাসে উত্তাপের কিছু কম বেশী হয়। কোন কোন দিন ১০ ডিগ্রী উত্তাপের কম বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাস যখন খুব ঠাণ্ডা থাকে, তখন গাছের উত্তাপ কমিয়া যায় এবং তাহার রস জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন বাতাস খুব গরম থাকে, তখন

গাছের ভিতরকার উত্তাপ ১৫ ডিগ্রী হয়। বড় বড় গাছ শীতকালে বাতাস অপেক্ষা কিছু গরম ও গ্রীষ্মকালে বাতাস অপেক্ষা কিছু ঠাণ্ডা থাকে।

আশ্চর্য্য সাপ।

বাঁকুড়া দর্পণে প্রকাশ যে, কতকগুলি রাখাল সেদিন রামসাগরের নিকটবর্ত্তী কোনও পুষ্করিণীর ধারে একটা বৃহৎ ঢোঁড়া সাপ বধ করিয়াছে। সাপটি সাত হাত লম্বা ও তাহার লেজের নীচে দুটী পা আছে। ঐ আশ্চর্য্য সাপ দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছে। লোককে দেখাইবার জন্য সাপটীকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। এ, গে।

চুট্‌কী গল্প।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী বংশবাটিকা (বাঁশবেড়ে) বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থান। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে প্রায় ৫০।৬০ খানি চতুষ্পাঠী (সংস্কৃত টোল) ছিল। অদ্যাপি ১০।১২ খানা টোল হীনাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, এবং অনেক পুরাতন টোলের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে একজন চিন্তাশীল অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আপন মনে ফাঁকি (পূর্ব্বপক্ষ) চালাইতেন। আপনিই ফাঁকি করিয়া আপনিই তাহার উত্তর করিতেন। একদা প্রত্যূষে এই ভাবে ভাবিত হইয়া একটি হুঁকা হস্তে অগ্নিদেবের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। টোলের পার্শ্বে একঘর গোপের বসতি ছিল। সেই বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটী যুবতী প্রাঙ্গণস্থ চুল্লীতে ধান্য সিদ্ধ করিতেছে। যুবতীটি সেই ঘরের বউ। অগ্নি প্রার্থনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বউটী পলায়ন করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুল্লীসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বাম হস্তে হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিলেন এবং বধূটী যেরূপে অগ্নিমুখে তুষক্ষেপ করিতেছিল, তিনিও সেইরূপে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আকায় তুষ দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে শাস্ত্রীয় ফাঁকি সিদ্ধান্ত চলিতেছে। বউটী অন্তরাল হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। দেখিল, হাঁড়ীর ধান সিদ্ধ হইয়া উঠিল। কি করে, অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া নিকটস্থ হইল এবং আকার হাঁড়ী নামাইয়া সিদ্ধ ধান স্থানান্তরে ঢালিয়া পুনরায় নূতন ধান্যপূর্ণ হাঁড়ী উনানে চড়াইয়া দিল। এইরূপে দেড় সলি ধান সিদ্ধ হইয়া গেল, তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রগাঢ় অভিনিবেশ ভঙ্গ হইল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন যে অবস্থায় [illegible], অবগুণ্ঠন দূরে থাকুক, যুবতী [illegible] যথাবস্থায় নিকটবর্ত্তিনী হইলেও তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ হইত

না !! আড়াই (/২৷৷০) সেরে এক কাঠা, চারি কাঠায় এক আড়ি,—২০ আড়িতে এক সলি। এ সকল চিত্র এখন আর স্বপ্নেও দেখা যায় না।

ছানার মুড়কি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

নিরেট বাঁধা টাট্‌কা ছানা /১ এক সের।
চিনি দোবারা /৷৷ অর্দ্ধ সের।

প্রথমে ছানাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গজার ধরণে ধারাল অস্ত্র দ্বারা চৌকান আকারে কাটিয়া রাখিবে। পরে জ্বালে অল্প ঘৃত চড়াইয়া ঐ ছানা খণ্ড সকল ঐ ঘৃতে অল্প সাঁতলান ধরণে নাড়িয়া চাড়িয়া পাত্রে রাখিবে।

পরে একতার বন্ধ চিনির রস প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ সাঁতলান ছানার খণ্ড সকল ফেলিয়া দিয়া খুন্তি দ্বারা আস্তে আস্তে ওলট্‌ পালট্‌ করিতে থাক। যখন দেখিবে যে ক্রমে রস শুকাইয়া সমস্ত মুড়কির গায়ে লাগিয়াছে, তখন নামাইয়া সম্ভব মত অল্প শুকান চিনি দিয়া নাড়িলেই ছানার মুড়কি প্রস্তুত হইল।

দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১২ই আগষ্ট বেথুন সাহেবের ৪৭ বার্ষিক স্বর্গপ্রাপ্তি স্মরণার্থে বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা প্রাতে বিশেষ উপাসনা, এবং অপরাহ্ণে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ দর্শন করেন।

২। জার্ম্মণির অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ প্রিন্স বিসমার্কের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি জার্ম্মণির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ সকলকে প্রুসিয়ার সহিত মিলিত করিয়া এক মহারাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। গত শ্রাবণ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী পরলোকগত হইয়াছেন।

৪। গত ৭ই শ্রাবণ গোয়ালপাড়ায় ভূমিকম্প প্রায় ৩ মিনিট স্থায়ী হয়। কাশ্মীরেও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে।

৫। রুসিয়া সাম্রাজ্যের মোট অধিবাসি-সংখ্যা বার কোটী নব্বই লক্ষ মাত্র। তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় কোটী ইউরোপীয় রুসিয়ার লোক।

৬। স্পেন আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এক্ষণে সন্ধি প্রস্তাব ঠিক হইতেছে।

৭। আমাদের মহারাণী বালমোরাল প্রাসাদে বাস করেন বলিয়া তাঁহার একটী উপাধি "বালমোরালের লেডী।" ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদ ক্রয় করেন। সম্প্রতি ইহার ৫০ বার্ষিক জুবিলী হইয়া গিয়াছে।

৮। বৈদেশিক বিভাগের অণ্ডার সেক্রে-

টারী কুর্জন সাহেব লর্ড এলগিনের স্থানে ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইবেন স্থির হইয়াছে। ইনি রক্ষণশীল দলের একজন অগ্রণী।

৯। কুচবিহারের মহারাজা ১৫ই জুলাই উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়া যান। তিনি মহারাণী কর্ত্তৃক বাথের ৩য় শ্রেণীর সম্মানচিহ্নে ভূষিত হইয়াছেন।

১০। ইউরোপে ৫৫৭টি ভাষা প্রচলিত।

১১। স্কটলণ্ডের এক:কয়লার খনিতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অগ্নি লাগে, কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় নাই। এখন সমুদায় কয়লা দগ্ধ করিয়া আগুন নিবিয়াছে।

১২। মৌলবী আব্দুলজ আলি ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী ও আরবী ভাষায় অধ্যাপক ছিলেন, সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কত ভারতসন্তান কত স্থানে এইরূপ অজ্ঞাতে কার্য্য করিতেছেন।

১৩। দুর্গোৎসব উপলক্ষে হাইকোর্ট ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৪। রামপুরের নবাব বাহাদুর সার সৈয়দ আহম্মদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং আলিগড় কলেজে বার্ষিক ১২ হাজার স্থানে ২৪ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কোহিনুর নামক মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ইহার লেখক এবং বিষয়গুলি যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাও যথোপযোগী হইয়াছে। সকল প্রবন্ধই সুপাঠ্য। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কোহিনুর দীর্ঘজীবী হউক, এবং হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলন সাধন যে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সফল হউক।

২। প্রিয়বালা-চরিত—ঢাকার বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগতা পত্নীর জীবনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই রমণী অতি ধর্ম্মনিষ্ঠা, সুশীলা, গৃহকার্য্যদক্ষা ও নানা গুণে গুণবতী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার সদ্গুণে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। ইঁহার অকাল বিয়োগে আমরা বিশেষ শোক প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর ইঁহার সদ্গতি এবং ইঁহার শোকার্ত্ত স্বামী ও সন্তানগণের প্রাণে শান্তি বিধান করুন্।

৩। প্রেম ও ভক্তি—শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। এই লেখকের সহিত বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ অপরিচিত নহেন। ইঁহার লিখিত "বিরহিণী প্রকৃতি" প্রভৃতি কয়েকটী সুন্দর কবিতা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকে তাহা এবং আরও অনেকগুলি

ধর্ম্ম, নীতি, পারিবারিক প্রেম এবং স্বভাব দর্শন বিষয়ক কবিতা প্রকটিত হইয়াছে। লেখক ধর্ম্মানুপ্রেরিত হইয়া অধিকাংশ কবিতা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার লেখা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের যেরূপ চিন্তাশীলতা ও বর্ণনা শক্তি আছে তাহাতে অনুশীলনে কালে একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

বরষায়।

বলগো প্রকৃতি সখি কিসের এ দুঃখ তোর,
অবিরত কেন এত বহিছে নয়ন-লোর?
তিলেক বিরাম নাই,এত কি অসীম ব্যথা,
মুছিতে পারনা আঁখি, কহিতে পারনা কথা?
তরুলতা যত ওই নীরব নিস্পন্দ হোয়ে,
ও ম্লান মূরতি পানে অনিমেষে আছে চেয়ে।
আকাশে উড়ে না পাখী, গাহে না প্রেমের গান,
তোমার বিষাদে সখি,সবারি ব্যথিত প্রাণ।
পথেতে চলেনা লোক, যে আসে সে ধীরে যায়,
পাছে কারো অবিচারে ও প্রাণ বেদনা পায়।
কি দুঃখ তোমার সখি,কেন এত আঁখিজল!
তিতিল যে ত্রিভুবন—ভাসিল যে ধরাতল।
কার তরে এত ব্যথা? সে কি গো ধরণী-ছাড়া,
পরশে না প্রাণ তার এত তোর অশ্রুধারা?
অথবা সে নিরমম, ধরণী ভাসিল যায়,
তার সে পাষাণ প্রাণ গলে না স্বজনি! তায়!
নীরব নিশ্চল হয়ে শুধু বরষিবে আঁখি,
কবে না একটী কথা, বারেক চাবে না সখি?
তবে কাঁদ স্বজনিলো! ব্যথিত হৃদয় যার,
অবিরাম প্রাণভরে কাঁদা বড় সুখ তার;
ঢাল আরো অশ্রুজল, ভাসাও ধরণী-কায়;
আমারো তোমারি সনে কাঁদিতে যে সাধ যায়।

শ্রীবনলতা দেবী।

সন্ধ্যা বালা।

সাঁঝের মলিন ছা'য়
ঢাকিল ধরণী কায়,
রবির উজল কর দূরে ভেসে যায়,
প্রকৃতির কোলে গিয়া আপনি লুকায়।
নীরব তটিনী রাণী
কলোক কল্লোলিনী,
শ্রান্ত দেহখানি লয়ে তীরেতে ঘুমায়,
কমল সরসী সখী ঢলে পড়ে গায়।
সুনীল অম্বরপটে,
তারকা চন্দ্রমা ফুটে,
সমীরণ ছুটাছুটি করে নাক আর,
পারি না খেলিতে এবে শ্রান্ত দেহভার।

বনগুলি নিরবিলি
বিপিনে ফুটন্ত কলি,
নীরবে ছড়ায় বাস অতি ধীরে ধীরে,
চলে যায় সন্ধ্যাদেবী চাহেনাক ফিরে।
নড়ে না গাছের পাতা,
কহে না একটি কথা,
যেন কত বিষাদের ছায়া জাগে প্রাণে,
অথবা বলিবে বুঝি রজনীর কাণে।
নিঝুম নিকুঞ্জ বাটী,
বালা বসে একেলাটি,
একমনে শূন্যপানে স্থিরদৃষ্টে চায়,
আকুল নিশ্বাস তার বায়ুতে মিশায়।
অধরের পাতা দুটি
থেকে থেকে কেঁপে উঠি
শিশিরের বিন্দু সম কপোলে বহায়.
অনিমেষ আঁখি-তারা কাহারে খোঁজায়।
ঘুরি ফিরি সারাদিন,
পাখী শাখে সমাসীন,
এ দিক্ ও দিক্ করি আঁখিটি নাচায়,
বালিকার শুভ্র মুখ চোখে পড়ে যায়,
বিহগিনী ডাকে সখী
মেলগো কমল আঁখি
তেয়াগিয়া ঘুমঘোর উঠ উঠ জাগি,
অতীত স্মৃতির কোলে মগন কি লাগি?
রজনীর অন্ধছায়
এখনি ডুবিবে হায়!
কানন বিটপী লতা ফল ফুল কলি,
আঁধারের মহাগর্ভে পড়ে যাবে চলি।
সন্ধ্যার কোমল আলো
ক্রমে ক্রমে হবে কালো,
ঢাকা যাবে অতীতের মধুমাখা স্মৃতি,
মিশে যাবে অন্ধকারে বর্ত্তমান প্রীতি।
ভবিষ্যৎ চিন্তা যত
সকলি হইবে হত,
জীবনের আশাগুলি হবে অপহৃত,
শুকাইবে পরাণের ব্যথা-ভরা ক্ষত।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আঁধার।

যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার,
যে ঘরে সকাল বেলা,
শিশুতে না করে খেলা,
সেথা না আলোক ফুটে সোণালী ঊষার।
যেথা শিশু মা মা বোলে,
আসেনাক মার কোলে,
সে ঘরে পড়েনা ছায়া কভু জো[illegible]।
যে ঘরে দুরন্ত ছেলে,
এটা ওটা টেনে ফেলে.
হাসেনা মধুর হাসি স্মরণ সুধার।
সে ঘর আঁধার ভরা,
সংসারের শুকতারা,
শিশু হেসে আসেনাক [illegible] মাথার।
শুভ্র কুসুমের দল,
অকলঙ্ক নিরমল,
যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার।
আমার সাধের ঘরে,
ঊষাও আসিত যে রে,

জোছনাও ছড়াইত মণিময় হার।
শিশুও করিত খেলা,
ফুলও ফুটিত মেলা,
বিহগ (ও) গাহিত গীতি স্বরগ সুধার।
আজ নেই গেছে চলে,
আমি আছি শূন্য কোলে,
আমার স্বরগ স্বপ্ন ভেঙ্গেছে আবার।
সুখের সংসারে থাকি,
সুখ বিভু! নেই বাকি;
পড়ে আছি কবে যাব, বাছারা আমার
এত স্নেহ সুখ ফেলে,
যেথায় গিয়েছে চলে,
নবীন কোনও রাজ্য ছিল আকাঙ্ক্ষার।
কি ভাগ্য কারেই বলি,
কার বা কথায় ভুলি,
মানবের ছুটো কথা শুধু সান্ত্বনার—
তাতে কি এ জ্বালা যায়?
এ যে অসহন হায়!
দাও শক্তি সয়ে রব শুধু বলে যায়।
গিয়েছে তোমার কোলে,
আমার এ কোল ফেলে,
সুখে রেখ, এই শুধু মিনতি আমার।
শ্রীস—দেবী।

বিরহ-গীতি।

একা যদি আসিয়াছি যাব যদি একা,
(সে) কেন দিল দেখা?
ঢালিলা এ প্রাণে কেন এত স্নেহরাশি;
দয়া পরকাশি।
এত যদি স্নেহ তার কেন গেলা চলি,
করি হৃদি খালি?
তার সে মধুর স্মৃতি পুনঃ কি কারণে,
জাগে এ পরাণে?
পরাণে তাহারি কথা জাগে নিরন্তর,
(তার) স্নেহ-পূর্ণ স্বর।
অলক্ষ্যে এ হৃদি মম করেছে সে চুরি,
(এ যে) বড় বাহাদুরি।
পরাণে পরাণে আজি বান্ধি প্রেমডোরে,
চলি গেলা দূরে।
তুচ্ছ এ জীবন মম তুচ্ছ এ সংসার,
সেই মাত্র সার।
নিঠুর সংসার আজি হোক্ দূরতর,
বাসনা আমার।
অলক্ষ্যে বিজনে বসি স্মরি সেই নাম,
যাক্ এ পরাণ।
যে দেশে গিয়াছে সেই, সে দেশে কি হায়!
সদা জ্যোৎস্না ভায়?
যে যায় সে নাহি ফিরে,—ছাড়ি স্নেহ ধন,
সবে করিছে গমন।
এত কি অমৃত-ভরা সেই দেব-দেশ,
নাহি দুঃখলেশ?
নাহি সেথা জরা মৃত্যু শোক অশ্রুধার,
নাহি হাহাকার?
সত্য কি সে না ফিরিবে না হইবে দূর
মম অশ্রু নীর?
হোক্ তবে হোক্ আজি হোক্ অবসান
এ শূন্য পরাণ।
সুদীর্ঘ বিরহ পরে হবেরে মিলন,
সেই শুভক্ষণ।
শ্রীমতী রেবা রায়।
কটক।

বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵৹, পশ্চাদের বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে।৹ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেন্টের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অনূ্ন এক বর্ষের জন্য প্রতিবার মলাটের ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা ২৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।৹। বিজ্ঞাপন বদলাইতে হইলে পূর্ব্ব ইংরাজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ঠিক্ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা যেরূপ থাকিবে, সেইরূপ ছাপা হইবে। অপরাপর নিয়ম বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজি মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতুবা আমরা দায়ী হইব না।

৫। কাহার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৬। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ ও লক্ষ্মীপ্রসাদ বামাবোধিনীর সরকাররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা ও উপনগরস্থ গ্রাহকগণ কার্য্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত বিল লইয়া ইহাদের হস্তে বামাবোধিনীর মূল্যাদি প্রদান করিবেন। অন্যথা টাকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও হরিমোহন ঘোষাল বামাবোধিনীর এজেন্ট হইয়া মফস্বল ভ্রমণ করিতেছেন। গ্রাহকগণ কার্য্যাধ্যক্ষের ও এজেন্টের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত বিল লইয়া তাঁহার হস্তে টাকা দিলে, আমরা দায়ী হইব।

৮। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা তাহা অন্য নামে না পাঠাইয়া, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ১৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৯। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। যদি কাহার নাম প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

১০। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি সম্পাদকের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিষয়ে যোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

"বামাবোধিনী" কার্য্যালয়,
১নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

No. 404 September, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৬ বর্ষ। ৪০৪ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩০৫—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ষট্‌ত্রিংশ শুভ জন্মোৎসব।

শরৎ আকাশে
পূর্ণচন্দ্র ভাসে
তারাহার গলে পরি,
দিগঙ্গনাগণ
করিছে বরণ
জলদে মুখ আবরি।
দেখিতে দেখিতে
একি আচম্বিতে
ফেলি প্রেম-অশ্রুধারা,
ক্ষিতিরে গগন
করে আলিঙ্গন,
মহাভাবে মাতোয়ারা!
প্লাবনে অমনি
ভাসিল ধরণী,
নদী জলে কানেকান;

মাঠ ঘাট বাট
সব এক ঠাট,
ছুটে 'ষাঁড়া-ষাঁড়ী' বাণ*।
নবধৌত বাস
পরিয়া সুহাস
হাসে তরুলতাগণ;
কামিনী কহলার,
যূথী জাতি আর
ফুটে ফুল অগণন।
জল স্থল শূন্য
নব শোভা পূর্ণ,
সৌরভে আমোদময়;
নব আশা হৃদে

*ভাদ্রমাসে জলের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে ভয়ঙ্কর বাণ হয়, ইহাকে 'ষাঁড়া-ষাঁড়ী' বাণ বলে।

পাইয়া সুহৃদে
পুলকিত কৃষীচয়।
জীবের জীবন
করিতে পালন
অজস্র বিধির দান;
দেখ নারী নরে
সংবৎসর তরে
(কত) অন্ন জল সুবিধান!
এ হেন সময়
বিভু কৃপাময়
খুলি প্রেম-উৎস-দ্বার,
বামাবোধিনীর
জীবন নদীর
করিলা শুভ সঞ্চার।
নারী হিত-ব্রত
সাধিয়া নিয়ত
সার্থক করিতে প্রাণ,
কত আশা লয়ে
কত দুঃখ সয়ে,
হয়েছে সে আগুয়ান।
পর্ব্বত-আকার
বাধা বিঘ্ন তার
পথের করিয়া দূর,
আশার অতীত
ফল অকথিত
কে বিধানিল প্রচুর?
বিশ্ববিধাতার
করুণা অপার
মহিমা অসীম ভবে;
এ ক্ষুদ্র পরাণ
তার সাক্ষ্য দান
করিবে যাবৎ রবে।
শুভ জন্মোৎসবে
ভাই ভগ্নী সবে
গাও বিভু-গুণ-গান,
ভক্তি উপাচারে
পূজিয়া তাঁহারে
সফল করি এ প্রাণ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট বন্ধ—গত আগষ্ট মাসে পার্লেমেণ্ট বন্ধ উপলক্ষে মহারাণীর বক্তৃতা হয়। তাহাতে ভারতের প্লেগের উল্লেখ ছিল। প্লেগ নিবারণ জন্য রাজকর্ম্মচারী-দিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে।

রাজপ্রতিনিধি—বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন নবেম্বর মাসে শৈলাবাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন, পরে ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিয়া ডিসেম্বরের শেষে ভারত হইতে বিদায় লইবেন। ইংরাজী নববর্ষের প্রথম হইতে নূতন রাজপ্রতিনিধি মাননীয় লর্ড নাথানিয়েল কর্জনের রাজদণ্ড গ্রহণের সম্ভাবনা।

বিরাট সভা—আগষ্টের শেষ দিনে কলিকাতায় টাউন হলে এক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। নগরবাসিগণ মিলিত

হইয়া প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের যথেষ্ট কারণ আছে, এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

স্পেন-মার্কিন-সন্ধি—ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে সন্ধিবন্ধনের সহায়তা করিয়াছেন। বিজয়ী আমেরিকা তাঁহার রক্ষণাধীনে কিউবার স্বাধীনতা, এবং পোর্টরিকো ও লুজনদ্বীপের অধিকার দাওয়া করিয়াছেন।

শিশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা—জজ ট্রাট ও কতকগুলি খৃষ্টীয় মিসনরী পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার অনুকরণে এই সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার ফল কিরূপ হয়, দেখিবার কথা।

বাবু আনন্দমোহন বসু—ইনি এক বৎসর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতায় যেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, সেইরূপ ভারতবাসীদিগের প্রতি বহুসংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি মহা আদরে ও সমারোহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

ঘটার বিবাহ—রাজপ্রতিনিধির কন্যা লেডী এলিজেবেথ ব্রুসের শুভবিবাহ আগামী ২২এ সেপ্টেম্বর হইবে, লাহোরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পৌরোহিত্য করিতে আসিতেছেন।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—আগামী অক্টোবর হইতে সংবাদপত্র সকলের বিনা টিকিটে যাইবার অধিকার উঠিয়া যাইতেছে। ৫ এক পয়সার টিকিট বিলাত হইতে আসিতেছে, তাহাতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের কাগজ যাইবে, ১০ পয়সার টিকিটে ২০ তোলা পর্য্যন্ত যাইবে। বৎসর বৎসর কাগজ রেজেষ্টারী করিতে হইবে।

মৃত্যু—(১) গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক কেয়ার্ডের মৃত্যু হইয়াছে। (২) যে ফরিদকোটের রাজা সেদিন ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সমারোহে একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। (৩) ডাক্তার অমূল্য চরণ বসুর মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় শোকান্বিত হইলাম। ইনি একজন দেশহিতৈষী সাধু-চরিত্র দীনবৎসল চিকিৎসক ছিলেন। (৪) বঙ্কিম প্রেসের স্বত্বাধিকারী বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি, এলের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত হইলাম। ইনি বামাবোধিনীর একজন লেখক ছিলেন এবং স্ত্রীজাতির হিতকল্পে "গৃহলক্ষ্মী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন।

পারিস প্রদর্শনী—আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে যে মহা প্রদর্শনী হইবে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অরণ্য ও পর্ব্বতজাত পদার্থ সকল পাঠাইবেন, তাহাতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

(৪০৩ সংখ্যা ১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

১১। ইউরোপের আল্‌প্‌স পর্ব্বতে আরোহণেচ্ছুগণ একত্রিত হইয়া একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর সুবিধাজনক সময়ে উক্ত পর্ব্বতের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিবার জন্য সমবেত চেষ্টা হয়। ইঁহারা আলপ্‌স পর্ব্বতের উপরেই একটী সভা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সভাগৃহটী পর্ব্বততল হইতে বার হাজার ফিট উপরে! ইউরোপ খণ্ডে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে মানবের বাসগৃহ নাই।

১২। সমস্ত ভারতবর্ষে চারি শত নব্বই খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু একমাত্র লণ্ডন নগরীতে চারি শত তিরাশিখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৩। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মসম্প্রদায় দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত;—প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান কাথলিক। ইউরোপের অন্তঃপাতী সুইডেন প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান বাস করেন। তথাকার ৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৯৮ হাজার প্রটেষ্টাণ্ট, এবং কেবল দুই হাজার মাত্র লোক রোমান কাথলিক শাখাভুক্ত।

১৪। অল্পকাল পূর্ব্বে জাপান নানা বিষয়ে চীন অপেক্ষা হীন ছিল, কিন্তু জাপানীদিগের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কার্য্যতৎপরতা, ও বুদ্ধিমত্তা আজ জাপানকে চীন অপেক্ষা উন্নতির উচ্চতর সোপান আরোহণে সমর্থ করিয়াছে। এক্ষণে চীন জাপানের দ্বারে শিক্ষা, দীক্ষা ও ভিক্ষার আকাঙ্ক্ষী। এক্ষণে চীনবাসী যুবকগণ জাপানে শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষার্থ গমন করিতেছেন; কি প্রকারে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হয়, সে মন্ত্রেও জাপানীদিগের হস্তে দীক্ষিত হইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না, এবং তাঁহাদিগের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছেন। চীনের রক্ষণশীলতা ও আলস্য পৃথিবীর বিবিধ পতিত জাতির পক্ষে শিক্ষার স্থল।

১৫। সর্ব্বদা নিষ্ঠীবন (থুথু) প্রক্ষেপ করা একটী কু-অভ্যাস। ইহা প্রক্ষেপকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, গৃহের অপরিস্কারতাজনক। নিষ্ঠীবনপ্রক্ষেপকারী কোনও পুরাতন রোগগ্রস্ত হইলে তাঁহার নিষ্ঠীবন উক্ত রোগের বীজ-সঞ্চারক। অষ্ট্রেলিয়ায় নিয়ম আছে সাধারণের ব্যবহার্য্য কোনও অট্টালিকার মেজের উপর যে কেহ নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিবে, তাহাকে বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। তথায় নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ অপরাধ জন্য সত্তর টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা যাইতে পারে।

১৬। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য এত বৃহৎ যে, সূর্য্যের মধ্যভাগ যদি শূন্য হইত, তাহা

হইলে ৩. লক্ষ পৃথিবী তাহার মধ্যে রক্ষিত হইতে পারিত।

১৭। তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণ জন্ত সমুদ্রের নিম্ন দিয়া যে সকল তার ফেলা হইয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭ শত ৯০ মাইল। এই কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৩ শত ৬০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৭। কোরিয়া প্রদেশে প্রথা আছে যে যতদিন রাজা কুমার থাকেন, কিম্বা স্ত্রী-বিয়োগের পর অবিবাহিত থাকেন, তত-দিন তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কেহই বিবাহ করে না। এই প্রথা প্রচলিত থাকার কারণ এই যে, রাজা নিজে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্য হইতে পাত্রী নির্ব্বাচন করেন, সুতরাং যতদিন রাজা অবিবাহিত থাকেন, ততদিন সকল শ্রেণীর বিবাহযোগ্যা কুমারীগণের রাণী হইবার আশা বলবতী থাকে, সুতরাং রাজার বিবাহ কিম্বা পাত্রী নির্ব্বাচিত না হইলে কোনও অবিবা-হিতা যুবতীই বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন না।

১৮। ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে সমুদ্র-পথে আসিবার পথ সর্ব্ব প্রথমে পোর্ত্তুগেল-দেশীয় নাবিক বাস্কো দি গামা আবিষ্কার করেন। তিনি ১৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই লিসবন নগর পরিত্যাগ করেন। ঐ দিনের চতুর্থ শত বাৎসরিক উৎসব, গত বৎসরের ৮ই জুলাই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন ভারতের পক্ষেও এক মহাদিন, কেননা ইউরোপের সহিত যোগ নিবদ্ধ হওয়াতে ভারতের যে উত্তরোত্তর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

১৯। অনেক পাঠিকা বোধ হয় অবগত নহেন যে, আমাদের সৌর জগতের গ্রহের সংখ্যা দুইটী চারিটী করিয়া আবিষ্কৃত হইয়া এক্ষণে ৪১৬টী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২০। গ্রীণলণ্ডে একখানি সংবাদপত্র আছে, তাহার নাম অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর অন্ত কোনও স্থানে ঐরূপ দীর্ঘনামবিশিষ্ট সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। নামটী গ্রীণলণ্ডের ভাষায় রচিত,—অতনগল্-লিন্তিৎ রলিং ইং ইনারমিক্ নুনারমি নাসুমিক্। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রনামবিশিষ্ট সংবাদপত্র আমেরিকায় ইলিনয় প্রদেশে প্রকাশিত হয়। উহার নাম X (এক্স)।

২১। আফ্রিকার অন্তঃপাতী কঙ্গো নামক নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এক বামন জাতি বাস করে। তাহারা সাড়ে তিনহস্তের অধিক লম্বা হয় না। মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে। ইহারা অতি সাহসী এবং সামান্ত কারণেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা উদ্ভিজ্জজাত বিষে শরাগ্রভাগ সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অতি সহজে শত্রুনিপাত করে। কোন্ বৃক্ষ বা লতা হইতে বিষ আহরণ করা যায়, তাহা এই বামন জাতি বিশেষ অবগত আছে। ইহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশবাসী কাফ্রিবর্গ ঐ সকল বিষপ্রদ বৃক্ষ লতার বিষয় কিছুই জানে না।

২২। উত্তর জর্ম্মণির অন্তঃপাতী হিদল্‌শিন্ নামক নগরে একটী খ্রীষ্টীয় উপাসনালয়ের প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহৎ গোলাপগাছ আছে। ইহা ৪০ ফিট উচ্চ, এবং শাখা প্রশাখায় অবনত হইয়া প্রস্থেও ৩৫ ফুটের কিছু অধিক। প্রবাদ আছে যে, ৮৩৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে এই গাছটী রোপিত হয়। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এই বৃক্ষের বয়স যে তিন শত বৎসর অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

২৩। কাগজে লিখিবার পেন্সিল পূর্ব্বে সীসা সহযোগে প্রস্তুত হইত; এক্ষণে উহা প্রাকাইট্ নামক এক প্রকার ধাতু ও জর্ম্মণিতে উৎপন্ন পাইপ ক্লে নামক এক প্রকার মৃত্তিকা সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাকাইট্ এক প্রকার বিশুদ্ধ অঙ্গার। আমেরিকার কোন কোন স্থানে ইহার খনি আছে।

স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী।

অশীতির বৃদ্ধ ঋষির মূরতি,
বালকের মত কোমল প্রকৃতি,
ভাবে গদগদ প্রেমে আত্মহারা,
পরমেশ-নামে চোখে বহে ধারা!
সত্যে নিষ্ঠাবান্ বিশ্বাসে অটল,
শান্ত শিষ্ট ধীর বিবেকী সরল।
প্রেমিক সুজন স্বদেশানুরাগী
কর্ম্মে মহাকর্ম্মী যোগে মহাযোগী।
জ্ঞানেতে প্রবীণ নাহি অভিমান,
প্রাণের অধিক জাতীয় সম্মান।
জাতীয় গরবে গর্ব্বিত যে জন,
সে কি করে খর্ব্ব জাতীয় জীবন!
স্বজাতির কুৎসা শুনিলে শ্রবণে
তীব্র প্রতিবাদ করি সেইক্ষণে
দেখাইলা কত চরিত্রের বল;
নীরব অমনি নিন্দুকের দল।
উচিত বলিতে ভীত নহে মন,
মহাপুরুষের এইত লক্ষণ।
এমন সোণার রামতনু হায়!
হারাইয়া আজি কাঁদিছেন মায়!
এ হেন রতনে চিনে কয় জনে?
রতন নহিলে রতন কে চেনে?
চিনিবার লোক বড়ই বিরল,
সাধে কি ভারত গেছে রসাতল।
গুণের আদর করিতে যে জাতি
না শিখিল,—বল কেমনে সুখ্যাতি
গৌরব সে জাতি পাইবে জগতে?
দেশের দুর্দ্দশা কি আছে এ হতে?
সভা সমিতিতে কি হবে মাতিলে
মহৎ চরিত্রে সম্মান না দিলে?
ভারতসন্তান ভকতি-ভাজনে
ভকতি অর্পেতে পূজ কায়মনে।

ধার্ম্মিকের কথা সুমধুর গাথা
থাকে যেন সদা হৃদয়েতে গাঁথা,
চরিত্রকাহিনী করিবে শ্রবণ—
প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন
জননীর সেই অমূল্য রতন
পদচিহ্ন রেখে,— জনমের তরে
নিমগন এবে কালের সাগরে।
গিয়েছে ঈশ্বর গিয়েছে কেশব
একে একে দেখি চলে গেল সব!
অবশিষ্ট তার ছিল একজন,
দেবোচিত ভাব দেখায়ে সে জন,
আঁধারি ভারত কাঁদাইয়া যায়
আনন্দেতে আজ ছুটিল সেথায়—
দেবতার দেশ— অমর ভবন
বিরাজে যথায় নন্দনকানন।
শত মন্দাকিনী বহে দিন রাত,
বিরাজে বসন্ত ফোটে পারিজাত!
যাও যাও দেব যাও নিজ বাসে,
মনসাধ কার মিটে এ প্রবাসে?
পূরাও বাসনা অনন্ত জীবনে
স্নেহময়ী-কোলে প্রেমামৃত পানে!
মজে থাক সেথা অনন্ত আরামে,
ভুঞ্জ মোক্ষফল গিয়ে মোক্ষধামে!
পূরিবে কামনা মিটিবে পিয়াস,
আনন্দে বিহর স্বর্গসুখ বাস।
ও পূত চরিত্র করিয়ে স্মরণ
ধন্য হই মোরা বঙ্গবাসিগণ॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

মাতৃশ্রাদ্ধে নিত্য পাঠ্য।*

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥১॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥২॥

গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।

যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥৩॥

জীব যাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে ও যাঁহার স্নেহে জীবিত থাকে, সেই মাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জগজ্জননী, মাতার সমান গুরু আর কে আছে?

গুরূণামেব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥৪॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন; মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥৫॥

সন্তান জন্মিলে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ

* স্বর্গীয়া কৈলাসকামিনীর পুত্র কন্যাগণ তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন হইতে একমাসকাল প্রত্যহ ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার নিত্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

করেন, পুত্র কন্যারা শত বর্ষেও তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না।

আশিষো যা প্রযুঞ্জাতে প্রীতৌ পুত্রগুণৈর্হি তৌ।
তা এব খলু পুত্রস্য স্বর্গসোপানসন্ততিঃ ॥৬॥

মাতা পিতা সন্তানের গুণে পরিতৃপ্ত হইয়া যে সকল আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন, তাঁহাদের সেই এক একটী আশীর্ব্বাদ সন্তানের স্বর্গারোহণের এক একটী সোপানস্বরূপ।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে,
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এবতু দুষ্কৃতং। ৭

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, এবং একাকী স্বীয় দুষ্কৃতিফলও ভোগ করে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ,
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। ৮

বান্ধবেরা মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টের ন্যায় ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান, ধর্ম্মই কেবল তাহার অনুগামী হয়েন।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ। ৯

পরলোকের সহায়ের নিমিত্ত পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকে না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

তস্মাৎ ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং। ১০

অতএব আপনার সহায়ের নিমিত্ত প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, জীব ধর্ম্মের সহায়তাতেই দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ১১

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই; ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষে মধুস্বরূপ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রভাতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"লম্বিত ঘন কেশ শুভ্র উজল বেশ,
অধর মধুরহাসিনি!
নমঃ নমঃ সরস্বতি! দেবি ভারতি!
পীযূষ ভাব-ভাবিনি!"

প্রভাতীর কোমল জীবন বড়ই পবিত্র। প্রভাতী যখন তাম উপবনে সুনীল সন্ধ্যার কনক কিরণে প্লাবিত কুঞ্চিতাগ্র কেশ-কলাপে সজ্জিত হইয়া হাসি মুখ লইয়া সদ্যোগ্রথিত পুষ্পমাল্যে স্বামিপূজার কার্য্যে বিব্রত হইত, তখন তাহাকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

প্রভাতীর ক্ষুদ্র জীবন এক মহান্ ভাবে পূর্ণ। ধর্ম্মই তাহার জীবনের জীবন, হৃদয়ের পরম ধন। এ নশ্বর

সংসারে এমন কি প্রিয় বস্তু আছে যে ধর্ম্মের জন্য সে তাহা ত্যাগ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইবে? প্রভাতীর ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়া অনেক ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহাকে অনেক দুঃখের বিভীষিকা দেখিতে হইয়াছে। কখন কখন প্রবল দুঃখাতিশয্য বশতঃ তাহাকে ম্রিয়মাণা হইতে হইয়াছে। স্নেহ-স্বরূপিণী জননীর উন্মাদ রোগ এবং নিরুদ্দেশ, স্নেহপ্রতিম পিতৃদেবের অকস্মাৎ মৃত্যু, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতৃধনের অকাল-বিয়োগ, মাতৃসমা ভগ্নীর বালবৈধব্য এবং অকালে ইহলোকত্যাগ, এইরূপ নানা দুর্ঘটনা ও বিপদেও তাহার হৃদয়ের ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল বা বিচলিত করিতে পারে নাই। তাহার বিশ্বাস, "দুঃখ কি?" দুঃখ ত মা মঙ্গলচণ্ডিকার পরীক্ষা স্বরূপ। সে সুখের ভিতরে যেমন—দুঃখের ভিতরেও তেমনি প্রভূত শক্তিস্বরূপিণী অনন্তরূপিণীর মঙ্গলময় হাত দেখিত।

"যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ;
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
(আমি) তার হই দাসের দাস।"

সে শৈশবকালে মাতার নিকট এই কথাটী শুনিয়াছিল। এখনও তাহা তাহার মনে আছে। এই কথাটী অবলম্বন করিয়া সে দারুণ দুঃখের দুর্ব্বহ জীবনকে সুখময় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুমতী প্রভাতীর সখী। মধুমতীর সরল জীবন প্রভাতীর মধুময় সরস জীবনের সঙ্গে একত্র হইয়া বড় সুমধুর হইয়াছে। মাতৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-স্নেহে এবং বহু আত্মীয় স্বজনের যত্নে সম্বর্দ্ধিত ধনি-গৃহের একমাত্র কন্যা মধুমতী সখী, প্রভাতীর জীর্ণ পর্ণগৃহে অধিক সময় যাপন করিত।

একদিন মধুর অপরাহ্নে একটী কুসুমিত শ্যাম কাননের প্রান্তভাগে এক শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে উপবেশন করিয়া দুই সখীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সেই পুষ্পিত বনের অনতিদূরে তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া শোভা নামে পদ্মগন্ধে সুরভীকৃত এক স্রোতস্বতীর সলিল বহিয়া যাইতেছে। শোভার বালুকাময় ভূমিতে চক্রবাক চক্রবাকীসহ মৃণালকন্দ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। নলিনীদলের ছায়ায় হংস-মিথুন মৃদু তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া কম্পিত হইতেছে, তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে যেন তাহারা অনিন্দ্যরূপা নলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে। সেই স্বচ্ছ ছায়াচ্ছন্ন চ্যুতমুকুল-গন্ধ বিকিরিত পুষ্পিত বনতলে প্রভাতী ও মধুমতীকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। অপরাহ্নের লোহিত রৌদ্রে সুরঞ্জিত বসন্তবায়ু স্পর্শে কম্পিত পাদপপত্র সকল তাহাদের রূপেই যেন রমণীয় বোধ হইতেছিল।

তাহাদের সম্মুখে আগুবিলম্বিত কেশরশিখা-বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত শিরীষ-কুসুমের উপরিভাগে কুঙ্কুম-রস-চৌর্ক্ক-মধুকর বিচরণ করিতেছে

শোভন বপুতে রত্নালঙ্কার ও মুক্তাহারদ্বারা সংবর্দ্ধিত রূপে অঙ্কুরোদ্গতা স্বর্ণময় কল্পলতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কনকনিকষের সুস্নিগ্ধ বিদ্যুৎবৎ প্রভাতী তরু-কুসুম ও কিশলয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-বিভূষিতা। রক্ত কুবলয়শোভিত করাগ্রে কপোলতল বিন্যস্ত করিয়া সে কহিল "গাও গাও আমার মাথা খাও সেই গানটী আবার গাও।" দেহের পশ্চাৎস্থিত কেতকী শাখা সংলগ্ন অঞ্চলখানি টানিয়া লইতে লইতে মধুমতী গাইল :—

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত-রমণী-পানে,
কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে?
অজ্ঞান আঁধারে তারা, হয়ে আছে পথহারা,
হয়ে সুখশান্তি হারা ভ্রমিছে ভব-কাননে।
কোমল কুসুম-সম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা-মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন;
সমাজ চরণতলে, তাদের সতত দলে,
রাখহে রাখহে প্রভু দুঃখিনী রমণীগণে।
বিধবা-নয়নাসার, ঝরিতেছে অনিবার,
ভাসায়ে ভারত-হৃদি, দেখিতে বাঁচি কেমনে?
তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়ে আঁখি-জল,
উদ্ধারিবে দুঃখিনীয়ে, জুড়াবে তাপিত প্রাণে॥

গাইতে গাইতে যখন ভগবৎপ্রেমের ভাবতরঙ্গ গভীর হইতে গভীরতর ভাবে উছলিয়া উঠিল, তখন সেই সলজ্জ মৃদু-কম্পিত কণ্ঠ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া কোকিল-কাকলিত ও পুষ্প-সুরভিত মধুর বনকে মধুরতর করিয়া তুলিল। এইরূপ অনেকক্ষণ গাইয়া সেই উচ্চ কণ্ঠ মৃদু হইতে মৃদুতরে পরিণত হইয়া পরে বিলীন হইয়া গেল। আপনার চক্ষের ভক্তি-বিগলিত অশ্রুজল মুছিয়া মধুমতীর অশ্রু-পূর্ণিত মুখকমল চুম্বন করিয়া প্রভাতী কহিল "তুমিই যথার্থ নারীজন্ম ধারণ করিয়াছিলে।" বলয়ালঙ্কৃত হস্ত দ্বারা প্রভাতীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মধুমতী কহিল "তুমি যাহা কহিয়াছ তাহা নিশ্চয়ই সত্য, কারণ আমি শিশিরময়ী প্রভাত-কালীন পদ্মিনীর ন্যায় প্রভাতীর সমাগম সুখ অনুভব করিতেছি।"

প্রভাতী মধুমতীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সুরপন্নাগ-মাল্য-পরিবেষ্টিত দেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঠিক্ সেই সময় দ্বাবিংশ বৎসরের একটী নবীন যুবক অতি সুন্দর মূর্ত্তি ও সহাস্য মুখ লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্তে একখানি চিত্র ছিল। "কোতল খাঁর কারাগৃহে জগৎসিংহের সম্মুখে মহামহিমাময়ী আয়েসার কোলে তিলোত্তমার মূর্চ্ছিত দেহ" এই চিত্রে প্রদর্শিত।

(ক্রমশঃ)

পরা বিদ্যা।

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণনিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"—মুণ্ডকোপনিষদ।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ঋষি চতুর্ব্বেদ ও ছয় বেদাঙ্গকে অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিলেন, আর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কি? না যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়। হিন্দুদিগের ধর্ম্মের মূল বেদ, তাহাকেই হিন্দু ধর্ম্মোপদেষ্টা অশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, ইহার কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা বেদ অর্থে লিখিত পুঁথি মনে করেন না, অনাদি অনন্ত যে বেদ, তাহা অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের সহিত বর্ত্তমান। দেশবিশেষে, কালবিশেষে ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তিবিশেষে তাহার এক এক কণা প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মবাণী মানবভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া মানবের বুদ্ধিকল্পনা সহযোগে তাহাই শাস্ত্ররূপে রচিত হইয়াছে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থজী, গীতা ও ভাগবত, সকলই এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র আকারে গঠিত ও পূজিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবাণী কি পূর্ণরূপে লিপিতে বদ্ধ হইতে পারে? মানব-আত্মাতে যাহা জীবন্ত জ্ঞানালোকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যে আলোকে অগম্য অব্যক্ত ব্রহ্ম-স্বপ্রকাশরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পুস্তকের মৃত ভাষা তাহার ছায়ামাত্র, তাহাতে কি সারাৎসার পরম বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করাইতে পারে? এইজন্য চতুর্ব্বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতিদর্শন ও সমুদায় পুরাণ তন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াও এক ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বহুদূরে থাকিতে পারে—এমন কি নাস্তিক হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে। একটী পশু গ্রন্থরাশি পৃষ্ঠে বহন করিলে সে গ্রন্থভারবাহী চতুষ্পদ, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপণ্ডিত সেইরূপ শাস্ত্রভারবাহী দ্বিপদ জীবমাত্র।

এরূপ জীব কতই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত চৈতন্যের সমসাময়িক অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামী যিনি শেষ জীবনে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনবাসকালে "Confessions of Augustine" অগষ্টাইনের আত্মদোষ স্বীকারের মত নিজ খেদব্যঞ্জক এক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে আছে "অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু অজ্ঞানতা গেল না।" এক ব্রাহ্ম কবিও গাহিয়াছেন—"কি হবে সে জ্ঞানে যাতে

তোমারে না পাই।" ভক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও বলিতেছেন, "বেদে দিল চকে ধূলো, ষড়্‌দর্শন অন্ধগুলো।" ঋষি এই ভাবে বেদ সকলকে অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অপরা বিদ্যা দ্বারা কি লাভ নাই, এ কথা কে বলিবে? ইহা দ্বারা সংসারের সহস্র লাভ হইতে পারে, কিন্তু সংসারের অতীত পরম বস্তু লাভ হইতে পারে না। সে বস্তু লাভ হইতে পারে কিসে? পরা বিদ্যা দ্বারা। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায়, সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কোথায় আছে? ইহা যদি বেদে নাই, বেদাঙ্গে নাই, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নাই, তবে কোন্ শাস্ত্রে আছে? উপনিষদের এক আখ্যায়িকায় আছে ব্রহ্মবিদ্যা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা আপ্তবাক্য "Revelation." কিন্তু এ আপ্তবাক্য কোনও লিপিবদ্ধ জিনিষ নহে, ইহা সত্যের প্রস্রবণ স্বয়ং ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত হইয়া সাক্ষাৎভাবে মানবাত্মাতে অবতীর্ণ হয়। এই পরা বিদ্যা ব্রহ্মজ্যোতি, এ বিদ্যা লিখিত শাস্ত্রে নাই, ইহার শিক্ষক গুরুকল্পতরু স্বয়ং ব্রহ্ম। ইহা যখন আসে, তখন "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" দগ্ধ দারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানেই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার, নবজীবন, মুক্তি, পরিত্রাণ লাভ হয়।

দেবলরাজ।*

নদীয়া জেলার অন্তর্গত নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম রাজধানী শ্রীনগর। শ্রীনগর এখন যেমন প্রায় জনশূন্য ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ ঘোরারণ্যে পরিণত হইয়াছে, রাজধানী হইবার পূর্ব্বে যখন ইহার ঐরূপ অবস্থা ছিল, আমি সেই সময়ের অন্ধ পথ-বিচরণে চেষ্টা করিতেছি। বোধ হয়, তখন বঙ্গদেশ "বার ভূঁয়ার" বারটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এখন বঙ্গের যেখানে যত জমীদার ও রাজোপাধিবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী দেখা যায়, তাহার কতকগুলি উপরি-উক্ত বারভূঁয়ার উত্তরাধিকারী এবং কতকগুলি তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারীর উত্তরাধিকারী। দ্বাদশ ভৌমেশ্বরের মধ্যে যাঁহাদিগকে রাজশ্রী প্রথমেই অঙ্কে স্থান দিয়াছিলেন, এই আখ্যায়িকার নায়ক দেবলরাজ তাঁহাদের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম। অথচ বঙ্গের কোথাও তাঁহার একটী উত্তরাধিকারী বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যাপহারক কোন কর্ম্মচারীর

---

* দেবলরাজের রাজধানী "দেবগ্রাম" রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। সুবিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় রায় রামশঙ্কর সেন যখন রাণাঘাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন রায় দীনবন্ধু মিত্রের অনুরোধে দেবলরাজের বিবরণ সঙ্কলন করেন। সেই বিবৃতির মর্ম্মানুসারে এই আখ্যায়িকা লিখিত হইল। প্রঃ লেঃ।

বংশধর বা পৌত্তপুত্র কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঐ সময়ের ভূসম্পত্তি সকলের কিছু না কিছু অংশ অদ্যাপি যে কোনরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দ্বাদশ ভৌমেশ্বরের অগ্রগণ্য দেবলরাজের একটী দীর্ঘিকা ও রাজধানীর চতুষ্কোণে চারিটী "থুব" অর্থাৎ মৃণ্ময় স্তূপ ব্যতীত আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্মৃতিচিহ্ন যে গ্রামে বিদ্যমান, তাহার নাম দেবগ্রাম। দেবগ্রামই দেবলরাজের রাজধানী ছিল। ইতর লোকে উহাকে "দেগাঁ" বলিয়া থাকে। দেবগ্রামের অভ্যন্তর ও উপান্ত সূক্ষ্ম দর্শনে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবলরাজের রাজধানী পরিখা-পরিবেষ্টিত ছিল।

"হাঙ্গর" নামে একটী বক্রগামিনী নদীর চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহার এক মুখ রাণাঘাটের দক্ষিণ চূর্ণি নদীর সহিত এবং আর এক মুখ গোপাল নগরের নিকটবর্ত্তী ইছামতীর সহিত মিলিত। ভৈরব ও হাঙ্গরের ন্যায় বক্রতা বঙ্গদেশীয় আর কোন নদনদীর আছে কিনা সন্দেহ। ভৈরবের তরণীযাত্রিগণ পূর্ব্বাহ্ণে যে স্থানে পাক করিয়া ভোজন করেন, বহু ক্রোশ গমন করিয়াও সন্ধ্যাকালে আবার পূর্ব্বাহ্ণপাকের চুল্লী, হণ্ডিকাদি চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া থাকেন। হাঙ্গরের বক্রতাও এইরূপ। বিশেষতঃ দেবগ্রামের নিকট উহার বক্রতা অদ্ভুত। শুষ্ককালে তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যে বর্ষে ইছামতী নদীতে প্রবল বন্যা উপস্থিত হয়, সেইবার যদি কোন নৌকারোহী হাঙ্গর বাহিয়া চূর্ণিনদীতে আগমনের চেষ্টা করেন, হাঙ্গর নদী দেবলের রাজধানীর নিকটে আসিয়া কিরূপ লীলা করিয়াছিলেন এবং দেবল-রাজ হাঙ্গরের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বকীয় রাজধানীকে কিরূপ পরিখাপরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। হাঙ্গরের তরণীবাহী যাত্রী পূর্ব্বাহ্ণ এক প্রহরের সময় দেবগ্রামের প্রথম "থুব" দর্শন করিলে, প্রদোষকালে চতুর্থ "থুব" দর্শন না করিয়া ঐ গ্রামের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না। বোধ হয় দেবল-রাজধানীকে বলবতী স্রোতস্বতী সুনাব্যা শৈবলিনীরূপা পরিখা দ্বারা পরি-বেষ্টিত করিবেন বলিয়াই বিধাতা পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানে হাঙ্গরের অদ্ভুত বক্রতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তী পরম্পরা এবং ঐতিহাসিক সমন্বয় দ্বারা দেবলরাজের যে বিবরণটুকু জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, উপরি-উক্ত দীর্ঘিকা রাজপুরীর প্রাকার অভ্যন্তরেই বিদ্যমান ছিল। এখন সে প্রাকার, কি রাজপ্রাসাদ কাহারও কোন চিহ্নমাত্র নাই। এখন দেখিলে বোধ হয়, ঐ দীঘিকা প্রান্তর বা কানন মধ্যেই খনিত হইয়াছিল। কিন্তু এককালে অদৃষ্টদেবের অদ্ভুত চক্রে ঐ দীর্ঘিকায় দেবলের দ্বাদশ মহিষী, ষোড়শসংখ্যক কন্যা, পঞ্চদশ পুত্র, পৌত্রাদি শতাধিক পরিজন, কুবের-ভাণ্ডারে আছে কিনা সন্দেহ, এরূপ

মণিমাণিক্যখচিত বহু মণ ওজনের স্বর্ণাভরণ, কোটি স্বর্ণ মুদ্রা, এতদ্ব্যতীত রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল কাঁসা নির্ম্মিত বাসন এবং অন্যান্য অপরিমেয় গৃহসামগ্রীর এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন হইয়াছিল!! এই ঘটনার পর রণজয়ী অশ্বারোহী স্বয়ং দেবলরাজও ঐ. অতলজল দীর্ঘিকায় অশ্বসহ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তী—এই অদ্ভুত ঘটনার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দেবগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা স্ব স্ব গৃহে কোন কর্ম্ম কাণ্ড উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকটী তাম্বুল পত্র ও কয়েকটী গুবাক্ হস্তে ঐ দীর্ঘিকার কূলে উপস্থিত হইতেন। যাহার গৃহের কর্ম্মে যতগুলি থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, ঘড়া ও অন্যান্য গৃহসামগ্রীর প্রয়োজন হইত, তিনি তৎপ্রাপ্তির প্রার্থনা দীর্ঘিকার অধীশ্বর যক্ষদেবকে জানাইয়া পান সুপারি জলে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেন। পরদিন প্রত্যুষে প্রার্থিত সমস্ত দ্রব্যই জলকূলে প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ ঘটনা অনেক দিন যাবৎ চলিয়াছিল। কোন অধার্ম্মিক লোভী ব্যক্তি কোন সময়ে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাপ্ত সামগ্রীর কিয়দংশ অপহরণ করায় ঐ ব্যাপার রহিত হইয়া গিয়াছে। কেননা, যক্ষদেবের এইরূপ আদেশ ছিল যে, প্রার্থনা মত সকলেই সকল দ্রব্য পাইবে, কিন্তু কেহ কিছুমাত্র আত্মসাৎ করিতে পারিবে না; সমস্তই কর্ম্মসমাপনান্তে দীর্ঘিকাকূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস এইরূপ, দীর্ঘিকার জলে যত ধন সম্পত্তি নিহিত হইয়াছিল, যক্ষদেব, পূর্ব্বোক্ত "থুব" চতুষ্টয়ের নিম্নে তাহার ভাণ্ডার রচনা করিয়াছেন। এজন্য অনেকে অনেক সময়ে ধনপ্রাপ্তির আশয়ে ঐ থুব খনন করিয়াছে। কিন্তু অজগর সর্প, ভীমরুল প্রভৃতির দংশন ভিন্ন কাহারও ভাগ্যে অন্য কোন ফলপ্রাপ্তির সংঘটন হয় নাই।

ঐ প্রদেশে আর একটী জনশ্রুতি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কুম্ভকারজাতীয় কোন গৃহস্থ দেবগ্রামে গিয়া বাস করিলে প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার বংশ থাকে না। জনশ্রুতি প্রচারের পর কোন কোন কুম্ভকার ঐ গ্রামে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা জনশ্রুতির সত্যতাও সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

ঘুঘু অমঙ্গলজনক পক্ষী, কাহারও বাড়ীতে ঘুঘু আসিলে সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাড়াইয়া দেয়। দেবলরাজের সময় হইতেই ঘুঘুর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। নচেৎ ঘুঘু ও কপোত একপদস্থ পক্ষী ও এক কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত।

চৌবেড়িয়া গ্রামস্থ অনাদি কালের বুড়োশিব যে এখন খণ্ডশঃ বিভক্ত ও "পোড়া মহেশ্বর" বলিয়া খ্যাত, তাহারও সহিত দেবলরাজের সংস্রব আছে।

(২)

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার যে দুর্দ্দান্ত ও অসমসাহসী মুসলমান শাসনকর্ত্তা সের

আফগানের দুরাকাঙ্ক্ষানলে ভারত-সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়াছিল, যে অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত হইয়া হুমো বাদসা (হুমায়ুন্) সিন্ধুপারে পলায়ন করিয়াছিলেন; যাঁহার অত্যাচারে দিল্লী ছাড়িয়া অমরকোটের মরুভূমিতে আকবর সাহের সূতিকাধাম বিরচিত হইয়াছিল; হাবড়া হইতে কোট কাঙ্গড়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ, ঐ পথের উভয় পার্শ্বস্থ ছায়াপ্রদ পাদপশ্রেণী, কূপাবলী ও পান্থনিবাসনিচয় এবং ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা যাঁহার জনপনের স্মৃতি-চিহ্ন, সেই সের্ আফগান যখন সের্ সাহ হইয়া সুশাসন ও সুবিচারে ভারত-সাম্রাজ্য নখদর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে "হাঙ্গরীবাক্"নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে একঘর কুম্ভকার গৃহস্থ বাস করিত। কুমার দুই প্রকার, এক প্রকার ঠাকুর-গড়া, অন্য প্রকার হাঁড়ীগড়া। জনসমাজে প্রথম প্রকার কুমারের পদমর্য্যাদা কিছু বেশি। আমরা যে কুম্ভকার গৃহস্থের বিবরণ বলিতে উদ্যত হইয়াছি, সে হাঁড়িগড়া কুমার। সে কিছু হাঁড়ী কলসী সরা মালসা গড়িয়া বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে কোন-রূপে দিন যাপন করিত। মূল ধনের মধ্যে একখানি মাটী কাটিবার খুড়ি কোদাইল এবং একখানি জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন চাক।

হাঁড়ী গড়িবার উপযুক্ত যেটেল বা আটাল ও বর্ণক মৃত্তিকা সর্ব্বত্র মিলে না। বর্ণক মৃত্তিকাকে রাঙ্গামাটিও বলিয়া থাকে। কুমারকে ঐ দুই প্রকার মাটী পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া অনেক দূর যাইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রীনগর ও চৌবেড়িয়া নামক দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম হাঙ্গরীবাক্ হইতে নিতান্ত নিকট নহে। হাঙ্গরীবাকের কুম্ভকার যুবককে রাঙ্গা মাটীর জন্য মধ্যে মধ্যে ঐ দুই গ্রামে যাইতে হইত। চৌবেড়িয়া যাইবার অন্য কারণও ছিল। তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এই কুম্ভকার তরুণবয়স্ক, পরম সুন্দর। বাহ্যা-কৃতি দর্শনে তাহাকে উচ্চ শ্রেণীস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হইত। তাহার পোষ্যবর্গের মধ্যে বিধবা জননী এবং দুইটী অনূঢ়া ভগ্নী। দুঃখের সংসার, এজন্য কুম্ভকার বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই।

একদিন কুম্ভকার রাঙ্গা মাটীর ঝুড়ি মস্তকে লইয়া অপরাহ্নে শ্রীনগর হইতে প্রত্যাগত হইল। আজ পুত্রকে অধিকতর ক্লান্ত দেখিয়া জননী কহিলেন, "হ্যাঁরে, আজ কি মাটীর ঝুড়ি আনিতে তোর কষ্ট হয়েছে? মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছে। অন্য দিন তোকে এমন দেখি না।" পুত্র কহিল,—

"না মা, মাটীর ঝুড়ি আনতে আমার মোটে কষ্ট হয় না, আমি অমন চারিটা ঝুড়ি বহিতে পারি। আজ বড় বিপদে পড়েছিলাম।" মাতা কহিলেন,—

"বিপদ কি প্রকার?"

"আজ মাটী খুঁড়িবার কালে বড় রোদ লাগে। গায়ে কাপড় চোপড় ভিজে যায়। মাটী খোঁড়া হইল, আর ঘুম চাপ্‌তে

লাগিল। একটা গাছতলায় কোদালের উপর গামছা রাখিয়া তাতে মাথা দিয়া শুইলাম। তখন আকাশে মেঘ উঠিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, ঠিক্ নাই। ঘুম ভাঙ্গিবার একটু আগে সাপের গজ্‌রাণি শুনিতে পাইলাম। চক্ষু মেলিয়া দেখি আমার মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ চক্র ধরিয়া দুলিতেছে। আমার বোধ হইল, মুখে ছোবল মারিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। এমন সময়ে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন।"

"দেবা, তুই সেদিন শ্রীনগরের জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলি। আর একদিন একটা অজগরের মাথা মুড়ি কোদালে কাটিয়া মাটীর ঝুড়ির সঙ্গে বাড়ী আনিয়াছিলি, আজ একটা গোখুরা সাপ দেখিয়া তোর এত ভয় কেন?' কৃষকার যুবকের নাম দেবনাথ পাল। জননী প্রায়ই তাহাকে দেবা বলিয়া ডাকিতেন। দেবনাথ কহিল,—

"কি জানি মা, আজ জঙ্গলের মধ্যে মেঘের অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে মাথার উপর সাপের ফণা দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। ফণাই বা কি, যেন ডিঙ্গি নৌকা। এত বড় সাপ আমি কখনও দেখি নাই।"

"দেখিবি না কেন? সেদিন দীঘির পাড়ে অন্ধকারময় গর্ত্ত থেকে একটা মুখ বাহির হইয়া ছাগল মারিয়াছিল, সেটা কি?"

"সেটা কি মা? আমিত বুঝিতে পারি নাই।"

"সেটাও সাপ,—আমার বোধ হয়, সেই সাপটাই আজ তোর মাথায় 'ছত্র' ধরিয়াছিল।"

"মা, তুমি বল কি? তবেত আজ আমার মস্ত ফাঁড়া গেল। বোধ হয়, আজ আমাকেও গিলিতে আসিয়াছিল।" দেবনাথের জননী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

"ফাঁড়া নয়রে ক্ষেপা,—ফাঁড়া নয়। সে দিন দৈবজ্ঞ ঠাকুর তোর হাত ও কপাল দেখে কি বলিয়াছিলেন,—মনে নাই কি? আজিকার ঘটনাও সেইরূপ সুলক্ষণ।"

"মা, আমি ত ক্ষেপা নই,—তুমিই ক্ষেপী। তুমি সেই দৈবিজ্ঞি বামনের কথায় বিশ্বাস কর?"

"আমি বিশ্বাস করি, আর না করি, তোর সে কথায় কাজ নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর সাপ তাড়িয়ে দিয়ে কি বলিলেন, তুই তাই বল্।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরও তোমার মত পাগল। তিনিও সাপকে কিছুই না বলিয়া—'যাও বাচ্চা,—চলা যাও' বলিয়া আমার বুকে হাত দিলেন। 'ভয় নাই,—তোমার ভাল হবে,'—আমাকে এই কথা বলিয়া আপনিও বনের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন।"

"সন্ন্যাসীও পাগল,—আমিও পাগলী,—কেবল তুমি আমার চাণক্য পণ্ডিত। নয়?"

"তুই পাগল,—তোর সাতগোষ্ঠি পাগল। চারিটা পেটের ভাত করিতে আমার

মাথার ঘাম পায় পড়ে,—মাটী কাটিতে হাতে কড়া, ঝুড়ি বহিতে মাথায় টাক্‌—পোয়ান পোড়াইবার কাঠের জন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে দুবেলা সাপের মুখে,—বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হয়,—আমি রাজা হবো, আর তুমি রাজার মা হবে? নয়?"

"আমি যদি সতীলক্ষীর পেটে জন্মে থাকি,—এক পুরুষ ভিন্ন দুই পুরুষের মুখ না দেখে থাকি,—যদি হিঁদুর শাস্ত্র বাক্য সত্য হয়,—তবে দেখিস্‌ রাজার মেয়ে অবশ্যই রাজার মা হবে।"

(ক্রমশঃ)

জাপান্‌ কাহিনী।

জাপানীদের কয়েকটি দেশাচার।

(১)

জাপানবাসীরা অভিবাদন করিবার সময়ে সাধারণতঃ দুই জানুতে দুই হাত রাখিয়া সম্মুখ দিকে অবনত হয়; কেবল অধিক সম্মান দেখাইতে হইলে হিন্দুদিগের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। কেহ কিছু উপহার দিলে, তাহারা এক প্রকার অস্পষ্ট স্বরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকে। জাপান বালকদিগের মাতৃভক্তি সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। মাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি না লইয়া তাহারা কখনই গৃহের বাহির হয় না। মাতাকে কোন স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিলে বালক বালিকারা গৃহদ্বারে একত্রিত হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠনে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায় জাপান দেশেও পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সমাগমে এইরূপ অনেক স্পৃহণীয় প্রাচীন পদ্ধতির কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

ফুল জাপানবাসীদের বড়ই প্রিয় বস্তু। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময়ে ফুলের বাজার বসিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিই তথায় ফুল ক্রয় করিতে গমন করে। কোনও বাগানে নূতন রকম সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে জানিতে পারিলে সাধ্যমতে সকল ব্যক্তিই তথায় না গিয়া থাকিতে পারে না। ফল-পুষ্প-শোভিত সুন্দর উদ্যান জাপানবাসীদের প্রীতি-ভোজের প্রশস্ত স্থান।

যুবক মাত্রেই তাস, বটিকা বা জল-ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। জাপানে বাজীকরের সংখ্যা যেমন অধিক, তাহাদের ক্রীড়া সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক ও প্রীতিপ্রদ। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে জাপানে নাট্যশালার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে নৃত্যগীতের আলোচনা হইত বটে, কিন্তু ঠিক্‌ নাটক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জাপানের নাট্যশালায় স্ত্রীলোকদিগকে অভিনয় করিতে দেওয়া

হয় না। স্ত্রীলোকের অভিনয় বালকেরা করিয়া থাকে, কোনও কলুষিত ব্যক্তির সংহারের অভিনয় হইলে ইহারা যার পর নাই পুলকিত হয়। অভিনয় কালে তরবারি ব্যবহৃত হয়; মনে হয় রক্তপাত হইতেছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সাধারণ ব্যক্তিগণ অভিনয় দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা অভিনেতাদিগকে দেবতা মনে করে, কিন্তু শিক্ষিত ও উন্নতমনা জাপানী ভদ্র লোক অনেকেই নৈতিক অবনতির ভয়ে নাট্যশালায় গমন করেন না।

ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানেও নৃত্যগীত-কারিণী রমণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে "জিসাস" কহে। ইহারা সাধারণতঃ অতি নিকৃষ্টবংশীয়া। অনেক সময়ে পিতৃমাতৃহীন বালিকাদিগকে ক্রয় করিয়া জিসাস করা হয়। জিসাসগণ সাত বর্ষ বয়স হইতেই নৃত্যগীত ও অঙ্গ ভঙ্গী-করণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই সকল নৃত্যকারিণী রমণীগণের মধ্যে সুন্দরী ও কৌতুকপ্রিয়ার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কাহারও বাটীতে ভোজ বা উৎসব সময়ে আগন্তুকদিগকে পরিতুষ্ট ও পুলকিত করিবার জন্য জিসাসগণকে পারিশ্রমিক দিয়া আনান হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুৎসিতভাবে অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যগীতাদি করিত, জাপান সম্রাট্ নিয়ম প্রচার দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন। প্রভুর অনুমতি লইয়া জিসাসগণ স্বদেশীয় বা বিদেশীয় পুরুষের সহিত দূরদেশে অর্থোপার্জ্জনে যাত্রা করে।

জাপানে এক প্রকার আত্মহত্যার নিয়ম প্রচলিত আছে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি প্রথমে আপন উদর কর্ত্তন করে, পরে তাহার আত্মীয়ের মধ্যে কেহ উহার শিরশ্ছেদ করে। ইহাকে "হারাকারী" কহে। হারাকারীর প্রকৃত অর্থ উদরচ্ছেদে মৃত্যু। কিন্তু জাপানবাসীরা এইরূপ মৃত্যুকে এত ভাল বাসে যে, ইহাকে সম্মানসূচক মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পাছে জীবদ্দশায় শত্রুর হস্তগত হইয়া নীচতা স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য অনেক যোদ্ধা বীরপুরুষ "হারা-কারী" করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্র লোক দুইখানি করিয়া তরবারি ব্যবহার করিয়া থাকেন। একখানি দীর্ঘ, অপর খানি ক্ষুদ্র। শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ খানির এবং আত্মহত্যার জন্য ক্ষুদ্রখানির ব্যবহার হয়। সাধারণ ঘাতক-গণের হস্তে নিহত হওয়া অতীব লজ্জাকর ও অপমান জনক, এই হেতু পূর্ব্বে অপ-রাধী ভদ্রলোক ও যোদ্ধৃগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে সাক্ষিগণের সম্মুখে আত্মহত্যা করিত। এইরূপ আত্মহত্যা-কারী ব্যক্তি, উন্নত বধ্য ভূমিতে উত্তর মুখে উপবেশন করে, এবং তাহার বন্ধু বান্ধবগণ তাহার চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়। এই সময় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-বিজ্ঞাপক রাজকর্ম্মচারী সমাগত জনমণ্ডলীর প্রতিগোচরে অপরাধীর দণ্ডাজ্ঞা পাঠ

করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বা ছোরা অপরাধীর হস্তে প্রদান করেন। ছোরা গ্রহণ করিয়া হত্যাকরণেচ্ছু ব্যক্তি মৃত্যু-কালীন অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করণানন্তর সমাগত বন্ধুমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহে "আমি উদর কর্ত্তন করিলে, তোমরা কেহ দয়া করিয়া আমার শিরশ্ছেদ করিও।" তার পর ছোরাখানি বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া নাভির নিম্নদেশে প্রায় আট ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ত্তন করে। উদর কর্ত্তন করা হইলেই একজন বন্ধু তাহার শিরশ্ছেদ করে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি যদি উদরচ্ছেদ করণানন্তর পুনর্ব্বার সেই ছোরা দ্বারা আপন ওষ্ঠচ্ছেদ করিতে বা ছোরাখানি কোষ-বদ্ধ করিতে পারে, তবে সকলে তাহার সাহসিকতার শত শত ধন্যবাদ করিতে থাকে, এবং পুরুষানুক্রমে তাহার সাহসিকতার প্রশংসাজনক গান গীত হয়। উদরচ্ছেদের সময় কেহ কিছু মাত্র ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও নিন্দা করে।

মৃত ব্যক্তিকে বুদ্ধদেবের মন্দিরের নিকট কোন স্থানে কবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর ২৪ ঘণ্টা কাল মৃত ব্যক্তির মস্তক-চা পূর্ণ উপাধানেস্থাপ্য করিয়া শ্বেত বর্ণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্দুকের ভিতর উপবিষ্ট অবস্থায় রাখিয়া দেয়। কবর দিবার পর তাহার উপর সামান্য একখানি স্মারক প্রস্তর-ফলক স্থাপন করে। উহাতে মৃত ব্যক্তির নাম ও মৃত্যু তারিখ লিখিত থাকে। ঠিক্ এইরূপ লিখিত একখানি কাষ্ঠ ফলক গৃহ-দেবতার গৃহে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে শবদাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ প্রথা বন্ধ হইয়াছে।

জাপানীরা মৃত ব্যক্তির জন্য দুই প্রকারে শোক চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে:—(১) শোক-প্রকাশক পরিচ্ছদ পরিধান; (২) নিরামিষ ভোজন।

কোন্ কোন্ আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে কি প্রকারে কত দিন শোক প্রকাশ করিতে হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

	শোক পরিচ্ছদ-ধারণ।	নিরামিষ ভোজন।
পিতামহ	১৫০ দিন	৩০ দিন
পিতা মাতা	১৩ মাস	৫০ দিন
স্বামী	১৩ ,,	৫০ ,,
স্ত্রী	৯০ দিন	২০ ,,
ভ্রাতা বা ভগ্নী	৯০ ,,	২০ ,,
জ্যেষ্ঠ পুত্র	৯০ ,,	২০ ,,
অন্য পুত্র	৩০ ,,	১০ ,,

শ্বেতবর্ণ পোসাক জাপানীদের শোক-পরিজ্ঞাপক।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

চুট্‌কী গল্প।

(৫)

শ্রীধাম নবদ্বীপের নাম ও যশ ভারতবর্ষের বাহিরেও আছে, এরূপ বোধ হয়; কেননা, এককালে কাশী, পুনা, মিথিলা ও নবদ্বীপ সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ শিক্ষার প্রধান স্থান ছিল। তখন অনেক বৈদেশিক ছাত্র ঐ সকল স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিত। নবদ্বীপের সে সৌভাগ্য বহুকাল হইতে লোপ পাইলেও এখনও তাহার একটু নাম গন্ধ আছে। কিন্তু নবদ্বীপের পূর্ব্বাংশ, বোধ হয়, তখন গঙ্গাগর্ভেই নিহিত ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ঐ অংশ বালুকা ও পঙ্কময় কৃষিক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে এখন বড় আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ফাঁকা মাঠ ছিল। তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষকের কেদারখণ্ড দৃষ্ট হইত। এই মাঠে অতি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে একটী প্রাচীন বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার ঠাকুরসেবা ছিল। বাবাজীর কুটীর ও প্রাঙ্গণে এক পোয়ার অধিক জমি ছিল না। তাঁহার বাসস্থানের চতুঃপার্শ্বই কৃষকগণের কৃষিক্ষেত্রে আবৃত।

বাবাজী মহাশয় একদিন পাঁচ সাতটা কচা চিতা দ্বারা সামান্যরূপ বেড়া দিয়া দশ পনর হাত জমি ঘেরিয়া ফেলিলেন। একজন কৃষক তাহা দেখিয়া কহিল,—

"ও বাবাজী, একি করিয়াছ? আমার ক্ষেত বেড়িয়াছ কেন?" বাবাজীর মুখখানি বড়ই মিষ্ট ছিল। কৃষককে কহিলেন,—

"বাপু, ও জমি তোমার,—আমি যে জমিতে আছি,—এ জমিও তোমার,—সকলই তোমার। আমার আর কে আছে? আমিই বা আর কদিন? তবে কি জান, ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে থাকা ভাল নহে; একটু বায়ু সঞ্চালনের উপায় নাই, হাঁপাইয়া প্রাণ যায়,—অপরাধের ভয়ে সদা মরিয়া থাকি; এজন্য তোমার ঐ জমিতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিব।" কৃষক বাবাজীর কথায় গলিয়া গেল। "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

বাবাজী মহাশয় কয়েক মাস পরে আর এক কৃষকের কতকটা জমি পূর্ব্বোক্তরূপে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সে কৃষক আসিয়া বাবাজীর বেড়া ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলে বাবাজী কহিলেন,—

"বাবা, আমার একটা কথা আগে শুন, পরে বেড়া ভাঙ্গিও। আমার কি স্ত্রী পুত্র আছে? না জাতি গোত্র আছে? কেবল আমি যে কদিন। তার পর আমার ও ঠাকুরের জমি এবং তোমার এই জমি সকলই তোমার হইবে। আপাততঃ তোমার এই জমিতে দুগাছ শাক পাতাড় করিয়া ঠাকুর সেবা করিব।" কৃষক

ভাবিল, "তাইত, ঠিক্‌ কথা,—পরে সবই আমার হইবে।"

এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাবাজী ঠাকুরঘর, ফুল বাগান, কলা বাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ ইত্যাদির নাম করিয়া প্রায় চারি পাঁচ বিঘা ভূমি আত্মসাৎ করিলেন, অথচ একটি পয়সা রাজস্ব দেন না। ক্রমে এই ঘটনা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। বাবাজীকে তলব করিলেন। বাবাজী রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"শুনা গেল, তোমার কোনও ঠাকুর সেবা নাই, অথচ তুমি বিনা রাজস্ব দানে অনেক ভূমি ভোগ কর। প্রকৃত ঠাকুর সেবা থাকিলে রাজ সরকার হইতে দেবোত্তর ভূমি দানের নিয়ম আছে বটে।" বাবাজী করযোড়ে কহিলেন,—

"মহারাজ, আমিও ত কলিপাবন ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ সেবা করিয়া থাকি।" রাজা কহিলেন,—

"তুমি কি গৌরাঙ্গকে ভগবদবতার বলিয়া বিশ্বাস কর?" বাবাজী কহিলেন,—

"মহারাজ, সে বিষয়ে আমারও একটু সংশয় আছে।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গ-বিরোধী ছিলেন। এখন একটা প্রকাণ্ড বৈষ্ণবের মুখে সংশয়ের কথা শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন। কহিলেন,—

"বাবাজী, তুমি বুদ্ধিমান্‌,—তাই তোমার সংশয় আছে। যত মূর্খ নেড়া বৈষ্ণবে গৌরাঙ্গকে ঠাকুর বলে,—অবতার বলে,—কেহবা পূর্ণ ব্রহ্ম বলিতেও লজ্জিত হয় না। সেদিনকার পুরন্দর-পুত্র ডাংপিটে নিমাই পণ্ডিত আজ কিনা ঠাকুর হইয়া পড়িয়াছে। সোণার বেণের ভাতমারা নিতে নেড়া ও সীতে নাড়া এই দুইটা প্রতারক আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য তাহাকে ঠাকুর বানাইয়াছিল। নিতে নেড়া এখন প্রভু নিত্যানন্দ হইয়াছেন। সীতে নাড়া এখন শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রভু হয়েছেন। উদরপরায়ণ শঠ বৈষ্ণবগুলা বলে যে, তাঁহার তপস্যার জোরে ভগবানের সিংহাসন নড়িয়াছিল বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'নাড়া" বলিতেন। খাঁদীর বেটা পদ্মলোচন। মড়াঞ্চে পোয়াতির ছেলে 'নিমে' আজ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যদেব। কথাগুলা শুনিয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। নিতে সীতের বংশ খড়দা ও শান্তিপুরের গোসাইরা আজ সমাজের মাথার মণি হয়েছেন। হাড়ী শুঁড়ী সোণার বেণের বাড়ী ভাত খাইবেন,—আর ভদ্র সমাজে উচ্চাসনে বসিবেন। রাজা রঘুরাম, রাজা গোপাল রাম প্রভৃতি আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ ধর্ম্মসমাজে এত স্বেচ্ছাচার কেমনে সহ্য করিয়াছেন, বলিতে পারি না। আমি কিন্তু ইহাতে প্রশ্রয় দিব না,—আমি ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিব।"

রাজা সভাসদ্গণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হস্তমুখ সঞ্চালন করিয়া যখন এইরূপ আস্ফালন করিতেছিলেন, বাবাজী তখন কণ্ডূয়নচ্ছলে মধ্যে মধ্যে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে ছিলেন। অনন্তর মহারাজ বাবাজীর দিকে

ক্রোধরঞ্জিত লোচন আবর্ত্তিত করিয়া কহিলেন,—"বাবাজী মহাশয় এ বিষয়ে কি বলেন?"

বাবাজী দণ্ডায়মান ও অপেক্ষাকৃত সিংহাসনের নিকটস্থ হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ যদি অভয়-দান করেন, তবে মনের কথা প্রকাশ করিতে পারি, নচেৎ প্রাণের ভয়ে কিছুই বলিতে পারি না।"

তখন রাজাবাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার কোনও ভয় নাই,—নির্ভয়ে মনের কথা প্রকাশ কর।"

তখন বাবাজী সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ, শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ অবতার কি না, তদ্বিষয়ে আমার এতকাল যে সংশয় ছিল, আজ আপনার ভাব দেখিয়া তাহা এককালে দূর হইয়া গেল। কেননা, যখন যখন ভগবানের অবতার পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তখন তখনই তৎকালের শ্রেষ্ঠতম রাজা তাঁহার বিরোধী হইয়াছেন। বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ, নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু,—রাম অবতারে রাবণ,—কৃষ্ণাবতারে কংস ভগবানের বিরোধী হইয়াছেন। এখনও দেখিতেছি, গৌরাঙ্গ অবতারে আপনি বিরোধী। অতএব শ্রী গৌরাঙ্গ যে ভগবানের অবতার, তাহাতে আর কোন ও সংশয়ই হইতে পারে না।"

ভক্তিবাদে যখন রেবদেবী পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোন্ ছার।

বাবাজীর কথায় রাজা বাহাদুর বড়ই প্রীত হইলেন। কহিলেন,—"বাবাজী মহাশয়, আপনি কতখানি জমি দখল করিতেছেন। ঠাকুর সেবার জন্য আর ভূমির প্রয়োজন আছে কি?" বাবাজী—এই সুযোগে অনেক ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই নবদ্বীপের বড় আখড়া সৃষ্টির আদিম ইতিহাস। সেই সকল ভূমি অদ্যাপি ঐ আখড়ার অধীনে আছে।

(৬)

বাবুজী মহাশয়ের নিকট দুধে গোয়ালা টাকা চাহিল। বাবুজী কহিলেন,—

"ওহে ঘোষের পো, শুনেছি, তুমি আমাকে যে গাইয়ের দুধ দিতে, তোমার সে গাই মরে গিয়েছে। আজিকার দুধ কি অন্য স্থান হইতে কিনিয়া দিলে নাকি?" ঘোষের পো কহিল,—

"আজ্ঞে না, আপনি যে গাইয়ের দুধ খাইতেন, সেই গাইয়ের এক বক্না খুব দুধ দেয়। আমি আপনাকে সেই দুধ দিতেছি।" বাবুজী রক্ত চক্ষু আরও রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—

"কি বলি পাজি, আমাকে বুনের দুধ খাওয়াইতেছিস্? সর্ব্বনাশ করলি? আমি যে গাইয়ের দুধ খাইতাম, সে কি আমার মা নয়? তার বক্না কি আমার বুন নয়? কৈ ছুরিরে,—দাগাও ছুরি।

ঘোষের পোর টাকার তাগাদা ঘুরিয়া গেল। বাবুর চণ্ডমূর্ত্তি দর্শনে বেগে পলায়ন করিল। তখন বাবুজী সভাস্থ ভদ্রলোক দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

মহাশয়েরাই বিচার করুন,—আমি এত সাবধান হইয়া চলি,—'বুনের' দুধ টুকুনও খাই না,—তবু গাঁয়ের বিটলে বামনেরা আমাকে মাতাল বলে। এতে রাগ হয় কি না, বলুন দেখি।"

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

দন্তরোগ।

১। কর্পূর ও মরিচের গুঁড়া একত্র করিয়া দন্তশূল স্থানে প্রয়োগ করিলে লালা নিঃসরণ করিয়া উপকার করে।

২। বকুল পাতা চর্ব্বণ করিলে মাড়ি ও দন্তের শিথিলতা নিবারণ হয়। বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে উদ্ধৃত দন্তও স্থির হয়।

৩। কৃমি দন্তে (পোকাধরা দাঁতে) হিং উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু উপকার হয়। হিঙের আরক তুলায় করিয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইলেও উপকার হয়।

৪। কর্পূর ও আফিং এক সঙ্গে মিশাইয়া দন্তের বেদনা স্থানে দিলে আরাম হয়।

৫। পাপ্‌ড়ি খয়ের, মুসব্বর, তুঁতে ও কর্পূর সমান পরিমাণে লইয়া গুঁড়া কর, এবং দাঁতের গোড়া যেখানে ফুলিয়াছে, তথায় প্রদান কর, তাহাতে যন্ত্রণা যাইবে।

৬। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইলে, দারু-চিনির তৈল ২।১ বিন্দু ঐ স্থানে প্রদান করিলে, আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়।

৭। সিজ বৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে, দন্ত কৃমি বিনষ্ট হয়।

৮। গুঞ্জা ফল (কুঁচ) কর্ণে ধারণ করিলে দন্তের পোকা নিপতিত হয়।

৯। তেঁতুল, জয়ন্তী, শরপুঙ্খী, বাগ-ভেড়াণ্ডা কিম্বা করবী বৃক্ষের মূল দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

১০। গোলমরিচ, সৈন্ধব লবণ ও আঁটাল মাটি সমপরিমাণে লইয়া পেষণ করিবে, পরে ছাঁকিয়া ঐ গুঁড়া দন্তে মার্জ্জন করিলে দন্তের গোড়া শক্ত হয়।

অগ্নিদাহ।

১। পুড়িয়া মাত্র ঘৃতকুমারীর রস, চূণের জল ও নারিকেল তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে লেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয়, এবং পরে ফোস্কা উঠে না।

২। ওডিকলন নেকড়াতে ভিজাইয়া বারবার দগ্ধ স্থানে বসাইয়া রাখিলে সত্বর জ্বালা নিবারিত হয় ও ফোস্কা উঠে না।

৩। দগ্ধাঙ্গে মাংশুক লেপন করিলে অথবা নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল বাটিয়া মাখাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

৪। দগ্ধ স্থানে পুঁই শাকের পাতার রস লাগাইলেও উপকার দর্শে।

৫। দগ্ধ স্থান পুড়িবা মাত্র লবণ চাপা

দিলে ফোস্কা হয় না, জ্বালা নিবারণ হয়, এবং অচিরে আরোগ্য হয়।

৬। ইংরাজী কালি দগ্ধ স্থানে চালিয়া দিলেও উক্ত প্রকার উপকার দর্শে।

খাদ্যাখাদ্য বিচার।

হিন্দু শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের অতি সূক্ষ্ম বিচার দেখা যায়। অখাদ্য ভোজনে কেবল যে শরীরের অপকার হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা মনের অবনতি এবং আত্মারও অধোগতি হইয়া থাকে। মানবের প্রকৃতি ভেদের ন্যায় আত্মারও তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হয়। রাজসিক আহারের দ্বারা অহং বুদ্ধি বা আত্ম গৌরবের পুষ্টি হয়। তামসিক আহারের দ্বারা দুর্ব্বুদ্ধির উত্তেজনা হয়, এবং পরের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। গীতায় আছে :—

"আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

১৭ অধ্যায় ৮, ৯ ও ১০ম শ্লোক।

যে দ্রব্য আহারের দ্বারা আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহপ্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় আর যাহা দ্রব্য (কোন প্রকার বিকট, অথবা উগ্র গন্ধযুক্ত নহে,) ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু, অম্ল, লবণযুক্ত, এবং উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষতা-কারক, এবং উত্তাপবর্দ্ধক উহা রাজসিক প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে, ঐ সকল আহারের দ্বারা দুঃখ শোক নানা প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্দ্ধপক্ক এবং বিরসতা-প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে) এবং পূতিময়, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

বাহ্য বস্তু সকলের সহিত মানব প্রকৃতির অকাট্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, বিজ্ঞান ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহা সকলেই দেখিতেছেন জগতে এমন পদার্থ আছে যাহা দ্বারা মানব শরীরের পোষণ ও বর্দ্ধন হয়, আবার এমন পদার্থও আছে, যাহা দ্বারা মানব শরীর অসুস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিথির সহিত ও শরীরের বিশেষ যোগ আছে, তাই পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়। তিথি বিশেষে কোনও প্রকার খাদ্য শরীরের পক্ষে উপকারী বা অপকারী

হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু শরীরের সহিত আবার মনের অকাট্য নিগূঢ় যোগ আছে। সেই জন্য মাদক দ্রব্য সেবনে মনের বিকার ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অধিক পরিমাণে মাংস ভোজনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়। যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি ও ধর্ম্মসাধনের জন্য সমুৎসুক, সাত্বিক ভোজন তাঁহাদের পক্ষে সেবনীয় এবং রাজসিক ও তামসিক ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

হিন্দু শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার আছে,তাহা এক্ষণে অনেকের নিকট অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। বস্তুতঃ দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে অনেক বিধি ব্যবস্থা আছে,ধর্ম্মবুদ্ধি, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহার বিচার করা আবশ্যক। এক দেশে, এক-কালে, এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সঙ্গত, অন্য দেশে, অন্য কালে ও অপর ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসঙ্গত হইতে পারে। আমরা নিম্নে হিন্দুশাস্ত্রবিহিত তিথি, বার ও মাস বিশেষে নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকা প্রদান করিতেছি, এগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা বিচার করিলে মন্দ হয় না। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

নিষিদ্ধ খাদ্য।

মাস, বার ও তিথি বিশেষে

তিথি	যে দ্রব্য নিষিদ্ধ
প্রতিপদ	দেশী কুমড়া
দ্বিতীয়া	ছোট জাতীয় বেগুণ
তৃতীয়া	পটোল
চতুর্থী	মূলা
পঞ্চমী	বেল
ষষ্ঠী	নিম
সপ্তমী	তাল
অষ্টমী	নারিকেল
নবমী	লাউ
দশমী	কলমী শাক
একাদশী	শিম
দ্বাদশী	পুঁই শাক
ত্রয়োদশী	বেগুণ
চতুর্দ্দশী	মাস কলাই
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা	মৎস্য, মাংসাদি।

মাস বার বা পাত্রে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

বার মাস	লশুন, গাঁজর, পেঁয়াজ, গোময়জাত ছাতা।
তাম্র পাত্রে	দুগ্ধ, দধি, মাংস।
উচ্ছিষ্ট পাত্রে	ঘৃত।
দুগ্ধে	লবণ।
কার্ত্তিক মাসে	বেগুণ, গুল।
,,	মৎস্য, মাংস (বিশেষতঃ শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত)।
কাংস পাত্রে	নারিকেল জল।
মাঘ মাসে	মূলা।

হরি শয়নে (জগন্নাথের পুনর্যাত্রা হইতে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারি মাস)	কলমী, বেগুণ, মূলা, শণ।
রবিবার	মাস কলাই, মাংস, মসুর, নিম্ব পত্র, আদা, মধু, মৎস্য, বিম্ব, কাঞ্জি।
পান	আগা, মূল, জীর্ণশিরা।
ভাদ্রে	লাউ।
বার মাস	সাদা বেগুণ, গোল শ্বেত কলমির শাক।

(ক্রমশঃ)

আত্ম-সংযম।

(৪০৩ সংখ্যা—১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

২। অন্যায় নিবারণেচ্ছা আমাদিগের এক সহজ প্রবৃত্তি। ন্যায়ের উপরে ভক্তি আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার। আমরা যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকি, যতক্ষণ কোনও রিপুর উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া না যাই, ততক্ষণ ন্যায়ের প্রতি আমরা অসম্মান করিতে পারি না। মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগকে ধর্ম্মপথে থাকিবার এই এক প্রধান উপায় করিয়া দিয়াছেন। তবে আমরা যখন রিপু-পরতন্ত্র হইয়া, স্বার্থ-পরতার জন্য ন্যায়ের অবমাননা করি—অন্যায়কে ন্যায় স্থানীয় করিয়া পূজা করি, সে পতনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। যাহাহউক অন্যায় নিবারণেচ্ছা প্রবৃত্তি আমাদের পরম শুভ-করী হইলেও ইহারই অসংযতাবস্থাকে আমাদের দ্বিতীয় রিপু "ক্রোধ" বলা হয়। অন্যায় নিবারণেচ্ছা ভিন্ন ক্রোধের সংযত ভাব আর নাই।

যখন হিংসার জন্য বা অহঙ্কারাদির জন্য আমাদের ক্রোধোদয় হয়, তখন সে ক্রোধ আমাদের যমস্বরূপ। বিবাদ, কলহ, অন্যকে প্রহার, আত্মহত্যা, অন্যকে হত্যা, ইত্যাদি রোমহর্ষণ ভয়ানক ব্যাপার ক্রোধ হইতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অসংযত ক্রোধী ব্যক্তিই এ জগতে "রাক্ষস" শব্দের বাচ্য। একটু বেশী মাত্রায় রাগ হইলে মনের শান্তি, বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য যে একেবারে বিনষ্ট হয়, এ বিষয় নিজজীবনে কে অনুভব না করিয়াছেন? আবার ক্রোধ হইতে যে ভয়ানক পীড়া এবং পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এ জগতে যিনি সংযম অভ্যাস করিতে চাহেন, ক্রোধ রিপুকে বশীভূত করা তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা বুঝিয়াই মানব ক্রোধ সংবরণ করিবেন।

ক্রোধের প্রথম আবেগই অতি ভয়ানক। রাগ উপস্থিত হইতেছে, সেই সময়ে যদি সংযত করা যায়, তাহা হইলে রাগ আপনা

হইতেই থামিয়া যায়। এই সংযমনের জন্ত যাহাতে ক্রোধ জন্মে, এরূপ কথা বলা এবং শুনা পরিত্যাজ্য; যাহাকে দেখিলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, সে ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাজ্য। ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে বুঝিতে পারিলেই মৌনভাবে কোনও নির্জ্জন স্থানে যাইয়া মনকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত করাই উৎকৃষ্ট উপায়। সে সময়ে ক্রোধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভগবানের নাম জপ, সঙ্গীত অথবা কাব্য উপন্তাসাদি পাঠে মন দিলে মনের উষ্ণতা দূর হইবে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্রোধপ্রবণ, কথায় কথায় যাঁহাদের রাগ হয়, তাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়া, স্নিগ্ধস্বভাব বন্ধুর সহিত সদালাপ, শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত বাদ্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যানুশীলন করিলে তাঁহাদের "বদ্ মেজাজি" দূর হইয়া স্বভাব মধুর হইবে। আর এক কথা, দুর্ব্বল, পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইলে রাগ বেশী হইয়া থাকে। অতএব শরীর এবং গৃহের উন্নতি ও মঙ্গলজনক কাজে অবহেলা করিয়া কেহ নিজ দুর্ভাগ্যের পথ মুক্ত করিবেন না।

মানব ক্রোধ সংযমন করিবেন, কিন্তু অন্তায় নিবারণেচ্ছা যেন পরিত্যাগ না করেন। মহাদেবের যে ক্রোধে "দুর্ব্বলতা" পুড়িয়া "ভস্ম" হইয়াছিল, সে ক্রোধ "ক্রোধ রিপু" নহে, অন্তায় নিবারণেচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ যে ক্রোধের সহিত অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন, সে ক্রোধ ক্রোধ রিপু" নহে, অন্তায় নিবারণেচ্ছা। রাজা যে দুরাচার প্রজাকে দমন করেন, গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রী যে দুর্ব্বৃত্ত আত্মীয়কে শাসন করেন, তাহাও "ক্রোধ রিপু"র চরিতার্থতার জন্ত নহে, অন্তায় নিবারণেচ্ছার জন্ত। তাই বলিতেছি আমাদের ক্রোধ সংযত হউক, কিন্তু অন্তায় নিবারণেচ্ছা যেন আমরা কখনও ত্যাগ না করি, তাহা করিলে আমাদের কর্ত্তৃক ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনেক নিষ্ফল হইবে।

কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহাতে একটু গোলমালের কথা আছে। মনুষ্য-চরিত্র অপূর্ণ। সাধারণের ত্রুটি অনেক। আমার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে অন্তায় কাজ করিতে পারে, তাহাদিগকে শাসন করাও আমার অনিবার্য্য। এইরূপ শাসন করিব, অথচ রাগ হইবে না, ইহা কি সাধারণ মানবের সাধ্য? প্রকৃত পক্ষে রাগ তো আর অন্ত কিছুই নহে, অন্তায় নিবারণেচ্ছারই বিকৃতি। অতএব অন্তায় নিবারণ করিতে করিতে সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রোধের বশীভূত হওয়া সাধারণ মানবের পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনেক স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্ত ভগবদ্গীতায় মানবকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল উপদেশের সারাংশ এই যে, মানবকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রোধের ভান করিতে হইবে। যে পাপী, তাহাকে

শাসন করিবার ভার তোমার উপরে থাকিলে তুমি তাহাকে যথাযোগ্য শাসন করিবে—ইহাই তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। কিন্তু সাবধান সাবধান, রাগ যেন তোমার চিত্ত স্পর্শ না করে। সে যে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত, সেই অন্যায় কাজ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য মৃদুতাই এখানে আবশ্যক। তাহাতে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে উগ্রতা আবশ্যক; কিন্তু সাবধান সাবধান, তুমি মনে রাখিও, সে উগ্রতা একটা অভিনয় মাত্র। ভগবানের কাজ করিবার জন্য তুমি একটা ব্যবসায় করিতেছ মাত্র—তাহা তোমার স্বার্থপরতার জন্য নহে। এইরূপে ক্রোধ জয় করিয়া "ক্রোধী" হইতে পারাই প্রকৃত ক্রোধ সংযমীর কার্য্য। ক্রমশঃ)

প্রার্থনা *।

১

কোথা তুমি হে সর্ব্বমঙ্গল!
ছাড়ি এ মরতভূমি,
দয়াময়! কোথা তুমি,
কতদূরে দেব! তব আনন্দের স্থল?—
সেই প্রাণারামপুর
কহ নাথ, কতদূর,
নাহি যথা জরা, মৃত্যু নাহি অমঙ্গল,
কোন্‌খানে আছ তুমি, হে সর্ব্বমঙ্গল!

২

কোথা তুমি হে সর্ব্বমঙ্গল!
তোমার এ বসুন্ধরা,
কেবলি আতঙ্ক-ভরা,
এই আছে এই নাই জীবন চঞ্চল!
সহসা অজানা ঝড়ে,
মণি কত খসি' পড়ে,
পোড়ায় নন্দন বন, মহা দাবানল!
কেমনে সহিছ তুমি, অনন্তমঙ্গল!

৩

কোথা তুমি হে সর্ব্বমঙ্গল!
রণরঙ্গে ঘন ঘটা,
সে বাসন্তী শ্যামছটা,
বিনাশিল—ফুরাইল শোভা নিরমল!
আঁধারি সাধের গেহ,
চলি যায় কত কেহ,
ভেঙে দিয়া বজ্রাঘাতে কত মর্ম্মতল!
এ সময়ে কোথা তুমি, হে সর্ব্বমঙ্গল!

৪

আতঙ্কে পড়িছে প্রাণী অবশ হইয়া,
কত যে প্রভাত-রবি
উজ্জল পবিত্র ছবি,
উষা-কোলে অস্ত গেল আঁধার করিয়া!

* অতি অল্পদিন হইল কলিকাতাপ্রবাসী মাতৃভূমির কয়টী উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িয়াছেন ডাক্তার অমূল্য চরণ বসু, উকীল গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহারই মধ্যে। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

ফুটিতে ফুটিতে একি,
কুসুম ঝরিল দেখি !
সোণার শশাটী রাহু ফেলিল গিলিয়া !
আদর, যতন, আশা মরিল পুড়িয়া !

৫

কতদূরে আছ নাথ ! শুনিছ কি হায় !
মানব নিয়ত কাঁদে কত যাতনায় ?—
কোনখানে কাঁদে কেহ,
ভুলিয়া মমতা স্নেহ,
চলি গেছে প্রিয়তমা—কাঁদে বা কোথায়
"ফেলিয়া কোলের ছেলে,
মা গো ! আজ কোথা গেলে"
কেহ বা "প্রাণের ভাই অই চলে যায় !"
কেহ সাধে "প্রিয় পতি !
দাসীর ভরসা, গতি,
কেমনে ছাড়িয়া যাও অবলা জায়ায় !"
কেহ ডাকে "যাদুমণি ! ফিরে বাড়ী আয় ?"

৬

এত বিষাদের ভরা অবনী তোমার,
নরের দুর্ব্বল প্রাণ,
হয়ে পড়ে শতখান,
সহিতে এ মহা বজ্র পারে না যে আর !
বুঝি না তোমার ভাষা,
বুঝি না বিশ্বের আশা,
বুঝি শুধু এত ব্যথা নহে সহিবার—
অবোধ মানব, দেব ! বুঝিব কি আর !

৭

তাই ডাকি, কোথা তুমি অনাদি মহান্ !
ছাড়িয়া আনন্দ-ভূমি,
ধরাতলে এস তুমি,
দেখ কত দুঃখী—তব স্নেহের সন্তান !
যত বুক আছে খালি,
শান্তি সুধা দাও ঢালি,
বেঁচে যাক, বেঁচে-মরা শোকাতুর প্রাণ ।
ভাঙা হৃদি যোড়া দিতে,
অসহন সহাইতে,
তোমা বিনা কার সাধ্য, কে ক্ষমতাবান্ ?
তব বরে তিলে তিলে
শোক তাপ নরে গিলে,
কালকূট বিষ যথা গিলিলা ঈশান !—
দাও শক্তি, দাও শান্তি, সর্ব্বশক্তিমান্ !

শ্রীমা—

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ ।

(৪০১ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর)

মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুদিগের অপরিমেয় কীর্ত্তি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির অবসান হইয়াছে । বর্ত্তমান সময়ে গুরুজনের প্রতি ভক্তির অভাবে—বিশেষতঃ মাতা, পিতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির অভাবে আমাদিগের প্রত্যেক পরিবারে ভীষণ অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে । যে গৃহে মাতা পিতা দেবতারূপে পূজিত হইতেন, বর্ত্তমান সময়ে সে গৃহে বয়স্ক সন্তানগণ বৃদ্ধ মাতা পিতাকে কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ ও লুপ্তবুদ্ধি বলিয়া অগ্রাহ্য করেন । পরমা-

জনীর জনক জননী ভক্তি ও শ্রদ্ধাস্পদ না হইয়া উপহাসাস্পদ হইতেছেন! কোথায় সন্তান পিতা মাতার নিকট বিনীত ও আজ্ঞাবহ থাকিবে, আর কোথায় জনক জননীই সন্তানের সহিত নম্র হইয়া কথা না বলিলে ও তাহার অবাধ্য হইলে সেই বৃদ্ধ জনক জননীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না! সুশিক্ষিত পুত্রগণ মাতাপিতার শাসনে থাকা অপমানজনক মনে করেন; কারণ বৃদ্ধ পিতা মাতা সন্তানকে আদেশ করিতে বা তাহার ত্রুটী দেখাইতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পুত্রের বিবাহদ্বারা পিতামাতার সুখের আশা বৃথা। আজকাল নববধূর শ্বশুরালয়ে আগমন শ্বশুর শাশুড়ীর পক্ষে সুখের না হইয়া অনেকস্থলে দুঃখেই পরিণত হইয়া থাকে। সুখ, শান্তি ও আনন্দ পরিবর্দ্ধনের জন্য জনক জননী পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। কোথায় পুত্রবধূ গৃহে আগমন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা, তাঁহাদিগকে সুখী ও আনন্দিত করিবেন; না, কোথায় তদ্বিপরীতাচরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে দুঃখে ও কষ্টে ম্রিয়মাণ করেন। বধূকে শাসন করিতে গেলে অনেক সময়ে পুত্রের ভৎ'সনা শুনিতে হয়। পরন্তু পুত্রমাতা জননী বা শাশুড়ী সর্ব্বদা পুত্র ও বধূর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন। এজন্যই বোধ হয় বৃদ্ধাদিগের মধ্যে "যতদিন দেবে মুত, ততদিন কোলে পুত" এই প্রবাদ বাক্যটী সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। কার্য্যকলাপের ইহার সত্যতা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিতা বধূগণ শাশুড়ীর আদেশ মত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করা মূর্খতা মনে করেন। তাঁহারা দিন দিন ননীর পুত্তলীপ্রায় হইয়া উঠিতেছেন। স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক আত্মীয়মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। স্বহস্তে গৃহকার্য্য সমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অতিশয় নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন। সন্তানগণের লালনপালনের ভার দাস দাসীর উপর ন্যস্ত করেন। এতদ্বারা সন্তানগণের স্বাস্থ্য-বিহীনতা অথবা চরিত্রের অবনতির বিষয় চিন্তাও করেন না। অনেকে দিবানিশি পুস্তক হাতে করিয়া থাকাকেই উচ্চকার্য্য বলিয়া মনে করেন।

'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়াছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় তাদৃশ প্রীতিপূর্ণ ভাব নাই। এক ভ্রাতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত, অন্য ভ্রাতা সপরিবারে আত্মসুখে নিমগ্ন আছেন! এক ভ্রাতা অপরকে তাদৃশ স্নেহ অথবা ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন না। হিংসা ও দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তির স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আবার অনেক সময়ে ইহাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে পরিবারের মধ্যে যাহার স্বামী অধিকতর ক্ষমতাবান্, পরিবারে তাঁহার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ততই প্রবল হয়। তিনি গুরুজন বা অপরাপর আত্মীয় মণ্ডলীকে যথোপযুক্ত সম্মান ও স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন না। তিনিই বাড়ীর 'সর্ব্বেসর্ব্বা' হইয়া দাঁড়ান। এরূপ অবস্থায় পারিবারিক সুখশান্তি লাভ অসম্ভব হইয়া

পড়ে এবং গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ত্তমান সময়ে, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি দ্বারা একটী গণ্ডী প্রস্তুত করিয়া আমরা তন্মধ্যে বাস করিতেছি এবং বিমল সুখশান্তির পরিবর্ত্তে অসুখ ও অশান্তি গৃহ পরিবারকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। গৃহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক অশান্তির মূলে যে স্ত্রীলোক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ পুরুষ আজীবন স্ত্রীলোক দ্বারাই পরিচালিত হন। তিনি শৈশবকালে জননী দ্বারা রক্ষিত ও পালিত হন। এই সময়ে স্নেহময়ী জননীর চরিত্র ও ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। যৌবনে গৃহিণী তাঁহার পরামর্শদাত্রী ও পথপ্রদর্শিকা হন। স্ত্রী যে পথের অনুসরণ করিতে বলেন, স্বামী ভাল মন্দের বিবেচনাশূন্য হইয়া তাহারই পশ্চাদ্গমন করেন। তাই আমাদিগের দেশে "গিন্নির দোষে গৃহস্থ নষ্ট" এই প্রবাদটী শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রবাদটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রতীত হয় না। যেহেতু স্ত্রীলোকেই গৃহরাজ্যের রাজ্ঞী। বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, তাঁহারও সাধ্য নাই, তাঁহার কথা অবহেলা করেন। কাজেই তিনি স্বামীকে যে পথের অনুসরণ করিতে বলেন, তিনি জ্ঞানবিরহিত পুত্তলবৎ তাহারই অনুসরণ করেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই পারিবারিক সুখ অসুখ, শান্তি অশান্তির মূলে স্ত্রীলোক বিদ্যমান। (ক্রমশঃ)

সংখ্যাবাচক পদার্থ।

শতকিয়া পড়াইবার পূর্ব্বে শিশুদিগকে সংখ্যাবাচক কতকগুলি পদার্থের শিক্ষা দান অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে প্রচলিত। ইহাতে দুইটী উপকার আছে। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা সংখ্যা বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান হয়, দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি তত্ত্ব শিক্ষা হয়। একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পঞ্চ বাণ, ছয়ে ঋতু, সাত-সমুদ্র, আট বসু, নয় নবগ্রহ, দশে দিক্—১০টী সংখ্যার সহিত দশটি বিষয়ের জ্ঞান সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই রূপ রচনার অবশ্য ইতিহাস ও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু এখন তাহা ঠিক্ বুঝা যায় না। যতদূর পারা যায় আমরা ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণের চেষ্টা করিব। একটী বস্তু বুঝাইতে হইলে আকাশের নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বল একমাত্র চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাই একে চন্দ্র। চন্দ্রের কখনও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি কখনও ক্রমে ক্রমে হ্রাস দর্শন স্বাভাবিক ইহাতে, দুইপক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। আমরা দুইটী চর্ম

চক্ষু দ্বারা চন্দ্র, আলোক, অন্ধকার প্রভৃতি সকল দৃশ্য বস্তু দর্শন করি, কিন্তু এই দুই চক্ষু ছাড়া আর একটী চক্ষু আছে, তাহা প্রজ্ঞা চক্ষু। মহাযোগী শিব ত্রিনেত্র বলিয়া বর্ণিত। তিনি সামান্য দুই চক্ষু ব্যতীত তৃতীয় চক্ষু প্রজ্ঞা চক্ষুতে ভূষিত। প্রত্যেক যোগীর এই অন্তশ্চক্ষু জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় এবং তাহাদ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্য ও জ্ঞানরাজ্যের বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকেন। সকল জ্ঞানের তত্ত্ব ৪ বেদে নিহিত, সেই চারি বেদ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, সকল হিন্দুর চির-পূজনীয়। পঞ্চবাণ কামদেবের ধনুর ৫টী বাণ, যাহাতে সকল জীবকে বিদ্ধ করিয়া থাকে, মহাদেব যোগপ্রভাবে এই বাণ ব্যর্থ করিয়া কামদেবকে ভস্ম করিয়াছিলেন। ছয় ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ধরাবাসীদিগকে পর্য্যায়-ক্রমে এই সকল ভোগ করিতে হয়। সাত সমুদ্র হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কার অনুসারে লবণ ইক্ষু, সুরা, সর্পী, দধি, দুগ্ধ ও জলের সমুদ্র। এ গুলি এখন কল্পিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অষ্টাবসু ৮টী ভাই, যাহারা কুরুরাজ সান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে ভীষ্ম একজন। নবগ্রহ পৌরাণিক শিক্ষামতে রবি, সোম প্রভৃতি ৭ বার এবং রাহু ও কেতু। জ্যোতিষীরা ইহা দ্বারা মানবের ভাগ্য নির্ণয় করেন। দশ দিক্ দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম চারি দিক্, বায়ু, অগ্নি, ঈশান ও নৈঋত চারি কোণ এবং ঊর্দ্ধ ও অধ আরও দুই দিক্। এই দশ দিক্ ছাড়া আর দিক্ কল্পনা হয় না।

প্রাচীন সংখ্যাবাচক যে পদার্থ সকলের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা অনেক কারণে এখন প্রথম শিক্ষার ঠিক্ উপযোগী নয়। আমাদিগের মতে এই তালিকার সংশোধন করা আবশ্যক হইয়াছে। দশটী সংখ্যা-বাচক অনেক বস্তু আছে, প্রয়োজন বিবেচনায় সংখ্যা সকলের সহিত তাহাদের সংযোগ করিয়া বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা যায় এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই অঙ্কগুলিকে নীতি-জ্ঞানের সঙ্কেত করিতে পারেন। দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবদিগের নিধনের জন্য যতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাহাদিগকে স্থাপিত করেন, তখন মহামতি বিদুর যুধিষ্ঠিরকে সঙ্কেতে কতকগুলি পরামর্শ দেন। তাহার একটী উপদেশ এই—

"একয়া দ্বে বিনিশ্চিত্য ত্রীন্ চতুর্ভির্বশে কুরু। পঞ্চ জিত্বা ষড়্ বিদিত্বা সপ্তহিত্বা সুখী ভব।

ইহার অর্থ এই এক বুদ্ধি দ্বারা দুই পথ পাপ ও পুণ্য নির্দ্ধারণ করিয়া চারিটী দ্বারা অর্থাৎ সাম, দান, বিধি ও ভেদ এই চারি উপায় দ্বারা তিনটীকে অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবনকে বশীভূত কর। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগ-বান্‌কে জানিয়া সাতটী আপদ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও।

এক একটী সংখ্যাকে এইরূপ সঙ্কেত

করিয়া বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক অনেক উপকার লাভ করা যায়। সংশোধিত তালিকা সম্বন্ধে মত দিবার পূর্ব্বে এক একটী অঙ্কে কত পদার্থ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। ইহা দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ আপনাদিগের মত নির্দ্ধারণের অনেক সহায়তা লাভ করিবেন।

এক—ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, চন্দ্র, সূর্য্য, ক্ষিতি, আকাশ, গণেশদন্ত, শুক্রচক্ষু, বুদ্ধি।

দুই—ক্ষর (সৃষ্টবস্তু) ও অক্ষর (ঈশ্বর), প্রকৃতি ও পুরুষ, আত্মা ও পরমাত্মা,শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, নদীকূল, অসিধার, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, পথ (পাপ ও পুণ্য বা হিতাহিত), ইহকাল ও পরকাল, গতি (স্বর্গ ও নরক), পিতা মাতা,স্বামী স্ত্রী গুরু শিষ্য,এবং শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব।

তিন—নেত্র, কাল (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান),লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অথবা ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গঃলোক), ত্রিসন্ধ্যা (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং), ত্রয়ী (বেদত্রয় ঋক্, যজু ও সাম), গুণ (সত্ব, রজ ও তম), ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর), ধাতু (বাত, পিত্ত ও কফ), ত্রিবিক্রম (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালব্যাপী যাঁহার ত্রিপাদ), ত্রিপত্র (বিল্ব), ত্রি-পতাকা (তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা), ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক), অগ্নি—(দাক্ষিণাত্য,গার্হপত্য, ও আহবনীয়), শপথ, স্বস্তি ও শান্তিবাচনে (তিন তিন বারের বিধি),ত্রিকটু (শুঁট,মরিচ ও পিপুল),ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া), ত্রিপথ (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল), ত্রিধারা (ভাগীরথী, মন্দাকিনী ও ভোগবতী), ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম), ত্রিশূল, ত্রিকূট (পর্ব্বত), ত্রিকণ্টক (বৃহতী, অগ্নিদমনী ও দুস্পর্শ), নাড়ী (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না), স্বর (তারা, উদারা ও মাদারা), ত্রিকায় (বুদ্ধদেব), ত্রিকার্ষিকী (নাগর, অতিবিষা ও মুস্তা), ত্রিরেখা (ললাট-কুঞ্চন রেখা), ত্রিকোণ (ক্ষেত্র), ত্রি-ক্ষার (যবক্ষার, টঙ্কণ ও সর্জ্জিকা) ত্রিপদ, ত্রিদণ্ড (বাক্য, মন ও কায়) ত্রিগ্রন্থি (ভূর্ভুব স্ব), ত্রিদিব (তিন দেবতার স্থান—স্বর্গ)। ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত ও কফের দোষ), ত্রিপদী (ছন্দ), ত্রিপুটী (জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়), ত্রিপুণ্ড্র (কপালে ভস্মকৃত তিন রেখা), ত্রিপুর (এই অসুর স্বর্ণ, রজত ও লৌহদ্বারা তিন পুর নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিলোক পীড়ন করিত), ত্রিসবন (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা স্নান), ত্রিবিদ্যা (সত্ব, রজ ও তম), ত্রিমদ (মুস্তা, চিত্রা ও বিড়ঙ্গ), ত্রিমধু (শর্করা, মধু ও সর্পী), ত্রিপাদ (দোষ), ত্রিযামা (প্রথম, মধ্যম ও শেষ রাত্রি), ত্রি লবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও রুচ), ত্রিলৌহ (সুবর্ণ, রজত ও তাম্র), পাপ ও পুণ্য (কায়িক, বাচিক ও মানসিক), ত্রিরাত্রি (অশৌচ ও তীর্থবাসের জন্য), ত্রিবেণী (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংযোগ ও বিয়োগ স্থান), ত্র্যহস্পর্শ (এক দিনে তিন তিথির যোগ)। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রিয়ার মৃত সাম্রাজ্ঞী এলিজেবেথের শবদেহ ভিয়েনা কাপুচিন গির্জায় তাঁহার পুত্র ডিউক অফ রডল্‌ফের সমাধিপার্শ্বে সমাহিত হইয়াছে। সম্রাট্‌ উইলিয়ম-প্রমুখ রাজন্যবর্গ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বস্থানে জাহাজ সকলের মাস্তুল অর্দ্ধ অবনত করিবার আদেশ করেন।

২। বিসুবিয়স পর্ব্বতের পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গলিত ধাতু-স্রোত চারি দিক্‌ প্লাবিত করিতেছে।

৩। ছোটলাট আগামী নবেম্বরে দার্জিলিঙ্‌ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাম্বেল হাঁসপাতালের নূতন ছাত্রী-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিবেন।

৪। কুমারী রাচেল কোহেন এম বি লেডী এলিগিনের প্রদত্ত ১০০ পাউণ্ড ছাত্রীবৃত্তি লইয়া বিলাতে ডাক্তারী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রশংসার সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আয়র্লণ্ডে রাজকীয় সর্জনদিগের কলেজের "ফেলো" হইয়াছেন এবং ত্বরায় দেশে ফিরিতেছেন।

৫। গত ১৬ই সেপ্টেম্বরে টাউনহলে মহাসমারোহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর অভ্যর্থনা হইয়াছে। অনারেবল কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসনে থাকিয়া এবং অনারেবল বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দন-প্রদাতা হইয়া বক্তৃতা করেন।

৬। ধর্ম্মাচার্য্য বিবী ইসাবেলা জাপান সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে জাপানীয়া একটী শান্ত, দৃঢ়ব্রত ও অধ্যবসায়শীল জাতি। তাহারা ইউরোপীয় সভ্যতার গুণ ভাগ গ্রহণ করিয়া এবং স্বজাতির পুরাগত দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে।

৭। ইংরাজেরা অসডর্ম্মান যুদ্ধে দরবেশদিগকে পরাভূত করিয়া সগৌরবে জয়লাভ করিয়াছেন।

৮। বেহারের অনেকস্থান জলপ্লাবিত হওয়াতে লুপলাইনের রেলওয়ের সেতুসকল ভগ্ন হইয়া গাড়ী চলার ব্যাঘাত হইয়াছে। শস্যেরও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

৯। ডাক্তার লুনি ও তাঁহার দুইজন সহযাত্রী বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভ্রমণে প্রায় ২ বৎসর লাগিয়াছে।

১০। সম্প্রতি মজঃফরপুরে মৎস্যবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একজন সাহেব বিলাতে প্রদর্শনার্থ কতকগুলি মৎস্য স্পিরিটে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন।

বামারচনা।

প্রকৃতী সখী।

আজিগো প্রকৃতি সখী !
পরেছ শ্যামলা বাস,
হৃদয়ে বহিছে তব
নবীন বরষা শ্বাস।
হরিত লতিকা পাতা,
হরিত বিটপী ঘাস,
গলেতে বারিদ-মালা,
মুখেতে দামিনী-হাস।
শ্যামল বকুল শাখে
বিহগ বিহগী-বাস,
গাইছে মল্লার গীতি,
পরাণে নব উল্লাস।

ঝিম ঝিম ঝরে বারি
মিটায় ধরা-পিয়াস,
শীতলি জীবের প্রাণ
খুলিয়া নিদাঘ-পাশ।
যে দিলা তোমারে সখী
এমন নূতন বেশ,
পার কি দেখাতে তাঁরে
ঘুচায়ে মনের ক্লেশ ?
হয়না মুগধ কেন
দেখিয়া তোমার রূপ ?
অতৃপ্ত পিয়াসা প্রাণে
হেরিতে জগত-ভূপ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বরষা।

দশ দিক্ মেঘে ঢাকা আকাশ তপন ;
অবিরল বারিধারা,
স্নান করিতেছে ধরা—
বৃক্ষ লতা ফল ফুল নগর কানন। ১
তাপিত প্রখর তাপে ধীরা বসুমতী,
করিয়া কি সুকৌশল
যত বারিধির জল
বাষ্পাকারে নভপরে উঠালো প্রকৃতি ! ২
স্রষ্টার বিধানে ঘন মেঘে পরিণত,
এ কিরে ভয়াল দৃশ্য
আঁধারে ঘেরিল বিশ্ব,
গভীর গর্জ্জন এবে হয় ক্রমাগত। ৩

আকাশ ধরণীতল ঘেরিয়ে প্রাচীর
দিয়েছে যেন রে ভাই,
কোন দিকে ফাঁক নাই—
দিগন্ত ব্যাপিয়া মেঘ কালিমা গভীর। ৪
মৃদুল মারুত কভু হইছে প্রবল,
বলয় আকারে দেখি,
হাসিছে বিজলী সখী,
গম্ভীর হুঙ্কার করি, উগারি অনল। ৫
ফুটিয়া উঠিল শাখে কদম্ব-কেশর,
নব কিশলয় কোলে
মারুত হিল্লোলে দোলে
সুবাস ছুটিয়া গেল দিগ্ দিগন্তর। ৬

সরসে নলিনী দল ফুটিবারে চায়,
দারুণ বরষা ধারা
করিতেছে ক্ষত পারা,
আঁখিজলে ছল ছল পতি পানে চায়। ৭
মেঘেতে ঢাকিয়া কায় বরষা-তপন
চুপি চুপি থেকে থেকে,
বারিদের ধাঁধাঁ ফাঁকে
আহত কমল শির করিছে চুম্বন।৮
কুমুদ মুদিয়া আঁখি উচু করি শির,
নলিনীর মাথা খেয়ে
আশাপথ পানে চেয়ে
অপেক্ষায় বসে আছে বরষা শশীর। ৯
কমল বিরস আহা! হইবে অচিরে,
পশ্চিম আকাশে রবি
ডুবালো কনক ছবি
মৃদুল হাসির ছটা শোভে বৃক্ষ-শিরে। ১০
পূর্ণিমার চাঁদ অই, মেঘ রাশি রাশি
রঙ্গিন মেঘের রাশি—
বিভাগি, কৌমুদী হাসি
সুধীরে কুমুদ দলে বর্ষিছে যতনে। ১১
ধূসর ধবল রঙ্গে মেঘ রাশি রাশি
ভাঙ্গিয়া গম্ভীর ঘটা
প্রকাশি বিজলী ছটা'
ছুটা ছুটি করে রঙ্গে বায়ুপরে ভাসি। ১২
ধরেছে সুচারু বেশ মোহিনী প্রকৃতি;
পরিয়ে নীলিম সাটি,
তাড়িতে কোমর আঁটি,
উড়াইয়ে মেঘাঞ্চল যায় দ্রুতগতি। ১৩
পড়িছে বৃষ্টির ফোঁটা ধীরে টুপ টুপ্
ভিজে লতা ভিজে ফুল
ভিজে বৃক্ষে বুলবুল্
করিছে কাতরকণ্ঠে করুণ বিলাপ। ১৪
বিধাতার সৃষ্টি-লীলা অতি চমৎকার;
বায়ু মেঘ সহ বৃষ্টি
আবরিয়া জীবদৃষ্টি
আছে সদা অঙ্গভূষা হয়ে বরষার। ১৫
চারি দিক থৈ থৈ জলে ভরপুর;
খাল বিল নদী নদ
মাঠ ঘাট গ্রাম্য পথ
খানা ডোবা যত কিছু সরসী পুকুর। ১৬
জলে ডোবা ঘর বাড়ী বিষম ব্যাপার!
পাঁকুয়ে চরণ ক্ষত,
স্ফূর্তিহীন লোক যত,
বাঁচে প্রাণ অন্ত হ'লে দুরন্ত বর্ষার। ১৭

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন।

রাজা রামমোহন।*

হে দেব,
ঘোর অত্যাচারে যবে,
ব্যতিব্যস্ত ছিল সবে,
জ্বলিত অশান্তি-বহ্নি প্রতি ঘরে ঘরে,
উদিলে হে এ ভারতে দেবরূপ ধরে। ১
দীন আমি ক্ষুদ্র অতি,
কোথা মোর সে শকতি,
বর্ণিব তোমার গুণ, সৌন্দর্য্য অপার,
প্রকাশিতে সে মাধুর্য্য অসাধ্য আমার। ২
পার্কার ম্যাটসিনী বীর,

* গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজে রাজা রামমোহন রায়ের ৬৫ বার্ষিক মহোৎসবে পঠিত।

আমেরিকা ইতালীর,
দেখায়েছে ঐশী শক্তি যেরূপ জগতে;
সেইরূপ ছিলে তুমি এ দীন ভারতে। ৩

কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী,
কেহ ভক্ত, কেহ গুণী,
এ সব নিয়ত দেব দেখি ত সংসারে;
এত গুণ দেখি নাই কভু একাধারে। ৪

নদী অবিরাম স্রোতে,
ধায় যথা লক্ষ্য পথে,
শত শত বাধা পানে ফিরে নাহি চায়;
কার সাধ্য কেবা পারে রোধিতে
তাহায়? ৫

তেমনি তুমিও ছিলে,
সব বিঘ্ন পায়ে ঠেলে,
সাধন করেছ লক্ষ্য সদা প্রাণপণে,
তোমার উপমা বল সাজে কার সনে? ৬

মহামতি সুনিপুণ,
একেতে অশেষ গুণ,
পার্থিব ধনের রাজা ছিলে না ভারতে,
জ্ঞানে, ধর্ম্মে বীর বলি পূজিত জগতে। ৭

ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, নীতি,
পবিত্র স্বদেশ-প্রীতি,—
যে সময়ে ছিল সব অন্ধকারময়;
ভারতে উদিলে তুমি সাধু মহোদয়। ৮

যেই ভাষা ছিল পদ্যে,
প্রবর্ত্তিলে তারে গদ্যে,
তুমিত প্রধান নেতা এ বঙ্গ ভাষার;
রাজনীতি-বিশারদ প্রথমে সবার। ৯

ধর্ম্ম-সংস্কারক তুমি,
উদ্ধারিলে জন্মভূমি,
একেশ্বরবাদ দেব করিয়ে প্রচার,
ভারতে ঋষির যাহা ছিল অলঙ্কার। ১০

প্রজ্বলিত চিতানলে,
ভস্মীভূতা হবে বলে,
নারী যবে ব্যোমস্পর্শী ক্রন্দন তুলিত,
বাদ্য ভাণ্ড বাজায়ে তা গোপন করিত। ১১

বিকট পাপের মূর্ত্তি,
সতীদাহ অপকীর্ত্তি,
উজ্জ্বল প্রতিভাবলে করি নিবারণ,
বঙ্গের অশেষ দুঃখ করিলে মোচন। ১২

এমন হিতার্থী বন্ধু,
পবিত্র প্রেমের সিন্ধু,
নারীকুল উন্নতিতে সতত চিন্তিত,
বঙ্গে আর পুনরায় হবে কি উদিত? ১৩

এবে তুমি স্বর্গবাসী,
বিস্তারিয়ে গুণরাশি,
দ্যুলোক করিছ আলো সৌন্দর্য্যে অপার,
তব জ্যোতিঃ বর্ণে দেব! সাধ্য আছে
কার? ১৪

এক সত্য রক্ষা তরে
যীশু গেল মৃত্যুপারে,
দলে দলে লোক তাহা করিতে রক্ষণ,
অকাতরে করিতেছে প্রাণ বিসর্জ্জন। ১৫

হে মহান্ বঙ্গরাজ,
বলিতে যে হয় লাজ,
জীবন সঞ্চার বঙ্গে করিলে যেমন,
তোমার চরিত্র বঙ্গে কে করে গ্রহণ? ১৬

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম,
স্বীয় শাস্ত্রমত মর্ম্ম,
নিঃস্বার্থে স্বদেশসেবা করিলে যেমন,
তব সমদর্শী ভাব কে করে গ্রহণ? ১৭

তোমা হেন মহামতি,
দেশহিতে সদা ব্রতী,
না পাইলে বঙ্গদেশে উঠিবে না আর;
অস্থি-চর্ম্ম-সার এবে হয়েছে তাহার। ১৮
প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্মে বীর,
সাধু কাজে মতি স্থির,
মানব দেবতা তুমি ছিলে ত জগতে;
পুনঃ কি হিতৈষী হেন পাইবে ভারতে?১৯
আঠারশ তেত্রিশ সাল,
বঙ্গে এল মহাকাল,
এ বর্ষে সৌভাগ্য-রবি হল অস্তগত,
অন্ধ তামসেতে পূর্ণ করি এ ভারত। ২০
যাহাই আশ্বিন মাসে,
মধ্য রাত্রি-অবকাশে,
নিঃশব্দে আইল কাল ব্রিষ্টল নগরে;
বঙ্গ-রত্ন হায় হায় নিয়ে গেল হরে। ২১
এস ভাই ভগীগণ,
হয়ে এক প্রাণ মন,
উদ্দীপিত হই মোরা তাঁর গুণগানে;
তাঁহারে করি পূজা অশ্রুকণা দানে। ২২

শ্রীমতী বিনোদিনী সেন

দুটী চাঁদ

কোথা গেল তোর,ধন! সে আকুল ক্রন্দন?
ও ক্ষুদ্র, নিস্পন্দ চিত্র,মরি, কি মোহন!
দুইটী উজ্জল আঁখি, শশধর পরে রাখি,
কি মধুর ভাবে যাদু! হলি নিমগন?
যুগল কপোলে দুটী, সজল মুকুতা ফুটি,
করিতেছে সে শোভায় আরো মনোরম,
থেকে থেকে চারু হাসি নীরব মাধুরী রাশি
খেলিছে অধর-তীরে অতি অনুপম!
অনন্ত সুষমা-খনি তোর ও নয়ন-মণি,
হ'বে যেরে ব্যথা খোকা! চাহিয়া, চাহিয়া,
অনুমানি এতক্ষণে পরিচিত চন্দ্রাননে
পড়েছে তোমার মনে, ফেলেছ চিনিয়া।
ও যে তোর খেলা সাথী ল'য়ে ও রজত-ভাতি
কত খেলা খেলেছিস্ নন্দন কাননে;
আজি এ অবনী'পরে নিরখি সে সঙ্গিবরে
হরষ বিস্ময় বুঝি উছলিছে মনে?
স্বর্গের স্মৃতিগুলি প্রীতির কিরণ তুলি,
একে একে উদিতেছে বুঝি হৃদাকাশে?
ইন্দ্রাণীর সে সোহাগ, উপেন্দ্রর অনুরাগ,
পৌলমীর স্নেহমাখা, সুধাময় হাসে?
নারদের বেদগান, ভারতীর বিদ্যা দান,
সুররাজ দুর্লভ অঙ্কে আরোহণ;
কৈলাসে সে নিমন্ত্রণ যোগেশের আলিঙ্গন,
ভবানীর শত শত সাদর চুম্বন;
অসুরের আবাহন, অমরের নিবারণ,
যাইতে সেথায় তোর সেই আকিঞ্চন;
মন্দাকিনী নীরে স্নান, অজস্র অমিয় পান,
দেব-ঋষি প্রাণভরা আশীষ বচন;
অনন্ত অম্বর আর অসংখ্য তারার হার,
শুক্র, বৃহস্পতি আদি প্রিয় গ্রহগণ,
শুভ্র কৌমুদীর রাশি, মধুর বিজলী হাসি
ইন্দ্রের অশনি, ধনু, রবির কিরণ;
দেব-দেবী-বিমোহন পারিজাত ফুলবন,
বসন্ত মলয়ানিল চির বিরাজিত;

কল্পতরু তরুবর-মূলে তোর ক্রীড়াম্বর,
অজর সে পিকমূল আদরে পালিত,
নির্ঝরিণী কলগান, বিহগ ললিত তান,
সেথা কার দীপ্তিময়ী প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলা—
আর(ও) বুঝি ভাব কত কচি হৃদে শত শত
স্মৃতির দুয়ার খুলি করিতেছে খেলা?
ফিরাইলে আঁখিতারা, পাছে চাঁদ হয় হারা,
তাই অনিমেষ দৃষ্টি চাঁদের বদনে;
মরি কি সুন্দর শোভা বিশ্বজন-মনোলোভা,
দু'টি চাঁদ অধঃ উর্দ্ধে নয়নে নয়নে!
ওত আকাশের ইন্দু, অমিয় কিরণবিন্দু
বরষিয়ে, উজলিছে মরত-ভুবন;
তুইত হৃদয়-শশী পুলক-পীযুষ-রশ্মি
বিতরিয়ে, শীতলিস হৃদি-উপবন।—
তোরা দু'টি সুধাকর, কে অধিক মনোহর
মানস-মুকুরে যদি করি বিলোকন;
তোর সহ উপমায় হিমাংশু হারিয়া যায়,
অযুত সুধাংশু জিনি তুই অতুলন!
হেন অপরূপ শশী রচিল বিরলে বসি
যেই দেব বিশ্বশিল্পী, চরণে তাঁহার—
যুড়িয়া যুগল করে, ভকতি-উচ্ছ্বাস ভরে
করে বাছা! মাতা তোর কোটি নমস্কার।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী।

সন্ধ্যাতারা।

হাসিতে হাসিতে অচল ধামেতে;
তপন আপন লুকায় কায়;
সুরক্তিম সেই কিরণ মেখলা,
সাজায়ে সুন্দর ধরণী গায়।১
মৃদুলে মৃদুলে মধুর সমীর
কাননে ফুটায়ে কুসুম বালা,
ছড়ায়ে সুরভি আপন প্রভাবে
মোহি চরাচর সাজায় ডালা।২
এ হেন সময়ে গোধূলি ললাটে,
কে তুমিরে বালা উদিলে ওই;
প্রীতির নিশানা হাসি-ভরা মুখ,
হেরিয়ে অন্তরে মোহিত হই।৩
আজি নিশীথিনী তমসে আবৃত,
এ ঘোর আঁধারে কে তুমি বালা,
নিজ প্রভাবলে হয়ে প্রভাময়ী
অসীম গগন করিছ আলা?।৪
শশিকর দিয়ে বিশাই রচিত—
তুমি কি অমর-বিলাসী ফুল?
নহে কেন এত নয়ন-রঞ্জন,
না দেখি তোমার রূপের তুল।৫
শুনিয়াছি আছে চন্দ্রকান্ত মণি,
দেখি নাই কভু নয়নে হায়!
তুমিই কি সেই অমূল্য রতন,
শোভা দাও নিতি নীলিম গায়?।৬
অতুলিত রূপ নিরখি তোমার
পরাণ উদাসী মধুর স্বরে,
বলে বারে বারে শিশু সুকুমার
ও উজল মণি দাওমা ধরে।৭
কিশোরে শৈশবে প্রবীণ হৃদয়ে
যে দেখে তোমায় নীলিম গায়;
সে জন উদাসী ও রূপ নিরখি
ও বদনে বালা কি আছে হায়!৮

তমসে আবৃত জীবন আমার,
তুমিই করিলে আলোকময়;
মরুভূমি সম হৃদয়কন্দরে
তুমিই ফুটালে কুসুমচয়। ৯
যদিও কখন জীবন আমার
তমসে আবৃত আবার হয়,
সায়াহ্নের কালে নিরখি তোমার
সে ঘোর আঁধার করিব লয়। ১০
এইরূপে নিতি গোধূলির ভালে
বিকশিত হয়ো স্বরগ-বালা!
হেরিয়ে তোমায় হৃদয় ভরিয়ে
জুড়াইব আমি প্রাণের জ্বালা। ১২

শ্রীভবাবতী দেবী,
নপাড়া।

ছোট দাদা।

(স্বপ্নদৃষ্টে লিখিত)

কাল কিগো ছোট দাদা তুমি এসেছিলে?
আটমাস হয় ভাই, তোমা আমা দেখা নাই,
তাই কি স্নেহের ধনে দেখিতে আইলে?
সেই যে মধ্যাহ্নকালে—আট মাস হয়
দুধ ভাত মেখে রেখে, গিয়াছ স্বরগ লোকে,
আহার করিতে আর পাওনি সময়।
তাই কি আবার ভাই থাইতে আইলে,
সেই দুধ ভাত মাখা, তেমনি যে আছে ঢাকা!
সেরেছে কি কাল ক্ষত নাই আর গলে!
রোগমুক্ত হয়ে কি গো আইলে আবার?
স্বরগকুসুম বাসে, দেবতার খাসে দু-মা
সেরেছে কি ছোট দাদা! সেরেছে "ক্যান্সার?"
সেরেছে কি সে অরুচি—যন্ত্রণা অপার,
সেরেছে কি ছোট দাদা, সেই আহার সেই পাপা—
রোগমুক্ত হয়ে কি গো আইলে আবার?
আর তো পড়ে না রক্ত নাক মুখ দিয়া—
শরীরে কি পাও বল, নহ আর দুর্ব্বল,
আর তো থাইতে গলে যায় না বাধিয়া?
এখন কি পার ভাই সকলি থাইতে?
নিশ্চয় মরণ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি
আর তো ফেল না অশ্রু বসিয়া শয্যাতে?
এবে কি প্রফুল্ল ম্লান বদন তোমার!
লয়ে ঔষধের শিশি, রক্ষিয়াছ দিবা নিশি,
ঔষধ করেছ পান নিত্য অনিবার।
তবুও এ দেশে তোমা রাখিল না আর,
বাছিয়া লইয়া গেল, বাধা বিঘ্ন না মানিল,
দুরন্ত কালের চর দুরন্ত ক্যান্সার।
বুঝিল না আমাদের কেহ নাই ভবে,
বালক বালিকা দুটী, সবে উঠিতেছে ফুটি,
গগন করিছে পূর্ণ "বাবা" "বাবা" রবে।
বুঝিল না দুঃখীর কেহ নাহি আর
একটি সান্ত্বনা কথা, কহিতে জনক মাতা,
শ্বশুর শাশুড় নাই শূন্য এ সংসার।
তাই কি দেখিতে ভাই আইলে আবার,
কোলে নিতে গিরিজায়, চুমা খেতে উষা মায়,
মুছাইতে শোক-অশ্রু প্রিয় বনিতার?

শ্রীঅম্বুজা—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৬ বর্ষ। ৪০৫-৬ সংখ্যা। | আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৫। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতার গ্রহশান্তি—২৮এ সেপ্টেম্বরের পর আর কোনও "প্লেগ" না হওয়াতে প্লেগ-সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা সকল স্থগিত করা হইয়াছে। কলিকাতা নিরাপদ এবং রাজপুরুষেরাও নিরুদ্বেগ হইলেন দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি।

পেনী ডাক—আগামী বড় দিন হইতে ভারতবর্ষের যে কোনও স্থান হইতে বিলাত বা ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্ত যে কোন স্থানে চিঠি এক পেনী বা এক আনা মাসুলে যাইবে। এত দিন মাসুল ৵১০ ছিল।

দেশী সিবিলিয়ান—এ বৎসর সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় একেবারে ৮ জন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কোনও বৎসর দেশীয়দিগের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হয় নাই। উত্তীর্ণদিগের নাম :—

(১) মন্মথ কৃষ্ণ দেব, (২) যতীন্দ্র নাথ রায়, (৩) বায়রামজী রুষ্টমজী সেটা, (৪) প্রতাপচন্দ্র দত্ত, (৫) চারুচন্দ্র দত্ত, (৬) যতীন্দ্রনাথ রায় (ঢাকা), (৭) গোকুলচাঁদ বাধওয়ার এবং (৮) গাজাফর আলী খাঁ।

মহারাণীর ভ্রমণ—ভারতেশ্বরী স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। আগামী ১৯এ নবেম্বর লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন।

রমণীর আত্মোৎসর্গ—কর্ণেল অলকট্ যে পেড়িয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার শিক্ষকের অভাব হওয়াতে থিওজফিক্যাল সভা উপযুক্ত লোক আহ্বান করাতে আমেরিকার কুমারী

পি, সি, পামার বিনা বেতনে যাবজ্জীবন ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য করিবার ভার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। ইনি শিক্ষকতা-পরীক্ষোত্তীর্ণা এবং ইতিপূর্ব্বেই ষোল বৎসর কাল শিক্ষকতা করিয়া আসিয়াছেন।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র প্রেরণ—ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ এক জন বাঙ্গালী যুবককে ইটালীতে পাঠাইয়াছেন। তিনি আবার শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ তিন জন বাঙ্গালী ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন।

দৈবোৎপাত—গত ১০ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপসমূহে প্রবল ঝটিকা হয়, তাহাতে লক্ষাধিক লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও অন্য অন্য স্থানে বিপন্ন লোকদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞীর উইল—অল্প দিন হইল যে সাম্রাজ্ঞী শোচনীয়রূপে হত হইয়াছেন, তিনি অতিশয় বিচক্ষণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিন মাস হইল তিনি এক উইল করিয়া যান, তাহার প্রথমেই লেখা আছে "মানুষের কখন কি ঘটিবে, সে জানে না।" হায়! তাঁহারই উপর এই কথা খাটিল। ইউরোপের কোন রমণী ইহার মত অলঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন না। তাঁহার অলঙ্কারের কতক অংশ প্রায় কোটি মুদ্রায় বিক্রীত হইয়া ধর্ম্ম এবং দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ সাম্রাজ্ঞীর স্মরণার্থ একটী বিশেষ সম্মানসূচক উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন।

দিনামার রাজ্ঞীর স্মৃতি-সম্মান—আমাদের যুবরাজের শ্বশ্রূ দিনামার রাজ্ঞীর সমাধি-ক্রিয়া গত ১৫ই অক্টোবর সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতবর্ষের জাহাজ সকলের মাস্তুল অর্দ্ধাবনত করা হয়।

স্ত্রীর অপমানে নরহত্যা—মান্দ্রাজের এক দেশীয় সুবাদারের স্ত্রী রেলগাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের কামরায় আসিতেছিলেন। তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইয়াছিল, ইহাতে প্লেগ সন্দেহ করিয়া সুবাদারের অজ্ঞাতে তাঁহাকে প্লেগ-হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সুবাদার এই সংবাদ পাইয়া সেই শিবিরে গিয়া উপস্থিত হন এবং স্ত্রীর মুখে কর্ম্মচারীদিগের কঠোর ব্যবহারের কথা শুনিয়া তরবারির দ্বারা তাহাদের দুই-জনকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়াছেন। একজন কর্ম্মচারী মরিয়াছে।

আমেরিকার স্ত্রীজাতির উন্নতি—১৮৭০ ও ১৮৯১ এই দুই বৎসরের তুলনা করিলে মার্কিন স্ত্রীলোকদিগের ব্যবসায় কার্য্য সম্বন্ধে কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে দেখা যায়!

ব্যবসায়	১৮৭০ সাল	১৮৯১ সাল
স্থাপত্য	১	৫৩
চিত্র ও ভাস্কর	৪১২	১৫৩৪০
গ্রন্থরচনা	১৫৯	৬১৩৪
ধর্ম্মোপদেশ	৬৮	১৪৭২
চিকিৎসা	৫৫১	৭২৯৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	০	২০১০

আইন	৬	৪৭১
সম্পাদকতা	৩৫	১৪৩৫
বুককিপার	০	৪৩০৭১
রাজকার্য্য	৫১৫	৬৭১২
কেরাণীগিরি	৮০১৩	১,৪৩,৫৫৭

মহাত্মা টাটার মহদনুষ্ঠান—পারসী বণিক্ মহাত্মা জে, এন, টাটা ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া বৈজ্ঞানিক শিল্প শিক্ষার জন্ত একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ কার্য্যে আরও প্রভূত টাকার প্রয়োজন। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসিগণ টাটার মহদুদ্দেশ্য সাধনে সম্যক্ সহায়তা করিবেন।

নাম-মাহাত্ম্য।

নামের যে কি মাহাত্ম্য, অনেক সময় তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। এ বিষয়ের প্রতি একটু মনোনিবেশ করিলেই কিন্তু বুঝা যায় নামই সব! দ্বাপরের শেষে বা কলির প্রারম্ভেই বলুন নামের গুণ একবার বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়। বঙ্গদেশীয় কোন নরনারীকে আর বলিতে হইবে না যে, সত্যভামা-নাম্নী কৃষ্ণের এক প্রধানা মহিষী ছিলেন। কৃষ্ণের অনেক স্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, সত্যভামা স্বামীর হৃদয়ের অর্দ্ধেকের উপর অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সত্যভামা এক সময় এক প্রকাণ্ড ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। স্বামিসোহাগিনী প্রতিজ্ঞা করেন, ব্রত উদ্‌যাপনের সময় স্বামীর ওজনের ধনরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। উদ্‌যাপনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রত উদ্‌যাপনের অন্যান্ত অংশ সমাপ্ত হইবার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ওজন করিবার সময় আসিল। তুলাদণ্ডের এক দিকে তিনি উপবেশন করিলেন। আমি যতদূর জানি, শ্রীকৃষ্ণ আজকালকার বাঙ্গালী বাবুদের স্থায় স্থূলকায় ও স্থূলোদর ছিলেন না। ইতিহাস-পাঠে ইহাও আমি অবগত হইয়াছি যে, অনেক ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ সময় কলির বাঙ্গালী বাবুদিগকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের "ছিপছিপে" চেহারার নিন্দা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভগবান্ ত তুলাদণ্ডের এক দিকে উপবিষ্ট হইলেন। অপর দিকে দ্বারকা-রাজভাণ্ডার হইতে অসংখ্য ভৃত্য নানা প্রকার ধনরত্ন আনিয়া স্থাপন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই কার্য্য চলিল, কিন্তু কৃষ্ণের দিকের পাল্লা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ক্রমে রাজভাণ্ডার উজাড় হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মুখ এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতাব ধারণ করিল, যদুবংশীয় সকলের মুখ

শুষ্ক হইয়া গেল, সত্যভামা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। লজ্জা এবং ব্রতভঙ্গের ভয় তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল। ভগবান্ বোধ হয় তুলাদণ্ডে বসিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। মহা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ যানে আরোহণ করিয়া সেই "হুলস্থূল" ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "একটী তুলসীপত্র আন।" তুলসী পত্র আনীত হইলে নারদ তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখিলেন। তিনি তুলাদণ্ডের যে দিকে বসিয়াছিলেন, তাহার অপর দিকে যে সব ধনরাজি স্থাপিত হইয়াছিল ঋষিবর তাহা সব নামাইয়া সেই পাল্লার উপর কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসী-পত্র স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের পাল্লা-সমেত উপর দিকে উঠিলেন। উপর্যুক্ত তুলসীপত্র নারদকে প্রদত্ত হইল, সত্যভামার ব্রত উদ্‌যাপন হইল, যদুবংশীয় সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী "হা হুতাশ" করিতে করিতে দেশে ফিরিল এবং নারদ হৃষ্ট-চিত্তে ঢেঁকি হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

এই গল্পের মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিয়াছেন কি? তত্ত্বটী হইতেছে "নাস্তি নাম্নঃ পরং হি কিং" এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা দেবর্ষি নারদ। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্লভ সত্যের আবিষ্কার হয় বটে, কিন্তু ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আজও জনসাধারণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। প্রত্যেক গূঢ় তত্ত্বেরই দশা এইরূপ। কোন প্রতিভা-বান্ ব্যক্তি এক সময় উহা আবিষ্কার করেন, কিন্তু অনেক সময় উহা ধর্ম্মের তত্ত্বের ন্যায় বহুকাল গুহায় নিহিত থাকে। পরে কোন এক সুসময়ে উহার প্রচার হয়। ব্রহ্মার মানস-পুত্র নারদ নাম-মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেন বটে, কিন্তু এতকাল তত্ত্বটী প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। আজিকালি আমাদের দেশে কতকগুলি মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রসাদে নামমাহাত্ম্য প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাঁদের কল্যাণে ঋষিবর নারদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

প্রায় ১৫০ বৎসর হইতে চলিল ইংরাজেরা ভারতে রাজত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম কিছুকাল ত গোলমালেই কাটিয়া যায়। ইংরাজ-শাসন বদ্ধমূল হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের কথা উঠে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা স্থিরীকৃত হয়। দেশে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইতে না হইতেই ইংরাজীশিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, সাহেবদের অনেক গুণ এ দেশীয়েতে নাই এবং সেই জন্যই সাহেব ও বাঙ্গালীতে এত প্রভেদ। কি উপায়ে সাহেবদের মহৎ গুণ সকল আমাদের আয়ত্ত হয়,

চারি দিকে তাহার আন্দোলন হইতে লাগিল, এবং নানাপ্রকার পরীক্ষাও চলিতে লাগিল। দেখা গেল সাহেবেরা সুরাসক্ত। শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করিলেন ইংরাজ মহত্বের ভিত্তি সুরার উপর স্থাপিত। তাঁহারা অমনি মদ ধরিলেন এবং দেশে মদের স্রোত বহিতে লাগিল। ইংরাজেরা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আচার ব্যবহারের মস্তকে বিলক্ষণ পদাঘাত চলিতে লাগিল। সুরা-পরীক্ষার সহিত আর এক পরীক্ষাও চলিল। কেহ কেহ ভাবিলেন সাহেবের সাহেবত্ব ইংরাজী লইয়া। ভাষার গুণেই তাঁহারা বড় লোক। অমনি তাঁহারাও ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে, চিঠি পত্র লিখিতে, বক্তৃতা করিতে, বহি লিখিতে এবং স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন। দেশীয় ভাষা ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং বর্ব্বরের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল। বাবা, খুড়া, মা, খুড়ী, এবং গৃহিণী অশিক্ষিত বলিয়াই বাঙ্গালার সঙ্গে তাঁহাদের যাহা কিছু সম্পর্ক রহিল। ইংরাজের গুণ প্রাপ্ত হইবার জন্য ঈদৃশ এবং অন্যাদৃশ নানা পরীক্ষা চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিছু দিন পরে বুঝা গেল এ সমস্ত পরীক্ষা বিফল। মাংস এবং মদ খাইলেই অথবা বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেই ইংরাজের মহৎ গুণসমূহ লাভ করা যায় না।

এ দিকে দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন শিক্ষিত লোকের মনে বিলাত যাইবার ইচ্ছা উদিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। বিলাত-গত মহাত্মারা ইংরাজ সমাজে মিশিতে লাগিলেন ও ইংরাজের চালচলন অবলম্বন করিলেন। বাবু গঙ্গাগোবিন্দ দত্ত বিলাত গেলেন, কিন্তু বাবু গঙ্গা-গোবিন্দ দত্তরূপে আর দেশে ফিরিলেন না—তিনি হইয়া আসিলেন জি, জি, ডট্ এস্কোয়ার ব্যারিষ্টার-আট্-ল। বাবু 'কুলভূষণ' বসু ডাক্তার হইতে বিলাত গিয়া ডাক্তার কে, বোস্ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ যে সব শিক্ষিত লোক বিলাত গেলেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে সাহেব হইয়া দেশে ফিরিলেন। ইহাদের প্রায় সকলেরই দেশের ভাষা, দেশের রীতি নীতি, দেশের সমাজনিয়ম, দেশীয় নাম লেখা প্রভৃতির উপর বিজাতীয় বিতৃষ্ণা জন্মিল। কত কত মহাত্মার যে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা ইহাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে চান, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পুরাতন ফাইল খুঁজিয়া দেখিবেন। যাহাহউক সংখ্যা লইয়া এখন আমাদের কাজ নাই। ইহাঁরা দেশের যে কি উপকার সাধন করিলেন, তাহাই দেখা যাউক। বিলাত-ফেরতদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সাহেব-দের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল আর বিলাত যাইবার দরকার হইতেছে না। যাঁহারা বোম্বাই কি

মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন, তাঁহারাও ইংরাজী প্রথায় আপনাদের নাম লিখন প্রণালী অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

বটের বীজ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিলেও চলে; যে না দেখে, সে কখনই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, কালে ঐ ক্ষুদ্র বীজ হইতে বনস্পতি উৎপন্ন হয়। দেশের যে সব লোক বিলাত কি বোম্বাই মান্দ্রাজ গিয়া সাহেবী পদ্ধতিতে নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহা দ্বারা তাঁহাদের ও দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করান। লোকেও ইহা অন্যভাবে লয় নাই। অনেক অজ্ঞ ও নগণ্য লোকে ইহাদিগকে বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিত। ইহাদের "কাল চামড়া" ও সাহেবী পোষাক দেখিয়া অনেক লোক হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া বলিত ইহারা কলিকাতার সহজদৃষ্ট গ্যাস-ফিটার ফিরিঙ্গিদের দলভুক্ত হইতে অভিলাষী। মূর্খ লোকেরা জানিত না ইহাঁরা দেশ উদ্ধারের ও সমাজ সংস্কারের বীজ বপন করিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীতে প্রথম হইতেই ইংরাজের উচ্চগুণের অভাব লক্ষিত হয়, এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই অভাব মোচনের উপায় উদ্ভাবনে আপনাদের মস্তিষ্ক প্রচুর আলোড়িত করেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও পরীক্ষা এতাবৎকাল বিফল হইয়াছিল। এখন কিন্তু এক অলৌকিক ব্যাপার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যে সব বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী প্রথম ইংরাজী ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ ইংরাজী ধারায় নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইংরাজের যে সব সদ্গুণের অভাব নিবন্ধন সমাজ-সংস্কার এত কাল একরূপ বন্ধ ছিল, সেই সব গুণ তাঁহাদের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত গুণগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহাদের ও বড় বড় ইংরাজদের মধ্যে আর কোনও প্রভেদ নাই।

এদিকে দেশের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। জ্ঞানপিপাসু সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিলেন নামই সব, এবং এই নূতন সত্য প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সত্যটাকে নূতন বলা ঠিক্ হইল না। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ ইহার প্রচার করেন। কিন্তু যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটন-আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ নিয়মাবলী বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যেরা আবিষ্কার করিয়া যান এ কথা লোকে জানে না, তেমনি কে এই সুমহান্ সত্য পূর্ব্বে প্রচার করেন ইহাও অনেকে জানিত না। কিন্তু কোন্ মহাসত্য কবে নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হয়? নামমাহাত্ম্যরূপ পুনরাবিষ্কৃত মহাসত্যটীরও অনেক শত্রু জুটিয়া গেল। সমাজের অনেক অন্ধ অগ্রণীরা এই সত্য-প্রচারকদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন ও নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "এ সব পাষণ্ডদের সত্যের দোহাই দেওয়া

একটা ছল মাত্র ; ইহাদের আসল উদ্দেশ্য সাহেব হওয়া।” অগ্রণীরা নিজমতের সমর্থনার্থে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কুমার, নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্যাতনে কবে ও কোথায় সত্য দমিত হইয়াছে? শীঘ্রই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নূতন মতাবলম্বী হইলেন। যোগেশ চন্দ্র হড় এম, এ, নিকুঞ্জ বিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এ, মনোরঞ্জন দাস এম, ডি প্রভৃতিরা আর ওরূপ ভাবে নাম না লিখিয়া জে, সি, হড়, এম, এ ; এন, বি, মুখার্জ্জি বি, এ ; এম ডাস, এম ডি এইরূপ ভাবে নাম লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, যাঁহারা ইংরাজী ধরণে আপনাদের নাম লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারা সকল প্রকার ইংরাজী সদ্গুণে ভূষিত হইয়া পড়িলেন। নির্যাতনকারীরাও ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাই ভ্রান্ত, মনু যাজ্ঞবল্ক্য বুঝিতে পারেন নাই। সত্যের স্রোতে তাঁহারাও গা ঢালিলেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী হলধর তর্করত্ন এবং হিন্দুকুলর্ষভ সমাজনেতা জগৎদুর্লভ বসুও হইয়া পড়িলেন এইচ টর্করটুন ও জি, ডি, বোস্।

এদিকে মহিলা মহলেও গোল উঠিল। তাঁহারও শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারাও বুঝিতেছিলেন——

“না জাগিলে সব ভারতললনা
এ ভারত আর ইত্যাদি ইত্যাদি।”

জাগিবার উপায় উদ্ভাবনা হয় নাই বলিয়াই এতদিন তাঁহারা জাগিতে পারেন নাই। এখন দেখিলেন পুরুষেরা জাগিবার এক অমোঘ উপায় বাহির করিয়াছেন। “প্রমদা পতিবর্ত্মগা” ইহা কবির উক্তি এবং শিক্ষিতা বঙ্গনারী যে সে প্রমদা নন ; দেশের উপকারার্থে, দেশকে জাগাইবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়পদে অসমসাহসে পুরুষপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মন দৃঢ় হইলেও স্ত্রীলোকের দেহ দুর্ব্বল। সেই জন্য ৩।৪ বার না থামিয়া তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বাবু বাবুরাম রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী হইলেন, প্রথম, শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী রায় ; দ্বিতীয়, মিসেস প্রমীলা সুন্দরী রায়, তৃতীয়, মিসেস পি, এস রায় এবং সর্ব্বশেষ মিসেস বি, আর, রায়। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমাদের সুন্দরীরা নামমাহাত্ম্য বুঝিয়া যতই তাঁহাদের নাম-লিখন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ততই বিবিদের নানা সদ্গুণ তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া গেল।

এ স্থলে ইহা বলা উচিত যে, এতদিন উপর্য্যুক্তরূপ নামমাহাত্ম্য প্রচার অনেকটা ইংরাজীতে হইতেছিল। কিন্তু “নদী যবে ধায় সিন্ধুপানে, কার সাধ্য রোধে গতি তার?” ক্রমে ঢেউ বাঙ্গালায় গিয়া লাগিল। প্রথমতঃ হলধর তর্করত্ন মহাশয়, মাননীয় জগৎদুর্লভ বসু এবং শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী তাঁহাদের নাম ইংরাজীতে

লিখিবার সময় ইংরাজী পদ্ধতিতে লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহারা বুঝিলেন যে, ইহাতে সত্যের অবমাননা করা হয়, এবং তাঁহাদের একাগ্রতার অভাব প্রকাশ পায়। যাহা করা উচিত তাহা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত, এবং সর্ব্বতোভাবে না করিলে উন্নতির পথে বাধা পড়ে। ফল এই হইল যে, বাঙ্গলা কিছু লিখিতে হইলেও তাঁহারা ইংরাজী প্রথায় নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় আশীর্ব্বাদ পত্রীতে নাম সই করিবার সময় লিখিতে লাগিলেন এইচ টর্করত্ন, বসুজা কোন বন্ধুকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে উপসংহারে লিখিতে লাগিলেন "একান্ত তোমারি জে, ডি, বোস্" এবং শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী তাঁর মাতাকে লিখিত পত্রে লিখিতে লাগিলেন "প্রণতা পি, এস্ (মিসেস বি, আর) রায়।"

কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই যে আমাদের সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরা উপরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই উন্নতির প্রধান কারণ ইংরাজী প্রথানুসারে নাম লিখন। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী চালচলন এবং ইংরাজী পোষাক ইহার কতক সহায়তা করিয়াছে সত্য, কিন্তু যত দিন না ইংরাজী ভাষায় নাম লেখা প্রচলিত হইয়াছিল তত দিন উন্নতির স্রোত মন্দ ছিল। উন্নত হইয়াছি বটে, কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধে ইউরোপের প্রধান জাতিদের আমরা অনেক পশ্চাতে। যদি আমরা সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে চাই, যদি আমরা উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে চাই, যদি আমরা ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইতে চাই, যদি আমরা জন্মভূমির মুখ সমুজ্জ্বল করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের সাহেবদিগের মহদ্‌গুণসমূহে ভূষিত হওয়া আবশ্যক; এবং ইহার প্রধান উপায় নামমাহাত্ম্য বুঝা অর্থাৎ বিলাতী প্রণালীতে নাম লেখা। যে দিন দেশের আপামর সাধারণ ঐ প্রথা অবলম্বন করিবে, সেইদিন আমরা জগতের মধ্যে এক প্রধানতম জাতি হইয়া পড়িব।

নাম-মাহাত্ম্যের আর দুই একটী প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। অনেকেই বলেন যে, হিন্দু মুসলমান হইলেই নাম বদলান। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নাম বদলাইয়া থাকেন। অনেক সময় হিন্দু খৃষ্টান হইলেও নাম বদলান বা পুরাতন নামে একটা নূতন নাম যোগ করেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর তাঁহার নামের অগ্রে "মাইকেল" যোগ করিয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে একজন ছিলেন অতুলকৃষ্ণ কর। খ্রীষ্টান হইয়া হইলেন চার্লস্ গুডিভ কর। অনেক দেশীয় খ্রীষ্টান আপনাদের ছেলে মেয়েদের বিদেশীয় নাম রাখেন। এ দেশে টমাস পাড়ে বা ইলাইজা মিত্র বড় বিরল

নহে। ইহার কারণ কি? কারণ এক মাত্র। ইহাঁরা নামমাহাত্ম্য বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টান উভয়েরই বিশ্বাস প্রলয় দিনে সকল নর নারীর বিচার হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বর্গে অনন্ত সুখ এবং অন্যান্য সকলের নরকাগ্নির ব্যবস্থা হইবে। সকল লোককেই ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। মহতী জনতা হইবে এবং প্রত্যেক লোকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা জানান হইবে। এই অমানুষী জনতায় পাছে তাড়াতাড়িতে নামের দোষে কাহারও সম্বন্ধে ভুল ব্যবস্থা হয়, সেই জন্যই হিন্দু মুসলমান হইলে এবং অনেক সময় খ্রীষ্টান হইলে নামের সম্পূর্ণ অথবা অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাতে কি নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতেছে না?

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট এলিয়ট সাহেব বাঙ্গালী-বিদ্বেষী এবং সর্ব্বদা বাঙ্গালীদের উন্নতির পথে বাধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। সত্য কি মিথ্যা ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু আমারও এ বিষয়ে একটু সন্দেহ হয়। পূর্ব্বে গেজেটে বাঙ্গালী সিবিলিয়ানদের নাম সাহেবদের ন্যায় লিখিত হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত তখন ছিলেন আর সি ডট্। কিন্তু এলিয়ট বাহাদুর এ প্রথা রদ করিয়া নিয়ম করেন যে, বাঙ্গালী যে কেহ হউক না কেন, তাঁহার নাম সাহেবী ধরণে না হইয়া পুরা বাঙ্গালী ধরণে লিখিত হইবে। আমার বোধ হয় তিনি নাম-মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীদের নাম সাহেবী রকমে লিখিত হইলে পাছে বাঙ্গালীরা কালক্রমে সর্ব্ববিষয়ে সাহেবদের সমকক্ষ হইয়া উঠে, সেই ভয়ে সুচতুর এলিয়ট সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রথা পরিবর্ত্তিত করেন।

ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে তাহার অর্থ "নামে আইসে যায় কি?" আমি উপরে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে নামই সব। ইতি—

ডি, এন, বসু।

সুমিত্রা।

(চরিত্র সমালোচন)।

রবীন্দ্রনাথের সুপ্রতিষ্ঠিত "রাজা ও রাণী" নাটকের সুমিত্রা-চরিত্র অদ্য আমাদের আলোচ্য। উক্ত নাটকে যে কয়টী স্ত্রী-চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুণগরিমায় ও চরিত্রোৎকর্ষে সুমিত্রা শীর্ষস্থানীয়া। চরিত্রের যে সকল গুণে মানবী দেবী বলিয়া গণিতা ও পূজিতা হয়, সুমিত্রায় তাহার প্রায় পূর্ণবিকাশ

লক্ষিত হয়। অদৃষ্টগুণে আমাদের সুমিত্রা রাজকন্যা ও রাজরাণী। কিন্তু উচ্চকুলোদ্ভবা রাজ্ঞী বলিয়া, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য বা বিলাসিতা, আলস্য বা হৃদয়হীনতা, তাঁহার প্রকৃতিতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত তাঁহার চরিত্র বহুল সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত। তাঁহার হৃদয় সরল, উদার, স্নেহ-প্রবণ ;—তাঁহার অন্তঃকরণ পরদুঃখকাতর, সত্যসংযত, ওজস্বিতাপূর্ণ—সুমিত্রা প্রাণময়ী, শক্তিময়ী, ও দয়াময়ী। সুমিত্রা স্বামীতে প্রগাঢ় অনুরক্তা, সন্তানে অনুপম স্নেহযুক্তা, গৃহকার্য্যে সম্যক্‌-অভিনিবিষ্টা। সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেবীদুর্লভ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল গুণে প্রাচীন ভারতের আর্য্যললনাগণ প্রাতঃস্মরণীয়া এবং জগতের নমস্যা হইয়াছেন, যে সকল উৎকর্ষে সীতা ও সাবিত্রী, শকুন্তলা ও দময়ন্তী, পৃথিবীতে পুণ্যশ্লোকা হইয়াছেন, সে সকল গুণ আজিকার দিনে খুব সুলভ নহে।

আমরা সুমিত্রাচরিত্রের প্রধান প্রধান গুণগুলিকে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার পূর্ব্বক, তাহাদের সত্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিব।
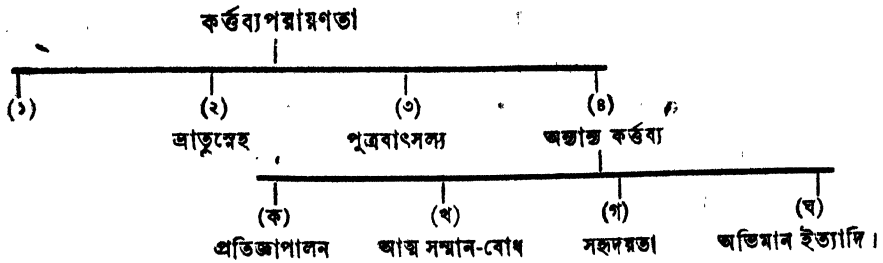
কর্ত্তব্যপরায়ণতা—কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান সুমিত্রাচরিত্রের মূলভিত্তি। তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণ সকল—অতুল পতিভক্তি, প্রগাঢ় ভ্রাতৃস্নেহ, অকৃত্রিম পুত্রবাৎসল্য প্রভৃতি সমস্তই সেই এক মূলস্তম্ভের উপর সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই অন্যান্য সকল মহত্ত্বের কেন্দ্রীভূত। ইহার প্রমাণ গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় "দৃশ্যে", (৯ পৃঃ), প্রেমবিহ্বল, আকাঙ্ক্ষাকাতর স্বামীর সহিত তাঁহার কথোপকথনেই ইহার সূচনা। স্বামী বিক্রমদেব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথা ছিলে প্রিয়ে ?"

হৃদয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যভার লইয়া সুমিত্রা উত্তর করিলেন—

"নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস।"

সুমিত্রা রাজরাণী অথচ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহিণী ; তাঁহার অবশ্যসম্পাদ্য অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি তাঁহার কাছে উপেক্ষিত নহে। তাই কহিলেন—

"থাকি যবে গৃহকাজে—
জেনো নাথ তোমারি সে গৃহ
তোমারি সে কাজ"

কি সুন্দর চিত্র! কি অপূর্ব্ব কবিত্ব!! কুসুম-কোমল পতিপ্রেমের সহিত কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান কি সুন্দর স্বর্গীয় ভাবে বিজড়িত!! "কেবল স্বামীর বাসনা পরিতৃপ্ত করিলেই গৃহিণীর কর্ত্তব্য শেষ হয় না" —এই নীতিটী সুমিত্রার প্রথম উক্তিতেই কেমন সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে! মহাকবি সেক্সপীয়রের জগদ্বিখ্যাত "জুলিয়স্ সিজর" নাটকের পোর্শিয়া-চিত্রও এই সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তব্যবুদ্ধির কাছে হীনপ্রভ!

তৎপরে পতি যখন মর্ম্মকাতর হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে কহিলেন—

"সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি
*   *   *   *
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ"
(১০ পৃঃ)

অমনি সুমিত্রা উত্তর করিলেন—

"কেবল অন্তরের তব? নহে নাথ নহে,
রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে!
(ঐ)
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী"

কি সুন্দর দেবী-দুর্লভ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা!!

স্থানান্তরে, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজ্যলক্ষ্মী সুমিত্রা ঘোর মর্ম্মবিদ্ধা। কিন্তু রাজা বিক্রমদেব তাহার প্রতিকার-বিমুখ। তিনি সুমিত্রাকে কহিলেন—

*   *   *   *

জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে" (১১পৃঃ)

তাহাতে রাজ্ঞী কহিলেন—

"শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছি ছি মহারাজ,
একি ভালবাসা?
*   *   *   *
আমারে বেসোনা ভাল রাজশ্রীর চেয়ে।"
(ঐ)

অন্যত্র—

স্থান দিও হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিওনা আমারে" (ঐ)
"এই মুছিলাম অশ্রু, যাও রাজকাজে"
(১৩ পৃঃ)
"ওই শুন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আবাহন!! (ঐ)

যে সাধ্বী রমণী, স্বামী বিমুখ হইলে, তাঁহার পূর্ণ ভালবাসা—ষোল আনা হৃদয়টুকু পাইবার জন্য জগতের অপর সকল স্বার্থ অম্লানমুখে বিসর্জ্জন করিতে পারে; যাহার অভাব হইলে, এমন কি প্রাণ পরিত্যাগেও কুণ্ঠিতা হয় না, সেই রমণী স্বামীর প্রাণভরা প্রেম অঞ্জলি পুরিয়া ডালি পাইয়াও, তাহা যেন দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিতেছেন! ইহা কি অসাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত নহে? পতির প্রতি এই রাজ্যশাসন, প্রজাপালন এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ কি কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-জনিত নহে? সুমিত্রা উপদেশে যথার্থই স্বামীর প্রতি গুরুতুল্যা। প্রেমময় পতির ঘোর মর্ম্মকাতরতা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র

বিচলিত করিতে পারিল না! তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞানরূপ অটলাচলে দাঁড়াইয়া স্বামীর হৃদয়ভেদী কাতরোক্তি—যাহাতে সামান্যা নারী একেবারে বিমুগ্ধ ও বিগলিত হইতেন—তাহাতে সনির্ব্বন্ধ বাহ্য বিরাগ দেখাইলেন!! তৎপরে সুমিত্রার স্বার্থত্যাগ কি অলোকসামান্য নহে? তিনি পতির পূর্ণ ভালবাসার অংশ স্বহস্তে অন্য কার্য্যে বণ্টন করিয়া দিতে ব্যগ্র—তাঁহার একাগ্র হৃদয়কে বিভিন্ন কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত। শুধু প্রবৃত্ত নহে—নিজে উপেক্ষিতা হইয়া থাকিতেও প্রস্তুত!! তাই বীর-প্রাণা সাধ্বী কহিলেন—

"ঘৃণা কর মহারাজ ঘৃণা কর মোরে,
সেও ভাল—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে,
করিও না বিসর্জ্জন সমস্ত পৌরুষ।"
(২৬ পৃঃ)

কেনইবা না বলিবেন? তাঁহার নারীর হৃদয়—জননীর প্রাণ। প্রকৃতিপুঞ্জের করুণ রোদনে সে হৃদয়-তন্ত্রী একতানে বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্তান ক্ষুধায় কাঁদিতেছে—অন্যের পাশব অত্যাচারে জীবন্মৃত হইতেছে—সে দৃশ্য দেখিয়া, সে পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া মায়ের প্রাণ স্থির থাকিবে কেমন করিয়া? তাই স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রতিমা সুমিত্রা নিজের সমস্ত স্বার্থ বলি দিতে এত ব্যগ্র! তাই তিনি কখনও স্নেহ-মধুর উপদেশে, কখনও মৃদু-তীব্র ভর্ৎসনায়, কখনও বা সজলনেত্রে পতির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রবৃত্তি লওয়াইতেছেন। পরিশেষে ভ্রাতা কুমারসেনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, সেই কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে, তাঁহার ছিন্নমুণ্ড স্বহস্তে লইয়া কাশ্মীরের রাজপদে উপহার!! ধন্য সুমিত্রা! ধন্য তোমার কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা!! আর যে কবি এরূপ উচ্চ আদর্শে নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে পারেন, তিনিও ধন্য!!

(১) পতিভক্তি—যে কারণে আমাদের সুমিত্রা কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সেই কারণ হইতেই তাঁহার হৃদয়ে অপরিমেয় পতিভক্তি উৎপন্ন।

(ক) "নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস" (৯ পৃঃ)

(খ) "কেবল অন্তরে তব? নহে—নাথ নহে,
অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী"
(১০ পৃঃ)

(গ) "শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশী নহি" (১১ পৃঃ)

(ঘ) "স্থান দিও হৃদয়ের পাশে ঐ

(ঙ) "কেমনে বোঝাব?
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে" (১৮ পৃঃ)

(চ) "ভাই, রাজারে মার্জ্জনা; কর রোষ আমার উপরে" (৬৭ পৃঃ)

(ছ) "চরণে পতিত দাসী
কি করিতে চাও কর" (২৬ পৃঃ)

যে পতিভক্তি আদর্শ হিন্দুরমণীর চরিত্রের প্রশস্যতম ভূষণ, সুমিত্রার প্রত্যেক কল্পনায়, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক কার্য্যে তাহা উত্তমরূপে স্ফুরিত। কবি তাহা অতিশয় দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়া, সুমিত্রাকে আদর্শসতী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইয়াছে। তবে সুমিত্রাকে কেবল পতিব্রতা করিয়া চিত্রিত করিলে, কবির উচ্চ আদর্শ খাটো হইয়া পড়িত। তাই পতিপ্রেমকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, কবি তাঁহাকে অন্যান্য কর্ত্তব্যের প্রতিও সমুচিত অনুরক্তা করিয়াছেন। ইহাতে সুমিত্রার পতিভক্তি আরো সুন্দর ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন স্বামী বিক্রমদেব কাতর-কণ্ঠে অভিমানভরে কহিলেন—

কোথা যাও একবার ফিরে চাও রাণী,
রাজা আমি পৃথিবীর··· ··· ··· ··
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী রাজরাজেশ্বরী?" (২৫ পৃঃ)

তখন সে কাতরতার প্রতি—সে ঐকান্তিক আগ্রহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সুমিত্রা উত্তর করিবেন—

"যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই
কভু" (ঐ)

পাতিব্রত্য-নিঃস্যন্দ কি মর্ম্মভেদী কঠোর উক্তি! কর্ত্তব্যজ্ঞানবিমিশ্র অনুপম পতি-প্রেমের কি নিদারুণ অভিব্যক্তি! এক দিকে পতিপ্রেমের অন্তর্নিহিত প্রখর স্রোতঃ, অপর দিকে রাজ্যনাশে ও প্রজা-পীড়নজনিত কর্ত্তব্যের সকরুণ আহ্বান!! উভয়ের কি সুন্দর সংমিশ্রণ। যেমন পার্শ্বে অন্ধকার না থাকিলে আলোকের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না; পার্শ্বে দুঃখ না থাকিলে সুখের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, তেমনি দুইটী বিভিন্নপথগামী চিত্ত-বৃত্তির সংঘর্ষণে, সুমিত্রার পতিপ্রেম কি সুন্দরই ফুটিয়াছে!! সিদ্ধহস্ত নিপুণ কবির কি সুন্দর কৌশল!!

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সুমিত্রা হৃদয়ে অণুমাত্র পতিদ্রোহিণী নহে। তিনি সম্যক্‌রূপে পতির অনুগতা ও পদাশ্রিতা। রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন এই দুইটী কর্ত্তব্যপালনে রাজাকে বিমুখ দেখিয়াই রাজ্যলক্ষ্মী পতির প্রতি বাহ্য বিরাগ মাত্র দেখাইতেছিলেন, এ কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। যখন কোন মতে তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন অভিমানে, দুঃখে, মর্ম্মবেদনায় আত্মহারা হইয়াই, প্রজাবৎসলা দীনজননী কহিয়া-ছিলেন—

"ঘৃণা কর মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে,
* * একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও ভাল * * (২৬ পৃঃ)

কিন্তু সাধ্বী পরঃমুহূর্ত্তেই যাতনায় মর্ম্মবিদ্ধ হইলেন। রাজা যখন কহিলেন—

"এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর!
নির্ম্মম! নিষ্ঠুর!! পাষাণ-প্রতিমা তুমি!"

তখনি সুমিত্রার হৃদয় গলিয়া গেল—পতির কাতরোক্তি তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিন্ধিল—মর্ম্মাহতা হইয়া কাতর-

কণ্ঠে কহিলেন—"স্বামিন্! প্রভো! আমি "পাষাণ-প্রতিমা" নই—আমার প্রতি বিনা দোষে এত "কঠিন বচন" প্রয়োগ করিতেছ—আমি তোমার "চিরানুগতা" "পদাশ্রিতা"—প্রেমাভিলাষিণী দাসী মাত্র।" তখন ধূলিধূসরিতা লতিকার ন্যায় কাতর ও বিনত হইয়া সুমিত্রা কহিলেন—

"চরণে পতিত দাসী কি করিতে চাও কর—
——কেন রোষ বিনা অপরাধে" (২৬ পৃ)

তখনও স্বামী নির্ব্বন্ধত্যাগ করিলেন না। সাধ্বী অনন্যোপায় হইয়া, হৃদয়ের প্রতপ্ত বাসনা ও পতিপ্রেম অশ্রুরূপে বাহির করিলেন। সুমিত্রা কাঁদিলেন। মরি! মরি! কবির কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানে ও কোমল পতিপ্রেমে—কাঠিন্যে ও কোমলতায়, পাষাণে ও প্রসূনে কি অপূর্ব্ব সম্মিলন! কি মধুর সমন্বয়! ধন্য কবি! ধন্য তোমার লেখনী!!

তৎপরে স্বামীর অপযশ প্রক্ষালনের জন্য সাধ্বী স্বীয় আত্মীয়গণকে দমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সক্রোধে কহিলেন—

"স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে।"
"অবিলম্বে যাও, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে।"
(২৭—২৮ পৃঃ)

ইহাও কি সুমিত্রার স্বামি-ভক্তি-ব্যঞ্জক নহে?

স্থানান্তরে, যখন সুমিত্রা ও তাঁহার ভ্রাতা কুমার সেন বিক্রমদেবের শিবির-প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত ও অপমানিত হইলেন এবং উদ্ধত যুবরাজ, যুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন, তখন পতিহিতৈষিণী রাজ্য-লক্ষ্মী, স্বামীর ও রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় অতিমাত্র ভীতা হইলেন। তিনি সহোদরকে মিনতি করিয়া যুদ্ধ-বিরত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন—

"ভাই রাজারে মার্জ্জনা কর" (৬৭পৃঃ)

পতিকৃত ভ্রাতৃ-অপমান সতী নিজশিরে লইয়া কহিলেন—

"কর রোষ আমার উপরে" (ঐ)

তৎপরে সুমিত্রার বিনয়ে ও সান্ত্বনায়, কুমার সেন বিক্রমদেবকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইয়া যখন কহিলেন—

"যুদ্ধ বীরধর্ম্ম বটে
ক্ষমা তার চেয়ে বীরত্ব অধিক"

তখন পতিব্রতা হাতে স্বর্গ পাইলেন—আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভ্রাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—

"ধন্য ভাই বীর তুমি, মহাপ্রাণ।
তুমি নরপতি এ নরসমাজমাঝে"

যখন সুমিত্রা দেবীমন্দিরে জগজ্জননীর পূজায় নিবিষ্টা, তখন তিনি একমাত্র পতির মঙ্গলকামনাই করিতেছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"আজ সব পূজা ব্যর্থ হল—
শুধু সে সুন্দর মুখ পড়ে মনে—
সেই প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটী

সেই শয্যাপরে একা সুপ্ত মহারাজ!

* * *

থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
'ফিরে এস, ফিরে এস রাণী'—
প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর"—

* * *

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে
গিয়াছেন বনে, আমি যাব পতিসত্য
পালনের লাগি। যে সত্যে আছেন
বাঁধা
মহারাজ রাজলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
ব্যর্থ হইবে না—সামান্য নারীর তরে॥

(৩১—৩২ পৃঃ)

এই উক্তিটী সাধ্বী সুমিত্রার সমগ্র হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। পতিভক্তি—পতি-হিতৈষণা যে তাঁহার শরীরের শিরায় শিরায় প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে বিরাজমান, উদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাহার অলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ হেন সুমিত্রা-চিত্র কবির ইন্দ্রজালময় লেখনীর অপূর্ব্ব প্রহেলিকা নয় কি? তাঁহার শিল্প-তুলিকার বিশ্ববিমোহন চিত্রপট নয় কি?

(ক্রমশঃ)

দেবলরাজ।

(৪০৪ সংখ্যা ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

(৩)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবনাথ পালকে হাঁড়ী গড়িবার মাটীর জন্য কখন শ্রীনগর, কখন বা চৌবেড়িয়া যাইতে হইত। ঐ দুইটী জনপদ তখন ঘোরারণ্যে আচ্ছন্ন ছিল, আমরা সে কথারও উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীনগরের জঙ্গলের মধ্যে তখন কত কালের পুরাতন একটা বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। ঐ পুষ্করিণীর ঠিক্ মধ্যস্থলে একটা মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইত। কোন কোন দুঃসাহসী ব্যক্তি কখনও কখনও ডুব দিয়া ঐ জলমধ্যগত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিত বটে, কিন্তু কেহ কখন উহার তলস্পর্শ করিতে পারে নাই। উহার ঐই প্রদেশের গভীরতা কত, তাহা নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু ঐ গভীরতা ৪০হাতের যে কম নহে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। জল এমন স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যপ্রদ যে, শ্রীনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদূরবর্ত্তী লোকেরা উহার জল লইয়া গিয়া পান ও পাকাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিত। চতুর্দ্দিকের পাড় অতিশয় উচ্চ। ঐ পাড়ই আটাল ও রাঙ্গামাটীর আকর স্বরূপ ছিল। কুমারেরা নিয়ত মৃত্তিকা খনন করায় চারি দিকের পাড়েই অনেকগুলি গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। দেবনাথ এক দিন পশ্চিম পাড়ের পূর্ব্বপার্শ্বে মাটী কাটিতেছিল। হঠাৎ পূর্ব্ব

পাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে তাহার দৃষ্টি পড়িল। একটা বৃহৎ গর্ভিণী রামছাগী একটা গর্ত্তের মুখের সমীপে চরিতেছে। যে গর্ত্তের সম্মুখে ছাগী চরিতেছিল, ঐ গর্ত্তের মধ্যে দুইটা ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেবনাথ তাহাও দেখিতে পাইল। তখন দিবা তৃতীয় প্রহর অতীত-প্রায়।

অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহর। পরিষ্কৃত দিবা-লোক। বায়ুপ্রবাহ আদৌ নাই। সরোবরের স্বচ্ছ জল স্থির ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপক। জলের উপর কুমুদ-জাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্‌ভিদের পত্র ভাসমান। এই পত্রগুলি বিচিত্র, বিধাতার লীলাবিশেষের বিচিত্র রঙ্গভূমি। পত্রগুলি আকারে ছাব্বিশ ইঞ্চি ছাতার অপেক্ষাও বৃহৎ। ছাতার শিকের ন্যায় কেন্দ্র হইতে পরিধিস্পর্শী ষোড়শটী শিরায় পত্রগুলি বিভক্ত। উভয় শিরার মধ্যস্থ পত্রভাগ এক একটি মরকতময় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজবৎ প্রতীয়মান। প্রত্যেক শিরো-পরি তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকশ্রেণী সুসজ্জিত। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি ক্ষুদ্র মৎস্য লম্ফ প্রদানে পত্রোপরি পতিত ও কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এক প্রকার মৎস্যভুক্ ক্ষুদ্রাবয়ব পক্ষী তৎক্ষণাৎ ঐ কণ্টকবিদ্ধ মৎস্যগুলি ভোজন করিতেছে। ঐ পাখীগুলা মৎস্যভুক্, কিন্তু জল হইতে মৎস্য শিকারে অক্ষম। এজন্ত জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ পাদপনিচয়ে তাহারা নিয়ত বাস করিয়া থাকে। দেবনাথ পাড়ের মাটি কাটা মাথায় উঠিয়াছে,—‘হাঁ’ করিয়া এই কাণ্ড দেখিতেছে। অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যস্থ প্রজ্বলিত দীপদ্বয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে। ক্রমে তাহার বোধ হইল, দীপ দুটি যেন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিতেছে। দেবনাথের নয়ন সচল দীপ দর্শনে অচল হইল। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড একটা মুখ বাহির হইয়া সমীপস্থ ছাগীকে গ্রাস করিল। একখানা ছাগ-চর্ম্ম জড়াইলে যেরূপ আকার হয়, ছাগী সেই মুখকবলে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সেইরূপ হইয়া গেল। প্রজ্বলিত দীপ দুইটা সেই মুখের চক্ষু,—অন্ধকারে জ্বলিতেছিল,—বাহিরে দিবালোকে আসিয়া নির্ব্বাণ হইয়া গেল। দেবনাথ ছাগগ্রাসী জন্তুকে আর কি মনে করিয়াছিল, অজ-গর সর্প বলিয়া চিনিতে পারে নাই। দেব-নাথের জননী যখন পুত্রমুখে এই বিবরণ শ্রবণ করেন, তখনই একটা অজগর সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কেননা শ্রীনগরীয় অজগরের কথা তাঁহার পূর্ব্বে শুনা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস যে, এই অজগরই সে দিন শীতাতপ নিবারণ জন্য দেবনাথের মস্তকে ‘ছত্র’ ধরিয়াছিল। এ দেশীয় সর্ব্ব-সাধারণের ধারণা, যে নরনারী সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা হয়, তাঁহারা ভবিষ্যতে রাজা বা রাণী হইয়া থাকেন। ভারত-ইতিহাস পাঠকগণ জানেন যে, জাহাঙ্গীর-মহিষী জগজ্জ্যোতির বালিকাকালে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।

দেবনাথ পাড়ের মস্তকে অজগর

যে দিন ফণাছত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহার অয়নার্দ্ধ পূর্ব্বে একদা একজন জ্যোতির্ব্বিৎ দৈবজ্ঞ হাঙ্গরীবাঁকে উপস্থিত হয়েন। তিনি এ বাড়ী সে বাড়ী বেড়াইয়া অবশেষে দেবনাথের ভবনে শুভাগমন করেন। দৈবজ্ঞ দেখিলে সকলেরই ভবিষ্যৎ জীবনের দুই একটী কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। দৈবজ্ঞ ঠাকুর পার্শ্ববর্ত্তী প্রশ্নকারিগণের সহিত আলাপ করিতেছেন— কাহারও বা হাত দেখিতেছেন;—কিন্তু মধ্যে মধ্যে দেবনাথের দিকে খর দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। তখন দেবনাথ "চাকঘরে" বসিয়া ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপরে বড় বড় কলসী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। দেবনাথের অসামান্য রূপ, উজ্জ্বল গৌর কান্তি, বীরত্ব ও সাহসব্যঞ্জক বদনশ্রী, কুম্ভকারসাধারণ-দুর্লভ কুম্ভকারিণী লঘুহস্ততা প্রভৃতি দর্শনে দৈবজ্ঞ মুগ্ধ হইয়াছেন। কখনও বা ক্রিয়মাণ কার্য্যে তাহার প্রগাঢ় অভিনিবেশ দেখিয়া ভাবিতেছেন,— "বিধাতার বিচিত্র লীলা,—এমন রূপকেও এমন নীচ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন!" দেবনাথের দৈহিক একটা চিহ্নে দৈবজ্ঞের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই চিহ্নটী উত্তমরূপে দেখিবার জন্য দেবনাথকে নিকটে আহ্বান করিলেন। দেবনাথ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিতে চাহেন না। জননী একটা ধমক দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিলেন। দৈবজ্ঞ অগ্রে দেবনাথের কর-রেখা পর্য্যালোচনা করিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার ললাট মার্জ্জন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবনাথের জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"মা, তোমার পুত্রের অবস্থা এবং তোমার বাড়ী ঘরের শ্রী ছাঁদ দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য যদি সত্য হয়, তবে তোমার এই পুত্র রাজা হইবে;—এই দেখ, কপালে রাজদণ্ড! আর কর-রেখায় যে সব সুলক্ষণ আছে তাহা তুমি বুঝিবে না।" এই উক্তি করিয়া দেবনাথের ললাটস্থ পরিস্ফুট রাজদণ্ড জননীকে দেখাইয়া দিলেন। দেবনাথ হাসিয়া কহিলেন,—

"ঠাকুর, আপনার গণনায় ভুল হইয়াছে, আমার কপালে ওটা রাজদণ্ড নহে,— যমদণ্ড।" এই কথা বলিয়া সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চাকঘরে গেলেন এবং কলসী নির্ম্মাণে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী জনগণের কেহ হাসিল, কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে খড়-উড়া চালা ঘরকে রাজপুরী বলিয়া বিদ্রূপ করিল, কেহ বা দৈবজ্ঞ-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গম্ভীর ও নীরব ভাব প্রদর্শন করিল। দেবনাথ-জননী একটী সিকি সহ এক কাঠা চাউলের সিধা সাজাইয়া দৈবজ্ঞকে দক্ষিণা দিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দেবনাথের মস্তকে নিদ্রাকালে দুর্জ্জয় অজগর ফণাছত্র ধরিয়াছিল, এই সম্বাদ পাইবামাত্র শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসিনী দেবনাথ-জননীর উপরি-উক্ত দৈবজ্ঞবাক্যে

অধিকতর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কারণেই সে দিন দম্ভ-সহকারে বলিয়াছিলেন, "রাজার মেয়ে অবশ্যই রাজার মা হবে।"

(৪)

যে তিনখানি জনপদের সহিত এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আছে, আমরা গল্পের প্রারম্ভেই সেই তিনখানির উল্লেখ করিয়াছি। চৌবেড়িয়া তন্মধ্যে অন্যতম। এই চৌবেড়িয়ায় দেবনাথ-জননীর পিত্রালয়। দেবনাথের মাতামহের নাম রাজারাম পাল। রাজারাম ঋদ্ধিমান্ লোক। তাঁহার কয়েকখানি ক্ষুদ্র তালুক ছিল এবং তাঁহার ঘরে পুরুষানুক্রমে বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। ঠাকুর গড়া বা হাঁড়ী গড়ার ব্যবসায় তাঁহাদের বংশে ছিল না। রাজারাম নিজে সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। চৌবেড়ে, শ্রীনগর ও হাঙ্গিরবাঁক এই তিনখানি গ্রামে তৎকালে প্রায় তিন শত ঘর কুম্ভকারের বাস ছিল। রাজারাম তৎসর্ব্বাপেক্ষা বিষয়ী ও ভদ্র লোকের ন্যায় ক্রিয়াকলাপশীল ছিলেন। এজন্য অপরাপর লোকে তাঁহাকে "কুমারের রাজা" বলিত। নামও রাজারাম। রাজারামের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। এরূপ স্থলে পিতামাতার নিকট পাঁচ ভাইয়ের এক ভগ্নীর বড়ই আদর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজারামের আদরের কন্যাটী বড়ই রূপসী ছিলেন। বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় দেখাইত। এই কারণে রাজারাম কন্যাকে "রাজকন্যা, বা রাজার মেয়ে" বলিয়া আদর করিতেন। ক্রমে তাঁহার এই উপাধি প্রতিবেশিমণ্ডলীতে, পরে গ্রামে প্রথিত হইয়াছিল। তিনি আপনাকে একটী ক্ষুদ্র রাজার কন্যা বলিয়া আপনার মনেও অভিমান রাখিতেন—ঘটনাবিশেষে সে ভাব প্রকাশও করিতেন। সেই জন্যই সে দিন পুত্রের শাস্ত্রীয় অবিশ্বাসকে সংযত করণার্থ "রাজার মেয়ে অবশ্যই রাজার মা হইবে" শপথপূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন।

আমরা এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটী সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত প্রদান করা হয় নাই, অথচ এই স্থলে তাঁহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক হইতেছে।

যশোহর জিলার অন্তর্গত কায়বা নামক স্থানে কয়েক ঘর পশ্চিমদেশীয় পাঁড়ে উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়া বাস করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময়ে তাঁহারা কতকটা বাঙ্গালী ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, আধ-বাঙ্গলা আধ-হিন্দীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন সেই বংশীয় যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, এক "পাঁড়ে" উপাধি ভিন্ন আর সর্ব্বাংশেই তাঁহারা "বাঙ্গালী বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের সঙ্গে কয়েকটী রজঃপুত ও ক্ষত্রিয় জাতীয় ভৃত্য

আসিয়াছিলেন। আমাদিগের বর্ণনার সময়ে ক্ষত্রিয়জাতীয় ভৃত্যদিগের বংশে একটী অনাসক্ত যাজনশীল পুরুষ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটী পুত্র কন্যার জনক হইয়াও অর্থ উপার্জ্জনে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না। ক্রমে ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে সাধ্বী পত্নীর অনাহার ঘটিতে লাগিল। একদিন তিনি স্বামীকে কহিলেন,—

"আপনি আশুতোষ মহাদেবের পরম ভক্ত, তাঁহার নিকট কিছু ধন প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই দিবেন। তিনি নিজে দিগ্বাস কপালমালী শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তিনি ভক্তগণকে ধনবান্ করিয়া থাকেন। আপনি ধন-কামনায় তাঁহারই আরাধনা করুন, তাহা হইলে আমাদের এ দুঃখ থাকিবে না।

পত্নীর পুনঃ পুনঃ এইরূপ উত্তেজনায় ক্ষত্রিয় সাধু গৃহত্যাগ করেন। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীনগরের অজগর ও শার্দ্দূল-সঙ্কুল ঘোরারণ্যই তপস্যার জন্য মনোনীত করেন। এই সন্ন্যাসীই ভবিষ্যৎ শুভসূচনা পূর্ব্বক ফণছত্রী দেবনাথকে অভয় দান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)।

প্রভাতী।

(৪০৪ সংখ্যা—১৭২ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনিল।

অনিল জীবনসমুদ্রের ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যখন কূলপ্রাপ্ত হইল, তখন চাহিয়া দেখিল—সংসারে বড় সুখ—বড় মধু।

অনিল বণিকের ছেলে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে বাণিজ্যস্থলে যাইতে নৌকা ডুবিয়া জলপথে তাহার আত্মীয় সকলের মৃত্যু হয়, কিন্তু দ্বাদশ বৎসরের বালক অনিল মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াও রক্ষা পায় ও পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করে।

সে সময় যে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেও তখন দশম বৎসরের বালিকা প্রভাতী। অনেক দিনের কথা। এক দিন সেই চক্রবাক্-পরিশোভিতা হংস-মেখলা নদীর তটে প্রভূত পুষ্প-সমন্বিত স্বরচিত উচ্চ স্তবকে উপবিষ্ট হইয়া বালক গত দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, বালিকা নিকটস্থ তরুশাখা আনত করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে করিতে ডাকিল "অনিল অনিল!" অনিল মুখ ফিরাইয়া দেখিল প্রভাতী; পুষ্প-চয়ন-শ্রমে বালাতপে রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায় প্রভাতীর মুখ শোভা পাইতেছে!

অনিল বালিকার সহাস্য মুখ দেখিয়া আপনার অতীত দুঃখ ভুলিয়া গেল। বাল্য-সুলভ সরলতায় হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রভাতী কহিল "ভাই, তুমি কি ভাবিতেছিলে? তোমার মনে কি কোনও দুঃখ হইয়াছিল?

অনিল। প্রভাতী! তোর ভালবাসায় আমি আপনার দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। তোর হাসি মুখ দেখিলে আমার আর কিছু মনে হয় না।

প্রভাতী। তুমি আমাকে বোনের মত ভালবাস, আমিও তোমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসি।

অনিল। তুমি আমাকে প্রথম নদী-তীরে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া মধুমতীর সাহায্যে গৃহে লইয়া আইস ও বালিকা হইয়াও প্রবীণার ন্যায় আমার সেবা শুশ্রূষা কার্য্যে রত হও। অতএব তুমিই আমার জীবন-দায়িনী। তোমাকে তো আমি ভাল-বাসিতেই পারি, তুমি আমাকে কেন ভালবাস?

প্রভাতী। হাঁ ভাই, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। কেন জানি না, বোধ হয় তুমি আমার কেউ হও।

অনিল। তোমার পিতাও বণিক্, আমার পিতাও বণিক্। কিন্তু তোমরা এক দেশের, আমরা আর এক দেশের; তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

প্রভাতী। বোধ হয় আর জন্মের কোনও সম্বন্ধ থাকিবে।

এই বলিয়া সে একটি উপকথা বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতামহীর নিকট সে এই উপকথাটি শুনিয়াছিল।

এক রাজ-মাতা তাহার পাচক ব্রাহ্মণের ছেলেকে বড় ভালবাসিত। তাহাকে ভাল খাওয়াইবার জন্য ও ভাল পরাইবার জন্য তিনি এত ব্যস্ত হইতেন যে, পরে নিজেই মনে মনে লজ্জিত হইতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত যে, সর্ব্বদাই সেই ছেলেটীকে কাছে কাছে রাখেন। কিন্তু রাজমাতা হইয়া একটা ভৃত্যের পুত্রকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখা কিরূপে সম্ভব হয়? এই ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, মা ভগবতী নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিতেছেন "ও ছেলেটা তোর কে হয়, তা তুই জানিস্? ও তোর পূর্ব্ব জন্মের কনিষ্ঠ পুত্র। অতএব তুই উহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিয়া আশা পূর্ণ কর্।"

রাণী জাগ্রত হইয়া বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেটাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এমন হইত কেন?

প্রভাতীর উপকথা শেষ হইল। অনিল কহিল তবে তাহাই হইবে। কিন্তু প্রভা? আমি আর অধিক দিন তোমার কাছে থাকিতে পারিব না। আমার পিতাঠাকুর যেখানে বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন, সেইখানে এখনও আমার কিছু বিষয় আশয় ও নগদ টাকা পয়সা আছে, অতএব সেখানে আমাকে যাইতেই হইবে। পিতা

কহিয়াছেন, আমি পুরুষ ছেলে এখানে এ ভাবে বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। এখানে বিদ্যা উপার্জ্জনের কোনও উপায় নাই, অতএব বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জনের জন্য আমাকে ইতিমধ্যে স্থানান্তরে যাইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইতে হইবে।

অনিলের কথা শুনিয়া বালিকার সহাস্য মুখ মলিন হইল, সুনীল নয়নযুগল হইতে জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অনিল। আমি যাইব বটে, কিন্তু আবার আসিব। তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোথাও সুখ নাই। আমার আর কেহই নাই।

প্রভাতী। তুমি গেলে আমরা আর কাহার সঙ্গে খেলিব? পাড়া প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না। তুমি আমাকে বাঁশী বাজাইতে শিখাইয়াছ। তুমি ঠিক্ করিয়া বাঁশী মুখে তুলিয়া না দিলে আমি বাজাইতে পারি না। চন্দ্রকিরণে সুশীতল তারকা-সুশোভিত রজনীতে সুরভিত বনপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে তুমি আমাকে শিখাইয়াছ, শ্যাম লতিকার পাতার তলে তলে ছায়ার মত মিশিয়া মিশিয়া খেলিতে শিখাইয়াছ, জ্যোৎস্না উঠিলেই নদীতীরে আসিয়া বসিতে শিখাইয়াছ। তুমি সঙ্গে না থাকিলে কি আর আমরা এ সব কাজ করিতে সাহস পাইব? আর মধুমতীর সঙ্গে অনেক সময় আমার ঐক্য হয় না।

ইহার কিছু দিন পরে বালক বালিকাকে ছাড়িয়া বহুদূর দেশে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, কত কষ্ট, কত অপমান ঘোর তরঙ্গের মত গড়াইয়া গড়াইয়া অনিলের জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কখনও বা দারুণ মিথ্যা অপবাদে অপদস্থ, কখনও বা অকারণে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও দীর্ঘ মেয়াদে কারাবাসী! ঘোর দরিদ্রতানলে দগ্ধ, ভীষণ রোগে মুমূর্ষু, দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত ও বদ্ধ, দারুণ শীতে অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ-শীল। এইরূপ অনেকানেক কষ্টে নিপতিত হইয়াও সে পুরুষোচিত ব্যবহার ত্যাগ করিল না। বাল্যকালাবধি তাহার হৃদয়ে প্রভূত শৌর্য্যবীর্য্য পরিলক্ষিত হইত। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভ তাহার মনে ধ্রুবতারা স্বরূপ হইয়াছিল, সেই জন্য শত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও সে তাহা লাভ করিতে পারিয়াছিল। অবশেষে অনিল নিজের অসাধারণ বুদ্ধিবলে একজন বিলাসী রাজার বিশ্বাসী বন্ধুর পদ প্রাপ্ত হইল ও নানা দেশ বিদেশে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনিল প্রভাতীর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এইরূপ ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারিল যে, অবশ্য ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার পক্ষপাতিনী হইয়াছে। তাহার

পর দিন অনিল রাজার সঙ্গে মহা সমারোহে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইল।

সপ্তম দিবস অতিবাহিত হইল, তবুও রাজার মৃগয়া-পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। কিন্তু অচিরে নির্ম্মলাকাশ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত ও বৃষ্টির সঙ্গে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল, সেনানীদল লণ্ড ভণ্ড হইয়া কে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা রহিল না।

অনিল তখন অশ্বারোহণে অন্ধকারাবৃত মাঠ দিয়া শনৈঃ শনৈঃ গ্রামাভিমুখে যাইতেছিল। এক কুহকিনী আশাই তাহাকে সেই দিকে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, অচিরে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইল। অতএব সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল।

যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন সে দেখিল—রজনী প্রভাত হইয়াছে, শশিকলার ন্যায় অতি সুন্দর পলাশপুষ্প সকল চারি দিকে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। এক রম্য কাননের ভিতর পত্র-পুষ্প-শোভিত তরুলতা-পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে শয্যোপরি সে শায়িত আছে, আনত পুষ্প-মুকুট-শোভিত মন্দার তরুরাজি কুঞ্জ আকারে চারি দিকে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নিশীথিনীর কণ্ঠে যেমন নক্ষত্রমালা শোভা পায়, অনন্ত-যৌবন-গৌরবশালিনী প্রকৃতির কোমল কণ্ঠে সুরভিত পুষ্প-মালিকা সকল তেমনি শোভা পাইতেছে। সে বনের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত চ্যুত-মুকুলাঙ্কুর পরিশোভিত রসাল বৃক্ষনিচয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কুটীরাভ্যন্তরেও রাশীকৃত কুসুমাবলী সজ্জিত আছে। আর সে দেখিল তাহার সম্মুখে নব-বিকশিত যৌবন-ভার লইয়া কে একজন রমণী বসিয়া আছে, তাহার শরীর-সৌন্দর্য্যে চারি দিক্ আলো করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে মুক্ত বাতায়নে অপর একজন রমণী দাঁড়াইয়া আছে। রমণীর মস্তকে আনিতম্ব-লম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশকলাপ কুণ্ডলীকৃত কবরীরূপে শোভা পাইতেছে। সে অনিলকে জাগরিত হইতে দেখিয়া কহিল "প্রভাতি, দেখ দেখ উনি জাগিয়াছেন। বোধ হয় তোমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তুমি উহার সঙ্গে কথা বল, আমি চলিলাম।" বলিয়া সে রমণী চলিয়া গেল।

মধুমতীর কথা শুনিয়া অনিলের মনের ভাব যে কি রকম হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অনিল দেখিল যে, এই সম্মুখস্থ মনোহররূপা রমণীই তাহার সেই প্রভাতী। সে তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া প্রভাতীকে সাদরে সম্ভাষণ ও প্রেম-চুম্বন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিতে গেল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভাবিতে লাগিল—আজ আমার জন্ম সফল হইল, কারণ আজ আমি হৃদয়ের রাণীকে ফিরিয়া পাইলাম। দেখিতেছি প্রভাতী এখন বড়

হইয়াছে। মলয়-হিল্লোলে যেমন বসন্ত পুষ্প-কোরক প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি নব-যৌবন-ভরে তাহার সৌন্দর্য্যও বর্দ্ধিত। আহা কি মধুর! কিন্তু ইহাকে প্রেম-চুম্বন করিতে আমার কোনও অধিকার আছে কি? আমি কে?।

প্রকাশ্যে কহিল "প্রভাতি! তুমি এখনও কি আমাকে সেইরূপ ভালবাস? আমি তোমাকে এত দিন ছাড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু কত যে কষ্টে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। প্রভাতি! এবার তুমি আমাকে কোথায় পাইয়াছিলে? প্রভাতীর সুনীল নয়ন অশ্রুজলে ছল ছল করিতেছিল, অনিলের মধুর বচনে তাহা মুক্তাহারের ন্যায় ঝরঝর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যে হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য-দেবতা, শত দুঃখে সুখেও যাহার মুখ মনে পড়িত, যাহার বিরহও তাহার নিকট স্বর্গ-সুখ, আজ সেই অনিল তাহার নিকট উপস্থিত। কিন্তু আজ সে অনিলের কথার কোনও জবাব দিতে পারিল না, শুধু মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনিলও অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে প্রভাতী কহিল "যে দুঃখের দিন গিয়াছে, তাহা যাক্, আর যেন সে সময় না আসে। আমি তোমাকে যে অবস্থায় পাইয়াছিলাম, তাহা মনে হইলে এখনো হৃৎকম্প হয়।

অনিল। তুমিই বার বার আমার জীবন রক্ষা করিতেছ। বলিতে বলিতে অনিলের মুখ কৃতজ্ঞতায় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। সে তখন আশ্বাসিতহৃদয়ে কহিল "প্রভাতি! তুমি কি এখনও আমাকে সেইরূপ ভাল বাস?"

প্রভাতী মুখ তুলিয়া অনিলের মুখের দিকে চাহিল, অমনি ছোট রকমের একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি কম্পিত করিয়া গেল। অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কিছু বলিতে পারিল না, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া আনত-বদনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সেই অধোমুখী প্রফুল্ল-কল্পলতার দিকে তাকাইয়া অনিলের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে মধুর বচনে কহিল "এ অমৃতাধরে এমন বিষময় হাসি হাসিবার অর্থ কি, প্রভাতি?"

প্রভাতীও ছাড়িবার মেয়ে নয়, সেও কালো কেশের রাশি ঈষৎ সরাইয়া সুন্দর গ্রীবাদেশ বামে হেলাইয়া দুলিত অঞ্চলাগ্র খুঁটিতে খুঁটিতে সুন্দর চোখের উপর চোখ স্থাপিত করিয়া কহিল "দেখ এ অসময়ে বেশী বেয়াদবী করিলে ভাল হইবে না। কাল তুমি কিছু খাও নাই, তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি যাই, তোমার আহারের উদ্যোগ করিগে।"

অনিল হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাস্তবিক আমি বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছি।"

অনিলের কথায় বালিকা কি বুঝিল সেই জানে, কিন্তু সে কথায় সে লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

চুট্‌কি গল্প।

কৃষ্ণ পান্তীর বাঙ্‌নিষ্ঠা।

রাঢ় দেশের "রাহাজানি" ভারত-বিখ্যাত। পথিকগণের প্রাণনাশ করিয়া অথবা তাহাদিগকে মৃতবৎ আহত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করাকে "রাহাজানি" কহে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই ঐ ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইত। হুগলী জেলার অন্তর্গত নাড়িয়া নিত্যানন্দপুরের নিকটবর্ত্তী বগাচণ্ডী-গাছার খাল, চাক্‌দার নিকটবর্ত্তী হেঁড়ের খাল, বঁইচির সন্নিকট গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড ইত্যাদি বহুসংখ্যক স্থানে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও ঐ ভায়নক কাণ্ডের অভিনয় শ্রুত হইয়াছে।

রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুদিগের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তীর যখন চূড়ান্ত উন্নতির সময় এবং তিনি যখন হাটখোলায় কর্ত্তাবাবু এই নামে সুবিখ্যাত, তখন একবার দুর্গোৎসবের পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন কালকাতা হইতে বাড়ী যাইতে-ছিলেন। তখন রেলপথ ছিল না; কলিকাতা ও রাণাঘাটের মধ্যে জলপথে যাতায়াত করিতে হইত। কৃষ্ণপান্তী যখন পূর্ব্বোক্ত হেঁড়ের খালের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন রজনী উপস্থিত। একদল জলদস্যু (বম্বেটে) তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিল। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সন্ধান লইয়াছিল যে, পূজার সময় কৃষ্ণপান্তী অনেক টাকা কড়ি লইয়া বাড়ী যাইতেছেন এবং তাঁহার নৌকাখানা মারিতে পারিলে লাভের সীমা থাকিবে না। যখন তাহারা নৌকায় উঠিয়া লোক জনের প্রতি প্রহার আরম্ভ করিল, তখন কৃষ্ণপান্তী কহিলেন,

"তোমরা কে? কেন এরূপ অত্যাচার করিতেছ?" দস্যুগণ কহিল,—

"আমরা ডাকাইত, তোমাদিগকে প্রাণে মারিয়া নৌকা লুঠ করিব।"

"তোমরা জান, এ নৌকাখানা কাহার?"

"জানি, হাটখোলার কর্ত্তা বাবুর।" কৃষ্ণপান্তী কহিলেন,—

"তবে আজ চলিয়া যাও, দ্বাদশীর দিন কলিকাতার গদিতে আমার সঙ্গে দেখা করিও।" দস্যুগণ নীরবে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণপান্তী যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, কখনই আপন কথার অন্যথা করিতেন না, এই বিষয়ে চোর ডাকাইত-দিগেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ইহা বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। নির্দ্দিষ্ট দিনে দস্যুদলের দুই এক জন অকুতো-ভয়ে হাটখোলার গদিতে গমনপূর্ব্বক কর্ত্তা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে পাঁচশত টাকা দিবার জন্য খাতাঞ্জীকে আদেশ করিলেন।

কোন কোন কর্ম্মচারী কৃষ্ণপান্তীর মুখে আগন্তুকগণের পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার পরামর্শ দিলেন। বাঙ্‌নিষ্ঠ কৃষ্ণপান্তী সে পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া দস্যুগণকে সংকল্পিত অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণপান্তীর জীবনে বাঙ্‌নিষ্ঠার ঐরূপ পরিচয় আরও পাওয়া যায়। যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন হরধামের রাজগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র হরধামের "মাসহারা" বন্ধ করেন। হরধামের পক্ষগণ মাসহারা পাইবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া জিলার কোন প্রধান ব্যক্তিকে জামিন চাহিলেন। হরধাম পক্ষের অনুরোধে কৃষ্ণপান্তী ঐ জামিন হইবার জন্য অঙ্গীকার করেন। মাসহারা দিতে ইচ্ছা না থাকায়, ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণপান্তীকে জামিন হইতে নিষেধ করেন। কৃষ্ণপান্তী সেই নিষেধের উত্তরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

আমি মুখ হইতে যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছি, তাহা পুনরায় কিরূপে মুখে লইব?"

যেমন মুখ হইতে থুথু ফেলিয়া তাহা আর মুখে লওয়া যায় না, কৃষ্ণপান্তীর ধারণা ছিল, কোন কার্য্য করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, তাহা আর পরিহার করা যায় না। কৃষ্ণপান্তীর এই উত্তর শ্রবণে নদীয়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার উপর রুষ্ট হন এবং অনেক অত্যাচার করেন। কিন্তু কৃষ্ণপান্তী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আপনার বাঙ্‌নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সুখের কল্পনা।

ছি! ছি! ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা—
ঊষার আলোক চুমি ধরাতল,
প্রেম অনুরাগে করে ঢল ঢল,
ফুল বালা ঢলি অনিলের গায়
সাদরে সোহাগে সুবাস মাখায়;
মিছে এ সকল অলীক বাসনা,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা। ১।

ছি ছি! ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা—
শারদ গগনে বিমল জোছনা,
চকোরী অধীরা প্রেম-নিমগনা,
গোলাপী বসনে প্রকৃতি সুন্দরী
আবেশে মগনা আপনা পাসরি;
মিছে এ সকল অলীক জল্পনা,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা। ২

ছি! ছি! ভুলে যাও সুখের কল্পনা—
সুচারু নয়নে সরলতা মাখা
প্রেমময়ী প্রাণে প্রেমছবি আঁকা,
দেহ প্রাণ মন যা কিছু আমার,
হৃদয় সর্ব্বস্ব—সকলি তোমার;
মিছে এ সকল আশার ছলনা,

ছি ছি ভুলে যাও সুখের কল্পনা! ৩।
ছি ছি! ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা।
'যে সকলে লয়ে করি আমি ঘর,
সকলি আমার নহে কেহ পর,
আপনার স্বার্থ সকলে ভুলিয়া
দিতেছে আমার সন্তোষ সাধিয়া,'
এ শুধু মোহের মোহিনী ছলনা,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও সুখের কল্পনা। ৪।
ছি ছি! ভেঙ্গে দাও অলীক কল্পনা।
অবগাহি ভব-সাগরের নীরে,
আবার এখনি দাঁড়াইবে তীরে,
ভুলি সংসারের সুখ আস্বাদন
বিভুপদধ্যানে হইব মগন।
হয়নি সম্ভব, কখন (ও) হবে না,
ছি ছি ভেঙ্গে দাও অনিত্য কল্পনা। ৫।
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে অসার কল্পনা,
যা কিছু তোমার দেখে চিনে লও,
পথের পথিক এই বেলা হও,
মোহিনী মায়ায় মন্ত্রমুগ্ধ হলে
এত খানি পথ কেবা দিবে বলে?
ক্রমে বেলা যায় এখনও চল না,
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে অসার কল্পনা। ৬।

কোড্রস।

গ্রীস ও তুরস্কের বিগত যুদ্ধ উপলক্ষে প্রায় সকলেই ঐ দুই দেশের ইতিহাসাদি সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক। অদ্য তাই বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাকে গ্রীসের অতি প্রাচীনতম সময়ের একটী বিষয় জানাইব।

গ্রীসদেশটী ইউরোপে। ইহার উত্তর সীমায় তুরস্ক, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় ভূমধ্যস্থসাগর, পূর্ব্ব সীমায় ইজিয়ান সাগর। গ্রীস দেশটী পর্ব্বত ও সমতল-ভূমিতে পূর্ণ এবং উহার প্রান্তভাগ সমুদয় সমুদ্রশাখা দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। এই গ্রীসের দক্ষিণাংশে লেকোনিয়া নামে এক প্রদেশ ছিল; তাহার রাজধানী স্পার্টা। উত্তরাংশে বিয়োসিয়া প্রদেশের রাজধানী ছিল থিব্‌স। ইহার পূর্ব্ব দিকে 'আটিকা'। এই আটিকার রাজধানী 'এথেন্স'। এই তিনটী নগর গ্রীসের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। দেশের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর।

আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, সে সময় নেপোলিয়ন কিম্বা ওয়েলিংটন ছিলেন না, ধনলোলুপ তৈমুর কিম্বা দারায়ুস ছিলেন না—ছিলেন তখন গ্রীসের প্রজাবৎসল রাজা 'কোড্রস'। প্রজার জন্য যে রাজার হৃদয় কাঁদে না, প্রজার দুঃখে যে রাজা অশ্রুপাত করেন না, স্বদেশের জন্য যে রাজা মরিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি রাজসিংহাসনের উপযুক্ত নহেন—তিনি কাপুরুষপদবাচ্য। কোড্রস যেমন উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ উচ্চবংশোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত ছিল। তাঁহার যেমন অসীম শারীরিক বল ছিল, তেমনি

মানসিক বলেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তিনি প্রকৃতপক্ষে বীরপদবাচ্য।

মনুষ্যের আশা মিটিবার নহে। রাজ্য-লোলুপ 'ডোরিয়ান্‌গণ' পিলপনিসসে (দক্ষিণ গ্রীসে) রাজশ্রী লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হইল না—এথেন্‌সের বিজয়লক্ষ্মী কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। ডোরিয়ানগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আশ্রয়-স্থান উত্তর-গ্রীসের কতক স্থান জয় করিয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে এথেন্সের দিকে ধাবিত হইল। উহারা আটিকায় আগমন করিয়া এথেন্‌সের সন্নিকটবর্ত্তী 'ইলিসস্‌' নদীতীরে শিবির স্থাপন করিল। এখন ডোরিয়ান্‌দিগের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না; তাহারা ভবিষ্যজয়ের আশায়—এথেন্সবাসীদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার আশায় যেমন বীরদর্পে রণভেরী বাজাইয়া অতুল আনন্দে মত্ত হইল—এথেন্‌সবাসীরা এবং তাহাদের রাজা বীরেন্দ্র কোড্রস স্বদেশরক্ষার্থে, অকৃতজ্ঞ ডোরিয়ান্‌দিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বীরসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া গগনভেদী বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া অটলভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে গ্রীসের অধিবাসিগণের ভবিষ্যদ্‌বক্তার উপর অচল বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাতেই তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। ডোরিয়ানগণ এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রসিদ্ধ ডেল্‌ফি তীর্থস্থানে তাহাদের জয় পরাজয় সম্বন্ধে দৈব-আজ্ঞা জানিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাদের হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব আশা ও নিরাশার স্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কখন তাহারা ভাবিতেছে যুদ্ধজয়ী হইলে এথেন্‌সকে চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিব, আবার তৎপরক্ষণেই বিরূপ ভাব মনে ভাবিতেছিল। আর এথিনিয়ানেরা তাহাদের মাতৃভূমির রক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য চিন্তিত। ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্‌বক্তার নিকট হইতে সংবাদ আসিল "যদি তোমরা এথেন্‌সের রাজশরীরে কোন প্রকার আঘাত না কর, তাহা হইলে বিজয়ী হইবে।" এ কথায় ডোরিয়ান্‌গণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ ভাবিতেছিল যুদ্ধে আসিয়া রাজাকে আঘাত না করিয়া যুদ্ধে জয়-লাভ কিরূপে সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ যদি তাহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত রাজাকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহাদের এত আশা ভরসা সমুদয়ই নিরাশার খর স্রোতে ভাসিয়া যাইবে! ইতিমধ্যে এথেন্সের প্রজাবৎসল রাজা কোড্রস এই সংবাদ পাইলেন। ওদিকে যেমন ডোরিয়ান সেনাপতি নৈরাশ্যের বিভীষিকায় ত্রস্ত; এদিকে কোড্রসের মনে তেমনি অতুল আনন্দ। তিনি ভাবিতেছেন আজ আমার জীবন সার্থক; আজ আমার অকিঞ্চিৎ-কর দেহের বিনিময়ে জন্মভূমির বিজয়-

পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিব, শুদ্ধ আমার জীবন-দানে সমগ্র এথেন্সবাসীর জীবন সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে;—তাই তিনি হীরকখচিত সুবর্ণ মুকুট আর মস্তকে ধারণ করিলেন না, বুঝিলেন উহাতে এথেন্সের উদ্ধার হইবে না। মহামূল্য রাজসাজ ত্যাগ করিলেন, কারণ দেখিলেন রাজবেশই বিপদের কারণ হইতে পারে। সেই মহামূল্য রাজবেশ, হীরকখচিত মুকুট, ও উষ্ণীষাদির পরিবর্ত্তে শতগ্রন্থি মলিন বাস, অসির পরিবর্ত্তে সামান্য কৃষক-যষ্টি, সুগন্ধ চন্দনের পরিবর্ত্তে ধূলিরাশি দেহে লেপন করিয়া সামান্য কৃষক সাজিয়া জন্মভূমির উদ্ধারার্থে ডোরীয় শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনৈক সেনার সহিত যুদ্ধে নিহত হন। এই ঘটনা ১০৬৮ পূঃ খৃঃ হইয়াছিল। ঘটনার পর দিন প্রত্যূষে এথেনিয়ান্‌গণ তাহাদের মৃত রাজার দেহ চাহিয়া পাঠাইলেন; তখন ডোরিয়ান্‌গণ কোড্রসের জীবনের সহিত তাহাদের জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ হইলেন।

বর্ত্তমান বীরত্বাভিমানিগণ বলুন দেখি এরূপ শান্তিপূর্ণহৃদয়ে ও শীতলরক্তে মরিবার জন্য কয় জন বীর প্রস্তুত? যদি ডোরিয়ান্‌গণ সে বার কোড্রসের মৃত্যুর পূর্ব্বে যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে জয় সম্বন্ধে কতদূর সফলমনোরথ হইত তাহা বলা যায় না, কারণ যে রাজার হৃদয় সর্ব্বদা স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, স্বদেশের মঙ্গলকামনাই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, যাঁহার হৃদয় প্রজ্বলিত বৈশ্বানর সদৃশ তেজে দীপ্তিমান্, তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ডোরিয়ান্‌দিগের জয়াশা নিতান্ত দুরাশা হইত। আর যদি ডোরিয়ানগণ ভবিষ্যদ্‌বক্তার কথা কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া কোড্রসের মৃত্যুর পর যুদ্ধ করিত, তাহা হইলেও তাহাদের জয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ, কারণ যে দেশের প্রজাগণ দেখিল- তাহাদের প্রজাবৎসল রাজা তাহাদের জন্য অকুতোভয়ে প্রাণ বলিদান দিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুদিগকে পরাভূত করিত। এথিয়ান্‌গণ কোড্রসের মৃত্যুর পর ইহাঁর সম্মানার্থে রাজপদ উঠাইয়া দিয়া আর কাহাকেও 'রাজা' উপাধি দিতে স্বীকৃত হইল না। কোড্রসের বংশধরগণই প্রিন্স বা আরকন উপাধি ধারণপূর্ব্বক বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উ, না, ব।

ভাইফোঁটা।

এস ভাই ফোঁটা দিব সুন্দর কপালে!
প্রীতিমাখা, হাসিমাখা,
স্নিগ্ধ পরিমল ঢাকা
চন্দন লইয়া হাতে রয়েছি দাঁড়ায়ে;
এস ভাই শুভক্ষণে,
আনন্দপূরিত মনে,
সুন্দর চন্দন-ফোঁটা দিইগো পরায়ে।
আজ ভাই ঘরে ঘরে,
আনন্দ-নির্ঝর ঝরে,
আশা হাসি উথলিত সবার পরাণে;
আজ সমীরে সুরভি বয়,
কুসুম সুরভিময়,
পরিমল বহে আজি বন উপবনে।
ভ্রাতার ভগিনী যারা,
হরষেতে মাতোয়ারা,
আশার হিল্লোল বয় পরাণের তলে;
সুগন্ধি চন্দন হাতে,
উপহার লয়ে সাথে,
ডাকিছে ভ্রাতারে সবে হাসিভরা গালে—
"এস ভাইফোঁটা দিই সুন্দর কপালে।
এস ভাই ফোঁটা দিব সুন্দর কপালে।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধাম,
পরমেশ প্রাণারাম,
সুন্দর মধুর তাঁর এ বিশ্ব ভুবন;
সুন্দর কুসুমরাশি,
মধুর চাঁদের হাসি,
মধুর বিহগগীতি মধু সমীরণ।
মধুর মিলনভরা,
সুন্দর এ বসুন্ধরা,
মধুর সংসার ভাই সুখের আলয়;
মধুর সুন্দর অতি—
ভ্রাতা ভগিনীর প্রীতি,
মধুর বাঁধনে বিশ্ব বাঁধা সমুদয়।
প্রণমি বিভুর পায়,
সর্ব্বসুখ বিধাতায়,
তাঁহারি এ অতুলন করুণার বলে
আজ এই শুভ দিনে,
হরষ উৎফুল্ল মনে,
চন্দনের ফোঁটা দিব ভাইয়ের কপালে।
এস ভাই ফোঁটা দিব তোমার কপালে!
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে,
বঙ্গে ভগিনীর প্রাণে,
কতনা বাসনা সাধ উঠিছে জাগিয়া;
সারাটী হৃদয় ভরে,
দেখ আজ থরে থরে,
ভক্তি প্রীতি ফুলরাশি উঠিছে ফুটিয়া।
এস ভাই হাসিমুখে,
ফোঁটা পরাইব সুখে,
সারা বরষের আশা হইবে পূরণ;
ভক্তিপ্রীতি প্রাণ ঢেলে,
ফোঁটা পরাইয়ে দিলে,
সুদৃঢ় হইবে আরো প্রাণের বাঁধন।
ভগিনীর প্রীতিগুণে,
মরতে স্বরগ আনে,
সুন্দর কুসুম শত ফুটায় শ্মশানে;
ভালবাসা মধুময়,

সমন দমন হয়,
ভগিনীর স্বার্থহীন ভালবাসা গুণে।
অজ্ঞাত পুণ্যের ফলে,
জনমি এ ধরাতলে,
এই উচ্চ অধিকার লভেছি যখন;

এস কাছে এস ভাই,
প্রাণে প্রাণে মিশে যাই,
চিরতরে বাঁধি আজি প্রাণের বাঁধন।

শ্রীবনলতা দেবী।

হিন্দু সদাচার।

স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে স্বচেষ্টাসম্পন্ন প্রাণিগণই অতি উত্তম। তদপেক্ষাও সজ্ঞান চেষ্টাশালী জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ জীবগণের মধ্যে মনুষ্যেরা প্রধান। মনুষ্য-দিগের মধ্যে বিদ্বদ্গণই প্রধান। বিদ্বদ্গণের মধ্যে চরিত্রবান্ সদাচারসম্পন্ন মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান। অতএব মনুষ্য সতত রাগদ্বেষবিরহিত হইয়া জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও সদাচারসম্পন্ন হইবে, তাহা হইলে তাহার আয়ু, স্বাস্থ্য ও সুখ বর্দ্ধিত হইবে। দুরাচার লোকে কেবল পরকালে দণ্ডনীয় হয় তাহা নহে, ইহকালে নিন্দনীয়, সদা ব্যাধিগ্রস্ত, অল্পায়ু এবং দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র হইতে হিন্দু সদাচার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত হইল। আশা করি, ইহা দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

১। যাহা কিছু পরাধীন, তাহা পরি-ত্যাজ্য, সতত আত্মবশ কর্ম্মই করিবে। যেহেতু পরাধীনতাই দুঃখের মূল, এবং স্বাধীনতাই সুখের হেতু।

২। যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, তাহাই কর্ত্তব্য; ইতর কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। যম, নিয়মই ধর্ম্মের প্রধান সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মাভি-লাষীর যম নিয়মানুষ্ঠানে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

৩। সত্য, ক্ষমা, সারল্য, ধ্যান, অ-নৃশংসতা, অহিংসা, বাহেন্দ্রিয়সংযম, প্রসন্নতা, মধুরতা ও কোমলতা এই দশবিধ যম।

৪। শৌচ, স্নান, তপস্যা, দান, মৌন, যাগ, অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, এবং ইন্দ্রিয়-সংযম, এই দশবিধ নিয়ম।

৫। কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এবং লোভ এই ছয় রিপুকে জয় করিলে বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়।

৬। পরপীড়নপরাঙ্মুখ হইয়া বল্মীক-স্তূপের ন্যায় ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই পরকালের একমাত্র সহায়।

৭। যে ব্যক্তির রসনা, ভার্য্যা, পুত্র, ভ্রাতা, মিত্র, ভৃত্য ও আশ্রিত বিনয়-

সম্পন্ন, তাহার গৌরব সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া থাকে।

৮। মদ্যপান, অসৎসঙ্গ, পতিবিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, অকালে শয়ন ও পরগৃহে বাস, এই ছয়টী নারীগণের ধর্ম্মভ্রংশের সহজ কারণ।

৯। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ, ব্যঞ্জন ও লবণ রিক্ত হস্তে দিবে না।

১০। লৌহময় পাত্রে করিয়া অন্ন দিবে না।

১১। বাক্যে "দিব" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত না করিলে, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত ঋণ জানিবে।

১২। জ্ঞানী ব্যক্তি বৃথা শপথ করিবে না।

১৩। মণ্ডল করিয়া ভোজন করিবে। ক্রোড়দেশে, পাণিতলে এবং জীর্ণ বস্ত্র, আসন ও শয্যার উপরে ভোজনপাত্র রাখিয়া ও মলাদিদূষিত হইয়া ভোজন করিবে না। পদপ্রসারণ করিয়াও ভোজন অকর্ত্তব্য।

১৪। বেঙের ছাতি ভক্ষণ করিবে না। ছেদনাধীন বৃক্ষনির্য্যাস এবং বৎসহীনা বা স্থানান্তরিত-বৎসা গাভীর দুগ্ধ ভক্ষণে বিরত হইবে।

১৫। অশ্বাদি একক্ষুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ এবং উষ্ট্র ও মেষের দুগ্ধ পান করিবে না।

১৬। যাহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা শশক, শজারু, কচ্ছপ, গোধা ও বিজ্ঞাত পশু পক্ষী ভোজন করিতে পারিবে। যদি দীর্ঘায়ু হইতে চাও, তবে যত্নপূর্ব্বক মৎস্য মাংস ত্যাগ করিবে।

১৭। যে মূঢ় ব্যক্তি কেবল আত্মপুষ্টির জন্য প্রাণিহিংসা করে, সে মহাপাপী।

১৮। সুখৈষী ব্যক্তি পরকে আপনার মত দেখিবে; সুখ দুঃখ নিজের পক্ষে যেমন, অপরের পক্ষে তদ্রূপই বিবেচনা করিবে। পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করিলে, নিজের জন্য পরেরও তদ্রূপ করিবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

১৯। এই জগতে বিনা দুঃখে অর্থাগম হয় না। অর্থহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়াকলাপ না করিলে ধর্ম্মার্জ্জন ঘটে না। ধর্ম্মহীন হইলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুখ সকলের বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি, অতএব যত্নপূর্ব্বক তাহা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

২০। ন্যায়ার্জ্জিত অর্থে পরলোকের কার্য্য করিবে, এবং বিশুদ্ধ কালে ও বিশুদ্ধ ভাবে সৎপাত্রে দান করিবে।

২১। নিজ শয্যা, আসন, শণ, কম্বল সর্ব্বদা শুচি জানিবে।

২২। বলপূর্ব্বক গৃহীত বা চোরহস্তগত হইলেও সতী নারীকে ত্যাগ করিবে না।

২৩। পথ বায়ু দ্বারা এবং দ্রব্য মূল্য দ্বারা শুদ্ধ হয়। জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি, সত্য দ্বারা শুদ্ধি মন বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্মশুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিশুদ্ধি হয়।

২৪। অম্লযোগে তাম্রপাত্র, ভস্মদ্বারা কাংসের ও প্রবাহ থাকিলে নদীর শুদ্ধি হইয়া থাকে।

২৫। পঞ্চগ্রাস গ্রহণ করার পর ঘৃত লইবে না। তিলঘটিত বস্তু, জল, দুগ্ধ, দধি, মধু, শাক, পানীয়, পায়স, ঘৃত, এই সকল দ্রব্যের ভোজনাবশিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে দিবে না। সর্ব্বশেষে দুগ্ধ আহার করিবে।

২৬। অতিথি আসিলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সৎকার করিবে, প্রত্যাখ্যান করিলে গৃহস্থ পাপগ্রস্ত হয়।

২৭। নববিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ, দুহিতা, বালক, গর্ভিণী ও রুগ্ন ব্যক্তিকে সকলের অগ্রে ভোজন করাইবে।

২৮। অনলস ভাবে প্রতিদিন: নিত্য কর্ম্ম যথাশক্তি সম্পন্ন করিবে।

২৯। রাহুগ্রস্ত, উদয় ও অস্তগমনোন্মুখ এবং জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে অবলোকন করিবে না।

৩০। জলমধ্যে আত্মরূপ দেখিবে না। বারিবর্ষণকালে ধাবমান হইবে না। গাভীবন্ধনরজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না ও নগ্নাবস্থায় জলমধ্যে প্রবেশ করিবে না।

৩১। ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কখনও ভোজন করিবে না। বল্মীকাদি প্রাণী বিদ্যমান আছে এতাদৃশ গর্ত্তে কিংবা গমন করিতে করিতে ও দণ্ডায়মান ভাবে অথবা গুরুজনের সম্মুখে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

৩২। মুখ দ্বারা অগ্নিতে ফুৎকার করিবে না। নগ্নাবস্থা নারী কখনও দর্শন করিবে না। অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না।

৩৩। জলমধ্যে বিষ্ঠামূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না। নির্জ্জন বাটীতে একাকী শয়ন করিবে না।

৩৪। নিদ্রিত ব্যক্তিকে অকারণে জাগরিত করিবে না। একাকী দূরপথে চলিবে না, ও অঞ্জলি সহযোগে বারি পান করিবে না। রাত্রিকালে আকণ্ঠভোজন অবৈধ। নৃত্য গীত বাদ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না।

৩৫। চিতাধূম, নবোদিত সূর্য্যের রৌদ্র ও দিবানিদ্রা দীর্ঘজীবনেচ্ছু ব্যক্তির ত্যাগ করা উচিত।

৩৬। ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত ও মস্তক কম্পন, পাদ দ্বারা আসনাকর্ষণ, দন্ত দ্বারা নখ লোমোৎপাটন এবং নখ দ্বারা নখ-চ্ছেদন করা কর্ত্তব্য নহে

৩৭। শুভাকাঙ্ক্ষায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা কদাচ ত্যাগ করিবে না।

৩৮। অভদ্র ও অধার্ম্মিকদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না।

৩৯। পূর্ব্ববিভব গত হইয়াছে বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, কারণ উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে বিদ্যা কি সম্পদ কিছুই দুর্লভ নহে।

৪০। লোককে সত্য অথচ প্রিয় কথা বলিবে, সত্য অথচ অপ্রিয় বলিবে না; মিথ্যা অথচ অপ্রিয় বাক্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

৪১। কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে

"ভাল" এই কথা বলিবে। লোকের ভালই চিন্তা করিবে।

৪২। রূপহীন, নির্ধন ও নীচকুলোদ্ভব বলিয়া কোনও ব্যক্তিকে নিন্দা করিবে না

৪৩। বাক্যবেগ, মানসিক বেগ, লোভ, উৎকোচ, দ্যূত, দৌত্য ও আর্ত্ত জনের দ্রব্য দূরে পরিহার করিবে।

৪৪। বৃদ্ধগণকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিবে, তাঁহাদিগের জন্য স্বকীয় আসন ছাড়িয়া দিয়া, নিজে নীচে বসিবে ও গমনকালে তাহাদিগের অনুগামী হইবে।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(৪০৪ সংখ্যা—১৯১ পৃষ্ঠার পর)

সন্তানগণ জনক জননীকে আত্মীয়-মণ্ডলীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে দেখে, তাহারা ঠিক্ তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারাও পিতা মাতার ন্যায় ভবিষ্যতে গুরুজনে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তির পরিবর্ত্তে বিপরীত ব্যবহার করিবে, সন্দেহ নাই। সন্তানের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী জননী। জননীর কার্য্য ও ব্যবহার সন্তানের জীবনে চিরকাল কার্য্য করে। তিনিই সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের মূলাধার। পিতামাতার চরিত্র অনুসারে সন্তানের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইয়া থাকে। সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ ভারত সন্তান-গণের তাহারাই পিতৃপুরুষ—ভাবী উন্নতির তাহারাই নেতা হইবে। দেশের উন্নতির ভার তাহাদিগের উপরেই ন্যস্ত থাকিবে। এরূপ চরিত্রবিহীন জনক জননীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা কিরূপে চরিত্রবান্ ও স্বদেশহিতৈষী হইতে সমর্থ হইবে? এরূপ বিচ্ছেদপূর্ণ গৃহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া একতা শিক্ষা করা কখনই সম্ভব নহে। বর্ত্তমান সময়ে গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। স্বার্থপরতা আমাদিগের পারিবারিক সুখ শান্তি অপহরণ করিতেছে।

গৃহে কোনও অতিথি সমাগত হইলে কোথায় আমরা প্রীতিপূর্ণ অন্তরে তাহার স্নানাহারের জন্য ব্যস্ত হইব, না অতিথিকে গলগ্রহ স্বরূপ মনে করিয়া বিরক্ত হইয়া থাকি। এখন অতিথি-সৎকার একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতিথিও মনে করেন তিনি বিদায় লইতে পারিলে রক্ষা পান।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে স্ত্রীজাতির সম্মানের পরিবর্ত্তে অবমাননা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই চরিত্রহীনতার বিষয় চিন্তা করিলে, প্রাণে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। এমন

কোন্ পাপ আছে যাহার জন্য হিন্দু সমাজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? যে সকল কার্য্যের জন্য লোকেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয় সচরাচর শুনি, প্রকৃত পক্ষে সেগুলি পাপ কার্য্য নয়। মদ্যপান, ব্যভিচার, সতীত্বনাশ, এ সকল পাপ করিলে এখন আর দণ্ড নাই, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না। এই পাপগুলি এখন পুরুষ-জাতির চরিত্রগত হইয়াছে। এগুলি দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রতি সপ্তাহের সংবাদপত্রেই পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, যেখানে সেখানে স্ত্রীজাতির অবমাননার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যে আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে দেবীবৎ সম্মান করিতেন, তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততি এখন যেখানে সুবিধা পায়, সেইখানেই স্ত্রীজাতির অবমাননা করিতে ক্রটি করে না। এরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়া স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরাবরুদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইতেছে। চতুর্দ্দিকের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া শুনিয়া, তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না। কাজেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা ঝগড়া, বিবাদ, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি নীচকার্য্য লইয়া লিপ্ত থাকিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তানগণ জননী সদৃশ জীবন লাভ করিয়া পুনরায় বাহিরের পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অহো! পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ কোন্ স্বর্গ হইতে কোন্ নরকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ভাবিলে বিষম বিষাদসাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়। যে দেশের পারিবারিক প্রণালী ও সামাজিক নীতি এরূপ কলঙ্কিত ও দূষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেশের সন্তান সন্ততি অথবা সে দেশ কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে না। হায়! হায়! কি পরিতাপের বিষয়! কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে প্রাণ মন শিথিল হইয়া যায়, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। ভগিনি, উঠ, গাত্রোত্থান কর। কর্ত্তব্যসম্পাদনে আর উদাসীন থাকিও না। এমন অত্যুজ্জ্বল আর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এরূপ নীচভাবে জীবন অতিবাহিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে জাতির ললনাগণ বহুগুণ-মণ্ডিতা ছিলেন, যাঁহারা অশেষ কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা জগল্ললামভূতা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান হইয়া এরূপ জঘন্য ও মোহাচ্ছন্ন ভাবে জীবন যাপন করা আমাদিগের শোভা পায় না। এস, আমরা ক্ষুদ্রতা, নীচতা প্রভৃতি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হই। জ্ঞান, ধর্ম্ম, সতীত্ব ও স্বদেশহিতৈষিতা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সমকক্ষ হই। পরিবারবর্গের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হই। এস আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া পতিত জাতিকে পুনরায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলি। (ক্রমশঃ)

ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার।

রস্কিন বিলাতের একজন প্রধান গ্রন্থকার। চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভাজ্ঞাপক অতি উচ্চ দরের রচনাবলী ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ আদরের বস্তু। রস্কিন্ অতি মহৎস্বভাবসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার সাধু ব্যক্তির একটী প্রধান চিহ্ন। রস্কিন্ স্বীয় ভৃত্যবর্গের প্রতি সদাই অতি সস্নেহ ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। রস্কিনের সুযশে আকৃষ্ট হইয়া কোনও ভদ্র ব্যক্তি একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি সেই সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার ভৃত্যের প্রতি তাঁহার যেরূপ ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন; —রস্কিনের সহিত আমি এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছিলাম। নানা প্রকার সুস্বাদু আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে রেউচিনির অম্বল ছিল; তাহা আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমি বলিলাম, 'এবছর আমি এই প্রথম রেউচিনির অম্বলের স্বাদ গ্রহণ করিলাম। কি চমৎকার হইয়াছে!' আমি রেউচিনির অম্বলের প্রশংসা করাতে রস্কিন বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজাইয়া একটী ভৃত্যকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন "মালীকে ডাকিয়া দেও।" মালী আসিলে পর রস্কিন তাহাকে মধুরস্বরে বলিলেন;—'দেখ জেক্‌সন্, তোমার এ সালের প্রথম রেউচিনি বড়ই ভাল হয়েছে; এতে আমি বড় সুখী হয়েছি। আমার বন্ধু মহাশয়ের জন্য তোমাকে রেউচিনির অম্বল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলাম, তিনি তা খেয়ে খুব প্রশংসা কচ্ছেন।" জেক্‌সন্ প্রভুর প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দোৎফুল্লবদনে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বকার্য্যে প্রত্যাগমন করিল।

আমাদের আহার সমাধা হইলে রস্কিনের কেটিনাম্নী পরিচারিকা প্রকোষ্ঠস্থ কয়েকটী বাতি প্রজ্বলিত করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে রস্কিন্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখুন মহাশয়, আজ পশ্চিমাকাশে সূর্য্যাস্তের বড় শোভা হয়েছে।" রস্কিন উত্তর করিলেন, "কেটি, তুমি এ সংবাদ দেওয়াতে তোমার কাছে বড় কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু আগে আমি দেখে আসি; যদি খুব সুন্দর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুকেও লয়ে যাব।" এই বলিয়া রস্কিন ছাদের উপর গমন করিলেন। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "বাস্তবিকই অতি সুন্দর হয়েছে, চলুন

দেখা যাক্।" পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্ব্বত-মালা, তাহার পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার, নির্ম্মেঘ—অস্তগত সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় আকাশমণ্ডলে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রসকিন্ তাহার সৌন্দর্য্যই চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন ; আমি কিন্তু রস্‌কিনের মালী ও পরিচারিকার সহিত তাঁহার যেরূপ মধুর সম্বন্ধ দেখিলাম, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম এবং সেই ভাব লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

অন্তঃপুর।

"অন্তঃপুর" নামে একখানি মাসিক পত্রের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এই পত্রিকা বঙ্গীয় রমণীদিগের জন্য এবং ইহার সম্পাদিকা একজন বঙ্গরমণী। ইহার প্রবন্ধ সকলও বঙ্গরমণীদিগের দ্বারা লিখিত হইতেছে এবং দেখা গেল সেগুলি স্ত্রীলোকদিগের বেশ উপযোগী। ইহার লেখা বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে। ৩৭ বৎসর হইল, বামাবোধিনী এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থ প্রকাশিত হইয়া যদিও তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু অন্তঃ-পুরিকাদিগের হিতসাধন একটী অতি বিস্তৃত কার্য্য এবং বামাবোধিনী চিরকাল সহযোগীর অভাব অনুভব করিতেছেন। অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিলা এই দুই খানি পত্রের অভ্যুদয়ে বামাবোধিনী আশান্বিত হইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের অকাল মৃত্যুতে সেইরূপ শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে "পরিচারিকা" ও "মহিলা" নাম্নী দুই খানি পত্রিকা নারীহিতব্রতে বামা-বোধিনীর সহকারিতা করিতেছেন, বামা-বোধিনীও তাঁহাদিগের সহিত ভগিনী-স্নেহে আবদ্ধ। "অন্তঃপুর" আবার বামাবোধিনীর উদ্দেশ্যসাধনের বিশেষ সহায় হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই অভিনব পত্রিকার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি প্রার্থনা করি। "অন্তঃপুরের" আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার "বীরাঙ্গনা" প্রবন্ধটীর অধিকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

বীরাঙ্গনা।

রমণী স্বভাবতঃ কোমলা। রমণী-হৃদয় চিরকালই কোমল ও দুর্ব্বল বলিয়া জগতে পরিচিত। কিন্তু এই কোমলপ্রাণা রমণীর প্রাণে যে অসীম তেজ আছে, তাহা প্রকাশ পাইলে জগৎ স্তম্ভিত হয়। যে রমণীর বাহু চিরকাল কবিদের ভাষায়

মৃণালের সহিত তুলিত হয়, সেই বাহু সৎকার্য্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, স্বদেশ-রক্ষার জন্য যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রে পরিশোভিত হইলে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। ইতিহাসে এইরূপ কয়েকটী বীরাঙ্গনার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের বীরত্বে জগৎ চমকিত হইয়াছিল, স্বদেশ ধন্য হইয়াছিল, রাজবংশ পবিত্র হইয়াছিল। রাণী লক্ষ্মীবাই এবং রাণী দুর্গাবতীর নাম এই ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ত্রিপুরার রাজবংশে এইরূপ একটী বীরাঙ্গনার উল্লেখ আছে।

ত্রিপুরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত অতি প্রাচীন ও বিস্তৃত রাজ্য। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত দেশীয় রাজা দ্বারা সুশাসিত ও সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৬৬০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ ছেংথুমফা ত্রিপুরা রাজসিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার রাজ্যে হীরাবন্ত নামে একজন ধনবান্ লোক বাস করিতেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী এবং বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। এই হীরাবন্ত একবার ত্রিপুর-রাজ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য ত্রিপুরা হইতে তিনজন পরাক্রান্ত সেনাপতির অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। সৈন্যগণ হীরাবন্তের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হীরাবন্ত ভীত হইয়া বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঙ্গেশ্বরও হীরাবন্তের সাহায্যের জন্য ত্রিপুর-সেনার বিরুদ্ধে এক প্রবল সৈন্যদল প্রেরণ করেন।

এই সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। মহারাজ ছেংথুমফা স্বীয় সৈন্যদল অপেক্ষা শত্রুসৈন্য প্রবল দেখিয়া যুদ্ধ করিতে অসম্মত হন। রাজমহিষী এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজাকে নানা প্রকারে যুদ্ধে যাইতে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজমহিষী তখন স্বয়ং সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া যুদ্ধসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। বলিলেন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কুলগৌরব রক্ষা করিব। তোমরা প্রস্তুত হও। রাজমহিষীর এই বীরত্বসূচক উৎসাহ-বাক্যে সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন রাজমহিষী সৈন্যসমূহকে মহাসমারোহে ভোজ দিলেন। তৎপর দিন তিনি সেনাপতি ও সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া শত্রুদমন করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৈন্যগণ রাজ্যেশ্বরীর বাক্যে ও কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুদল ভীত ও চমৎকৃত হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ত্রিপুর সৈন্যদল জয়নাদ করিয়া উঠিল। শত্রুগণ পলায়নপর হইল। রাজমহিষী জয়শ্রী সঙ্গে স্বয়ং

রাজলক্ষ্মীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজ্যময় তাঁহার বীরত্বের কথা ঘোষিত হইতে লাগিল। ভারত ইতিহাসে অনেক বীরাঙ্গনার নাম দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। কিন্তু এইরূপ জয়লাভ ও যশোলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং এই ঘটনা ভারত ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল অংশ।

গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠতা।

মহর্ষি মনু আর্য্যজাতির জীবনের যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্ব্বিধ আশ্রম উক্ত হইয়াছে ঃ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে অন্য ত্রিবিধ আশ্রমের মূল বা আধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা সকলেই গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু এই আশ্রমে থাকিয়াও কিরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া যায়, আমরা তাহা অবগত নহি; যৎকিঞ্চিৎ অবগত থাকিলেও তৎসম্বন্ধে সম্যক্ কর্ত্তব্যপালনে তৎপর ও নিয়মাধীন নহি।

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী এবং স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবার পরিজন লইয়া যথায় বাস করা যায়, তাহাই গৃহ। গৃহী বা গৃহস্থের ধর্ম্মকেই গৃহধর্ম্ম বলা যায়; অর্থাৎ গৃহে নিজের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে ও দেবতা সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য ও নিয়ম, তাহাই গৃহধর্ম্ম এবং এই গৃহধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

স্ত্রীজাতিই গৃহের মূল কারণ। সুতরাং এই আশ্রমের ভাল মন্দ মঙ্গলামঙ্গল পুরুষের উপর অনেক নির্ভর করিলেও বিশেষ ভাবে স্ত্রীজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। গৃহস্থাশ্রমীরা ভক্তি, প্রীতি, সদ্ভাব ও স্নেহ প্রভৃতি দ্বারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। পরিবারের মধ্যে যেমন এই সকলের অভাব হইতে পারে না, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, দয়া, নিঃস্বার্থতা, বিশুদ্ধতা ও সমদুঃখসুখতাদি কতকগুলি গুণ গৃহধর্ম্মের অঙ্গীভূত।

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমরা আদর্শ পরিবার কাহাকে বলি। পরিবারের মধ্যে সুখলাভে অনেক প্রকারে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। শারীরিক অসুস্থতাই সাধারণতঃ প্রধান কারণ। শরীর অসুস্থ থাকিলে কি নিজের প্রতি, কি অপরের প্রতি, কি ইষ্টদেবতার প্রতি, কোনও কর্ত্তব্যই সাধিত হয় না। অসুস্থ ব্যক্তির চিত্তও সচরাচর প্রফুল্ল ও সরলভাবাপন্ন থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহ মনের অতীত যে আত্মা, তৎসম্বন্ধেও কোনও কর্ত্তব্য সাধন ও উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এই রক্তমাংসনির্ম্মিত দেহও আমি নহি, যদ্দ্বারা চিন্তা ভাবনা করি সেই মনও আমি নহি, আত্মাই আমি, এবং সাংসারিক বা শারীরিক সুখ

অথবা ক্ষণিক মানসিক সুখ মানব-জীবনের লক্ষ্য নহে। আধ্যাত্মিক সুখ বা উন্নতিই প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব দেখা যাইতেছে আদর্শ পরিবার গঠিত করিতে হইলে আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ সুস্থতাই একান্ত আবশ্যক। শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের জন্য যেমন নিয়মিত স্নানাহার, রোগের চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্যলাভের জন্য যেমন জ্ঞানালোচনা, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও বিবিধ উপায়ে প্রফুল্লচিত্ত থাকা আবশ্যক, আধ্যাত্মিক সুস্থতা লাভের নিমিত্তও সেইরূপ আত্মচিন্তা ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজন। শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা যেমন সহজ, আত্মা পীড়িত হইলে অর্থাৎ সদ্বিষয়ে রুচি ও পাপের প্রতি ঘৃণা না থাকিলে অথবা আত্মা বা ঈশ্বরে উদাসীন থাকিয়া দৈহিক ও সাংসারিক বিষয়সমূহ সার জ্ঞানে তাহাতে লিপ্ত থাকিলে তাহার চিকিৎসা তত সহজ নয়। কিন্তু শারীরিক রোগ নির্ণয় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রোগ নির্ণয় অধিকতর দুঃসাধ্য হইলেও, শারীরিক চিকিৎসা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক চিকিৎসার আবশ্যকতা কোনও অংশে ন্যূন নহে।

আবার—

"রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাং।"

রোগ, শোক পরিতাপ ইত্যাদি আত্মকৃত। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মসকল পালন করিলে ইহাদিগের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিস্তার পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, আদর্শ পরিবার গঠিত করিতে হইলে অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ সুখ লাভ করিতে হইলে বা এককথায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে হইলে গৃহস্থাশ্রমীর কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে।

এই ত্রিবিধ সুস্থতা লাভ পরিবারে বিশেষভাবে রমণীর উপর নির্ভর করে। যে রমণী আপনার এবং গৃহের অপরাপর ব্যক্তিগণের এই ত্রিবিধ কল্যাণ চিন্তায় নিরত, সেই গৃহই প্রকৃত সুখ শান্তি পূর্ণ এবং সেই গৃহের অধিবাসিগণের উন্নতির পথও অধিকতর প্রশস্ত। সুতরাং যে নারী আপনার কি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের এই ত্রিবিধ কল্যাণ ও উন্নতি লাভ সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, আত্মম্ভরিণী, কোপনস্বভাবা ও ধর্ম্মবিহীনা, সেই নারীর গৃহে ক্ষণিক সাংসারিক সুখ যৎকিঞ্চিৎ থাকিলেও তাহা অশান্তিপূর্ণ এবং সেই গৃহস্থ ব্যক্তিগণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভে রমণী সহায় স্বরূপ না হইয়া বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, পুরুষগণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে একান্ত উৎসুক হইলেও গৃহে নারীগণের অজ্ঞতা নিবন্ধন ও ধর্ম্মভাব-বিহীনতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। নারী জাতির কর্ত্তব্য গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি রহিয়াছে। পিতা মাতার প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি ও পুত্র কন্যা

প্রভৃতির প্রতি। রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য পতির প্রতি। সর্ব্ব বিষয়ে পতির প্রকৃত সহচরী হওয়া, জীবনের সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তিতে তাঁহার সহায় হওয়া, পবিত্রতা ও কোমল প্রেম দ্বারা মলিনতা দূর করিয়া তাঁহাকে বিশোধন ও সান্ত্বনা করা নারীজীবনের উদ্দেশ্য।

পতি যেরূপই হউন না কেন, সতী স্ত্রীর পতিই ধর্ম্ম এবং আরাধ্য দেবতা। পতির প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও সম্পূর্ণ অকপটতা থাকা বিধেয়। পতিই তাঁহার সমুদয় হৃদয় মন অধিকার করিয়া থাকেন, সুতরাং অপর পুরুষে কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইতে পারেন না। রামায়ণে লিখিত আছে সীতার সপত্নী থাকা দূরে থাকুক, রাম কখনও অপর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। এই বাক্যটী স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিক শোভা পায়। সতী স্ত্রী ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তিনী এবং অভিন্নহৃদয়া থাকিয়া পতির সুখ দুঃখ—এমন কি মনের প্রত্যেক চিন্তা পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষমা এবং প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিতে যত্নশীলা। যে দ্রব্য, বাক্য, কার্য্য, ব্যবহার বা চিন্তা পতির মনোনীত নহে বা যাহাতে তিনি অন্তরে ক্লেশ পান, সতী নারী বিষতুল্য তাহা বর্জ্জন করিয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে গৃহে স্ত্রীলোক দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষ্যা ও স্বার্থপরতায় নিযুক্ত, আবার যে গৃহে গৃহের শ্রীস্বরূপা স্ত্রীগণ অনাদৃত ও অপমানিত হন, এই উভয় গৃহ হইতেই দেবতাগণ দূরে বাস করেন। গৃহ লক্ষ্মীহীন হইলে যে লক্ষ্মী দূরে পলায়ন করেন, ইহার মর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥"

যথায় পতি পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট এবং পত্নী পতির প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিত্য কল্যাণ নিশ্চিত।

চরিত্রের বিশুদ্ধতা, প্রেম, লজ্জা ও নম্রতা নারীজাতির শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্যক্ রক্ষা করিতে হইলে পাপের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, প্রবল আত্মদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন। এমন বিশুদ্ধস্বভাবা কয় জন রমণী আছেন, যাঁহারা বাক্যে, কার্য্যে, ব্যবহারে এবং চিন্তায় কখনও একতিল পবিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হন না এবং ন্যায়ের তুলাদণ্ডে নিরন্তর আপনাদিগকে স্থির রাখিতে সক্ষমা? আমরা যদি বিশুদ্ধতা ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে প্রতিনিয়ত আপনাদিগকে বসাইয়া রাখি, তবে দেখিতে পাইব যে, যে সকল কার্য্য, বাক্য, ব্যবহার ও চিন্তা আমরা কিছুমাত্র দূষণীয় বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হই না, তাহার মধ্যেই কত জঘন্যতা ও অপবিত্রতা বিরাজ করিতেছে! অতএব আদর্শ চরিত্র লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য প্রতিনিয়ত আপনাকে পবিত্রতা ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে বসাইয়া

রাখা এবং এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইলেই মহা প্রমাদ বলিয়া গণনা করা। যাহার যাহা লাভ করিতে হয়, তাহার তাহা লাভের উপায়সমূহও অবশ্য অবলম্বন করিতে হয়।

তৎপরে প্রেম, লজ্জা ও নম্রতা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই অবগত আছি। গৃহে নারীগণ প্রেম দ্বারা সকলকে বশীকৃত, সুশাসিত ও পবিত্র নিয়মাধীন রাখিবেন। কোনও নিয়ম বা সমাজ প্রেম করিতে বাধ্য করে না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই প্রেমেতেই জননী সন্তান প্রতিপালন করেন, পত্নী পতির সেবা করেন, সন্তান পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করেন। রমণী হৃদয়ের এই প্রেমরূপ সুস্নিগ্ধ বারি দ্বারা সংসারের শোক দুঃখ, পাপতাপসমুদায় ধৌত করিবেন। লজ্জা ও নম্রতা নারীজাতির নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু কেবল বাহিরে লজ্জা ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিলেই যে লজ্জাশীলা ও নম্র হওয়া যায়, তাহা নহে; ইহাও অন্তরের জিনিষ। বাহিরে যদি পুরুষ দেখিয়া ৭ হাত ঘোম্‌টা দিলাম, কিন্তু অন্তরালে তাহাদের রূপ, দোষ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ উপহাস, তামাসা ও সমালোচনা করিলাম; বাহিরে মিষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করিলাম, অন্তরালে কুৎসিত আমোদ ও কুৎসিত বাক্যালাপে ঘৃণা ও সঙ্কোচ বোধ না করিলাম, তবে তাহা প্রকৃত লজ্জাশীলতার লক্ষণ নহে। সুতরাং আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে এই সমুদয় কেবল বাহিরের জিনিষ নয়, কিন্তু অন্তরের জিনিষ। অন্তর প্রেম, পবিত্রতা, লজ্জা ও নম্রতা প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিলে বাহিরের ব্যবহার স্বতঃই তাহার অনুমোদিত হইবে। সকল দিক্ বিচারপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, রমণীর ইচ্ছাতেই তাঁহার গৃহ স্বর্গতুল্য হইতে পারে এবং তাঁহার জন্যই আবার সেই গৃহ নরকসদৃশ পাপ ও অশান্তিপূর্ণ হইতে পারে। রমণী গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ লাভের কারণ হইতে পারেন অথবা তাঁহার কারণে গৃহের সকল লোকেই দুঃখ ভোগ করিতে পারেন। শিশু সন্তানগণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্য, কার্য্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া থাকে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। সুশীলা রমণী আপন প্রতিবেশীর প্রতিও আপন কর্ত্তব্য পালনে বিস্মৃত হন না। পরোপকার ধর্ম্মের একটী অঙ্গস্বরূপ। প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে সহানুভূতি করা, সাধ্যানুসারে তাঁহার দুঃখ মোচন করা ধর্ম্মশীলা নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রেমের জন্যই যাহার জন্ম, সেই কোমলপ্রাণা রমণীর প্রাণ কি দুঃখী লোকের দুঃখে কাঁদিবে না? কিন্তু ইহা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহারও উৎকর্ষ করা চাই, কার্য্যে ইহা পরিণত করা চাই। পরকে ভাল বাসিলে—দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার প্রয়াসী হইলে তবে হৃদয় মন প্রশস্ত হইতে পারে।

"সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বংসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥"

তৎপরে গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে গৃহে রমণীর সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি সামান্য সামান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিতেও অবহেলা না করিয়া তাহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। গৃহের সুশৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলার জন্য রমণী একমাত্র দায়ী। যে দেশের নারীগণ রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য বিখ্যাত, সেই দেশের রমণীগণ কেননা সেই সকল কর্ম্ম প্রশংসার সহিত করিতে পারিবেন? রমণী ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমুদয় কর্ম্মই পবিত্র ধর্ম্ম-কার্য্য বা ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া করিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সংসারে নারী-জাতির কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অতি গুরুতর। নারী যদি ধর্ম্মভাববিশিষ্টা হন, তবে পরিবারস্থ শিশু সন্তানগণ হইতে বয়স্ক সমুদয় নর নারীর ধর্ম্মের দিকে মতি হইবে। তাঁহার ধর্ম্মে তাদৃশ রুচি না থাকিলে অপর সকলের ধর্ম্মভাবও শুষ্ক হইয়া যাইবে। ধার্ম্মিকা ও পতিব্রতা রমণী সম্বন্ধে এইরূপ অনেক আখ্যান আছে যে, পুরুষ চরিত্রহীন হইলে ও নানা প্রকার পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও ধার্ম্মিকা নারী কেবল মাত্র আপনার পাতিব্রত্যের গুণে, সাধুতা ও ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহাকে অধর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া চিরজীবনের জন্য ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিতেছেন। পুরুষের পক্ষে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য যত্নশীলতা যতদূর স্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভব, নারীর পক্ষে তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। সতী নারী যেরূপ অপর সমুদায় বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সমুদায় হৃদয় মন পতিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মপ্রার্থী বা ঈশ্বরপ্রার্থী মানবাত্মা সেইরূপ সমুদায় অনিত্যতা হইতে চিত্তকে একমাত্র ব্রহ্মেতেই অর্পণ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ঋষিগণের উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা গৃহস্থকে তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইতে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে এবং সমুদায় কর্ম্ম ব্রহ্মেতে অর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন।

গৃহে নারী স্বয়ং যেরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য যত্নশীলা থাকিবেন, সেই-রূপ অপর সকলেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মো-পার্জ্জনের সহায় হইবেন। গৃহকর্ম্মে ত্রুটি না করিয়া জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মা-লোচনায় কিছু সময় দিলে তাহাতে উন্নতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার ধ্যান এবং আত্ম-চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

জীবনের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উপরে যে সমুদায় বিষয় বর্ণিত হইল, সে সমুদায় সম্যক্ যে গৃহে প্রতিপালিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবার বা আদর্শগৃহ বলা যায়। সুতরাং আমাদিগের চরিত্রকে আদর্শ

চরিত্র, পরিবারকে ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবার রূপে গঠিত করিতে হইলে এই সমুদায় ধর্ম্ম-নিয়ম যথাবিধি পালন করিতে হইবে।

কি হিন্দু কি অহিন্দু জীবনের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলের পক্ষেই এই নিয়ম। যিনি জীবনের এই সমুদায় কর্ত্তব্য সম্যক্ সাধন করিতে পারেন, তিনি যে সমাজ-ভুক্তই হউন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে ও ধর্ম্ম লাভে তিনিই সমর্থ, নতুবা কেবল হিন্দু, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নাম লওয়ায় ফল কি?

জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে আমাদের বঙ্গীয় রমণীকুলের হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক এবং ঈশ্বর করুন জাতি পদ নির্ব্বিশেষে সমুদায় মানব জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সত্য লাভে সমর্থ হউক।

স—বা—দেব, দেরাদূন।

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

বর্ত্তমান রাজাবাড়ীর দক্ষিণ দিকে 'মাটিভাঙ্গা' নামক একটী ছোট পল্লী দেখিতে পাইবে। গ্রামে অল্পসংখ্যক লোকের বাস, তন্মধ্যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত অধিকাংশই নীচ-জাতীয়। উক্ত পল্লীর অগ্নিকোণে একটী তৃণাচ্ছাদিত ছোট কুটীর দেখিতে পাইবে, দেখিবামাত্রই উহা দীন দরিদ্রের আবাস বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে; প্রকৃত পক্ষেও উহা এক ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাসগৃহ।

(২)

সুন্দর গ্রীষ্মের প্রভাত। প্রতি দিনের প্রভাতের মত আজও প্রভাত মনোরম। তেমনি সুশীতল বাতাস, তেমনি চাঁপা ও গন্ধরাজের দিগন্তব্যাপী সুবাস, তেমনি সর্ব্বজন-প্রীতিকর পাখীর সুস্বর, তেমনি মধু-আহরণ-রত মৌমাছিদলের মধুর ঝঙ্কার। সকলি সুন্দর, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সকল মানবকে সমান সুখী করিতে পারে না।

সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে দরিদ্র ব্রাহ্মণদম্পতী পুত্র কন্যা দু'টী লইয়া বিষণ্ণমুখে আপনাদের ভগ্ন কুটীরে বসিয়াছিলেন, অন্নকষ্টে তাঁহারা নিতান্ত শীর্ণদেহ ও পীড়িতহৃদয় লইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। আজ ঘরে কিছুই খাদ্য নাই, বেলা বাড়িতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিশু দু'টী যখন খাবার চাহিবে তখন কি করিবেন এই দুঃসহ ভাবনায় জননী অত্যন্ত কাতরা হইতেছিলেন, তাই সে প্রভাতের সৌন্দর্য্য তাঁহার দ্বিগুণ কঠোর বোধ হইতেছিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল, শিশুগুলি ক্ষুধায় অধীর হইয়া কান্না ধরিল। মাতা অনন্যোপায়; কেবলই রোদন করিতেছিলেন, কিন্তু কেবল তাঁহার সেই অশ্রান্ত অশ্রুজল তাঁহার সেই অপরিমেয় দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইল না।

পিতামাতা শিশুদিগকে শান্ত করিবার জন্য বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তি না হইলে তাহারা শান্ত হইবে কেন? বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কাতর ক্রন্দন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পিতা ম্লানমুখে অল্প দূরে বসিয়াছিলেন। সন্তানের এই কষ্ট জননীর হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা দিতেছিল, তিনি বহু চিন্তায় অন্ন সংগ্রহের সুযোগ উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"তোমার গৃহে আসিয়া আজীবন কেবল দুঃখই সহ্য করিলাম, সুখ কি তাহা কখনও জানিলাম না, আর কখনও যে এ দুঃখের অবসান হইবে এমন আশাও করা যায় না। আজ আমার গৃহে এমন কিছু নাই যাহাতে ছুটী শিশুর ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারি। আমি অবলা স্ত্রীলোক, শতছিন্ন বস্ত্রে গৃহের বাহির হইতে পারি না। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাই অতি ঘৃণার্হ দাসাবৃত্তিও আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এখন ইহারা অন্নাভাবে মারা পড়িবে ইহা কি চক্ষে দেখা যায়!"

এইরূপ গঞ্জনাতে ব্রাহ্মণের মনস্তাপ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি বলিতেছিলেন "দেখিতেছ যখন আমি বহু চেষ্টাতেও আমার এ দুর্গতি নিবারণ করিতে পারিলাম না, অর্থলাভের সুপথ তোমাদের দুঃখ দূর করা আমার ক্ষমতার অতীত, তখন আমার দুঃখ পাওয়াই যেন ভগবানের অভিপ্রায়, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষের শক্তি কোথায়?" পত্নী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নানারূপ কঠোর বাক্যে ব্রাহ্মণের যাতনা জ্বলন্ত ও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন—উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "এই আমি অর্থের অন্বেষণে বাহির হইলাম, তাহার সন্ধান না পাইলে আর ফিরিব না।"

৩

সম্বৎ ৪৮ হইতে ৫৩ বৎসরের মধ্যে যে সকল পথযাত্রী হিমালয়ের উপত্যকাভূমি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন—হিমালয়ের নিম্নতর শৃঙ্গে এক নিমীলিতনেত্র ধ্যাননিরত কঙ্কালাবশিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি তাহাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সেই অনাবৃত দেহটী দেখিলেই তাহাকে নিতান্ত কৃপাপাত্র দীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইত। সেই কোটরস্থিত চক্ষু ও স্থির মুখমণ্ডলে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছায়া অঙ্কিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও যোগীর শরীরের শ্রী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল, দেহটী নিতান্ত রুক্ষ ও অস্থিসার দেখাইতেছিল, তথাপি যদিও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তবে অনুমান করিতে পারিতেন যে, যোগিবর অদ্যাপি ৪৮ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন নাই এবং এক সময়ে তাঁহার শরীর সবল ও সুঠাম

ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, তিনি রাত্রিকালে ফল মূল আহার করিতেন এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যোগনিরত থাকিতেন। তপস্বী কত যুগ বা কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ কঠোর যোগসাধন করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া কেহ নির্ণয় করিতে পারিত না। পথিকেরা নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহারই নিকট দিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া যাইত। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, শ্বেত তুষারাবৃত হিমসিক্ত দুর্গম পর্ব্বত-প্রদেশে বসিয়া তাঁহার তপশ্চারণ করিবার একনিষ্ঠ আগ্রহ ও প্রাণগত যত্ন দেখিয়া পথিকেরা বিস্ময়ে মগ্ন হইত।

৪

তপস্বী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সাধনার সময় প্রাণপণ দৃঢ়তার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আজ সে নিরূপিত দিন শেষ হইয়া শেষ দিনের প্রভাত আসিয়াছে। আজ সকলি সুন্দর দেখাইতেছে। লতা পাতা ফুল ফল অতুল সৌন্দর্য্যভরে আন্দোলিত হইয়া ঊষা দেবীর অভ্যর্থনা করিতেছে—পাখি-কুল এ মধুর সময়ে মধুর ভাবে তাঁহারি মধুর আবাহনসঙ্গীতে উপত্যকাভূমি জাগাইয়া তুলিতেছে। তখন সুবাসবাহী শীতল বায়ু বার বার গা ছুঁইয়া তাঁহাকে আশার মধুর বাণী শুনাইতেছিল। তিনি এ মনোরম মাধুর্য্যের মধ্যে আরাধনা সমাপনে অভীষ্ট দেবতার চরণ কামনা করিতেছিলেন।

যোগিবর ধ্যানভঙ্গের পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—জগজ্জননী ভগবতী তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিদিব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি আরাধ্যা দেবীকে নিকটে দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বলহৃদয়ে দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। দেবী জননীতুল্য সস্নেহ মধুর বাক্যে বলিলেন "বৎস! তুমি কি জন্য এই কঠোর সাধনা করিতেছ বল, আজ আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আসিলাম।" ক্ষণকাল যুবকের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দেবী পুনশ্চ বলিলেন, "বাছা, তোমার আন্তরিক অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর।" যোগী বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ! আপনি অন্ত-র্যামিনী, জগতের প্রত্যেক মানবের প্রতি-দিনের সুখ দুঃখ আপনি পরিমাণ করিতে-ছেন, এই বিশাল বিশ্বসংসারে আপনার অবিদিত কোথাও কিছু নাই। আমি নিতান্ত দীন, দরিদ্র, অন্নকষ্টে কাতর। এ অবস্থায় জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা-মাত্র, আমার এ দুর্দ্দশা দূর হইবার উপায় বলিয়া দিন।" ভগবতী বলিতে লাগিলেন "বাছা তুমি নিরাশ হইও না, গৃহে ফিরিয়া যাও এবং আমার উপদেশ মত কার্য্য কর, অচিরে তোমার দুঃখের অবসান হইবে। তোমার গৃহে অলক্ষ্মীর আবাস, তাই তোমার দরিদ্রতার শেষ হয় না। তুমি

প্রথমতঃ একটী অলক্ষ্মী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে ভাণ্ডারগৃহে স্থাপিত করিবে, পরে তাহাকে তথা হইতে অপসৃত করিয়া তথায় লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যহ ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা করিবে।

"তোমার বাসস্থানের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ সহর, তথায় অনাথনাথ রায়ের সুবিখ্যাত হাট, সেখানে সপ্তাহে ২ বার মাত্র হাট হয়। তাহার নিয়মাবলী দূর এবং নিকট পল্লীবাসী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছে। অলক্ষ্মীমূর্ত্তি তোমার ভাণ্ডারগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া উক্ত হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইবে এবং বলিবে ইহার মূল্য ২০০ টাকা, কদাচ ইহার কম মূল্যে বিক্রয় করিবে না।" উপদেশ দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

(৫)

অল্প ব্যবধানে উল্লিখিত জমিদারের সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা; তাহার মনোহর শ্বেত চূড়া বহু দূর হইতে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পরোপকারী, ধার্ম্মিক, খ্যাতনামা অনাথ নাথ রায়কে বালক বৃদ্ধ যুবক রমণী সকলেই চিনিত।

অনাথনাথ রায়ের কিছুই অভাব ছিল না। কারুকার্য্য-খচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, অপর্য্যাপ্ত ধন, অগণিত বন্ধুবান্ধব পূর্ণ বৃহৎ পরিবার, অসংখ্য দাস দাসী। বাহিরে বহু তেজীয়ান হস্তী অশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জাজল্যমান পরিচয় দিত। গোয়ালে অনেক দুগ্ধবতী গাভী থাকিত। সুন্দর পোষা বিলাতি কুকুরগুলি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। স্থূলকায় শুভ্র পোষা বিড়ালগুলি মকমলের মত কোমল গা'টী লইয়া অসঙ্কোচে তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিত। প্রতি কক্ষে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার উপযুক্ত প্রভূত পদার্থ বিন্যস্ত দেখা যাইত। কোথাও বা যুঁইফুলের মত মনোহর বিলাতি ইঁদুরগুলি, কোথাও বা গৃহপালিত ক্রীড়াশীল সুন্দর শশকপুঞ্জ প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরিত। পালিত পাখী সকল কেহ বা শীশ, কেহ বা গান ধরিয়াছে, কেহ বা অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলিতেছে। সকলের উপরে স্নেহময়ী জননী, ভগিনী ও সাধ্বী পত্নী।

(৬)

তাঁহার সমস্ত সুখময় জীবনের উপর দিয়া কে যেন একটী সুগভীর দুঃখ-রেখা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে; এ অতুল বিভবের মধ্যে কিছুতেই তাঁহার সে অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইত না। অনাথনাথ রায় নিঃসন্তান। একটী সন্তানের অভাবে তাঁহার নিকট জগৎ সংসার ঘোর মরুভূমি সদৃশ কঠোর বলিয়া অনুভূত হইত। তিনি সতত বিমর্ষ ভাবে থাকিতেন এবং সংসারে অত্যন্ত বীতস্পৃহ ছিলেন। ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্রজাদিগকে পুত্রবাৎসল্যে পালন করিতেন, কেহ কোন রূপ অকারণে কষ্ট পাইতেছে কিনা সে দিকে তাঁহার জাগ্রৎ দৃষ্টি থাকিত।

কিরূপে স্বদেশীয় লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি সমস্ত মনপ্রাণ, সমস্ত সময়, সমস্ত অর্থ অকাতরে অজস্র ভাবে কেবলি পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন তাঁহার মাথায় কত শত দীন দুঃখীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত সংখ্যা করা যায় না। বাস্তবিক তাঁহার মত এমন স্নেহশীল, মিষ্টভাষী, সত্যনিষ্ঠ, বিনীত লোক সচরাচর দেখা যাইত না।

(৭)

সন্নিকটে কোথাও হাট না থাকায় নিকট পল্লীবাসী জনসাধারণ, বিশেষতঃ গরীব দুঃখী লোকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিত। অনাথ নাথ রায় সেই অসুবিধা নিবারণার্থ আপন কাছারি-সন্নিহিত প্রান্তরে একটী হাট সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। "উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট কোনও জিনিষ হাটে বিক্রয় করিতে গিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে না, কি কি দ্রব্য অবিক্রীত রহিয়াছে, হাট ভাঙ্গিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জমিদারের প্রেরিত লোক যাইয়া তাহা অনুসন্ধান করিবে ও সেই সেই দ্রব্য উচিত মূল্যে খরিদ করিয়া সরকারি ভাণ্ডারগৃহে অর্পণ করিবে, সেই হাটের এইরূপ নিয়ম ছিল।

(৮)

আজ অনাথনাথ রায়ের হাটে লোকে লোকারণ্য। চারি দিকে অসংখ্য বিক্রেতা নানাবিধ দ্রব্য লইয়া বসিয়াছে। এই ঘন জনতা ভেদ করিয়া এক ব্রাহ্মণ একটী প্রতিমা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। প্রতিমার মুখখানি সম্পূর্ণ কালীমাখা, সর্ব্বাঙ্গে স্থানে স্থানে কালীর রেখা, কপালে দীর্ঘ রক্তের ফোঁটা, বিকট বিভৎস আকৃতি! এই কদর্য্য প্রতিমা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াকুল হইল এবং ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিল না। কেহ কেহ মূল্য জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিয়া বসিলেন, "ইহার মূল্য ২০০ টাকা!" শুনিয়া সকলেই তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া ঠিক্ করিল এবং উপহাস করিতে লাগিল। কেহ বলিল "ঠাকুর! আর কিছু দাম কমাও, আমি এ সুন্দর প্রতিমা লইতেছি।" কিন্তু ঠাকুর কোন মতেই দর কমাইতে স্বীকার পাইলেন না, তিনি কাহারো বিদ্রূপে কর্ণপাত না করিয়া অটল ভাবে প্রতিমা লইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে সমস্ত বিক্রেতা ও খরিদদার চলিয়া যাইতে লাগিল; তখনও ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন, যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমিদারের প্রেরিত লোক হাটে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। সে এই কদাকার অলক্ষ্মীমূর্ত্তি ও তাহার অতিরিক্ত মূল্য শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিল 'যে অলক্ষ্মীর মুখ কেহ দেখে না, তাহাকে কোন্ সাহসে এত মূল্য দিয়া খরিদ করি।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আনুপূর্ব্বিক

সকল ঘটনা অনাথনাথ রায়কে লিখিয়া আদেশ চাহিয়া পাঠাইল। তিনি উত্তরে লিখিলেন "ইহা অলক্ষীমূর্ত্তি হইলেও চিরন্তন প্রথানুসারে ইহা খরিদ করিতে হইবে।" ভৃত্য প্রেতিমা খরিদ করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত করিল, অনাথ প্রতিমা নিজ গৃহ মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

(৯)

কালের অপার মাহাত্ম্য! আজ অনাথের সে সুরম্য প্রাসাদ কোথায়? তাঁহার সে অগণিত দাস দাসী, সে হস্তী অশ্ব কোথায়? এখন সেই সযত্ন-পালিত কুকুর বিড়াল, সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ, সে ঐশ্বর্য্যের কিছুই নাই। সেই দীন-পালক অনাথও এখন একজন দীন! এক কদা-কার কুটীর এখন তাঁহার বাসস্থান।

ভগবন্! আপনার মহিমার কে অন্ত করিতে পারে? অনাথ দ্রুতবেগে সমস্ত গুলি দুঃখের ধাপ বাহিয়া নীচে নামিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সেই ভীষণ দুঃসময়ে তাঁহার অবিচলিত নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া মনুষ্যমাত্রেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল। সে সময়ে তাঁহার দুঃখের সান্ত্বনা করিবার একমাত্র সহায় ছিল সাধ্বী অনুপমা দেবী। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী প্রত্যহ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রাণে বল পাইতেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় কষ্ট বহন করিতেছেন মনে করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ফলতঃ সংসারের এই প্রবল তরঙ্গাঘাত সে ধার্ম্মিকা দম্পতী ভীম বলে সামলাইয়া উঠিতেছিলেন।

(১০)

বর্ত্তমান সময়ে একবার সে ব্রাহ্মণ দম্পতীকে দেখিয়া আসি। এখন সে হা হুতাশ, সে দীনতা, সে বিষণ্ণতা কিছুই নাই। সুসময় পাইয়া জননী-হৃদয়ের লুপ্তপ্রায় গুণগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তিনিও সাধারণের মত সুযোগ্যা গৃহিণী ও শিক্ষানিপুণা জননী।

(১১)

অষ্টমীর চাঁদ ধীরে ধীরে উঠিয়াছে; সুন্দর মেঘশূন্য রজনী। অনাথ শীতল বাতাসে বাহিরে একান্তে ভগবানের সৃষ্টিমহিমা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী তাঁহার দেউড়ী লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেখিলেন—রমণী অসামান্যা লাবণ্যময়ী, মনোহর রত্নালঙ্কারে ভূষিতা সুদীর্ঘ সিঁথি সিন্দুর-মাখান। দেউড়ি আলোকিত করিয়া ধীর গমনে চলিয়া-ছেন। তাঁহার সস্নেহ অচঞ্চল দৃষ্টি, অনাথ দেখিয়া বিস্ময়াকুল হইলেন। নিকটে যাইয়া সবিনয়ে কহিলেন, "দেবি! আপনি কে? এবং কি কারণে কোথায় যাইতে-ছেন, দয়া করিয়া প্রকাশ করুন্।" লক্ষ্মীদেবী সুকোমল করুণার্দ্রস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! আমি এত কাল তোমারি গৃহ-লক্ষ্মী ছিলাম, তোমারি পূজা পাইয়াছি ও কল্যাণ কামনা করিয়াছি। তুমি ইতিমধ্যে এ অলক্ষ্মীকে গৃহে স্থাপনা করিয়াছ। যেখানে অলক্ষ্মী, সেখানে লক্ষ্মী কখনও তিষ্ঠিতে পারেন না।"

লক্ষ্মীদেবী পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন, অনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে অনাথ দেখিতে পাইলেন —শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অসাধারণ-তেজঃ-পুঞ্জ এক পুরুষমূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছেন। অনাথ সভয়ে নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! আপনি কে? এবং কি অপরাধে আমার গৃহ ত্যাগ করিতে-ছেন?" নারায়ণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে অনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি এত কাল তোমারি গৃহদেবতা ছিলাম, আজি লক্ষ্মী তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং লক্ষ্মীহীন গৃহে আমি কিরূপে থাকিতে পারি? বলিতে বলিতে নিমেষ-মধ্যে চক্ষুর অন্তরাল হইলেন। অনাথ নারায়ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু অলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলেন না।

১২

তৎপর দিবস রাত্রিতে দেউড়ি অভিমুখে অত্যন্ত কোলাহল শুনিতে পাইলেন, নানা প্রকার জন্তুর নিনাদে বহির্দ্দেশ শব্দায়মান, তাহাতে একটা মহা ব্যাপার উপস্থিত! অনাথ বহির্গত হইয়া দেখিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেবদেবীগণ স্ব স্ব বাহনে চড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। অনাথ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? তখন প্রথমে সর্ব্বসংহারকর্ত্তা শিব তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "বম্ বম্! নারায়ণ তোমাকে ত্যাগ করিয়া-ছেন, আমরা নারায়ণশূন্য গৃহে থাকিতে পারি না, অতএব আমরাও চলিলাম।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সকলেই অন্ত-র্হিত হইলেন। অনাথ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোনরূপ উদ্বেগের লক্ষণ দেখা গেল না।

১৩

বাস্তবিক অনাথ ও অনুপমার তৎকালীন নিশ্চিন্ত প্রসন্ন ভাব দেখিয়া তাঁহাদের যে কোনও অসুখ বা অভাব ছিল ইহা কেহ সহজে অনুমান করিতে পারিত না। আত্ম-প্রসাদ রূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রত্যহ ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাঠাইতেন, বুঝি তাহা পান করিয়াই উঁহারা এরূপ তেজীয়ান্ ছিলেন।

১৪

অনুপমা দেবী চিরজীবন সুখ শান্তির ক্রোড়ে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন। বড় ঘরের কন্যা, জমিদারের গৃহিণী, অভাব কাহাকে বলে জানেন না। তিনি কিরূপে অকাতরে অক্ষুণ্ণহৃদয়ে এ গুরুতর দারিদ্র্য-দুঃখ বহন করিতে-ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বিশেষ কঠিন হইবে না। তাঁহার সে অসাধারণ দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা অমূল্য সুখ নিহিত ছিল যে, তাহার প্রসাদে তিনি অনায়াসে দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার নিশ্চয়ই এমন একটী লাভ ছিল, যাহাতে বর্ত্তমান

জীবনের সমস্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইতেছিল। এমন একটী শান্তির উৎস তাঁহার চোখের কাছে বহিতেছিল—এমন একটী আশার প্রদীপ তাঁহার বুকের কাছে জাজ্বল্যমান ছিল—এমন একটী প্রেম-নির্ঝরিণী তাঁহার পায়ের কাছে অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছিল, যাহার মধুর কুলু কুলু তানে বিভোর থাকিয়া তিনি সংসারের দুঃখ গণিবার অবকাশ পাইতেন না। অনাথের ধর্ম্মে বুঝি অনুপমা অনুপ্রাণিতা। সেই দুর্গম মলিন কক্ষেও তাঁহার রাণীত্বের অভাব ঘটিয়াছিল এমন মনে হয় না।

১৫

এক পক্ষ পরে পুনরায় এক রাত্রিতে অনাথ দেখিতে পাইলেন, এক পরম জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ দ্রুতগতিতে তাঁহার সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার চারিটী বিলম্বিত দীর্ঘ বাহু; মস্তকে সুদীর্ঘ জটারাশি লম্বমান; সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি শ্বেতচন্দনে বিলেপিত; গলদেশে শুভ্র যুঁই ফুলের মালিকা; সেই মনোহর পুষ্পের সুরভি বায়ুতাড়িত হইয়া বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। সর্ব্ব-প্রীতিকর দেবদেহ, তাঁহার স্নেহ-করুণ নয়নে প্রেম-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। অনাথ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিয়া সন্নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আপনি কে? আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া কি উদ্দেশে কোথায় চলিয়াছেন? ধর্ম্ম সুমিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! আমি ধর্ম্ম; এত কাল তোমার গৃহে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিলাম, এখন নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমিও চলিলাম"। ধর্ম্মের বাক্য শেষ হইলে অনাথের মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখা গেল। ভক্তি-ভাবে ধর্ম্মের চরণে প্রণত হইলেন। বলিলেন, "প্রভো! তুমি কি বলিতেছ! অন্যান্য দেবগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে জন্য তুমি তো যাইতে পার না। দেখ, আমি কেবল তোমারি জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছি, তোমারি রক্ষার জন্য সমস্ত বিভবে, সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, তুমি কোন মতেই যাইতে পার না।" অনাথের বাক্যে ধর্ম্ম লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবন আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক্"। ধর্ম্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় অনাথের কদর্য্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনাথ নিশ্চিন্তমনে কুটীরে ফিরিয়া নিদ্রিত হইলেন।

১৬

এ অবস্থায় বহু দিন কাটিল। একদিন গভীর রাত্রে ছাদে গুরু বস্তু পতনের শব্দে অনাথ জাগিয়া উঠিলেন, এবং তথ্যানুসন্ধানে ছাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন,—নারায়ণকে বহন করিয়া বিরাট পক্ষী গরুড় উপস্থিত। বিশাল-

দেহ অতুল-তেজঃপুঞ্জ নারায়ণ স্বয়ং নিকটে। অনাথ যুক্তকরে বলিলেন, "দেব! কি মনে করিয়া আবার অধমের গৃহে আসিয়াছেন?" নারায়ণ প্রীতিপ্রফুল্ল-মুখে উত্তর করিলেন "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" —ধর্ম্ম তোমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমি কি ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে পারি? যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহার সকলি আছে।"

পর দিবস রাত্রিতে অনাথ পেচকের কর্কশস্বরে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন লক্ষ্মী দেবী আবার আসিয়াছেন। অনাথের প্রাণের আনন্দ চক্ষুতে প্রকাশ পাইতেছিল। সস্মিতমুখে বলিলেন, "মাতঃ! আবার কি কারণে আমাকে দয়া করিতে আসিয়াছ?" লক্ষ্মী দেবী বলিলেন "নারায়ণ তোমার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমি কি নারায়ণ হইতে দূরে থাকিতে পারি?" অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেবতাগণ আবার অনাথের গৃহে আসিয়া পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন। অনাথ একটীমাত্র কথা না বলিয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার আনন্দ ভাষার অতীত। দেবগণ একবাক্যে বলিতেছেন,—"দেখ অনাথ! আমরা বিনা আহ্বানে তোমার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম! যেখানে স্বয়ং ধর্ম্ম, যেখানে নারায়ণ, সেখানে আমাদের আগমন অনিবার্য্য।"

১৭

অনাথ প্রেম-বিহ্বলহৃদয়ে সকল মঙ্গলের আধার ভগবানের চরণধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সে ভক্তি-মাখা মূর্ত্তি হইতে শত ধারে সৌন্দর্য্য ক্ষরিতেছিল, নিমীলিত নেত্রপ্রান্তে প্রেম অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল বহুকাল পরে আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাণের মধ্যে পাইয়াছেন, যেন সে সুখ হারাইবার তাঁহার একটা বড় ভয় ছিল। যেন তাঁহার মুখে নীরব ভাষা গাহিতেছিল—

"আমি ডুবিতে গেলাম প্রেম সাগরের তীরে,
ভাসি উঠি বারে বারে।
(এবার) আমায় জন্মের তরে, প্রেম সাগরে
তুমি ডুবাও দয়া করি হে।"

যদি কোন কঠোরহৃদয় নাস্তিকের ভাগ্যে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন ঘটিত, তবে বিনা তর্কে, বিনা উপদেশে নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইয়া ভগবানে বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া উঠিত। তাহার ঔদ্ধত্য যাইয়া নম্রতা আসিত, অনাস্থা যাইয়া বিশ্বাস আসিত।

১৮

অনাথের পূর্ব্বতন সমস্ত বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন তাঁহার সে দেবচরিত্রের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে না। তেমনি বিনীত, সেই চিরন্তন ধীর গম্ভীর অশিথিল সংযত প্রকৃতি। তেমনি প্রীতিপ্রসন্ন মুখ, ব্যক্তিমাত্রেরই আরামদায়ক। সে প্রসন্নতার ন্যূনাধিক্য নাই। আর তাঁহার গৃহিণী অনুপমা দেবী, তিনিও সম্পূর্ণরূপে অনাথের সহধর্ম্মিণী। তাঁহারও এখন পূর্ব্ব হইতে সেবা-ভক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয় না—সেই অমায়িক স্থির প্রশান্ত চিত্ত, তেমনি পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়!

১৯

এখন তাঁহাদের বিত্ত বিভব আত্মীয় কুটুম্ব যথেষ্ট হওয়াতে সেই সীমাবিশিষ্ট কর্ত্তব্যভার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই এখন তাঁহাদিগকে সমধিক বিনীত, চিন্তিত ও সতত প্রার্থনাপরায়ণ দেখা যাইত।

এ গল্পটী রূপক হইলেও ইহার মধ্যে মহা সত্য আছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, উচ্চ নীচ পুরুষ রমণী প্রত্যেকেরই অনাথের মত চরিত্রলাভ একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনাথের চরিত্র দেখিবার মত বিষয়, শুনিবার মত কথা। অনুকরণ করিবার মত দৃষ্টান্ত।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

সবিরাম জ্বর।

ভাঁটপাতা চূর্ণ এক আনা মাত্রায়, জলসহ সেবন করাইলে সবিরাম জ্বর মগ্ন হয়।

৪.৫ তোলা হাতি শুঁড়োর পাতা থেতো করিয়া বস্ত্রে পুটলী বন্ধন পূর্ব্বক জ্বর আসিবার ৫ ৬ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে নিয়ত ঘ্রাণ লইলে পালা জ্বর আইসে না।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর।

লক্ষণ—ক্লেদপূর্ণ মুখ, এবং মুখে তিক্ততা, তন্দ্রা, মোহ, কাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কখন দাহ, কখন শীত, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে লক্ষিত হয়, তাহাকেই পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বলে।

অমৃতাষ্টক পাচন—গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা, ইহার পাঁচন, ॥০ তোলা পিপ্পলীচূর্ণ যোগ করিয়া, শীতল হইলে সেব্য। ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে।

কণ্টকার্য্যাদি পাঁচন—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরেতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্‌তা, কট্‌কী, ইহার ক্বাথপানে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরাদি সত্বর নাশ হয়।

পুরাতন ও জীর্ণ জ্বর।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাঁচন—বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল, শুঠ। এই পাঁচন সেবনে পুরাতন জীর্ণ ও ধাতুগত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

এক ছটাক ক্ষেতপাপড়া, এক ছটাক গোলঞ্চ, এক ছটাক ধনিয়া, অর্দ্ধ ছটাক মুথা, অর্দ্ধ ছটাক হরীতকী, এক সঙ্গে এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইয়া প্রতি দিন অল্প উষ্ণ এক ছটাক করিয়া মধুর সঙ্গে পাঁচ দিন খাইলে পুরাতন জ্বর আরাম হয়।

চিরতা, মিছরি, মরিচ, যষ্টিমধু ও

ধনিয়া এক সঙ্গে একসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক আন্দাজ ২।৩ দিন খাওয়াইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর।

লক্ষণ—অল্প অল্প অন্তর্ভূত শীত, হাত পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্লেশ বোধ, গাঢ় নিদ্রা, দেহ ভারি, মস্তকে বেদনা, মুখ ও নাসিকা দ্বারা জলস্রাব, কাশ, ঘর্ম্ম না হওয়া, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের তাপ, ধমনীর মধ্যে বেগ, এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখা যায়, তাহাকেই বাতশ্লেষ্মা জ্বর বলে।

ঔষধ ব্যবস্থা—দশমূল, পাঁচন বা কষায়তম নামক পাঁচন বাতশ্লেষ্মা জ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে

সংসার ও বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য কি? সংক্ষেপে বলিলে, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য! সুতরাং একদিকে সংসার-রতি, অন্য দিকে বৈরাগ্য; এক দিকে ভোগ-বাসনার তরঙ্গোচ্ছ্বাস—অন্যদিকে হৃদয়ের নিস্পৃহ বিশ্রান্ত ভাব; এই দুইটী বিপরীত ভাবের যুগপৎ সম্মিলন স্থূল বুদ্ধিতে সম্ভবপর নহে। এই জন্যই বোধ হয় অনেক দিন হইতে বৈরাগ্য শব্দটীর সঙ্গে সংসার-ত্যাগের ভাবটী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বৈরাগ্য ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চতম সোপান। বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম, শব্দ ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বদ্ধ। এই জন্যই বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, "সংসারে খাঁটি ধর্ম্ম হয় না; সংসার পরিত্যাগ কর—অরণ্যবাসী হও—খাঁটি ধর্ম্ম মিলিবে।" এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমাদের বৃদ্ধ ও যুবকগণ সংসার হইতে ধর্ম্মকে বিদায় দিয়াছেন। সংসার ও বৈরাগ্য—বিষয় কার্য্য ও ধর্ম্ম সাধন—দুইটী ভিন্ন রাজ্যের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা ভীষণ—কর্কশভাষী ও যথেচ্ছাচারী; আবার গৃহে—সমাজে ও সভামণ্ডপে তাঁহারা কোমল মধুরভাষী ও মিতাচারী। কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মনিয়মকে পদদলিত করিয়া, গৃহে ফিরিয়া শান্ত-শিষ্টভাবে ধ্যানস্তিমিতলোচনে দুই চারি বার উপাসনা মন্ত্র পাঠ করিয়া মনে করেন, আজ আর একটী স্বর্গের সোপান প্রস্তুত হইল—আরও কিছু দূর উঠিয়া পড়িলাম।

ধীরচিত্তে একটুকু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বাস্তবিক সংসার ও বৈরাগ্যে কোন বিরোধ নাই। সংসারেই বৈরাগ্য—বৈরাগ্যেই সংসার। সংসার ভিন্ন বৈরাগ্য অর্থশূন্য—কাল্পনিক। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈরাগ্যের অর্থ সংসারে অনাসক্তি। সুতরাং যতক্ষণ বৈরাগ্য,

ততক্ষণ অনাসক্তির বিষয়ীভূত সংসারের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ সংসারেই বৈরাগ্যের আরম্ভ, সংসারেই ইহার পরিণতি। আবার বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার নরক—পিশাচের লীলাক্ষেত্র। বৈরাগ্যেই সংসারের উৎপত্তি—বৈরাগ্যেই ইহার স্থিতি, আবার বৈরাগ্যেই ইহার বিনাশ। ক্রমে ক্রমে এই ভাবগুলির পরিস্ফুটনের চেষ্টা করিব।

আমি বলিয়াছি, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। সংসারে থাকিলে পার্থিব দ্রব্যে আসক্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই আসক্তি ও অনাসক্তির যুগপৎ সম্মিলন কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা যাউক, এই আসক্তি ও অনাসক্তির প্রকৃত অর্থ কি?

মনুষ্যমাত্রেই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তিগুলির সাধারণ নাম স্বভাব-প্রবৃত্তি (Primary Instincts)। ইহাদের কতকগুলি আমাদের ভৌতিক শরীরের রক্ষা ও উন্নতি করিতেছে। আর কতকগুলি, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ও উন্নতির সহায়তা করিতেছে। প্রথম গুলি পশুদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। শেষোক্তগুলি কেবল অনন্ত উন্নতিশীল মনুষ্যেই দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থাতে এই প্রবৃত্তিগুলি অনাসক্ত ও নিস্পৃহ ভাব ব্যক্ত করে। ইহাদের একটা দ্বিতীয় অবস্থা আছে। এই অবস্থাতে ইহাদের নিস্পৃহভাব বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ভোগবাসনার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। এই সময়ে ইহারা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপযুক্তরূপে অনুশাসিত না হইলে, মনুষ্যজীবনের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয় এবং পশুত্ব তাহার স্থলে রাজত্ব করিতে থাকে। আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞান পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অভ্যুদয় হয়। এই অবস্থাতে এক প্রকারের "আসক্তির" উৎপত্তি হয়। তাহাকে আমরা "পৈশাচিক" কিম্বা "বৈষয়িক" আসক্তি বলিতে পারি। সংসারাসক্তির ইহাই প্রচলিত অর্থ। আসক্তির আর এক দিক্ আছে। তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে, ঐ দ্বিতীয়াবস্থার প্রবৃত্তিগুলি এক অতি আশ্চর্য্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া, সংসারের হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থাতেও এক প্রকারের "আসক্তি" আছে। ইহাকে আমরা "সাত্ত্বিক" বা "দৈবিক" আসক্তি বলিতে পারি। এই প্রকারের "আসক্তি" পরহিতার্থে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া—স্পৃহান্বিত। পার্থিব আত্মসুখ-পরাঙ্মুখ বলিয়া—নিঃস্পৃহ। এই প্রকারের আসক্তিই "অনাসক্তি।" অনাসক্তির অন্য অর্থ নাই। অনাসক্তি "ত্যাগ" নহে। অনাসক্তি আত্মপরাঙ্মুখী আসঙ্গলিপ্সা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, অনাসক্ত ভাব লইয়াই মানবপ্রকৃতির নির্ম্মাণ। এই অনাসক্ত ভাবের যথাযথক্রম বিকাশেই

মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক ও পূর্ণ বিকাশ। আমাদের বিষয়জ্ঞানের পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবের বিকৃতি না হইলেই আমাদের জীবনের মহত্ত্ব রক্ষিত হয়। কাজেই মানবজীবনের প্রথমে যেমন বৈরাগ্য—পরিণতাবস্থাতেও তেমনই বৈরাগ্য। তবে প্রথমোক্ত বৈরাগ্য আত্মজ্ঞান-বিশ্লিষ্ট; শেষোক্ত বৈরাগ্য আত্মজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট। এই প্রকারের বৈরাগ্যকেই আমরা প্রকৃত বৈরাগ্য বলিতে পারি।

আর একটী কথা। আমাদের অন্তর্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগতের অতি নিকট সম্বন্ধ। বহির্জ্জগতের জীবন্ত ক্রিয়া ভিন্ন অন্তর্জ্জগতের পরিস্ফুটন হয় না। বিশেষতঃ মানবসমাজ পরিত্যাগ করিলে, আমাদের প্রবৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সন্তান-বাৎসল্য, দয়া, স্বজাতিপ্রিয়তা প্রভৃতি উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি মানবসমাজ ব্যতিরেকে পরিপুষ্ট হইতে পারে না। সন্তান না থাকিলে কাহার প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিব? দুঃখী না দেখিলে কাহার জন্য দয়া হইবে? মনুষ্যসমাজে না থাকিলে কেমন করিয়া স্বজাতি-প্রিয়তা জন্মিবে? বস্তুতঃ এই প্রবৃত্তিগুলি আপেক্ষিক, বহির্জ্জগতের কিছু না হইলে ইহাদের প্রয়োগ অথবা পরিচালনা হইতে পারে না।

আবার আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবৃত্তিগুলির কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সন্তানবাৎসল্য নিজগৃহ অতিক্রম করিয়া প্রতিবেশীর সন্তানকে আলিঙ্গন করে। দয়া স্বদেশ অতিক্রম করিয়া জগন্ময় বিস্তৃত হয়। স্বজাতিপ্রেম—বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত হয়। পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে বসিয়া স্নেহময়ী মাতা, অপরপ্রান্তস্থ বিজাতীয় সন্তানের দুঃখের কথা পাঠ করিয়া অশ্রুজল নিক্ষেপ করেন। দয়াবানের হৃদয় সুদূরদেশস্থ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া পার্থিব সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় ছুটিয়া যায়। বিশ্বপ্রেমিক পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হৃদয়ের প্রীতি বিতরণ করেন। আবার সর্ব্বোচ্চ প্রবৃত্তিগুলি, যথা বিস্ময়বুদ্ধি, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও ভক্তি সংসারাতীত রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এই জগতের হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বিস্ময়বুদ্ধি তখন জ্ঞানার্জ্জনী-বৃত্তিতে পরিণত হইয়া, কত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার করে;—সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, কত কাব্য, নাটক ও সঙ্গীত বিদ্যার সৃষ্টি করে—ভক্তি ধর্ম্ম নিয়মের সংস্থাপন করিয়া সামাজিক সুখ-শান্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পায়।

এখন স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, এই প্রবৃত্তিগুলির সমঞ্জসীভূত বিকাশেই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত। সংসার ভিন্ন এই সকলের সমঞ্জসীভূত বিকাশ হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই আবার বলি, সংসার ও বৈরাগ্যে কোনও বিরোধ নাই। উভয়ে ওতপ্রোত ভাবে সম্বদ্ধ। যে সুখেচ্ছা আমাদিগের পৈশাচিক বা বৈষয়িক

আসক্তিতে উপস্থিত করে, তাহা মানব প্রকৃতির বিকার বা অস্বাভাবিক বিকাশের ফলমাত্র।

এখন হয়ত কেহ আপত্তি করিবেন, যদি সংসারে থাকিলে মানব স্বভাব প্রবৃত্তিগুলির অস্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা রহিল, তবে সংসার-ত্যাগ কি শ্রেয়ঃ নহে? আমি উত্তর করিব, এইরূপ আপত্তিও অস্বাভাবিক। পরন্তু সকল ধর্ম্ম নিয়মেরই এই মূল বন্ধন (conditions)। যদি মানুষকে অদৃষ্টাধীন না বলিয়া স্বাধীন জীব বল, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যেখানে স্বাধীনতা সেখানে দুইটী বিপরীত অথবা বিরোধী পথের সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা স্বাধীনতার কোনও অর্থই নাই। যদি তুমি ইচ্ছা করিয়া দুইটী পথের যে কোনটীতে না যাইতে পার— কেবল একটীতেই যাইতে পার, তবে বুঝিব তুমি স্বাধীন নহ—পরাধীন। স্বাধীনতার অর্থ—দুইটী সমসাময়িক বিরোধী প্রবৃত্তির কোন একটীকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া। মানব-স্বভাব-প্রবৃত্তিগুলির অস্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়া যদি সংসার পরিত্যাগ করিতে চাও, তবে এই যুক্তিতে মানুষের অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম নিয়মকেও পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টবাদী হইতে পার। বস্তুতঃ এই বিরোধী প্রবৃত্তি গুলির সংগ্রাম স্থলে, যদি ভালটীকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহার পথানুসরণ করা যায়, তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়; সে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সংগ্রামই মানুষের ধর্ম্ম—সংগ্রামেই তাহার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। "ধর্ম্ম-যুদ্ধে মৃতোবাপি-তেন লোকত্রয়ং জিতং" ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু হইলেও তিন লোক জিত হয়। বাস্তবিক যাহার জীবনে সংগ্রাম নাই, হয় সে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; নতুবা দেবত্ব লাভ করিয়া মুক্তির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই অবস্থাই সাধুদের মুক্তি ধাম।

ঐ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। আমরা এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধকে দুই ভাবে দেখিতে পারি। এক স্থূল দৃষ্টিতে—আর এক সূক্ষ্ম বা দার্শনিক দৃষ্টিতে। যাঁহারা স্থূল দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁহারা এই উচ্চ সম্বন্ধকে নিম্ন করিয়া এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন—বেশী দূর আর যাইতে দেন না। তাঁকে কেবলই এই পার্থিব জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বলিয়া মনে করেন—পিতা মাতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধকে এই জগতের মোহ-মায়ার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন—সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যে সংসারের স্বার্থ মিশ্রিত করেন—সুকীর্ত্তির প্রত্যাশাতেই বেশী পরিচালিত হইয়া দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন—বহির্জগতের উপকরণ গুলিকে কেবলই ভোগ-সুখের কারণ বলিয়া মনে করেন ইত্যাদি। যদি বা কখন কখন নিষ্কাম ভাব লক্ষিত হয়, তাহাও অতি নিম্ন শ্রেণীর। এই সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহা কোন সুদূর সংসারাতীত রাজ্যে পঁহুছিতে

পারে না। স্বভাব প্রবৃত্তিগুলির আংশিক বা পূর্ণ অস্বাভাবিক বিকাশেই ইহার অভ্যুদয়। আবার যাঁহারা দার্শনিক চক্ষুতে এই জগৎকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা এই সম্বন্ধকে অতি পবিত্র ও সংসারাতীত রাজ্যের সম্বন্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কেবল বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা সুদূর ভবিষ্যতেরও শিষ্য। ত্রিকালেই তাঁহাদের সাধনা। তাঁহারা এই ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া সংসারাতীত রাজ্যে উপস্থিত হন। এই বন্ধনরজ্জুর একপ্রান্ত দূর দূরান্তর ভেদ করিয়া সেই অনন্ত বিশ্বপিতার চরণ স্পর্শ করিয়াছে—অন্য প্রান্ত এই সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া মানবহৃদয়ে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী প্রভৃতি প্রত্যেকেই এই অনন্ত রজ্জুর এক একটী গ্রন্থিমাত্র। সকলেই এক দড়িতে বাঁধা। কেহ কাহাকেও পৃথক্ মনে করিতে পারেন না। এই অনন্ত বিশ্বপিতার চরণে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার জন্য ইহাঁদের প্রত্যেকেই তাঁহার দড়ি টানিতেছে। তিনি কাহাকেও নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য এই জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। সকলেই অনন্ত রাজ্যের পথিক। এই দার্শনিক দৃষ্টিই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বভাব-প্রবৃত্তিগুলির পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশেই ইহার অভ্যুদয়। আত্মজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার এই দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর ও উজ্জ্বলতর হইয়াছে, তাঁহারই প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। তিনি সংসারকে বৈরাগ্যের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। আবার বৈরাগ্যেই সংসারকে সংস্থাপিত বলিয়া মনে করেন।

সাধক কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ (Wordsworth) এই দার্শনিক ভাবে জগৎকে দেখিতেন। তাই মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

"To me the meanest flower that blows can give Thoughts, that do often lie too deep for tears".

ঐ নগণ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পটীও আমাকে এমন গভীর ভাব দিতে পারে, যাহাতে আমি অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

শ্রী অ।

নূতন সংবাদ।

১। জাতীয় মহাসমিতির চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ২৮শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হইবে। তজ্জন্য মান্দ্রাজ নগরে এক পটমণ্ডপ গঠিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিবেন।

২। অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ম্যান্সফিল্ড কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার

ফেয়ারব্যারণ কলিকাতা সহরে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি একজন উদারচেতা খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক।

৩। বড় লাট লর্ড এলগিন্ সস্ত্রীক ব্রহ্মদেশ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম-বাসীদিগকে সুমিষ্ট বক্তৃতা ও উপাধিদান দ্বারা আনন্দিত করিয়াছেন।

৪। কলিকাতায় অনাথবন্ধু-সমিতি বিগত পূজার সময় নানা স্থানে দরিদ্র-দিগকে পরিধেয় বিতরণ করিয়াছেন, আবার শীতকালে গাত্রবস্ত্র বিতরণ করিতেছেন।

৫। সীমান্তে এক পাগলা মোল্লা দল বল সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। তাহার শাসনার্থ সৈন্যদল প্রেরিত হইতেছে।

৬। যুক্তরাজ্য স্পেনীয়দিগকে পরাভব করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের স্থায়ী সৈন্য ২৫০০০ ছিল, এক লক্ষ হইবে।

৭। ভারতহিতৈষিণী কুমারী ম্যানিঙ দ্বিতীয় বার ভারতদর্শনে আসিতেছেন। আগামী জানুয়ারিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। ভারতমহিলাগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উদ্যোগিনী হউন্।

৮। মান্দ্রাজের ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরে একটী ব্রাহ্মবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বর শ্রীমান্ গোবিন্দ রাজলু নাইডু বিলাত-ফেরত ডাক্তার, নিজামের সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করেন; কন্যা ডাক্তার অঘোরনাথের কন্যা সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

"হাসি ও অশ্রু" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং ইহার লেখিকাকে প্রতিভাশালিনী সুকবি বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি। ইতিমধ্যে যে কয়েকটী বঙ্গমহিলা কাব্যরচনায় যশস্বিনী হইয়াছেন তন্মধ্যে তিনি আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা। আমাদের আত্মীয়া কোনও বিচক্ষণা মহিলা এই পুস্তক সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সাদরে নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

হাসি ও অশ্রু—একখানি কবিতা-পুস্তক। রচয়িত্রী শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী—একজন বঙ্গমহিলা। অনেক দিনের নীরব বনে যখন পাপিয়া প্রথম তাহার মধুমাখা কণ্ঠ খুলিয়া দেয়, অচির ঘুমভাঙা মানবের প্রাণে সেই গীতি যেমন এক তীব্র লালসা, সুখময় আকুলতা এবং দিশাহারা উদাস ভাব জাগাইয়া দেয়, হাসি ও অশ্রুর অনেকগুলি কবিতা আমাদের-প্রাণেও সেই রকম ভাব সকল জাগাইয়া দিল। বঙ্গমহিলার লিখিত কবিতা-পুস্তক, এ দেশের কয় জনের পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে, জানি না। কিন্তু

যিনি পড়িবেন, তিনি কবিকে একটু ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতেছি। পরেরই জিনিস "নিজস্ব" বলিয়া পরিচয় না দিয়া, সরল, মধুর অথচ নিজের ভাষায় যিনি নিজ মনের কথা পরের হৃদয়ে মাখিয়া দিতে পারেন—সমীরণের মত অন্যের সলিলতুল্য হৃদয়ে সুস্পষ্ট স্পর্শ-রেখা রাখিয়া দিতে পারেন, তিনি প্রকৃত কবি। সে রেখা চিরস্থায়ী না হউক, হৃদয় আলোড়িত—আন্দোলিত করিয়া থাকে। সেই হিসাবেই শ্রীমতী সরোজ কুমারী একজন প্রকৃত কবি। এখনকার দিনে কবিতা লেখা অনেকেরই "অভ্যাস" হইতেছে—বলা বাহুল্য দুর্ভাগ্য বশতঃ তন্মধ্যে বহু জনের শ্রম "ব্যর্থ" হইয়া পড়িতেছে। এমন দিনে শ্রীমতী সরোজকুমারীর মত সুকবির অভ্যুদয়ে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। প্রকৃত গুণের আদর যদি না করি, তবে ভগবান্ মানুষকে গুণগ্রাহিতা শক্তি দিয়াছিলেন কিসের জন্য ?

কবির সুমধুর কবিতাগুলি লইয়া বেশী আলোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না—যে নবস্ফুট ফুল চাঁদের আলো মাখিয়া ঢল ঢল করিতেছে, তাহাকে ছুঁইলে তাহার নীরব সৌন্দর্য্য সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে!—আমাদের সমালোচ্য কবিতাগুলিও সেই চন্দ্র-কিরণ-স্নাত ফুলের মত, তাই ভয় করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া বেশী কথা কহিলে পাছে তাহাদের মাধুর্য্য শুকাইয়া পড়ে! সে তো উপভোগ করিবারই জিনিস, কিন্তু সে অতি কোমল প্রাণে উপভোগ করিতে হইবে।

আমাদের কবির প্রতি আমাদের একটুকু অনুযোগ আছে।—"অনুযোগ" নহিলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও সম্পূর্ণ হয় না, এ কথা অনেকেই জানেন। আমাদের অনুযোগ এই যে, যাঁহার বাগানে এত সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে, তিনি আবার বিদেশীয় "পাতা বাহার" লইয়া টানা টানি কেন করিয়াছেন? * ইহাতে যদি তাঁহার উপবনের শোভা বাড়িত, তবে আমরা কথা কহিতাম না, কমিয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, যে সুকবি "জীবন প্রভাত, ভালবাসা, শোকোচ্ছ্বাস, শিশু হারা" প্রভৃতি কবিতায় পারিজাতের সৌরভ বিলাইয়াছেন, শেলী বার্ণস্ প্রভৃতি অনুবাদ করিতে তাঁহার বড় আবশ্যক ছিল কি ?

যাহাহউক অনেক দিনের পরে আমরা এই পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কার শুনিলাম। শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, পুলকিত হইলাম, আর আশ্বাসিত হইলাম! ভগবান্ শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর লেখনীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

লেখিকা—বঙ্গবাসিনী।

---

* শেলী প্রভৃতি মহাকবি, তবে তাঁহাদিগের কবিতা "পাতা বাহার" বলিলাম অনুবাদের জন্য। কেহ আমার অপরাধ লইবেন না।—লেঃ।

বামারচনা।

আমি কেন অসুন্দর ?

কি যেন আমার ছিল গিয়াছে চলিয়া,
কি যেন রয়েছে শূন্য আমার পড়িয়া,
ক্ষুদ্র গৃহের ভিতরে,
প্রকৃতির অভ্যন্তরে,
দেখি যেন ছিল কিছু গিয়াছে উভিয়া ;
বুঝিতে না পারি আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া।
শিশুর আধল কথা—মিষ্টতা গিয়েছে,
গৃহ শ্মশানের তুল্য পড়িয়া রয়েছে,
আকাশে নবীন রবি,
শশাঙ্ক শীতল ছবি,—
কে যেন গোপনে শোভা হরণ করেছে,
দেখি সব সারহীন খোসাটি রয়েছে।
বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন,
মুছিয়ে ফেলেছি কবে নয়ন-অঞ্জন !
তাই আমি অসুন্দর,
তাই শূন্য চরাচর,
দেখিতেছি শোভাহীন ভূধর কানন,
নিরানন্দময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জীবন।
যেদিকে ফিরাই আঁখি দেখি অন্ধকার
জল স্থল নদনদী গিরিপারাবার।
কুসুমে সৌরভ নাই,
সংসার শ্মশান ছাই,
ছাইমাখা চরাচর অভাবে কাহার ?
নাই সুখ নাই শান্তি শুধু হাহাকার।
সতী নারী পতি বিনে এ সংসারমাঝে,
হইলেও সুন্দরী তার শোভা কিহে রাজে ?
পতিসুখে সতীসুখ,
লভি কত শত দুখ—
সতত প্রফুল্ল থাকে সংসারের কাজে,
তাহার নয়নে সব মধুময় সাজে,—
প্রাণপতি প্রাণেশ্বর অভাবেতে প্রাণ,
হারায়েছি দিব্য নেত্র—হয়েছি অজ্ঞান।
তাই সব শূন্যময়,
তাই শূন্য এ হৃদয়,
তাই প্রাণে উঠে না সে সুমধুর তান,
তাই শুষ্ক অসুন্দর আমার বয়ান।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

তুমি আমি।

এস এস সখি ! দুঃখিনীর ঘরে,—
পূজিব তোমায়, প্রেমপ্রীতিভরে।
গলাগলি হ'য়ে কব দু'ট কথা,
দেখাব মরমে কি অসহ্য ব্যথা।
হেথা—আপন গরবে মোহিত সবাই,—
ডাকিয়া সুধাই, হেন জন নাই
দলাদলি লয়ে সবাই বিভোর,—
তাই বলি সখি ! আয় কাছে মোর।
ফেলে এস তব স্বার্থের ভূষণ,—
তার তাপে মোর ঝলসে নয়ন।
পরে এস পূত নিঃস্বার্থ বসন,—
প্রেমভরে করি নিরেট বন্ধন—
নিকটে আসিয়া দাও দরশন,—
সে ছবি হেরিয়া জুড়াক জীবন—
হেন পূত ছবি পাই না দেখিতে,
তাই তোরে ডাকি আকুলিত চিতে।

দলাদলি এস ছুটি পদে দলি।
কেনবা কিসের তরে দলাদলি?
যে জন তোমারে করেছে গঠন,—
আমারেও সখি! গড়েছে সে জন।

তুমি যার প্রজা এ মর ধরায়,—
আমিও তাহার বাঁধা রাঙা পায়,—
তুমি যারে ডাক আমি ডাকি তাঁয়।
এক পথে চলি প্রভেদ কথায়।

তুমি আমি কেন? সবে ডাকে তায়,-
নামের পার্থক্যে কিবা আসে যায়?
"জল" বলি সখি! কেহ জল খায়;
"ওয়াটার" কারো পিপাসা মিটায়।

তবু দলাদলি, নাহি ছি ছি লাজ।
দলাদলি সেত নীচতার কাজ।
এস তুমি আমি দূর ক'রে তায়,
বিশ্বসেবা-ব্রতে ঢালি আপনায়।

তাপিত পতিত যত জন আছে,
"ভাই বোন" বলে ডেকে লব কাছে।
এস তুমি আমি বিশ্ব-সেবাতরে—
শত প্রাণ বলি দিব হর্ষভরে।

বিশ্বপ্রেম দিয়া গড়িয়া নগর,—
তুমি আমি এস বাঁধি তাহে ঘর।
যাহার যা ইচ্ছা করুক তাহাই,
তুমি আমি এস প্রেমে ডুবে যাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী

খোকার বিদায়।

খোকা গেছে কৈ জানে কোথায়?
আমি আছি পথ চেয়ে হায়!
তার সে খেলেনাগুলি ধূলিতে হতেছে ধূলি,
কে তাদেরে লইয়া খেলায়!
খোকা গেছে কোথা—কোন্ দেশে,
একবার চাবে না কি এসে!
সাধের কাপড় তার প'ড়ে আছে এক ধার,
সে কি তুলে লবে নাক হেসে!
খোকা গেছে কোথা—কত দূরে,
শূন্য শেষ পালঙ্ক উপরে,
এক পাশ শূন্য রাখি—সেথা হতে আসি সে কি
ঘুমোবে না রজনী মাঝারে!
খোকা গেছে সে দেশ কোথায়!
কার কোলে রয়েছে সেথায়!

তাহার দুধের বাটি; সাধের ঝিনুক সেটি
ক্ষুধা পেলে কেবা তা যোগায়!
খোকা আজি গেল কোন্ দেশে,
খেলাতেছে কোন্ নব বেশে!
কোন্ স্বরগের পুরে, একা বেড়াতেছে ঘুরে,
আধ আধ কথা ক'য়ে হেসে।
খেলা-শ্রান্ত হইবে যখন,
ঘুমে ঢুলে আসিবে নয়ন,
তখন আকুল হয়ে থাকে বুঝি শুধু চেয়ে,
মনে পড়ে মায়ের আনন।
শত পুষ্প ঘেরা পথ ছায়,
নাহিক কণ্টকরাশি তায়।
মার স্নেহভরা বুকে, ঘুমাত যেমন সুখে,
তেমনি কি মিলিবে সেথায়!

আয় তবে আয় খোকা আয়,
কোথা মোর 'অরুণ' কোথায়!
আঁধার পরাণ মোর, কই সে উধার ঘোর,
অন্ধ আঁখি সে 'মণি' হারায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

দুর্গোৎসব।

চৌপাশে দোকান পাট, নব অভিনব ঠাট,
আমোদ প্রমোদ রঙ্গ কত বাজি খেলা;
সুচিকণ, মনোহর, রঙ্গিন বসন থর,
শিশু-মন-মোহকর খেলনার মেলা!
প্রতি মুখে হাসিরাশি ঢালিছে সানাই, বাঁশী,
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য দিবস যামিনী;
হয়ে উলসিত মন, মহাপূজা আয়োজন,
করিতেছে শুচিব্রতা কুলের কামিনী।
দুঃখ সে ঢেকেছে মুখ, লহরে ছুটেছে সুখ,
মরি, কি কল্যাণস্রোতে স্নাত বঙ্গভূমি!
শীতল অনিলরাশি সরল সোহাগে ভাসি
লুটিতেছে দেবালয়ে পরিমল চুমি।
সুরভি কুসুমরাজি স্বরগ শিশিরে মাজি,
করিছে পবিত্রতর সুকোমল কায়,
ফুল্ল বিল্বদলগুলি নাচিছে পুলকে ভুলি
দুরলভ অর্ঘ্য হতে দেবতার পায়!
শরতের নীলাকাশে গাহিতেছে প্রেমোচ্ছ্বাসে,
এ মহা হরষ-গীতি; বিহঙ্গমগণ
আপনি মা বসুন্ধরা লয়ে আনন্দের ভরা
যেন রে জীবের তাপ করিছে হরণ।
নারী চির-কাঙালিনী, অনাথিনী, অভাগিনী,
আজন্ম অভাগা নর, শিশুর (ও) পরাণে
এ শিব তরঙ্গমালা দ্বাদশ মাসের জ্বালা
প্রক্ষালি করিছে তৃপ্ত শান্তি সুধা দানে।
তিনটি দিনের পরে এ সুখও পড়িবে ঝরে
কোথায় লুকায়ে রবে স্বপনের প্রায়!
সংসারের নশ্বরতা, সুখ দুঃখ বিলীনতা,
জীবন মরণ কিবা তাও হেন হায়!
রে সুখ পীযুষ সবি! জলাশয় গর্ভে রবি,
লুটাবে বিজয়া গীতি, শোক-স্মৃতি আর,
শত দীপ দীপ্তালয়ে, জনস্রোত বিনিময়ে,
খেলিবে দু'দিন পরে বিজন আঁধার!
কিসের এ সুখোৎসব? কেনরে প্রফুল্ল সব?
শুধু আনন্দের রব, মহোল্লাস গীতি?
সন্তাপিত বঙ্গালয় এ সুখের অভিনয়
কেনরে করিছে আজি, কিসের এ প্রীতি?
বসন ভূষণে সাজি বিশ্বজননী কি আজি,
অবতীর্ণা বঙ্গগেহে, তাই এ কুশল?
বহুল বিবিধ রাগে, সাজাইয়া অনুরাগে,
অজ্ঞান আঁধারে অন্ধ মানব সকল;—
পুতুলে প্রতিষ্ঠা করি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী
পূজিছে পরমানন্দে চরণযুগল!
হয়ে প্রেমে দিশাহারা পূত ভক্তি প্রীতিধারা
ঢালিছে সে পদযুগে তাই অবিরল!
নিখিল এ বঙ্গ হায়! অনাদি অনন্ত পায়,
যদি এ উচ্ছ্বাসরাশি করিত অর্পণ—
পূজিত হৃদয় ভরি অদ্বিতীয়া একেশ্বরী

হ'ত কি বিমল দৃশ্য স্বরগ-শোভন !
তা হোক্ এ ভক্তিরাশি, হে ভকত বঙ্গবাসী !
অবশ্য স্পর্শিবে সেই রাজীব-চরণ ;
তাঁহারি কৃপায় কালে নাশি ভুল ভ্রান্তি জালে
করিবে সত্যের রবি জ্যোতি বিকিরণ।
অনর্থক অর্থব্যয় করিও না অপচয়,
মায়েরে তোষহ তুষি দীন হীনগণে ;
তাদের মলিন মুখে ফুটান-উজল-সুখে—
সেই সে অমর কীর্ত্তি মাতৃ-নিকেতনে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

বাঞ্ছা

বাসনা হয়েছে মনে
মিশিব সাগর সনে
কত দেশে যাব।
প্রভাতের উষালোকে
মধ্যাহ্ন নিদাঘ বায়
প্রেম গান গাব।
গোধূলির নীলাকাশে
রজনীর স্নিগ্ধতায়
আকুল হৃদয় রাখি,
কুসুমের পরিমলে
শুভ্র শিশিরের তলে
মিশে মিশে থাকি।
তটিনীর কলতানে
গাহিব আকুল প্রাণে
তরল তরঙ্গ ভরে
ভেসে ভেসে যায়।
শিশুর মধুর হাসে,
প্রণয়ীর প্রেম-ভাষে
মায়ের বিমল স্নেহে ;
শোকের নয়নজলে,
আঁধার হৃদয়তলে,
অতীত সুখের গেহে।
জোছনায় ফুলবনে
উদাস নয়নকোণে
সদা মিশে রব ;
আকাশের তারা সাথে
মিশিব আঁধার রাতে
স্নিগ্ধ জ্যোতি ঢালি;
অনুদিন রব মিশে
সুধাধার নীলাকাশে
সুস্থির বিজলী।
ধবল জোছনা-করে
বাসন্তি লতার পরে
ফুল ফুটে রব।
বাঞ্ছা মোর এ হৃদয়
হবে পবিত্রতাময়,
চির দিন সকলের
প্রতিচ্ছায়া হব

শ্রীসরলা দত্ত।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৮-৯৯ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "লজ্জাশীলতাই নারীর প্রধান ভূষণ এবং পতি-সেবাই নারীর প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক্ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোনপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৮ অব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৫ নং ডালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্ বুক্ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে প্রবন্ধটী পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটীকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা }
২১ অক্টোবর, ১৮৯৮ }

সি, এ, মার্টিন
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

No. 407. December, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

।উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৬ বর্ষ। ৪০৭ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৫—ডিসেম্বর ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি— মহামান্য লর্ড কুর্জন ডিসেম্বর মাসে বিলাত হইতে শুভ-যাত্রা করিয়া ৩০শে তারিখে বোম্বাই নগরে পদার্পণ করেন। ইংরাজি নববর্ষের প্রথমে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ৩রা কলিকাতায় শুভাগমন ও ৭ই জানুয়ারী গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার প্রথম লেবি দরবার হইবে। আমরা সাদরে নব রাজ-প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

নূতন প্রধান সেনাপতি—সার উইলিয়ম লক্‌হার্ট—যিনি সীমান্ত যুদ্ধে রণ-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,—তিনি সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

নূতন ডিরেক্টর—ডাক্তার সি, এ, মার্টিন্ অবসর গ্রহণ করাতে বৈজ্ঞানিক এ পেডলার তাঁহার স্থানে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছেন।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—গত বড় দিন হইতে এক আনা মাসুলে বিলাতী চিঠি চলিতেছে।

নূতন কয়লার খনি—আসামে একটী নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভারতের বাণিজ্যের যুগান্তর হইবে অনেকে মনে করিতেছেন।

নূতন সমাচার—অনেকগুলি খ্রীষ্টান পণ্ডিত একত্র মিলিয়া মূল গ্রীক ভাষা হইতে বাইবেলের নূতন অনুবাদ করিতে-ছেন। ইহা "The twentieth Century New Testament"—বিংশ শতাব্দীর নূতন সুসমাচার—নামে প্রচারিত হইবে।

অন্তঃপুরিকাদিগের সমাদর—বোম্বাই

শাসনকর্ত্তার সহধর্ম্মিণী লেডি স্যাণ্ডহর্ষ্ট তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট-হাউসে দেশীয় মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন. ২০০ শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু—গত ৫ই ডিসেম্বর আগ্রা নগরে রায় শালীগ্রাম বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এক সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারাল্ ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ইনি ধর্ম্মসাধনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সমুদায় আয় সাধুসেবাতেই ব্যয়িত হইত।

পারিতোষিক রচনা—১৮৯৭-১৮৯৮ সালের পরীক্ষায় শ্রীমতী সুরলতিকা ঘোষের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে তিনি ব্রজমোহন দত্তের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজ-অতিথি—নিম্নলিখিত রাজগণ পুরাতন বড় লাটকে বিদায় দিবার ও নূতন বড়লাটকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন:—

কাশ্মীরের মহারাজা, কাশীর মহারাজা, হাইদ্রাবাদের নিজাম, ত্রিপুরার মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, রামপুরের মহারাজা, অযোধ্যার মহারাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

ক্রীড়া-কৌতুক—বেলুনবাজ ভাণ্টা—ন কলিকাতায় আসিয়া বেলুন চড়ায় —ইতেছেন। প্রিন্স রণজিৎ সিং কলিকাতার গড়ের মাঠে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ক্রিকেট-ক্রীড়া-যুদ্ধ করিতেছেন। খৃষ্টের জন্মোৎসবদিনে গড়ের মাঠে বার্ষিক ঘোড়দৌড় প্রভৃতির অভাব হয় নাই।

চন্দ্রগ্রহণ—গত ২৭শে ডিসেম্বর চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল।

দান—(১) কাশীতে এক দরিদ্রাবাস স্থাপনার্থ ভিঙ্গার রাজা গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী ইহাতে বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে।

(২) দ্বারবঙ্গের নূতন রাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর পরলোকগত জ্যেষ্ঠের স্বর্গকামনায় ভারতের সকল প্রদেশের দরিদ্রদিগের ভোজের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১০০০০, এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০০০ করিয়া টাকা দিয়াছেন।

(৩) ত্রিপুরার মহারাজ ত্রিপুরা-হিতসাধনী সভার সাহায্যার্থ বার্ষিক ১০০ টাকা ও এককালীন ৫০৲ টাকা দিয়াছেন।

কুমারী ম্যানিঙ্—নারী-হিতৈষিণী এই ইংরাজ রমণী ভারতে দ্বিতীয়বার আসিয়াছেন। দেশীয় মহিলা ও বামাহিতৈষিগণ ইহাঁর সমুচিত অভ্যর্থনা ও ইহাঁর শুভসঙ্কল্প সিদ্ধির সহায়তা করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

২১ অক্টোবর, ১৮৯৮

আত্মসংযম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪। মমতা—ভালবাসাই মমতার মূল। ভালবাসা যে আমাদের সর্ব্বোচ্চ রমণীয় প্রবৃত্তি, এ কথা নূতন করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র। এই ভালবাসা ঘনীভূত হইলে তাহাকে "মমতা" বলিয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে "আমারই" বলিয়া যে জ্ঞান, ইহাই মমতার কার্য্য। মহাপ্রাণ ব্যক্তিদিগের মমতা, তাঁহাদের মুক্তি-স্বরূপ। যিনি আত্ম-পরিজন হইতে মমতা অনুশীলন করিয়া স্বদেশ, সমাজ, বিশ্বজগৎ—তার পরে ভগবানে সেই মমতা বিকশিত ও চরিতার্থ করিতে পারেন, তিনি মুক্তজীব—তিনি নরদেহে দেবতা। মহাত্মা রামচন্দ্র সমাজের মমতায় প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ক্ষত্রিয়গণ স্বদেশের মমতায় নিজের সর্ব্বস্ব অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; শাক্যসিংহ বিশ্বজগতের মমতায় সকল ভোগসুখে পদাঘাত করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্য দেব ভগবৎ-মমতায় নরদেহে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সবলের পক্ষে মমতা মুক্তি স্বরূপ, এ কথা সেই জন্যই বলিতেছিলাম। কিন্তু সবলের পক্ষে মমতা "মুক্তি স্বরূপ" হইলেও দুর্ব্বলের পক্ষে—সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা বড়ই ভয়ানক হইয়া থাকে। মমতা, স্বার্থপরতার যোগে "মোহ" নামক দারুণ রিপু হইয়া নর-মানবের নরকের পথ প্রশস্ত করে।

মোহ রিপু মানবকে যার পর নাই সঙ্কীর্ণ-চেতা ও নীচ করিয়া ফেলে। রামায়ণে আছে মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী, ভরতকে রাজ্য দিতে এবং রামকে নির্ব্বাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্থরার কু-মন্ত্রণার মর্ম্ম এই যে "রাম তোমার সপত্নী-পুত্র; শাস্ত্রানুসারে রাজত্ব তাহার প্রাপ্য হইলেও সে বনে যাউক, কেননা তাহাতে তোমার পুত্র ভরত নিরুদ্বেগ হইবে। ভরত তোমার গর্ভজাত পুত্র, সে রাজা হউক, কেননা তাহাতে তুমি অধিকতর আনন্দ লাভ করিবে।" আত্মসুখের প্রতি এইরূপ যে আসক্তি, তাহাই মোহ। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ নহে * *। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ্ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয় চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সেই জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন এমন বিষয় নাই।

যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট।” সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ঐরূপ ব্যক্তিদিগের মধ্যে লোভ ও অহঙ্কারের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্থূলতঃ উহাই মোহের কার্য্য। ঐ যে “আমার আমার” উহাই মোহ। মোহ মানবের কাণ্ড-জ্ঞান এতই বিনষ্ট করে! বলিতে লজ্জা করে বঙ্গগৃহে অনেক মহিলা স্বামী বা পুত্রের অদর্শনে যে অন্ন জল ত্যাগ করেন, তাহাও মোহের একবিধ শাখা। যে জননী আপন পুত্রের জন্য সুখাদ্য এবং বিধবা মাতার পুত্রের জন্য কুখাদ্য ভাগ করিয়া থাকেন, তাঁহার মাতৃস্নেহ মোহের আবরণে আবৃত। কৃপণের অর্থাদির প্রতি যে অনুচিত আসক্তি, তাহাও মোহের কার্য্য।

মোহ রিপু নিবারণের উপায় উদারতা অভ্যাস করা। প্রীতি বৃত্তি যতই সম্প্রসারিত হইবে, ততই উদারতা অভ্যস্ত হইবে। আপনার ছেলেটীকে তো ভালবাসি, পিতৃহীন ভ্রাতুস্পুত্রটীকেও ভাল-বাসিব; দূর-সম্পর্কীয় অনাথ শিশুটীকেও ভালবাসিব; নিঃসম্পর্কীয় অন্ধ ভিক্ষুককেও ভালবাসিতে হইবে। এইরূপ কর্ত্তব্য-বোধে প্রীতিবৃত্তির বিকাশ করিতে করিতে ভালবাসা আপনা হইতেই বাড়িবে —মোহের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে। একটা কথা এই যে, যাহারা আমাদের পোষ্য, তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা আমাদের তো অবশ্য কর্ত্তব্য, অসঙ্গতি নিবন্ধন অন্যের সেরূপ করিতে না পারিলেও আমরা প্রীতির অনুশীলন করিলে মোহাসক্ত হইব না। যে ব্যক্তি প্রীতির অনুশীলন করিতে চেষ্টা করে, সে কৃপণতার জন্য যে “ছল ছুতা” করিবে না, এ কথা বলা তো বাহুল্য। অতএব অর্থের অসঙ্গতি জন্য পরের আর্থিক সাহায্য করিতে না পারিলেও পরকে ভালবাসিতে কেহ বিমুখ হইও না। হৃদয় প্রশস্ত হইলে মোহ-রিপুর হাত এড়াইতে পারিবে, সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

এই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র অধিকারিণী ভগবতী বিশ্বজননী। তিনি আমারই, আমি তাঁহারই। তাঁহার যাহা কিছু, তৎসমুদায়কে ভালবাসিবই। এইরূপ সংস্কারে কর্ত্তব্যবোধে ভালবাসা আরম্ভ করিলে, মানবের ভালবাসার যথোচিত বিকাশ হইবেই হইবে। ভালবাসার নেশা বড়ই নেশা, মানবকে তাহার বাধ্য হইতেই হইবে।

আর এক কথা, অনেক রিপুর বাহিক একটা আবরণ থাকে, তাই সময়ে সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তিও পাপকে চিনিতে না পারিয়া পুণ্যভ্রমে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। মোহ রিপুরও এমনি একটা সুন্দর আবরণ আছে; সহসা দেখিলে মোহকে নীচ প্রবৃত্তি বলিয়া চিনিতে না পারিয়া সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি প্রেম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আঁধার ও আলোকে যেরূপ প্রভেদ, দানবে ও

মানবে যেরূপ প্রভেদ, নরক ও স্বর্গে যেরূপ প্রভেদ, মোহ রিপু হইতে প্রেম প্রবৃত্তিরও সেইরূপ প্রভেদ। কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা মোহ ও প্রেমের প্রভেদ বলা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি পুত্রাদি কোনও আত্মীয় বিদ্যা বা অর্থোপার্জ্জনার্থে দূর দেশে যাইতেছে, তাহার অদর্শন-জনিত কষ্টে তাহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা মোহের কার্য্য। পক্ষান্তরে যিনি পীড়িত পুত্রের সুচিকিৎসা জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য প্রেমের কার্য্য। মোহ সঙ্কীর্ণ, দুর্ব্বল,মোহ স্বার্থপর। প্রেম উদার, সবল, প্রেম পরার্থপর। যে ব্যক্তি তাহার প্রীতিভাজনকে বলে "আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হই, অতএব, তুমি সকল অনুষ্ঠেয় কার্য্য ছাড়িয়া আমার কাছে বসিয়া থাক—তাহাতে তোমার অধর্ম্ম হয়, অজ্ঞানতা হয়, দরিদ্রতা হয়, অযশ হয়, যাহাই হয় হউক, আমি তোমাকে চক্ষের উপরেই রাখিব, কেননা তাহাতেই আমার সুখ"; সে ব্যক্তি মোহপরায়ণ, প্রেমের কথা সে জানে না। আর যিনি তাঁহার প্রীতিভাজনকে বলেন "তোমাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হই, কিন্তু তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে দেখিলে আরও বেশী সুখী হই —কেননা তাহাতেই তুমি অধিকতর সুখী হইবে। তোমার মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াই আমার পরম সুখ। তুমি জ্ঞানার্জ্জনার্থে ইয়োরোপে যাইতেছ, তোমার অদর্শনে আমার মন কাতর হইবে বটে, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশয়েই সে কাতরতায় আমি অবসন্ন হইব না, বরং পরম পরিতৃপ্ত হইব," তিনিই প্রেমপরায়ণ। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া মোহ হইতে প্রেমের পার্থক্য চিনিতে, পারা যায়; তাহা চিনিতে পারিলে কেহ বিষকে আর অমৃত মনে করিবেন না।

(ক্রমশঃ)।

পক্ষীদিগের সম্বন্ধে পৌরাণিক মত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পক্ষীদিগের সম্বন্ধে নানা দেশে নানা জাতি মধ্যে বিবিধ সংস্কার দেখা যায়। পক্ষীদিগের গতি, স্বর, উপবেশন প্রভৃতি কার্য্য বিবিধ শুভাশুভ ঘটনার পরিচায়ক। কাক-চরিত্র বিদ্যা যাহা দ্বারা এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা কেবল হিন্দু-দিগের মধ্যে বদ্ধ নহে, প্রাচীন রোমক দৈবজ্ঞগণ ইহার বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। রোমের সংস্থাপক রমুলস ও তাঁহার যমজ সহোদর, রিমসের মধ্যে রাজত্ব লইয়া বিবাদ হয়, রমুলস রিমস অপেক্ষা দ্বিগুণসংখ্যক শকুনি দর্শন করাতে জয় লাভ করেন।

প্রাচীন দেবোপাসকদিগের মতে বিশেষ বিশেষ পক্ষী বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রিয়। হিন্দু পুরাণে ব্রহ্মার হংস, বিষ্ণুর গরুড়, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পেচক, কার্ত্তিকের ময়ূর যেমন প্রিয়, গ্রীক পুরাণে যোভের ঈগল, জুনোদেবীর ময়ূর ও হংস, মিনার্ভার পেচক, মার্সদেবের কাঠঠোকরা এবং রতি দেবীর চটক ও ঘুঘু পক্ষী সেইরূপ প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। দেবতারা কখন কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক বিহঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং নরনারীগণ শাপ-গ্রস্ত হইয়া বিহঙ্গযোনি প্রাপ্ত হয়। বেদে অগ্নি বাজপক্ষী হইয়াছিলেন। জুপিটার গানিমিদি নাম্নী রূপবতী রমণীর মন হরণ করিবার জন্য ঈগলমূর্ত্তি এবং লীডানাম্নী অন্য নারীর প্রিয়পাত্র হইবার জন্য সোয়ান পক্ষীর রূপ ধারণ করেন। নলরাজ দেবতাদিগের বরে রাজ-হংস হইয়া দময়ন্তীর চিত্ত হরণ করেন। প্রসিদ্ধ ব্রিটিষরাজ আর্থর দাঁড়কাক হইয়াছিলেন এইরূপ জনপ্রবাদ।

অসভ্য জাতিগণের মধ্যে অদ্যাপি পক্ষীদিগের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিশ্বাস আছে। আমেরিকার এক শ্রেণীর আদিমনিবাসীরা বিশ্বাস করে, কাক পক্ষী তাহাদিগের আদি পুরুষ। কালি-ফর্ণিয়ার টুপারাগুয়া জাতি পেচককে বীরপ্রধান বলিয়া মনে করে। পিমাস জাতির মধ্যে পৃথিবীর মহাজলপ্লাবনের কর্ত্তা ঈগল পক্ষী।

আত্মা দেহত্যাগানন্তর পক্ষিরূপে লোকান্তরে যায়, ইহা একটী প্রাচীন বিশ্বাস। অনেক লোকে ইহাও বিশ্বাস করে যে, আত্মা সকল পক্ষিরূপে আমাদের চারি দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। পাউহ্বটান নামক এক জাতি বন্য পক্ষী-দিগকে আপনাদের মৃত বীরদিগের রূপান্তরিত আত্মা মনে করিয়া তাহাদিগকে শিকার করে না। হুরণ জাতি পান-কৌটীকে দেহমুক্ত আত্মার রূপান্তর বলিয়া পবিত্র জ্ঞান করে।

দেশবিশেষে কতকগুলি পক্ষী পবিত্র ও মঙ্গলসূচক বলিয়া পূজিত, আবার অপর কতকগুলি অপবিত্র ও অমঙ্গলের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিয়া ঘৃণিত। আমাদের দেশে লক্ষ্মীপেঁচা, শঙ্খচিল, কপোত প্রভৃতি সুলক্ষণসূচক। কালপেঁচা, শকুনি, ভোতল, কড়্‌কড়ে, প্রভৃতি পক্ষী অমঙ্গল-কর ও যমের অনুচর। এ সকল পক্ষী যেখানে গমনাগমন করে, তথাকার ভদ্রস্থতা নাই। ইহাদের শব্দ যত দূর শ্রুত হয়, তত দূর মহামারী প্রভৃতি দুর্ঘটনা বিস্তারিত হয়।

সমগ্র ইউরোপে সারসপক্ষী পবিত্র বলিয়া সমাদৃত। চাতকও তদনুরূপ। সুইডিসদিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, যিশুখৃষ্ট যখন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া হত হন, তখন সারস (ষ্টার্ক) ষ্টার্কা ষ্টার্কা বলিয়া তাঁহার বল বিধান করে এবং চাতক (সোয়ালো) সোলা সোলা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে। ইহারা বাটীতে থাকিলে মঙ্গল

এবং ইহাদিগের বাসা ভাঙ্গিলে অমঙ্গল হয়।

রবিন প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার পক্ষী পবিত্র বলিয়া আদৃত। স্কটলণ্ড-বাসীরা বলে রবিনকে বিরক্ত করিতে নাই। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের এক ফোঁটা রক্ত আছে।

ব্রিটনদিগের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী আছে। (wren) রেণ পক্ষী স্বর্গ হইতে অগ্নি আনয়ন করে, ইহাতে তাহার কতকগুলি পালক পুড়িয়া যায়! রেণ অতি ক্ষুদ্রকায় এবং ঈগল বৃহদাকার পক্ষী। ইহাদিগের মধ্যে কে রাজা হইবে এই কথা লইয়া বিবাদ হইল। পরে স্থির হইল যে, যে অধিক উচ্চে উঠিতে পারিবে, সেই রাজা হইবে। ঈগল দ্রুতগামী, রেণকে অনায়াসে পরাজয় করিবে মনে করিল। কিন্তু রেণ ঈগলের পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা উচ্চে উঠিল এবং জয় লাভ করিল!

ঘুঘু পক্ষী আমাদের দেশে অমঙ্গলকর। ঘুঘু যাহার ভিটায় চরে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু খৃষ্টানেরা ইহাকে অমরত্ব, দাম্পত্য প্রেম ও নম্রতার আদর্শ বলেন।

ঈগল পক্ষীর বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা প্রচলিত। প্রাচীন জনশ্রুতি, পক্ষিরাজ ঈগল প্রতি ১০ বৎসরে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী অগ্নিময় প্রদেশে গমন করেন এবং সমুদ্রে ঝম্প দিয়া নব যৌবন লাভ করেন!

ফিনিক্স নামক এক পক্ষীর সম্বন্ধে জনশ্রুতি—ইহা এক যুগে একটী মাত্র জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধ হইয়া অগ্নিতে আপনাকে দগ্ধ করে এবং তাহার শরীরের ভস্মরাশি হইতে আর এক নূতন ফিনিক্স উৎপন্ন হয়!

সোয়ান পক্ষী সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতে একটি কিম্বদন্তী আছে যে, ইহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এ অতি সুস্বরে গান করে।

আমাদের দেশের ডাক পাখীর সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস, তাহারা ডিম পাড়িয়া অবিশ্রান্ত চিৎকার করিতে থাকে। চিৎকার করিতে করিতে গলা চিরিয়া এক বিন্দু রক্তপাত হয়, তাহা দ্বারা তাহাদের ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয়।

পেলিকান নামক সমুদ্রপক্ষীর বিষয়ে এইরূপ জনশ্রুতি পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত আছে। সে তাহার বক্ষ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া সন্তানকে পান করায়। আরও কথিত আছে যে, পেলিকানেরা মৃত অবস্থায় জন্মে, পক্ষিমাতা বক্ষঃস্থলের এক ফোঁটা রক্ত দিয়া তাহাদিকে বাঁচাইয়া তুলেন।

মাছরাঙা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সংস্কার, ইহা যখন ডিম ফুটায়, তখন ভাল হাওয়া বয়। প্লিনী, বার্জিল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

দেবলরাজ।

(গত প্রকাশিতের পর)

(৫)

চৌবেড়িয়ায় দেবনাথ পালের মাতুলালয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এজন্য দেবনাথ চৌবেড়িয়ায় বড় একটা যাইতেন না। কারণ সেখানে পঞ্চ পাণ্ডব সদৃশ পঞ্চ মাতুল বিদ্যমান ছিলেন ;—কেহ নিজ বিষয় কার্য্য দেখিতেন, কেহবা সম্ভ্রমজনক অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, —কেহবা তৎকালীন রাজস্ব-নবাব ক্রোরীয়ান গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রাজধানী পূর্ব্বস্থলীতে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ;—কেহবা রাজপুত্রের ন্যায় বাড়ীতে বসিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গে নিয়ত আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইতেন। সেই স্থানে মাটী কাটিতে যাইতে দেবনাথের মাথা কাটা যাইত। এজন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তিনি চৌবেড়িয়ায় যাইতেন না। যে দেবনাথের মাতামহ ও মাতুলগণের অবস্থা এতাদৃশ অনুকূল, সেই দেবনাথকে মাটির ঝুড়ী মাথায় বহিতে হয়, এ ঘটনা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে ; কিন্তু দেবনাথ অলস ভাবে পরের গলগ্রহ হইয়া অন্নাচ্ছাদনের সুখভোগ করা অপেক্ষা, আপনার শ্রম ও ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া দুঃখ ভোগ করাও সুখ মনে করিতেন। এই জন্য তিনি বর্ত্তমান কালের ন্যায় "শালাবাবু" বা "ভাগিনেবাবু" হইতে পারেন নাই।

হাট, বাজার ও মেলা এই তিনটী শব্দ বহু দিন হইতে বঙ্গ দেশে প্রচলিত আছে, যে স্থানে দিবসের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কালে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি ও বিক্রয় হইয়া যায়, তাহাকে হাট কহে। যে স্থানে দীর্ঘকালস্থায়ী দোকান পাট আছে, তাহাকে বাজার বলে। আর যে স্থানে মাসের মধ্যে বা বৎসরের মধ্যে ২।৪ দিন ব্যাপিয়া বিবিধ দ্রব্যের আমদানী ও বহু লোকের সমাগম হয়, তাহাকে মেলা বলে। এই মেলা আবার শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রকার। আমরা যে সময়ের গল্প ফাঁদিয়াছি, সে সময়েও এই প্রকার নানা স্থানে হাট, বাজার ও মেলা হইত। হাটের অনেক নাম আছে। নিত্য হাট, একের হাট, দুইয়ের হাট, পাঁচের হাট, সাতের হাট ইত্যাদি। আবার বার ধরিয়াও হাট বসিয়া থাকে। শ্রীনগরে নিত্য হাট ও মঙ্গল শুক্রের হাট হইত। চৌবেড়িয়ায় তিনের হাট ও প্রতি মাসে বুড়ো শিবের এক দিন মেলা হইত। হাঙ্গরীবাঁকে পাঁচের হাট বসিত। এই হাটের খুব সমৃদ্ধি ছিল। অনেক জিনিস পত্র আসিত ও দশ পনরখানা

গ্রামের লোক জুটিত। এই দিন দেবনাথ অন্য কোন স্থানের হাটে যাইতেন না,—ঘরে বসিয়া হাঁড়ী কুঁড়ি বিক্রয় করিতেন। শ্রীনগরের অনেকাংশ বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও অনেক লোকের বাস ছিল। এজন্য প্রথমে একটী সামান্য প্রকারের বাজার ছিল এবং মাছ তরকারীর হাট বসিত। তদ্ভিন্ন প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে খুব জাঁকের হাট হইত। দেবনাথ এই দুইটী হাটে যাইতেন। চৌবেড়িয়ার তিনের হাটে অর্থাৎ তিন দিন অন্তর যে হাট হইত, সে হাটে অতিশয় হাঁড়ি কলসীর বেচা কেনা হইলেও দেবনাথ কদাচ সে হাটে যাইতেন না। কিন্তু বুড়ো শিবের মাসিক মেলায় না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেননা সপ্তাহের মধ্যে শ্রীনগরের দুইটী এবং নিজ গ্রামের একটী এই তিনটী হাটে যত বেচা কেনা হইত, এক বুড়ো শিবের মেলায় তত বিক্রয় করিতেন।

এখন যেমন নন্দনঘাট, বারহাট, কায়েতপাড়া, চন্দননগর প্রভৃতির হাঁড়ি প্রসিদ্ধ, তখন হাঙ্গরীবাঁক, শ্রীনগর ও চৌবেড়িয়ার হাঁড়ী তদ্রূপ প্রসিদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে দেবনাথ পালের হাতের হাঁড়ী লোকে সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ করিত। চৌবেড়িয়ার চতুর্দ্দিকেই অরণ্য ছিল। ঈশান কোণের বন অধিকতর নিবিড়। এই বনে এক প্রকাণ্ড শিব-মন্দির ছিল। তন্মধ্যে এক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির কত কালের এবং কাহার প্রতিষ্ঠা করা, তাহা জানা যায় না। ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা করা বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ঐ শিবের সেবার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য্য। মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ ঘন বনে আবৃত হইলেও সম্মুখে অতিশয় প্রশস্ত, পরিষ্কৃত ও সমচতুরস্র প্রাঙ্গণ ছিল। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বে একটী প্রকোষ্ঠ ছিল। ঐ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে রোয়াক। এই প্রকোষ্ঠমধ্যে মহাদেবের পরমান্ন পাক হইত। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটী অন্ধকারময় সোপানসংযুক্ত গহ্বর ছিল। গহ্বরের মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সিঁড়ির দুই চারিটা ধাপ ও অন্ধকাররাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইত না।

অতি প্রত্যূষে একজন মালী এক পাত্র ফুল বিল্বপত্র রন্ধনশালার রোয়াকে ফেলিয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন এক আঁটী কাঠ, এক জন এক ভাণ্ড দুগ্ধ, একজন এক সের পরিমিত আতপতণ্ডুল ও কিঞ্চিৎ ঘৃত রাখিয়া যাইত। মধ্যাহ্নকালে একজন ব্রাহ্মণ এক কমণ্ডলু গঙ্গাজল হস্তে আগমন করিয়া পূজা করিতেন এবং স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন। শিবের সেবার্থ যতগুলি লোকের উল্লেখ করা গেল, সকলেই কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ ভূমির স্বত্ব যে তাহাদের বংশের কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)।

একালের শ্বাশুড়ী বউ।

আমাদের সমাজে একাদশ দ্বাদশ বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই অধিকাংশ কন্যার বিদ্যাচর্চ্চা পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ১৫।১৬ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, এবং তাহাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপ কন্যারা বিবাহের পর শ্বশুরালয় গমন করিয়া আদর্শ বধূ হইতে পারেন। কিন্তু এ নিয়ম বাঙ্গালি-সমাজে বহুল প্রচলিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্কা বালিকা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার দু এক দিবসের মধ্যেই পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আইসে। এখন হইতে সে বউ। তাহার স্বামীর পরিবারের মধ্যে সে একটি নবাগত ব্যক্তি। এই নূতন পরিবারের সকলেই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু কয় জন তাহার যথার্থ আত্মীয়?

পরিবারবর্গ ও পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে নববধূ দেখা ও তাহার সমালোচনা করা প্রথম কর্ম্ম। পুরাতন প্রথা-মত শ্বাশুড়ী স্বয়ং বউকে ঘরে তোলেন। বর কনে আসিবামাত্র একটা হুলস্থূল বাধিয়া যায়, সকলেই বউ দেখিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে ব্যস্ত। সকলেই বর ও তাহার পরিবারের বন্ধু, কিন্তু তাঁহারা ইহা বিস্মৃত হন যে, পরিবারের মধ্যে বধূও একজন। এই ভ্রমে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া কনের ও তাহার আত্মীয়গণের কুৎসা করিতে আরম্ভ করেন। দেখা গিয়াছে, এক স্থলে নববধূকে অভ্যর্থনা করিবার সময় সমাগত নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন "এমন সোণার চাঁদ ছেলে, তার যোগ্য কি এই বউ?" কেহ বা বেয়ানের উদ্দেশ্যে উপহাস করিয়া সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কিছু বলিলেন। কেহ বলিলেন "বিবাহের যোড় ভাল হয় নাই। কি খেলো কাপড় দিয়াছে, আর অল্প টাকা দিলেই ভাল চেলি হইত।" কেহ কেহ "ওমা গহনা দেখ, যেন ফুঁ দিলে উড়ে যায়!"

আর একজন বলিয়া উঠিলেন "দান-সামগ্রী দেখেছ কি? উহা কিরূপে সভায় বাহির করিয়াছিল? লজ্জা করে নাই?" নববধূর সম্মুখেই এইরূপ আরও কত কথোপকথন চলিতে লাগিল। কোন্ বউ নিখুঁত সুন্দরী, কাহার বৈবাহিক অনেক টাকা দিয়াছিল, এ প্রকার অনেক কথা সে সময় হইল। হায়! কেহ ভ্রমেও ইহা বিবেচনা করিলেন না যে, বধূ নিজের রূপ অথবা অর্থের ত্রুটি সম্বন্ধে কিছু প্রতীকার করিতে পারে কি না?

কন্যার তৎকালীন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। এইমাত্র সে শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে। স্নেহময়ী মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীর অশ্রুভরা মুখ সে এখনও ভুলে নাই, তার উপর মাতৃ-পিতৃ-নিন্দায় তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, আর সহ্য হইল না—কাঁদিয়া ফেলিল। তখন একবাক্যে সকলে "ওমা এত বড় মেয়ের কান্না কেন গা,? চুপ কর, আর কেঁদ না।" ইত্যাদি বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মধ্যে দু এক জন বউয়ের হইয়া দু চার কথা কহিলেন, কিন্তু দশ জনের মুখের নিকট এক জনের কথা কে শোনে? কাজেই তাঁহাকে নীরব হইতে হইল।

বিবাহের কনে প্রায় ৭।৮ দিন শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে, সেই কয় দিন ধরিয়া বউ সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন হইয়া থাকে। সপ্তাহ গতে নববধূ পিতৃগৃহে গমন করে। সচরাচর বৎসরেক পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসে। তথায় আসিয়া বধূ দেখে তাহাকে কেহ মাতার মত স্নেহ করে না, বরঞ্চ কোনও কাজ করিতে না জানিলে, বা না পারিলে, কিম্বা তাহার দ্বারা সামান্য মাত্র কোনও ক্ষতি হইলে, তাহাকে ক্ষমা করা দূরের কথা, পরিবারস্থ সকলে শতমুখে তিরস্কার করেন। এ সময় তাহার কোমল মনে সম্ভবতঃ ইহাই উদয় হয় যে, 'মা ত আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন না, ইহারা কেন আমাকে এত তিরস্কার করে?' এ সময় বধূরা স্বামী ভিন্ন আর কাহারও ভালবাসা পায় না, এ নিমিত্ত সংসারের ভিতর তাহাকে আপনার বলিয়া জানে, সুতরাং সকল সুখ দুঃখের কথা স্বামীকে না জানাইলে প্রাণের কষ্ট ঘুচে না। এদিকে পুত্র নিজ মাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী মনে করেন, বউ আসা পর্য্যন্ত পুত্র তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করে না। ভাবিলেন ইহা বউমার শিক্ষা, কেননা মাতার চক্ষে আপন সন্তান মন্দ দেখা কঠিন।

ইহার পূর্ব্বে পুত্র আমার নিকট আসিয়া 'মা এটা দাও, ওটা দাও' কত কথাই বলিত, এখন আর সে ভাব নাই। অনর্থক এ প্রকার কয়েকটি কথা মনে আন্দোলন করিয়া, অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া মনে মনে বউয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। বউ পিতৃগৃহ হইতে আসিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার লইবে ও তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে, এবং তাঁহাকে নিজমাতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, পূর্ব্বে ইহাই তাঁহার মনে ধারণা ছিল। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল কই? হয় ত বউ ভাল কাজ করিতে পারে না, কারণ তাহার মাতা গৃহস্থালির কার্য্য তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে কন্যাকে কেবল লেখা পড়া, কার্পেট বোনা ইত্যাদি এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং

গৃহিণীর মনোমত বউ হইল না। তিনি প্রতিবাসিনীদের নিকট বৈবাহিকার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অধিকাংশ স্থলে এই লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত হয়। বউ তাঁহাকে পূর্ব্বের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না। শ্বাশুড়ীও বউমাকে আর সেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন না। অল্পমাত্র সাংসারিক কারণে পরস্পরের মনে অসন্তোষের বীজ জন্মিতে থাকে। এ অবস্থায় বউ একটু অন্যায় করিলে (জানতই করুক বা অজানতই করুক, তাহা বিবেচনা না করিয়া) সক্রোধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। এ অবস্থায় শ্বাশুড়ীর প্রতি বউয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়া অসম্ভব বলিতে হইবে। অপর বউ শ্বাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া আপন শিশু পুত্র কন্যাদিগকে অকারণে প্রহার করিয়া নিজের ক্রোধ-শান্তি করেন, ইহাতে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। পৌত্র পৌত্রীকে বিনাপরাধে শাস্তি দেওয়া যেন তাঁহাকেই শিক্ষা দেওয়া, সুতরাং এরূপ অন্যায় অত্যাচার দর্শনে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিলেন—সে সময় পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। শ্বাশুড়ীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধে আঁটিতে না পারিয়া, পরিশেষে বধূমাতা স্বামীর উপর সমস্ত রাগ ঝাড়িয়া তাঁহাকে পৃথক্ হইতে অনুরোধ করেন। কতক দিন দম্পতীর মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে, স্ত্রী শ্বাশুড়ীর অধীনে থাকিতে একবারে অসম্মত। এজন্য মনে মনে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—নিশ্চয়ই ভিন্ন হইতে হইবে। স্বামী বেচারা মহাবিপদাপন্ন।

এ দিকে স্ত্রীর অনুরোধ, ওদিকে গর্ভধারিণী মাতাকে ত্যাগ করা,—বিষম সমস্যা হইয়া পড়িল। কতস্থলে দেখা গিয়াছে বিপন্ন স্বামী এরূপ স্থলে দুই চারিটা আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীর বাক্যরূপ স্রোতে ভাসিয়া গেল এবং নিজেও তাহাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল, সুতরাং পরিণামে স্ত্রীর জেদই বজায় থাকিল। পৃথক্ হইয়াও বধূর মনে উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিল না, শ্বাশুড়ীর প্রতি, আক্রোশ বদ্ধমূল রহিল। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় কিম্বা পীড়া-কালে যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতেও অগ্রসর হইতে চাহেন না, বা এক কপর্দ্দক দ্বারা সাহায্য করাও আবশ্যক মনে করেন না।

সে কালের অনেক শ্বাশুড়ী বউকে ভাল বাসিতেন না, অপরন্তু কেহ কেহ বউয়ের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রবণ করিলেও তনু রোমাঞ্চিত হয়, সুতরাং ক্রমে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে বউরা স্বাধীন হইতে আরম্ভ করিত। কোন কোন বউ হিংসা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শ্বাশুড়ীর প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িত না, কেহ

কেহ বা মনের কষ্টে আত্মহত্যা করিত।

পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণেই হউক, কিম্বা সে কালের শ্বাশুড়ীদিগের অমানুষিক ভয়ানক যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতেই হউক, একালের অধিকাংশ বধূ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বশীভূত হইতে চাহেন না। এখনকার বউরা আধুনিক শিক্ষাভিমানিনী (শিক্ষিত হউন বা না হউন) হওয়াতে আর শ্বাশুড়ীদের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। প্রাচীনাদের গ্রাহ্য করা বা তাঁহাদের মতে কার্য্য করা নিজেদের পক্ষে অপমান মনে করেন। এজন্যই অনেকের মধ্যে সদ্ভাব থাকে না।

অনেকে ইহা অবগত নহেন যে, কিরূপ ব্যবহার করিলে পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ জন্মিতে না পারে। সম্ভবতঃ আপন আপন উচিতানুচিত বিবেচনা করিয়া চলিলে কাহারও সহিত কলহ হওয়া সম্ভব নয়। শ্বাশুড়ীর উচিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া বালিকা বধূ যখন প্রথম শ্বশুরগৃহে আসেন, তখন তাহাকে কন্যাসম যত্ন ও স্নেহ করা। যত্নে শোণিতপিপাসু হিংস্র পশু সিংহ ব্যাঘ্রও মানবের বশীভূত হয়। তবে বালিকা বধূ কেন শ্বাশুড়ীর বাধ্য হইবে না? বধূ তাহার পিতা মাতার বিরুদ্ধে কোন কথা কেহ বলিলে বিরক্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এ কথাও মনে করা কর্ত্তব্য যে, স্নেহ না করিলে স্নেহ পাওয়া যায় না। বালিকাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে না, অতএব অপরের প্রতি মায়া মমতা একদিনে জন্মে না। ক্রমে ক্রমে সে যখন বুঝিতে পারিবে বাটীর সকলেই তাহাকে আপনার মত ভাবে এবং তদনুযায়ী স্নেহ করে, তখন তাহার ভালবাসা স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি জন্মিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই একদিন নববধূ হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্বাশুড়ীর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু নিজে শ্বাশুড়ী হইলে আর পূর্ব্বের বিষয় স্মরণ করেন না। বধূ অবস্থায় যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন বধূর প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলে তাঁহারা আদর্শ শ্বাশুড়ী রূপে পরিগণিত হইতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এ প্রবন্ধ পাঠে কেহ যেন ইহা না মনে করেন যে, এ কালের সমুদায় শ্বাশুড়ীই বউদের কষ্ট দেন ও তাহাদের সহিত বিবাদ করেন, কিম্বা সকল বধূগণ শ্বাশুড়ীদিগের সহিত কলহ করেন ও পৃথক্ হন। তাহা নয়। অনেক শ্বাশুড়ী বধূদিগকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করেন। কন্যা ও বধূকে সমচক্ষে দেখিলে, তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়া অসম্ভব, ইহা তাঁহারা অবগত আছেন। অপরন্তু এই ভাবেন, পুত্র একাকী ভালবাসা ও সেবা যত্ন সমস্ত করিতে সক্ষম হইতে পারে না, এ জন্য তাহার প্রতিনিধিরূপে বধূ নিযুক্ত হইয়াছে; এ কারণে তাহাকেও নিজ তনয়ার মত স্নেহ করা উচিত। সুবুদ্ধি-

মতী শ্বাশুড়ীর গুণে ও যত্নে মোহিত হইয়া বধূগণ আপনা হইতে তাঁহার প্রতি আসক্ত হন এবং সুবোধ সুশীলা হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে পরিবারবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। মাতার মত শ্বাশুড়ী পাওয়াতে বধূও তাঁহাকে মাতৃসম ভালবাসেন। এরূপ স্থলে শ্রদ্ধা ভক্তি আপনি জন্মে। লক্ষ্মী-সম বধূর গুণে অনেক দুরন্ত শ্বাশুড়ীও শান্ত হন। এ প্রকার সুগৃহিণীদের গৃহ সোণার সংসার রূপে পরিণত হয়।

শ্রীমতী সত্যবতী দেবী।

রাজপুত রমণীর বীরত্ব।

পাঠিকাগণের নিকট অদ্য এক রাজপুত রমণীর অদ্ভুত বীরত্বের বর্ণনা করিব। কিরূপে রাজপুত রমণীগণ স্বদেশ রক্ষার্থ মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া অম্লানবদনে স্বীয় সন্তানদিগকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রদান করিতেন, তাহা ইতিহাসে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সময়ে সময়ে রাজপুত রমণী অসিহস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পাশ্চাত্যদেশ সকলের ইতিহাসে এইরূপ স্ত্রীলোকের বীরত্ব-দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় "জোয়ান ডি আর্কের" নাম শুনিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চম হেনরি এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক ফ্রান্সদেশাধিপতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলে কেবল মাত্র জোয়ানের শৌর্য্যে ও বীর্য্যে ফ্রান্স দেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। স্পেনদেশের অন্তর্গত সারাগোসা নগর ফরাসীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল মাত্র এক যুবতীর সাহসিকতায় নগর রক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। সুবিখ্যাত সিপাহিবিদ্রোহের সময় ঝান্সির লক্ষ্মীবাই স্বয়ং ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মৃত হন। মহাবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর যৎকালে আমেদ নগর আক্রমণ করেন, তখন উহা কেবল একজন স্ত্রীলোকের বীরত্বে রক্ষিত হয়। যত দিন চাঁদবিবি জীবিত ছিলেন, ততদিন আকবর আমেদ নগর হস্তগত করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহী সৈনিকদিগের হস্তে চাঁদবিবি নিহত হইলে, আমেদ নগরের পতন হয়। আমাদিগের বর্ণনীয় ঘটনাটীও আকবরের রাজত্বসময়ে সংঘটিত হয়।

পাঠানবীর সের সার নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে অমরকোট নগরে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। আকবর যখন ত্রয়োদশ-

বর্ষীয় বালক, তখন তাঁহার পিতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং পঞ্জাব প্রদেশ ও দীল্লি ও আগ্রা নগরদ্বয় জয় করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে আকবর রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের পরিসর এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে নামে মাত্র রাজা বলা যায়। কেবল মাত্র দীল্লি ও আগ্রা নগর তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিত। ক্রমে ক্রমে স্বীয় বুদ্ধি ও পরাক্রমে আকবর পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। রাজত্বের প্রথমেই আকবর রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রাজপুত রাজন্যবর্গের মধ্যে কয়েকজন মোগল সম্রাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, আর কয়েকজনকে হস্তগত করিতে না পারিয়া সম্রাট্ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আকবর অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সহজে তাহা ছাড়িতেন না। রাজপুতানার মধ্যে মিবারের মহারাণাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই প্রথমে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিতে আকবর প্রয়াস পান। যখন আকবর দীল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন, প্রায় সেই সময়েই উদয় সিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুই জনের শিক্ষার বিশেষ প্রভেদ ছিল। আকবর প্রথম হইতেই বিপজ্জালে বেষ্টিত ছিলেন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় সেই সকল বিপদ অতিক্রম করেন, ইহাতে তাঁহার বিস্তর শিক্ষা হয়। প্রথম হইতেই আকবর যুদ্ধনিপুণ বীর্য্যবান্ বৈরাম ও অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন আবুল ফাজিল প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে তাঁহার শিক্ষার কিছু ত্রুটি হইতে পারে নাই। কিন্তু উদয় সিংহ প্রথম হইতেই চাটুকার এবং রমণীগণ দ্বারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত থাকাতে নিতান্ত ভীরু এবং রাজ্যশাসনে অপটু হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকবর সসৈন্যে মিবার রাজধানী চিতোর নগরের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিলে উদয় সিংহ একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজাকে কর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী এক রমণী স্বয়ং যোদ্ধৃবেশে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং কয়েকবার এরূপ প্রচণ্ডবেগে মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন যে, মোগল সৈন্য চিতোর পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া গেল।

উপরি-উক্ত আক্রমণ এবং রমণীর বীরত্ব সম্বন্ধে ফেরিস্তা গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই, তবে রাজপুতানার কবিগণ এই আক্রমণ এবং সম্রাটের আংশিক পরাভবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া থাকেন। এই যুদ্ধের সময় একবার রমণী-চালিত রাজপুত সৈন্য একবারে মোগল শিবিরশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকবরের শিবির সম্মুখে উপনীত হইয়াছিল। যাহা হউক, পুনরায় আকবর স্বদলবলে আসিয়া চিতোর নগর অবরোধ করিলেন। ভীরু উদয় সিংহ

রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

রাজা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু চিতোর একবারে রক্ষকশূন্য হইল না। চিতোরের অধীনস্থ রাজপুত সর্দ্দারগণ রাজধানী রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যবন আক্রমণের সময় চিতোর রক্ষার্থ বাপ্পারাওলের বংশীয় (১) কোন রাজপুত্র স্বীয় রক্ত দান না করিলে রাজধানী রক্ষা হইবে না, এইরূপ প্রবাদবাক্য বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। যখন আলাউদ্দিন প্রভৃত পরাক্রমে চিতোর আক্রমণ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশপুত্র চিতোর রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রক্তপিপাসা শান্ত করেন। অল্পকাল মধ্যেই হামির চিতোর উদ্ধার করেন। মালবরাজ বাজবাহাদুর চিতোর আক্রমণ করিলে শিশোদিয়বংশীয় দিওলারাজ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া চিতোর রক্ষা করেন। কিন্তু এইবার রাজা পলায়ন করাতে রাজরক্ত দ্বারা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিতৃপ্তির আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, সুতরাং এইবার মোগল আক্রমণে চিতোর নিশ্চয়ই বিজিত হইবে এইরূপ ভাবিয়া চিতোর-রক্ষী বীরগণ নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন ; কিন্তু একবারে হতাশ না হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

রাজার পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আকবর অসাধারণ বিক্রমে চিতোরের সূর্য্যতোরণ আক্রমণ করিলেন। সহিদাস চন্দওয়ৎ বীরগণের সহিত উক্ততোরণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মোগলগণ রাজপুত অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক, তথাপি রাজপুত সৈন্য মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও পশ্চাৎপদ হইল না। পুনঃ পুনঃ আকবরের অসংখ্য মোগল সৈন্য সহিদাসের স্বল্পসংখ্যক রাজপুতের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, প্রতি আক্রমণে রাজপুত সৈন্যশ্রেণী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, তথাপি কেহ হটিল না। অটল পর্ব্বতবৎ অবস্থান করিয়া রাজপুতগণ মোগল-আক্রমণ ব্যাহত করিতে লাগিল। অব্যর্থ বর্শা চালনে বহুসংখ্যক মোগলকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া সহিদাস চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

সহিদাসের মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে অপর রাজন্যগণ জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। প্রথমেই দীল্লীশ্বরবংশীয় কাটারি-রাজ, তৎপরে বিজলি-রাজ প্রমর ফুলেশ্বর এবং সাদ্রিরাজ ঝালাকুলেশ্বর তদনন্তর ঈশ্বরীদাস রাঠোর চিতোর রক্ষার্থ আপন আপন জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। ইহাদের মৃত্যুর পর চিতোর রক্ষার ভার বেদনোরের অধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়মল্ল এবং কৈলওয়ার অধিপতি পুত্তের উপর

(১) চিতোরের রাজবংশের আদিপুরুষ বাপ্পা রাওল। ইনি হিন্দুসূর্য্য এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করেন, ইহাঁর বংশের নাম শিশোদিয় বংশ।

ন্যস্ত হইল। পুত্তের জননী এবং বনিতা চিতোরে উপস্থিত ছিলেন। অসংখ্য মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে কিছুতেই নিস্তার নাই, ইহা জানিয়াও পুত্তকে যুদ্ধে যাইতে তাঁহারা নিষেধ করিলেন না। স্বদেশরক্ষার্থ পুত্রের মরণ রাজপুত-জননীর পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের বিষয় ছিল না। পুত্ত জননীর আদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য লইয়া অসংখ্য মোগল চমূর সম্মুখীন হইলেন। পুত্তজননী যে কেবল পুত্রকে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, তাহা নহে। স্বদেশরক্ষারূপ গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং নিজে যোদ্ধৃ-বেশে সজ্জিত হইয়া ও পুত্রবধূকে রণসাজে সাজাইয়া ভীষণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের অসাধারণ বীরত্বে মোগল সৈন্য চমকিত হইল। কিয়ৎক্ষণের জন্য বোধ হইল অসংখ্য মোগল-বাহিনী রমণীর বীরত্বে বাত্যাতাড়িত সংক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মির ন্যায় প্রহত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু অমানুষিক বীরত্ব দ্বারাও তাঁহারা চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বদেশরক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ইতিহাসে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া ক্রমে ক্রমে পুত্ত, তাঁহার জননী ও বনিতা যুদ্ধে হত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চিতোর-রক্ষার সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। জয়মল্ল আকবরের স্বহস্ত-নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে কঠিন জহরব্রত নির্ব্বাহিত হইল। রাজপুত মহিলাগণ পবিত্রতা রক্ষার্থ জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন এবং আকবর বাদশাহ শূন্য চিতোর নগরী অধিকার করিলেন। বারান্তরে জহর-ব্রতের বিবরণ পাঠিকাগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদেশে কোন পাঠিকাকে বোধ হয় কখনও যুদ্ধে যাইতে হইবে না, কিম্বা যুদ্ধে-গমনোন্মুখ পুত্রকেও বিদায় দিতেও হইবে না, তবে কখন কখন কঠিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। সেই সময়ে কর্ত্তব্যের কঠোরতার বিষয় চিন্তা করিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত হওয়া উচিত নহে। কর্ত্তব্যপালন মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সংসারে থাকিতে হইলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, বিপদে পতিত হইলে একবারে অভিভূত হইয়া পড়া মূঢ়তার লক্ষণ, স্থিরচিত্ত হইয়া তাহার যথা-সাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। দেশের হিতসাধনে, স্বীয় কর্ত্তব্য-পালনে, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন—মৃত হউন বা হন, তিনি উচ্চশ্রেণীর বীর। যে রমণী এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা প্রকৃত "বীরাঙ্গনা" বলিয়া অভিহিত করি।

ইংরাজ ও বাঙ্গালী।

তিন কিম্বা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের খবর বঙ্গদেশে কে রাখিত? ইংরাজ বহুদূরে সাগরপারে তরঙ্গমালা-পরিবেষ্টিত শ্বেতদ্বীপে বাস করিতেন। কিন্তু ইংরাজ যখন আমাদিগের রাজা হইলেন, আমাদিগের সঙ্গে ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হইল, আমরা ইংরাজের বাক্যে চলিতে লাগিলাম, ইংরাজের অনুকরণ করিতে লাগিলাম, ইংরাজের অধিকৃত দেশে বাস করিতে লাগিলাম, তখন ইংরাজ ও বাঙ্গালীর বিষয়ে তুলনায় সমালোচনা আবশ্যক হইল। প্রথমতঃ ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে দেশগত বিভিন্নতা। এই দেশগত বিভিন্নতায় ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রভেদ আছে। ইংরাজ স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, বিশেষ-রূপে কর্ম্মঠ, সাহসী, অধ্যবসায়শালী, চতুর ও কার্য্যতৎপর। বাঙ্গালী উষ্ণপ্রধান দেশবাসী বলিয়া স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও ভীরু এবং উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী হইলেও সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্ কিন্তু দীর্ঘসূত্রী।

ইংরাজ ও বাঙ্গালীর শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজ বাল্যকাল হইতে আপনার গন্তব্য পথ মনোনীত করিয়া লইতে সক্ষম। বাঙ্গালী যাহা হউক একটা অবলম্বন করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। যে ইংরাজ ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত হইবেন এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করেন, তিনি অল্প বয়সেই অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সে অধ্যবসায় নাই, সেইরূপ বয়সে সেইরূপ জ্ঞান সঞ্চয় করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। দারিদ্র্য বা অন্য বিঘ্ন বিপত্তিতে ইংরাজকে পরাঙ্মুখ করিতে অপারগ, কিন্তু সামান্য বিপৎপাতে বাঙ্গালীকে নিরস্ত করিয়া ফেলে। যে ইংরাজ নৌ-ব্যবসায়ে পারদর্শিতা ও গৌরবলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বাল্যকাল হইতেই সেই ব্যবসায়ে দীক্ষিত হয়েন। ইহাতে ধনী ও নির্ধনের বিচার নাই। একজন রাজার পুত্র বা পৌত্র অনায়াসেই তাহাতে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু অস্মদ্দেশে তদ্রূপ ঘটিবার নহে। এই স্থানে পদমর্য্যাদা ও জাত্যভিমান প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ইংরাজ বাণিজ্যে জীবিকা, সম্পদ্‌ ও সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে মনস্থ করেন, তিনি বাল্যকাল হইতে সেই ব্রতে ব্রতী হয়েন। কিন্তু বাণিজ্যের নামে বাঙ্গালীর বিতৃষ্ণা। তিনি ব্যবসায় বুঝেন না ও ভালবাসেন না। আজ কাল দুই একজন বঙ্গবাসীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি হইলেও মূলধনের অভাব, কিন্তু ইংরাজের সেরূপ অভাবে কোন ক্ষতি করিতে

পারে না। তিনি যে রূপেই হউক, সে অভাব পূর্ণ করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইংরাজ বাল্যকালে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালী সে অধিকারে বঞ্চিত। কামার, কুমার, ছুতার, দরজী, জুতাবিক্রেতা কাহারও কার্য্য ইংরাজ ঘৃণা করেন না। কার্য্যই ইংরাজের লক্ষ্মী। এই কার্য্যসেবায় তিনি সততই রত। ঐকান্তিকচিত্তে কার্য্যানুসরণই তাঁহার ধনাগম ও উন্নতির প্রশস্ত পথ। কার্য্যবিশেষের প্রতি বাঙ্গালীর ঘৃণা প্রকাশ, তাঁহার অধঃপতনের মূল। ইংরাজ বুঝেন যে, ব্যবসা কখন মনুষ্যকে নীচ করে না, কিন্তু মনুষ্য আপন প্রকৃতি ও ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবসাকে নীচ করিয়া ফেলেন। ইংরাজের নিকট সকল ব্যবসায়েরই গৌরব আছে।

বিদ্যালয়ে পঠদ্দশার শেষ হইলে ইংরাজ দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হয়েন। বিবিধ দেশের আচার ব্যবহার শিক্ষা, ইংরাজের শিক্ষার একটী অঙ্গ। ইহা বাকি থাকিতে, ইংরাজ শিক্ষাকে অঙ্গহীন বোধ করেন। বাঙ্গালী গৃহ হইতে বিদেশ ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইতে অনিচ্ছু। ইংরাজের ছাত্রজীবন মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার উন্নতির কাল। সেই কাল তাঁহার পক্ষে আনন্দ ও সুখময়। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শারীরিক উন্নতিও সাধন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে নাট্যাভিনয়, ব্যায়াম প্রভৃতি অনেক আমোদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর এ সব বিষয়ের তাদৃশ চর্চ্চা নাই। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় বলিয়া, ইংরাজ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কার্য্যকুশল থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালী ইহার অভাবে যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া পড়েন। ইংরাজ শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষা প্রায় পুঁথিগতই থাকিয়া যায়। ইংরাজ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করেন, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না করিতে পুস্তকের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ইংরাজ যাহা জানেন না, তাহা অপরের নিকট জানিয়া লইতে লজ্জা বোধ করেন না; কিন্তু বাঙ্গালী অযথা লজ্জাপ্রযুক্ত অনেক সময়ে শিখিবার সুযোগ হারান ও ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইংরাজের শিক্ষাভিলাষ প্রবল, যে কোন প্রকারে হউক, শিখিতেই হইবে; বাঙ্গালীর অভিমান ও আলস্য তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতু।

ইংরাজ কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনি সময়ের মূল্য বুঝেন। কর্ত্তব্যানুরোধে সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তিনি আপন জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন। সময়ের মূল্য বুঝেন বলিয়া ইংরাজের এত উন্নতি। বাঙ্গালী তাহা বুঝেন না বলিয়া তাঁহার এত দুর্গতি।

ইংরাজ রাজার জাতি বলিয়া কথঞ্চিৎ তেজীয়ান্ হইবার কথা, কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল-

চিত্ত ও তেজীয়ান্। ইংরাজের চলন তেজীয়ান্, বাক্য বলীয়ান্ ও কার্য্য ফলবান্। তাঁহার অধিকংশ কার্য্য তেজঃসম্ভূত ও ফলপ্রদ। বাঙ্গালীর দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত চলন নিস্তেজ, ভাষা দুর্ব্বল, ও অনেক সময়ে কার্য্য নিষ্ফল। ইংরাজ মিথ্যা কথা কহিতে পারেন, বাঙ্গালীও মিথ্যা কথা কহিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিথ্যা কথার প্রভেদ এই যে, ইংরাজ যদি মিথ্যা কথা কহেন, তাহাও তেজের সহিত; বাঙ্গালীর মিথ্যা কথা ভয়সংযুক্ত, সুতরাং দূষণীয় মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়।

আপনার লোক জন সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ইংরাজ একটী ভৃত্যের কোন কার্য্য করিতেও সঙ্কুচিত ও অসম্মত নহেন। কিন্তু বাঙ্গালী, চাকরের জন্য সেই কার্য্য ফেলিয়া রাখিবেন। চাকর যতক্ষণ না আসিবে, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। বাঙ্গালী যতক্ষণ তাকিয়া টেসান দিয়া সট্‌কায় বা আল্‌বোলায় তাম্রকুট সেবন করিবেন, ইংরাজ ততক্ষণ স্বহস্তে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবেন।

ইংরাজের মস্তিষ্ক নবোদ্ভাবন ও নবাবিষ্কার-শক্তিতে বলীয়ান্। বাঙ্গালী উদ্ভাবনকার্য্যে ততটা পটু নহে; সুতরাং নূতন যন্ত্রের বা কলের সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অসাধারণ। ইংরাজ বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাই আজ বিজ্ঞানবলে পৃথিবীর অধীশ্বর। ইংরাজ গ্রন্থপ্রণয়নে বা বিরচনে মতিমান্, কিন্তু প্রতিভাশালী বাঙ্গালী তাহাতে ন্যূন নহেন। ইংরাজ গুণগ্রাহী। বাঙ্গালীর নিকট পরের গুণ চক্ষুশূল। পরের গুণ উল্লেখ করিতে হইলে বাঙ্গালীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

ইংরাজ মহিলা বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী। নারীশিক্ষা ইংরাজ সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাঁরা যে কেবল মাত্র পুস্তক পাঠে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাহা নহে; বিবিধ প্রকার সাংসারিক কার্য্যেও ইহাঁদিগের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। ইহাঁরা স্বাধীনভাবে সমাজে গতিবিধি করেন বলিয়া অনায়াসেই সমাজের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে সক্ষম। কাহাকে কিরূপ সম্ভাষণ করিতে হইবে, কাহার নিকট কিরূপ ভাবে দাঁড়াইতে হইবে, কাহার সহিত কিরূপে কর-মর্দ্দন করিতে হইবে, এই সমস্ত তাঁহারা আপনা আপনি শিখিয়া লয়েন। বঙ্গীয় মহিলা বুদ্ধি-জীবিনী, কিন্তু কতদূর বিদ্যাবতী বলা যায়? অস্মদ্দেশে নারীশিক্ষা একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। দুই এক স্থানে দুই চারিটী রমণী শিক্ষিতা নামের যোগ্যা। যত দিন না সমগ্র বঙ্গদেশ স্ত্রীশিক্ষাকে একটী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন, তত দিন নারীশিক্ষা আমাদিগের দেশে ফলপ্রদ হইবে না। শিখিতে হয় বলিয়া দুই একখানি বই পড়িয়া ছাড়িয়া দিলাম, এরূপ করিলে শিক্ষা হয় না। বঙ্গীয় কামিনী স্বাধীনভাবে সমাজে মিশিতে পান না। সমাজের নিয়মাবলী শিক্ষা

করিবার তাঁহার তত সুবিধা ঘটে না। অনেক ইংরাজ রমণী উত্তম বা দক্ষ গৃহিণী বটে, স্বহস্তে গৃহের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া থাকেন, এবং গৃহস্থলীর সুব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, কিন্তু শিশুর লালন পালন আদি অনেক কার্য্যের ভার অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইংরাজ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সাম্যভাব আছে। স্ত্রী একপ্রকার পুরুষের সহিত সমান হইয়া গৃহকার্য্য পরিচালন এবং সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অনেক সময় তাঁহার মত বলবৎ হয়। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকে প্রায় গৃহের সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। শিশুপালন, রন্ধন, গৃহপরিমার্জ্জন, ইত্যাদি সকলগুলিই তাঁহার করণীয়। অধুনাতন দুই একটী স্ত্রীলোক অবস্থাবিশেষে সেই সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। স্বামী, স্ত্রীর উপাস্য দেবতা—স্ত্রী, তাঁহাকে পূজা করেন।

সাধারণতঃ ইংরাজ রমণী স্বামীর সহিত গির্জ্জায় গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় কামিনী গৃহে থাকিয়া ষষ্ঠী মাকাল পূজা আদি করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইংরাজ ভামিনী অপেক্ষা বঙ্গীয় রমণী অধিকতর নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম্মপ্রাণা। ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণের প্রাণ। তিনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে ধর্ম্মকার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মান্ধ এবং তাঁহার জীবন ধর্ম্মময় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজের ধর্ম্ম, নিয়ম ও পদ্ধতির অধীন, কিন্তু বাঙ্গালীর ধর্ম্ম সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে।

দ্বারস্থ ভিক্ষুককে প্রত্যহ মুষ্টিমেয় তণ্ডুল ভিক্ষা দান করা বঙ্গীয় কামিনীর গৃহকার্য্যের একটী অঙ্গ। আপনার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন হইতেও তিনি ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে খাওয়াইয়া সন্তোষ লাভ করেন। ভিক্ষুক বাটী হইতে নিষ্ফল চলিয়া যাইলে, তিনি মহাপাপ মনে করেন। ইংরাজ কামিনীর সেরূপ শিক্ষা ও সংস্কার কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ ভিক্ষুকের প্রার্থনায় তাঁহার কর্ণপাত হয় না, না হইবার কারণও আছে।

সন্তানকে শিক্ষাদান ইংরাজ মহিলার একটী মহৎ গুণ। বঙ্গীয় কামিনী সে বিষয়ে অজ্ঞ। বাল্যকালে মাতা সন্তানকে যে শিক্ষাদান করেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী ও ফলপ্রদ; সেই জন্য যৌবনে সহজেই ইংরাজের স্বভাব সংগঠিত হইয়া যায়, এবং ইংরাজ কার্য্যকুশল হইয়া উঠেন। ইংরাজমহিলাগণ নানাবিধ ভোগ-বিলাসিতার অনুসরণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছদ ধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, নাট্যাভিনয় দর্শনাদি সুখ সম্ভোগ করেন। পুরুষের ন্যায়ও আবার অনেকে বহুবিধ ব্যবসায়াবলম্বিনী হয়েন। কেহ ডাক্তারী, কেহ ব্যারিষ্টারী, কেহ মাষ্টারী ইত্যাদি ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

করেন। অস্মদ্দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়াছে। এইক্ষণে দুই এক জন বঙ্গীয় কামিনী উপরি-উক্ত ইংরাজ রমণীগণের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক ভদ্র ইংরাজমহিলা বাজারে গিয়া বাজার করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশে তাহা আজও চলিত হয় নাই।

ইংরাজ ও বাঙ্গালীর খাদ্যে ও পরিচ্ছদে প্রভেদ আছে। ইংরাজ মাংসাশী ও স্থূলবস্ত্রধারী, বাঙ্গালী শাকান্নভোজী সূক্ষ্ম-বস্ত্রপরিধায়ী। খাদ্যের ও পরিচ্ছদের প্রভেদে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ ঘটে। ইংরাজ স্বাধীনতা-প্রিয়। স্বাধীনতা তাঁহার শরীরের অস্থি ও মজ্জা এবং জীবনের প্রধানতম সুখ। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা নাই, কি করিবেন, পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইংরাজের দেশহিতৈষিতা আছে। তিনি জাতীয় উন্নতির পক্ষপাতী। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। বাঙ্গালীর দেশহিতৈষিতার অনেক সময় সরলতার অভাব দৃষ্ট হয়। ইংরাজের ঐক্য আছে। ইংরাজ যে কাজ করেন, তাহা দশজনে মিলিয়া করেন। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালীও দশ জনের পরামর্শসম্ভূত। তাঁহার রাজ্য দশ জনের রাজ্য। বাঙ্গালীর ঐক্য কথার কথা। বাঙ্গালী সে বিষয়ে চির-কাল বঞ্চিত। বাঙ্গালীর জাতীয় সহানু-ভূতি কম। তিনি পরদ্বেষী ও পর-শ্রীকাতর। তিনি পর, এমন কি, আত্মীয় স্বজনেরও ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর। এই গুণেতে তিনি আবার আপনার বিদ্যাবত্তার ও বুদ্ধিমত্তার গৌরব করিয়া থাকেন।

ইংরাজের বিবাহকার্য্য দিনমানে গির্জায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর বিবাহকার্য্য রাত্রিকালে কন্যাগৃহে হইয়া থাকে। ইংরাজের পরিণয় সামাজিক চুক্তি (civil contract) বলিলেও হয়, বাঙ্গালীর বিবাহ একটী ধর্ম্মমূলক বিধি (Religious Institution)। ইংরাজের বিবাহসূত্র ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর পরিণয়শৃঙ্খল, ইহ জগতের কথা দূরে থাকুক, পর জগতেও বিচ্ছিন্ন বা ভগ্ন হয় না। বাঙ্গালীর বিবাহ অল্প বয়সে হয়, কিন্তু ইংরাজের বিবাহ পরিণত বয়স না হইলে ঘটে না। ইংরাজ একান্নভুক্ত পরিবারপ্রণালী ভালবাসেন না। বাঙ্গালী একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা-প্রিয়। তিনি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী আদি দশজন আত্মীয় স্বজনের সহিত বাস করিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

বিপৎকালে অতি সামান্য উপকার প্রাপ্ত হইলেও ইরাজ তাহা বিস্মৃত হন না। তিনি সুযোগ পাইলেই, উপকারীর উপকার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী অনেক সময়ে অকৃতজ্ঞ। তিনি উপকারীর উপকার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া কখন কখন তাঁহার অনিষ্ট সাধনের ত্রুটি করেন না।

ইংরাজ নিয়ম ও সুশৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী।

নিয়মই ইংরাজের উন্নতির সোপান এবং নিয়মবলেই ইংরাজ সর্ব্বত্র জয়ী। বাঙ্গালীর অধিকাংশ কার্য্য অনিয়মিত এবং বিশৃঙ্খল। এই নিয়মাভাবেই বাঙ্গালী অনেক স্থলে অকৃতকার্য্য ও নিষ্ফল। শ্রীভু।

নারীর বিশ্ব-হিতৈষিতা।

যেখানে নারীর পূজা হয়, সেখানে দেবতারা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রের উক্তি। নারী কিরূপ সমাদরের পাত্রী, তাহা এই উক্তিতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই নারী লোকসমাজের এইরূপ বরণীয়া ছিলেন এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমাজের পরিচালকগণ নারীর সম্মান অব্যাহত রাখিবার জন্য বিবিধ উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সুচ্ছায় বৃক্ষ ও সুশীতল জল যেমন পথশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত পান্থের শান্তি বিধান করে, সংসারক্ষেত্রের রোগ শোক পরিতাপের মধ্যে নারীর কোমলতাও সেইরূপ লোকের কাতর হৃদয় অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। নারীর এই অসামান্য কোমলতার নিদর্শন সকল দেশেই পাওয়া যায়। যে দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, পুরুষের ন্যায় নারীগণও যে দেশে অসঙ্কুচিতভাবে সকল স্থানে গমনাগমন করেন এবং সকলের সহিত আলাপ পরিচয়ে ব্যাপৃত থাকেন, সেই দেশের নারীজাতির কোমলতার ও করুণার একটী বিশ্বব্যাপী মহানুভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে লোকে নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়, সেইখানে এই কোমলহৃদয়া করুণাময়ী কুলমহিলারা নিপীড়িতদিগের শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হয়েন। ইউরোপের মহাসমরসমূহের বিবরণে আমরা নারীর এই সার্ব্বজনিক সদয় ভাবের পরিচয় পাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে একটী বিশ্বহিতৈষিণী নারী আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় কিরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই।

এখন ভারতের স্থানে স্থানে মহামারীর আবির্ভাব হইতেছে;—বোম্বাই, পুনা, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এই মহামারীতে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইতেছে। রোগাতুরদিগের শুশ্রূষার জন্য ইংলণ্ডের মহিলারা দলে দলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ইহাঁরা সংক্রামক ব্যাধির বিভীষিকায় দৃক্‌পাত করেন নাই, বিদেশের জলবায়ুর বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই, পথের দূরত্বে বিচলিত হয়েন নাই এবং বিশাল সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক অপরিজ্ঞাত স্থানে

অপরিচিতদিগের মধ্যেও অবস্থিতি করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন নাই। ইহাঁরা যাহাদের ভাষা বুঝিতে পারেন না, যাহাদের আচার ব্যবহার জানেন না, তাহাদের শুশ্রূষার জন্য স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া বহু দূরদেশে সমাগত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য, ইহা অপেক্ষা লোক-হিতৈষিতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ইহা অপেক্ষা বিশ্বজনীন স্নেহের ও দয়ার উদার ভাব আর নাই। ইহাঁদের কেহ কেহ মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এই অপার্থিব হিতৈষিতার অপরিসীম স্নিগ্ধভাব অন্তর্হিত হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাজের স্বাধীন কুল-মহিলারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরিচালিত হইলে, এইরূপে সর্ব্বজনীন মঙ্গল হয়। আমাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, ভবিষ্যদর্শী শাস্ত্রকারগণ সমাজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নারীগণকে অপরের অধীন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন অধীনতায় তাঁহাদের হিতৈষিতার গতি সঙ্কুচিত হইয়াছে। অন্তঃপুর যাঁহাদের বিচরণস্থান, পরিচিত আত্মীয় স্বজন মাত্র যাঁহাদের দর্শনীয় বিষয়, সর্ব্বদা স্বতন্ত্রতা হইতে নিবৃত্ত থাকা যাঁহাদের চিরাভ্যস্ত ও চিরন্তন ধর্ম্ম, তাঁহারা সকলের শুশ্রূষা করিতে পারেন না। কিন্তু স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের অভাবে অস্মদ্দেশের নারীজাতির হিতৈষিতার গৌরব অন্তর্হিত হয় নাই। আমাদের পুরস্ত্রীগণ প্রতিবেশি-বর্গের প্রতি কিরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কাহারও বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলে ইহাঁদের মুহূর্ত্তমাত্র অবসর থাকিত না। ইহাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। রন্ধনে, পরিবেশনে, আবশ্যকমত দ্রব্যাদির সংগ্রহে ইহাঁদের কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইত। পূর্ব্বে প্রতিপল্লীর প্রতিগৃহেই এইরূপ অমৃতময়ী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব দেখা যাইত। এখনও এই রমণীয় দৃশ্যের একবারে বিলোপ হয় নাই। পল্লীগ্রামের ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে এখনও এইরূপ অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শোকাতুরে সান্ত্বনা, রোগগ্রস্তদিগের শুশ্রূষা প্রভৃতিতে ইহাঁরা অপরিসীম প্রীতি ও দয়ার নিদর্শন দেখাইতেন।

আমাদের দেশের পুর-মহিলাতে সর্ব্বজনীন প্রীতি ও দয়া আর একরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অর্থ দান করিলে সকল জাতির লোকেই উপকৃত হইয়া থাকে। যে কোনরূপ বিপদই হউক না কেন, অর্থ সংগৃহীত না হইলে কিছুতেই উহার প্রতীকার হয় না। লোকের কর্ম্মতৎপরতার সহিত অর্থের সংযোগ থাকা আবশ্যক, নচেৎ সংসারের বিঘ্ন বিপত্তির নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এ বিষয়ে যাঁহাদের দয়া কেবল পরদেশে

নিবন্ধ থাকে না; স্বদেশ ও স্বজাতির ন্যায় পরদেশ ও পরজাতির কষ্ট ভাবিয়াও যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থদান করেন, তাঁহাদের লোক-হিতৈষিতার সীমা নাই। আমাদের দেশের মহারাণী শরৎ সুন্দরী এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর চরিতে এইরূপ বিশ্ব-হিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীর-

সংখ্যাবাচক পদার্থ।

(৪০৪ সংখ্যা—১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

চারি-যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি); বেদ (সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব); বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র); দিক্ (দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম); পাদ (ধর্ম্মের ৪ পাদ সত্যযুগে—সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া; ত্রেতায়—সত্য, দান ও দয়া; দ্বাপরে—দয়া ও দান; কলিতে—দান); চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ); আশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বান-প্রস্থ ও ভিক্ষু); চতুরস্র (চারিকোণা ক্ষেত্র ও বেদী); চতুর্মাস্য (পুনর্যাত্রা হইতে রাস পর্য্যন্ত চারি মাস); চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক); চতুঃশাল (চকমিলান বাড়ী); চতুরম্ল (অম্লবেতস, জম্বীর, বৃক্ষাম্ল ও কাগজী লেবু); চতুর্দন্ত (ঐরাবত); চতুর্দ্দোল, চতুষ্পদী (চৌপদী ছন্দ); চতুষ্পাঠী (চতুর্ব্বেদ পাঠস্থান); চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদজ্ঞ—চৌবে); চতুর্ব্যূহ (ভগবানের চারি প্রকার মূর্ত্তি); চতুষ্পথ (চৌমাথা পথ অথবা চতুরাশ্রম-পালনকারী ব্রাহ্মণ); চতুরানন (ব্রহ্মা), চতুর্মুখ (ব্রহ্মা এবং এক প্রকার ঔষধ)। রাজনীতি (সাম, ভেদ, দান ও সন্ধি)।

পাঁচ—পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম); পঞ্চযজ্ঞ (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ); পঞ্চ কর্ম্ম [ন্যায়মতে (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমন। বৈদ্যক মতে—বমন, রেচন, নস্য, নিরূহ, ও অনুবাসন]; পঞ্চকষায় (জম্বু, শাল্মলী, বাস্তাল, বকুল ও কুল); পঞ্চ কৃত্য (সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, বিধান ও অনুগ্রহ); পঞ্চকোল (পঞ্চমূল পাঁচন—পিপ্পলী, পিপ্পলামূল, চব্য, চিত্রক ও নাগর); পঞ্চকোষ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়); পঞ্চ-ক্ষার (কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বীট, সৌব-র্চ্চল); পঞ্চগব্য (দধি, ক্ষীর, ঘৃত, গো-মূত্র ও গোময়); পঞ্চতত্ত্ব (পঞ্চভূত), পঞ্চমকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন); পঞ্চতপা (গ্রীষ্মে চারি দিকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠের চারিটী অগ্নিকুণ্ড করিয়া মধ্যে সূর্য্যবিম্ব রাখিয়া তপস্যা); পঞ্চ-

তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ; পঞ্চতিক্ত (নিম্ব, অমৃত, বৃষ, পটল ও নিসিন্দা) ; পঞ্চদশী (প্রতিপদাদি পঞ্চ দশ তিথির পূরণী—পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ; অথবা ১৫ প্রকরণ সহিত শ্রীভারতী তীর্থ-বিদ্যারাধ্যকৃত বেদান্তগ্রন্থ); পঞ্চনখ (শশক, শল্লক, গোধা, খড়্গী ও কূর্ম্ম) ; পঞ্চনদ (শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পঞ্চ নদী সমন্বিত পঞ্জাব প্রদেশ) ; পঞ্চপ্রদীপ (আরতির জন্য পাঁচমুখ প্রদীপ) ; পঞ্চপিত্ত (বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ুরের পিত্ত) ; পঞ্চবন্ধ, পঞ্চরত্ন (কনক, হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ ও মৌক্তিক) ; পঞ্চরাত্র (পঞ্চবিধ রাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় সহিত গ্রন্থ ; পঞ্চ রাত্র অর্থাৎ জ্ঞান যথা—১ম ও ২য় সাত্ত্বিক জ্ঞান ; ৩য় নৈর্গুণ্য জ্ঞান ; ৪র্থ রাজসিক জ্ঞান ; ৫ম : তামস জ্ঞান) ; পঞ্চ লক্ষণ (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ); পঞ্চবটী (অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী ও অশোক) ; পঞ্চ বল্কল (ন্যগ্রোধ, ডুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বত্থ ও বেতস) ; পঞ্চবাণ (দ্রবণ, তাপন, শোষণ, মোহন ও উন্মাদন) ; পঞ্চ শস্য (ধান্য, মুগ, তিল, যব ও সর্ষপ) ; পঞ্চসূনা (চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ) ; পঞ্চাগ্নি (উদরে গার্হপতি, মধ্যদেশে দক্ষিণ, আস্যে আহবন, এবং মস্তকে সত্য ও পর্চ্চা) ; পঞ্চস্বরোদয় (পঞ্চ স্বরের উদয় অর্থাৎ প্রকাশ সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্র ; পঞ্চ স্বর যথা ;—(১) রাজা ; (২) মাজা ; (৩) উদাসা ; (৪) পীড়া ; (৫) মৃত্যু ; পঞ্চাঙ্গ (বাহু, জানু, মস্তক, বক্ষ, ও চক্ষু ; বৃক্ষের—ত্বক্, পত্র পুষ্প, মূল ও ফল)।

পঞ্চামর (দুর্ব্বা, বিজয়া, বিল্বপত্র, অমরা লতা ও কাল তুলসী)।

পঞ্চামৃত (সশর্কর দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও মধু, 'পঞ্চম'মাসে গর্ভিণীর ভক্ষ্য)।

পঞ্চোপচার (ধুপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্য।

পঞ্চ পিতা (জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, রাজা ও গুরু)।

পঞ্চশিখ (ধর্ম্মের হিংসা ভার্য্যা হইতে পঞ্চ পুত্র—সনৎকুমার, সনাতন, সনক, সনন্দন ও কপিল। পঞ্চাম্র (১ অশ্বত্থ, ১ পিতৃমর্দ্দ, ২ চম্পক, ৫ কেশর, ৭ তাল ও ৯ নারিকেল রোপণ করিলে আর নরক গমন করিতে হয় না)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ; কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পদ, মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার।

পঞ্চপাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

পঞ্চকন্যা—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী।

(ক্রমশঃ)।

প্রেমের গৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গের নাম বঙ্গদেশে কাহারও অপরিচিত নহে। সেই প্রেমের দেবতার কাহিনী অনেক ভক্ত অনেক প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, তবুও তাঁহার চরিত্র নিত্যই নূতন, তাই আমরা এই প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের গোটাকত কাহিনী পাঠিকা ভগ্নীদিগকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নবদ্বীপধামে ১৪০৭ শকে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচী দেবীর গর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময় নবদ্বীপ গৌড়ের রাজধানী ছিল। সেই রাজধানী খানি পাণ্ডিত্যের অসীম প্রতিভায় ঝক্ মক্ করিতেছিল। নবদ্বীপের ন্যায় আর কোথাও নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল না। তখন পাণ্ডিত্যলাভই জীবের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল, তাই নানা দেশ হইতে পাণ্ডিত্য-লাভাশায় দলে দলে লোক সকল আসিয়া নবদ্বীপ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঘাটে পথে মাঠে কেবল ন্যায় আলোচনা—আবাল বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখেই ন্যায়ের কথা। যখন দেশের এই অবস্থা, ঠিক্ সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দুস্তর ভবসাগর পার হইতে পারা যায় না, সেই দুস্তর জলধি পার হইতে হইলে প্রেমের তরী আরোহণ করিয়া শ্রীনাম(হরিনাম) রূপ হাইল বাহিয়া যাইতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে তাহাই বুঝাইতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যয়ন শেষ করিয়া অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্যপ্রভায় সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সকল ছাত্রই সেই নবীন পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নের জন্য লালায়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ এই সময় একবার গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটে। কেবল নয়নধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল! "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া তিনি কেবল ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অবস্থাকে সাধারণে বায়ুব্যাধি বলিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; ভক্তগণ "কৃষ্ণপ্রেম" বলিয়া আনন্দে গদগদ হইতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা বহু দিন হইতে নিমাইয়ের মত একটি কৃষ্ণভক্ত খুঁজিতেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপনার্থ নিয়মিতরূপ টোলে গমন করেন সত্য, কিন্তু ছাত্রগণকে পাঠ দিতে পারেন না—অজস্র নয়নধারায় পুঁথি সিক্ত হইয়া যায়—অক্ষর নয়নগোচর হয় না। আবার বহু কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া যদি সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যান, তবে তাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ নামেরই ব্যাখ্যা হইয়া পড়ে। যথা,

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্রবৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ছাত্রগণ সে ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পণ্ডিতের অবস্থা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিবেদন করিলেন। ছাত্রগণকে যথোচিত পাঠ দিবার জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরোধ করিলেন। প্রভু পূর্ব্বে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করেন। তিনি গুরুর আদেশে পুনরায় নবোদ্যমে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমার্ণবে ডুবিয়াছে, তিনি সমগ্র জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। সেই শ্যামসুন্দরের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত,—পাঠ দিবে কে? আবার সেই নয়নধারা আসিয়া তাঁহার নবোদ্যমে আঘাত দিল। অগত্যা তিনি শিষ্যগণকে পুস্তকে ডোর দিতে বলিয়া ও অন্য স্থলে তাঁহাদিগকে অধ্যয়নের আদেশ করিয়া অধ্যাপকতায় ক্ষান্ত হইলেন।

এই তাঁহার অপরিমেয় প্রেমের প্রথম প্রকাশ মাত্র।

প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণবিরহে যেমন আকুল হইয়া রোদন করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ ভাবে বিভোর হইলেন। তিনি আপনাকে শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যাহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেন, শ্রীমতী তাঁহার পায়ে ধরিতেন "যে কহে কৃষ্ণের নাম ধরে তার পায়।" শ্রীগৌরাঙ্গও সেই আচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনও এইরূপ ভাবে পূর্ণ। তিনিও চটকপর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন ভাবিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পর্ব্বত বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেন। শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে যখন অজ্ঞান, তখন।

"তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে,
তবে সে বুঝিনু সোয়াগ আছে।"

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্যও সে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এক সময় তিনি প্রেমাবেশে অচেতন হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহার জীবন পরীক্ষার্থে—

"সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হইল॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

ফলকথা—বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেই শ্রীমতীর ও শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সমতুল্য বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি আপনি উপদেষ্টা, আপনিই উপদিষ্ট। তাঁহার জীবনে একাধারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাই ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে একাধারে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করেন।

প্রভু শ্রীরাধা-ভাবে বিভোর হইয়া কখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিতেছেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় আকুলনেত্রে আশাপথ চাহিয়া আছেন। কখনও বা কুঞ্জ সাজাইতেছেন, আবার

কখনও বা তাঁহার মথুরা গমন স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ অন্তরঙ্গ,—বিশেষতঃ এই সময় হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কাছছাড়া হইতেন না। অতি সতর্কতার সহিত তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু বড়ই ব্যাকুল হইয়া "কৃষ্ণ কোথা" বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। সে ক্রন্দন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না দেখিয়া গদাধর বলিলেন, তিনি; তোমার হৃদয়মন্দিরেই বিরাজ করিতেছেন। ইহা শ্রবণে প্রভু স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য উন্মুখ হইলেন। যথা—

"হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥"

চৈঃ ভাঃ।

এইরূপ ভাবে প্রভু সর্ব্বদাই বিভোর! প্রভু এখন দীন হইতে দীন, গঙ্গাস্নানার্থে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন গমন করেন, প্রভু তাঁহাদিগের সাজি ধুতি বহিয়া লইয়া যান, আর ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক বলেন "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কৃষ্ণে মতি হয়।" প্রভুর সেই প্রেমার্ত্তি—সেই দীনতা দর্শনে সকলে বিস্মিতচিত্তে বিমুগ্ধ-প্রাণে অশ্রু বর্ষণ করিত। দীনতা ব্যতীত মুখের চাটুকারিতায় যে ভক্তিরত্ন লাভ হয় না, প্রভুর আচরণেই তাহা বুঝা যায়।

এই সময় শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন। এখনও আমরা যে কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তনের অমৃতময় স্বাদ আস্বাদ করিতে পারি, সে প্রভুরই সৃষ্টি। প্রভু জীবশিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, তাই জীবকে শিখাইলেন—প্রেমসাধন দ্বারা ভগবান্‌কে বশ করিতে হয়। এতাবৎ এই আনন্দ-রসে নিজেই ডুবিয়া আছেন, জীবের উদ্ধারের উপায় হইল না। তিনি নিজে সুখে ডুবিয়া থাকিতে আসেন নাই—জীব উদ্ধার করিতে—জীবকে শ্রীভগবানের অমৃতময় প্রেমাস্বাদন করাইতেই তাঁহার আগমন। সুতরাং তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। গৃহে বসিয়া থাকিলে সে কার্য্যোদ্ধার হইবে না, পাপীর দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া হরিনাম বিতরণ করিতে হইবে, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করেন। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কেশব ভারতীর নিকট উপবিষ্ট, সে সময় কণ্টক (কাটোয়া) নগরে এক অপূর্ব্ব ভাবস্রোত বহিয়া গিয়াছিল। তাহা এই যে, কেহই প্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দিবে না, আবাল-বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই কাঁদিয়া আকুল। কেহ অনুরোধ করিতেছেন—প্রভো! এ নবীন বয়সে তুমি সন্ন্যাস লইও না, কেহ বা কেশব ভারতীকে অনুরোধ করিতে-ছেন, এ নবীন পুরুষটীকে সন্ন্যাসী সাজাইও না। এই যে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শনে তাহারা আত্মহারা হইয়া নয়নজল ঢালিতেছে, এই তাহাদের উদ্ধারের সোপান। সকলে

কাঁদুক, অনুরোধ করুক, যাহা ভগবৎ-ইচ্ছা তাহা কে রোধ করিবে? প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, কোনও বাধা টিকিল না। সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন। মন্দিরে প্রবেশ মাত্র শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। যথা—

"জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥"
চৈঃ চঃ।

সেই সময় নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া নিজ-গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে প্রভুর জীবনের আশা হইল। জ্ঞানী সার্ব্বভৌম বুঝিলেন ইহা মূর্চ্ছা নহে, কৃষ্ণ-প্রেমের বিকার। এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমের চিত্ত তাঁহার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে প্রভুর পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু শেষে তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়া পড়িলেন, তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিলেন। প্রভুর দর্শনে জ্ঞানীর জ্ঞান—পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ভাসিয়া গিয়াছিল, তাঁহার ভক্তিস্রোতের সম্মুখে কাহারও যুক্তি তর্ক টিকিতে পারে নাই।

নীলাচলে কিছু দিন থাকিয়া প্রভু তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে সমস্ত দেশ গ্রাম হরিনামে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। যে একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিল, সেই কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইল, আবার সেই ব্যক্তি প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে ভক্ত করিয়া তুলিল! এইরূপে সমস্ত দেশ গ্রামের লোক বৈষ্ণব হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা—

প্রভাতী।

(৪০৫-৬ সংখ্যা—২১৯ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি শেষ করিয়া সুস্থশরীরে কুটীরের দ্বারদেশে কুসুমিত তরুতলে উপবেশন করিয়া অমিল কহিল "দেখ প্রভাতি! আমাদের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তখন আমরা বালক বালিকা ছিলাম, আর এখন যুবক যুবতী বলিয়া গণ্য হইয়াছি। আর দেখ সংসারের কত পরিবর্ত্তন—তোমার আত্মীয় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এখন আর নাই; সেই

রমণীয় কুটীর এখন নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে কুসুমারণ্যের শেষ নাই। কুটীরের চতুর্দ্দিক হইতে কাল কোকিলের "কুউ" "কুউ", আর মদমত্ত ভ্রমরবৃন্দের মধুর গুঞ্জনধ্বনি শ্রুতি-কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। সদ্যোজাত শিশির-জলে সুস্নাতা প্রক্ষালিতপাপা নীরবতপঃ-সমন্বিতা বসন্ত ব্রততী দলের শ্যাম সৌন্দর্য্যে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে।

পূর্ব্বে এ সব কি এত ছিল? কিন্তু প্রভাতি! আমি এখন প্রচুর বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জনেও অবশ্য সক্ষম হইব। এই তরুলতা-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র পর্ণ-গৃহ হইতে তোমাকে ত্রিতল অট্টালিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই আমার জীবন সার্থক হয়। প্রভাতী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া কহিল—"না"।

অনিল। না কেন প্রভাতি! তুমি কি আমার উপকার উপেক্ষা কর? তুমি কি আমাকে ভালবাস না? প্রভাতী কোন কথা কহিল না, অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

অনিল। বল বল প্রভাতি!" তুমি আমাকে ভালবাস কি না? বল বল আমার মাথা খাও, মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। প্রভাতী লজ্জায় ম্রিয়মাণা অথচ হাস্যমুখে বলিল "হাঁ ভালবাসি; কিন্তু ভালবাসি বলিলে সে ভালবাসা প্রকাশ হয় না, সমস্ত পৃথিবী একত্র হইলেও আমার সে ভাল-বাসার তুল্য হইতে পারিবে না।" অনিল সেই প্রফুল্ল কল্প-লতিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাণাহত মৃগের ন্যায় অবশ শরীরে প্রভাতীর অতি নিকটে গিয়া উপবেশন করিল। প্রভাতীর কথায় আজ অনিলের সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল, সে নিতান্ত সানন্দচিত্তে প্রভাতীর সেই সরল সুন্দর ক্ষুদ্র মূর্ত্তিখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

প্রভাতী তাহার সেই ভাব দেখিয়া লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল—কোন কথা কহিল না; কেবল হাসিতে লাগিল—সে হাসি দেখিয়া অনিলও হাসিল। হাসিয়া কহিল "প্রভাতি! বেল ফুলের মালা পরিতে ভালবাস? প্রভাতী ঔৎসুক্যের হাসি হাসিয়া কহিল "হুঁ! কই? দিবে—আছে?

অনিল। স্ব-কর-গ্রথিত এক গাছি সুরভি পুষ্পমাল্য আপন কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া প্রভাতীর গলে পরাইয়া দিল।

ঠিক্ সেই সময় একটী মধুর হুলুধ্বনি উপস্থিত হইয়া সমস্ত কাননস্থলী কম্পিত করিয়া তুলিল। চমকিত ভাবে চাহিয়া প্রভাতী দেখিল, অনিল দেখিল—অবিকশিত পলাশ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া—মধুমতী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মধুমতীর অর্থে ও পরিশ্রমে প্রভাতীর সঙ্গে অনিলের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অগ্রে জানা গিয়াছিল যে, মধুমতীর পিতা পীতাম্বর দত্তের সঙ্গে পীতাম্বর বণিকের বিশেষরূপ জানা শুনা

ছিল। যে পীতাম্বরের নৌকা ডুবিয়া জলপথে মারা গিয়াছে, এ অনিল তাহারই বংশধর। তাহাদের আচার নিয়ম কুল-মর্য্যাদা মধুমতীর পিতার বেশ জানা ছিল। অতএব বিবাহের সময় কুলমর্য্যাদা লইয়া বিশেষ কোন গোলযোগ হইতে পারে নাই। সময় সরীসৃপের ন্যায় দ্রুতগামী, সুখের দিন তাহা হইতেও দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। বিবাহের পর অনিল প্রভাতীর সরল প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিন বৎসরকাল পরম সুখে যাপন করিল। ইতিমধ্যে তাহাদের বিভাতী নামে একটী কন্যা ও বালসূর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী সুনীল নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। মধুমতীদের জমীদারীর মধ্যে অনিলের দুই শত টাকা মাহিনায় একটী কাজ হইয়াছিল। ইদানীং তাহাদের টাকা পয়সারও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সেই নির্জ্জন বনভূমি তাহাদের চির অপরিত্যক্ত হইয়াছিল। তবে কিনা সেই স্থানের ঘর দ্বার অনেক উন্নত আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অর্থ তিন ভাগে বিভক্ত হইত, এক ভাগ সুনীল ও বিভাতীর জন্য সঞ্চিত হইত, একভাগ নিজেদের সংসার খরচের জন্য ব্যয় হইত, অবশিষ্ট অংশ দ্বারা দুঃখীদিগের অভাব মোচন হইত। এই ভাবে সুখ সচ্ছন্দে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রভাতী ঘরের বারান্দায় বসিয়া ছেলেটীকে এই বলিয়া সোহাগ করিতেছিল :—

কে দিল এ কুসুমের কমনীয় গাল,
কে দিল এ চাঁদ-ভাঙ্গা অধর ওষ্ঠ লাল,
কে দিল এ মেঘ-ভাঙ্গা ঘন কৃষ্ণ চুল,
কে দিল এ চাঁদ মুখ চারু চাঁপা ফুল,
কে দিল এ আলো-করা চাঁদনীর হাস,
কে দিল এ আধ আধ কোকিলের ভাষ,
কে দিল এ মন্দাকিনী নয়নের কোণে,
কে দিল এ সরলতা বালকের প্রাণে?
চোখে জল মুখে হাসি যে আঁকিল ছবি,
সেই বিশ্ব মহাকাব্য-রচয়িতা কবি,
তাঁহারি চরণে করি সভক্তি প্রণাম,
দিবানিশি করি আমি তাঁর গুণ গান।

সে সময় পাতার তল দিয়া দিয়া একটু একটু সোণার চাঁদ দেখা যাইতেছিল, মলয়-হিল্লোলে গাছের পাতা একটু একটু হেলিতে দুলিতেছিল, বিকশিত বকুল ফুল একটী একটী করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, অবিকশিত সেফালিকা ফুল ফুটিয়া উঠিতে-ছিল, সুগন্ধযুক্ত বসন্ত-বল্লরী প্ররোহরাশি প্রসব করিয়া নাচিতেছিল। মায়ের কোলে সুনীল ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতী দোলার উপর ছেলেটীকে শোয়াইয়া মেয়েটীকে বলিল "খুকী! তুই ঝি দিদির কাছে থাক্, মধুমতীর সঙ্গে আমার আজ সারাদিন দেখা হয় নাই; সে একবারও এ দিকে আসে নাই; আমি যে ছেলে পিলে লইয়া যাইতে অবসর পাই না তাহাতো সে কিছু বুঝে না, তাহাতে আবার ইদানী কি হইয়াছে সর্ব্বদাই কি এক রকম—বোদ্ বোদ্ পোত্ পোত্ করে গাল ফুলাইয়া থাকে, মাঝে মাঝে

প্রথার ... দেখি, বোধ হয় কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া মিশে না, তাহার যে কি রোগ ধরিয়াছে, বুঝি না। আজ তাহার রোগের ভাল ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবেই হইবে। অনিলের ঐ এক রকম গালফুলা রো[illegible] ধরিয়াছে। আজ আমি চল্‌লাম। প্রভাতী গিয়া দেখিল, আপন শয়নকক্ষে গিয়া মধুমতী বদ্ধ-বাতায়নপাশে উপবেশন করিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে মৃদু মৃদু স্বরে গান করিতেছিল,

"এস হে বঁধুয়া কহ কি লাগিয়া
আসিতে বিলম্ব হেন ?
হিমানী-ঋতুর চাঁদিমার পারা—
মু'খানি মলিন কেন ?
কি বিষাদে আজ বিষাদিত হেন
বল বল চিতহারী !
এখনি তাহায় ভাসাইব দূরে
বরষি প্রেমের বারি।"

প্রভাতী দেখিল মধুমতী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কণ্ঠ কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া গাইতে লাগিল—

"দেগো সাজাইয়া সাধের বাসর—
দেগো সাজাইয়া সই,
উজলি ভুবন, হৃদয়-রতন,
দেখ্‌লো আসিছে অই !
আঁচল ভরিয়ে আন্‌লো স্বজনি !
যতেক সুরভি ফুল,
বিনায়ে কবরী দেলো সাজাইয়া
অলকে কুসুমদুল।"

মধুমতী ক্ষণকালের মধ্যে গীত সমাপ্ত করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল ও মৃদু মৃদু কহিতে লাগিল।

* * * * *

"কে সে সই ভাগ্যবতী
শ্যামেরে পেয়েছে পতি
সই কলঙ্কের ভয়—পোড়া লোক-গঞ্জনার

* * * *

দেবের দুর্লভ মণি
যে পেয়েছে সে কি ধনী,
শ্যামের জীবনী বাড়ে সিঁথীর সিন্দুরে যার।"

তাহাকে এই ভাবে দেখিবামাত্র প্রভাতীর সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। আপন অজ্ঞাতসারে অপাঙ্গদেশে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। প্রাণটা যেন আপনা আপনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে অমনি ত্রাসিত হইয়া ডাকিল, "মধুমতি, মধুমতি !" মধুমতী কি একটা জিনিশ লুকাইয়া প্রভাতীর নিকট আসিয়া বসিল। প্রভাতী তাহার মলিন মুখ, সাশ্রুনয়ন যখনি দেখিল, তখনি কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "মধুমতি ! সখি ! হৃদয়ের বন্ধু ! তোমার কি হইয়াছে ? আমার নিকট খুলিয়া বল, আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমি জানি তোমার এমন কোন কথা নাই যে, আমার নিকট প্রকাশ করিতে না পার ; বল বল, মনের কথা খুলিয়া বল, আমার প্রাণ দিয়াও যদি তোমার কষ্টের লাঘব করিতে পারি, তাহা করিব।" মধুমতী কোন উত্তর দিল "না"—প্রভাতীর কোলে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মধুমতীর

একরাশ চুল প্রভাতীর কোলের উপর এলো থেলো হইয়া লুটিতেছিল। প্রভাতী মধুমতীর চুল সরাইতে সরাইতে মুখ মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "বল্ তোর্ এ দুঃখ কিসের?" মধুমতী কথা কহিল না, প্রভাতীর সরল সুন্দর মুখখানির দিকে যতই চাহিতে লাগিল, ততই তাহার দুঃখ বাড়িতে লাগিল। প্রভাতী কহিল "আমি তো ভাবিয়াই পাই না, তুমি আমার নিকট কি গোপন কর। এই মধুমতি! সুখের সমুদ্রের ঢেউ তোমার এ দুঃখ কিসের?" তবুও মধুমতী কথা কহিল না। প্রভাতী কহিল, "বল বল, আর নীরব হইয়া রহিও না।" মধুমতী প্রভাতীর কোলে মুখ লুকাইয়া মৃদুকম্পিতাধরে কহিল "আজ থাক, কাল কহিব।"

(ক্রমশঃ)।

নারীসুহৃদ্।

(১)

বর্ত্তমান শতাব্দী শেষ হইয়া আসিল। আর একটী বৎসর মাত্র বাকী আছে। এ বৎসরও দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীর মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিব তাঁহাদের দ্বারা নারীসমাজের কি কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ভারতীয় মহিলাকুলের সুহৃদ্রূপে যে সকল মহাপুরুষ বিগত শত বর্ষের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ভারতীয় নারীসমাজ রামমোহনের নিকট যে শতবিধ উপকার ঋণজালে চিরবদ্ধ, তন্মধ্যে প্রধানতম অনুষ্ঠান ঐ মহাত্মার সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা। শিক্ষার বহুবিস্তৃতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহরূপ ভীষণ ব্যাপার কল্পনার অন্তরালে লুক্কায়িত। পিতামহী দেবীর উপকথায় পরিণত হইলেও এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা ৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। সতীদাহ যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, এমন লোক এখনও জীবিত আছেন। জীবিত অশীতিপর বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায় যে, সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় সহমরণ হইতে হইতে শেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার সহমরণ এক প্রকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। মৃত পতির জ্বলন্ত চিতা আরোহণ করিতে না পারা দুরপনেয় কলঙ্কের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে বলপূর্ব্বক বিধবার দেহযন্ত্রের অবসান করাও ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। এইরূপ সহমরণ-প্রথা যে বর্ব্বরতা—নিতান্ত নৃশংস কার্য্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিকই সহমরণ-

প্রথার চরম ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন কিশোরবয়স্ক বালক, তখন তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে এইরূপ একটী লোমহর্ষণ ঘটনা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার হৃদয় এতই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি সেই মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবন পণ করিয়া এ কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিবেন।

বিধাতা কোন্ সূত্রে কাহার দ্বারা কি কার্য্যের সূত্রপাত করেন, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। স্পর্শমণির স্পর্শলাভে লৌহ স্বর্ণ হয়। মানুষ তাহা দেখিয়া বস্তুর গুণ-বৈচিত্র স্মরণ করিয়া অবাক্ হয়। কিন্তু দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মানবশিশু. বিধাতার স্পর্শলাভে কি আশ্চর্য্য দেব-শক্তি লাভ করে, তাহা মানুষ একটীবার তলাইয়া ভাবে না! বিপুল সমাজশক্তি শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ ও স্বার্থান্ধব্যাখ্যার বলে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছে, যাহার ভয়ে মহাবল ও পরাক্রমশালী ইংরাজ-রাজও সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়াও তন্নিবারণে সাহসী হইতেছেন না, এমন সময়—এমন দুর্দ্দিনে পুণ্যাত্মা পুরুষপ্রবর রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রবল যুক্তিবলে সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ প্রবল-পক্ষ ক্রমে হতবল ও অস্ত্রহীন হইয়া পড়িলেন। ভারত-ললনার পরম সুহৃৎ প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহাশয় রামমোহন রায়ের দর্শনপ্রার্থী হইয়া লোক প্রেরণ করিলেন। গবর্ণর জেনারেলের আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া রাজা কলিকাতার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। সেই পরিচয় ও সাক্ষাতের ফলে জীবন্ত নারীদেহ জলন্ত চিতানলে নিক্ষিপ্ত হওয়া নিবারিত হইল। সতীদাহের পক্ষীয় লোকেরা তাহাদের অনুষ্ঠিত পুণ্য কার্য্যের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিলও করিয়াছিলেন! নারীসুহৃৎ রামমোহনের বিশাল হৃদয়ে দুর্ভাবনার যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহারই তাড়নায় তিনি "সাত সমুদ্র তের নদী" পারে স্বাধীন জাতির স্বাধীন হৃদয়ে কর্ত্তব্যের জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অসংখ্য লোকের নিষেধ, আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন ও বাধা উপেক্ষা করিয়া নারী-সুহৃৎ রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করিয়া-ছিলেন। যে দিন তাঁহারি সম্মুখে প্রিভি কাউন্সেলের বিচারে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুকুম অক্ষুণ্ণ রহিল, সেই দিন সে বিরাট পুরুষের হৃদয়কন্দর হইতে আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হই-য়াছিল। আজ ৬৫ বৎসর পরে কে তাহার প্রবলতা অনুভব করিতে সক্ষম হইবে? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রহৃদয় লঘুচেতা লোকের সাধ্য কি যে তাহার এক কণার কণাও সুন্দররূপে অনুভব করি?

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ

১। গত ১৭ই জানুয়ারী ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে ছোট লাট বাহাদুর সস্ত্রীক শুভাগমন করিয়া একটী অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। লেডী উডবরণ স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা ও কাশিমবাজারের মহারাজা মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—৫০০ টাকা ও একটী স্বর্ণ মেডাল দানে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২। কুমারী ম্যানিং গত ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া প্রায় দুই সপ্তাহ কাল বালিকা-বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। আশা করি, তাঁহার প্রথম বারের ন্যায় এই দ্বিতীয় বারের আগমনও দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির কারণ হইবে।

৩। নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের কার্য্য অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি বাবু আনন্দ মোহন বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, সকল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোকেই শত মুখে তাহার প্রশংসা করিতেছেন।

৪। দ্বারবঙ্গের নূতন রাজা রামেশ্বর সিংহ "মহারাজা" উপাধি পাইয়াছেন এবং ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

৫। স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গ মহারাজের শূন্যপদে নসীপুরের রাজা রণজিৎ সিং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

৬। স্পেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্বীপবাসীরা বিদ্রোহী। মার্কিণ-সেনাপতি ইতিমধ্যে মেনিলা ও আরও কোন কোন নগর হস্তগত করিয়াছেন। অচিরে বিদ্রোহ দমন হইবার আশা করা যায়।

৭। বড়লাট 'আরব' নামক যে জাহাজে চড়িয়া আসেন, বড় দিনের দিন তত্রত্য বালক বালিকাদিগকে প্রচুর ভোজ দিয়া সুন্দর সুন্দর উপহার দান করিয়াছেন।

৮। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছাত্র গণিতে সর্ব্বপ্রথম হইবে, কীর্ত্তিচাঁদ মেকেঞ্জি পদক নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক তাহাকে প্রদত্ত হইবে। ইহার জন্য নসীপুরের রাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২০০০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৯। এ বৎসর বি, এল, পরীক্ষায় ১১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তন্মধ্যে একজন মাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১০। আগামী ১০ই মার্চ্চ লাহোরে কুক্কুর-প্রদর্শনী হইবে।

১১। তাড়াশের জমিদার রায় বনমালী রায় বাহাদুর পাবনায় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দশ সহস্র টাকা দেন। সম্প্রতি তথায় বালকদিগের বোর্ডিং গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাত হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রীতি ও পূজা—শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত। ইহাতে নানা-বিষয়িণী ৮০টীর অধিক কবিতা আছে। কবিতাগুলি কবি-হৃদয়ের প্রস্ফুটিত ভাবের এক একটী সুন্দর ছবি। ইহার অনেকগুলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই কবির হৃদয়ের সরলতা, পবিত্রতা, দীনের প্রতি সমবেদনা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যানুরাগ ও ইষ্টনিষ্ঠায় প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার সকল ভাবের মূলে তাঁহার ঐকান্তিক নিগূঢ় পতিপ্রেম দেখিতে পাইবেন। এরূপ পুস্তকপাঠে নারীগণ বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

২। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র লাহিড়ী বি, এল প্রণীত, মূল্য ১॥০ টাকা। বর্ত্তমান যুগের অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ান একজন অসাধারণ প্রতিভান্বিত পুরুষসিংহ। ইনি কেবল শৌর্য্যে ও বীর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন না, রাজনীতি, সমাজতত্ব, দেশহিতৈষিতা, বিদ্যানুরাগ, আশ্রিতবাৎসল্য, ও মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি অশেষগুণে ভূষিত হইয়া মহত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। পণ্ডিতবর এবট্ ইহাঁর যে জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই ইহাঁর প্রকৃত গুণমর্য্যাদা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্কিমবাবু ঐ জীবনী অবলম্বনে বর্ত্তমান জীবন-চরিত লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে অলংকৃত করিয়াছেন। তাঁহার লেখা সরল ও সরস হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় শেষ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বাসনা হয়। পাঠিকাগণ এতৎপাঠে আমোদিত, বিস্ময়াভিভূত ও উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

৩। মানস-কুসুম—শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সি, ই, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক ২৮টী কবিতা আছে। লেখক যে একজন ভাবুক, সুহৃদয়, ও সুনীতির পক্ষপাতী লোক, তাহা তাঁহার কবিতাপাঠে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। পুস্তকখানি সুপাঠ্য। বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে ইহা অর্দ্ধ মূল্যে প্রদত্ত হইবে, ইহাতে আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। যাঁহারা এই পুস্তক পাইতে ইচ্ছা করেন, কলিকাতা বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট নাম ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারেন।

৪। শিশুবোধ রামায়ণ—শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা মাত্র। আজি কালি শিশুদিগের উপযোগী সরল সংক্ষিপ্ত কয়েক খানি রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক উপকারের

সম্ভাবনা। এ পুস্তকখানিও সেই শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

৫। বনফুল হার—গীতিবাক্য—শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী প্রণীত, মূল্য ।• চারি আনা মাত্র। অনেকগুলি সুভাবপূর্ণ কবিতাকুসুমে এই বনফুল-হার গ্রথিত হইয়াছে। আমরা ইহার সকলগুলি আঘ্রাণ করিয়া সমান তৃপ্তি লাভ করিলাম। লেখিকা কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছেন এবং অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাশ সাধনেও সমর্থ হইয়াছেন। কি ভাষা, কি বাক্যবিন্যাস, কি ভাব, সকলই সুন্দর হইয়াছে। অল্প মূল্যের এরূপ পুস্তক উৎসাহপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ যোগ্য।

৬। হরিদাসী—প্রাপ্ত হইয়াছি, পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

সমুদ্র।

আহা হা! সমুদ্র তুমি মধুর কি এত!
টলমল নীল-কায়,
উছলি উছলি যায়,
নীল তরঙ্গের মালা নীল পরবত। ১

আহা হা সমুদ্র তুমি অনন্ত গভীর,
বিকাশি দশন ফেন,
মহাকাল ফণী যেন,
অনন্ত লহরী রূপে হতেছে বাহির। ২

ওহো হো সমুদ্র তুমি অনন্ত অব্যয়,
নেহারি ও নীল-কায়,
জীবাত্মা স্তম্ভিত প্রায়,
পলকে নীরধি তুমি করিছ প্রলয়। ৩

লবণাক্ত দেহ তব মহা পারাবার,
জলেশ! তোমার জলে
নানাবিধ রত্ন মেলে,
রত্নাকর নাম তাই হয়েছে তোমার। ৪

সমুদ্র! তোমারি গর্ভে ছিল সুধা ধন,
তোমারে মন্থন করি,
সে রতন নিল হরি,
চোরের মতন আসি লোভী দেবগণ। ৫

তোমারই গর্ভেতে সিন্ধু রহে প্রভাকর,
উদয় অচল কোথা,
মিথ্যা বুঝি সে বারতা,
তুমিই প্রসব কর উষায় ভাস্কর। ৬

অযুত-অযুত বর্ষি স্বর্গীয় কুসুম
তোমারি উদর হতে,
উঠে সূর্য্য শূন্যপথে,
সমীর স্বননে ভাঙ্গে প্রকৃতির ঘুম। ৭

তব নীরে সূর্য্য-অস্ত অতি মনোহর!
অংশুভরা অংশুমালী
তব অঙ্গে অংশু ঢালি,
ধীরে ধীরে নীল নীরে প্রবেশে ভাস্কর। ৮

সমুদ্র! সর্ব্বদা আর্দ্র তট-প্রান্ত তব,
দিবানিশি তব নীরে,
হাঙ্গর কুম্ভীর ফিরে,
বালুকায় শোভে কায় ওহে মহার্ণব! ১০

সমুদ্র! জীমূত-মন্দ্রে গর্জ্জ দিবা নিশি,
সর্ব্বদা তোমার স্বর,
অতিশয় ভয়ঙ্কর,
আতঙ্কে সশঙ্ক সদা তব তটবাসী। ১১
মহার্ণব মহাপ্রাণ নর-লোকে কয়;
কখনো পরের ধন,
তুমি না কর গ্রহণ,
তিলটা ফেলিলে জলে কূলে আসি রয়। ১২
সময়ে সময়ে তুমি নানা রূপ ধর,
ঊষায় মধুর রূপ,
যেন প্রকৃতির ভূপ,
প্রভাতে আরেক মূর্ত্তি অতি মনোহর। ১২
সায়াহ্নে ফুলের মালী সদৃশ সাগর,
অনন্ত শরীর হয়,
শুধু রশ্মি পুষ্পময়,
ঊর্ম্মি পরে ঊর্ম্মি যেন পুষ্প-অদ্রি-স্তর। ১৩
মধ্যাহ্নে নীলাম্বু তুমি ধবল-আকার,
ধবল-গিরির সম
মধুর মধুরতম,
অপরাহ্নে সোণা-মাখা দেখিতে বাহার। ১৩
কে রচিল এ বিশাল নীল পারাবার?
কেগো সে মহিমাময়,
যাহা ভাবে তাই হয়,
ধন্য সেই দয়াময়ে করি নমস্কার। ১৫

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

পবিত্র শিশু।

আমার নিকটে কেন পাঠাইলে প্রভু,
উদার পবিত্র এই অকপট শিশু।
শিশুর পালন এতো বিষম কঠিন,
কি করিব আমি ঘোর মূঢ় জ্ঞানহীন।
পাপী আমি দিবা নিশি মত্ত পাপাচারে,
সদ্ভাবে চলিতে পিতা জানি না সংসারে।
আপনাকে চালাইতে জানে না যে জন,
সে কি পারে দেবোপম শিশুর পালন?
নিতান্ত কপট দেখ অন্তর আমার,
কেমনে শিখাই সত্য সন্তানে তোমার?
অপবিত্র ভাব যার বিহরিছে মনে,
পবিত্র শিশুরে সেই শিখায় কেমনে?
পরের অনিষ্টচিন্তা সদা যার চিতে,
উদার শিশুরে সে কি পারে শিখাইতে?
কুটিলতা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা পূর্ণ যার প্রাণ,
কেমনে শিশুরে দিবে নীতি ধর্ম্মজ্ঞান?
তবে কেন এ অধমে দিলে এই ভার,
আমি ত মলিন দীন অযোগ্য ইহার?
মোর কাছে দিয়ে প্রভু এ পবিত্র ধন,
ময়লা করিলে আহা! স্বরগ-রতন!

শ্রীবিনোদিনী সেন।

পারি না।

আজি মোর শূন্য মনপ্রাণ,
কেমনে গাহিব আশার গান?
কেমনে যাইব কাছে?
লাজে ভয়ে কম্পিত হৃদয়,

পরাণ শুধুই বাসনাময়
কেমনে যাইব কাছে ?
তুচ্ছ স্বার্থে নিমগন হ'য়ে
রয়েছি কেবলি আঁধার লয়ে
কেমনে যাইব কাছে ?
সংকল্প ত পারি না রাখিতে,
অন্ধকার হেরি চারি ভিতে,
কেমনে যাইব কাছে ?
তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য যাহা,
করিতে পারি না আমি তাহা,
কেমনে যাইব কাছে ?

যা কিছু শকতি দেহে আছে,
লাগাতে পারি না তব কাজে !
কেমনে যাইব কাছে ?
দেবতা গো,
সঙ্কীর্ণ হৃদয় লয়ে কেমনে যাইব কাছে ?
কেমনে দাঁড়াব আমি এত বড় জগতের
মাঝে ?
তুমি নেও হাতে ধরে ভেঙ্গে যাক্ লাজ
ভয়,
তোমাতে সঁপিয়া দেই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ এ
হৃদয়।

সন্তোষ।

কেনরে পরের ছেলে ঘেরিয়া আমায় ?
এস নাক যাও সরে,
জান না ছুঁলে এ করে,
গাছের ফুটন্ত ফুল ঝ'রে পড়ে যায়।

কেন বাছা কাছে এসে
চাহিছ অমন হেসে,
কেন ও অমৃত ঢাল এ মরু হিয়ায় ?
ওই সুধা আধ বোলে
সাধ যায় নিতে কোলে,
কবেকার কথা আজি মনে পড়ে যায়।

কেনরে অধরে হেসে
চুম্বন দিলিরে এসে,
সপ্তস্বর্গ দ্বার আজি খুলে পুনরায়।

কচি মুখ মিষ্ট হাসি,
স্বর্গের অমৃত রাশি—
দেবতা-দুর্লভ ওযে মিলে তপস্যায়।

ও নয় আমার তরে,
এ মরু হৃদয় পুড়ে,
ফুটিয়া ও শিশু ফুল হাসি না হারায়।
এই করি আশীর্ব্বাদ,
মা বাপের মন-সাধ
পূরাও, সুখেতে থেকে 'সন্তোষ' ধরায়।

সংসারের অসন্তোষে,
রাগ কিম্বা ক্রূর দ্বেষে
পরশে না ও পবিত্র হৃদয় ছায়ায়।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।